উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

সুবর্ণ জয়ন্তী

১৩৫৪

মনুষ্যত্বের মূল্য নৈতিক মানদণ্ডে ধার্য করা ছাড়া বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই—আর পারস্পরিক প্রীতি-সখ্য-সততা ও পরার্থপরতাই মানবতার প্রকৃতরূপ। তাই **মহাত্মা গান্ধীর বাণী** আজ শুধু ভারতের নয়, আণবিক মারণযন্ত্র শক্তিও সমগ্র পৃথিবীর সাধক নয়।



শ্রীঅতীন্দ্রনাথ দে

প্রতিষ্ঠাতা

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী


इण्डिया साइकिल
फिटमेन्टस
THE INDIA CYCLE MFG. CO. LTD.
CALCUTTA
भारत में सब जगह मिलती हैं
CALCUTTA
दि इण्डिया साइकिल मैनुफैकचरिंग कं० लि० कलकत्ता

চিত্র-সূচী



উদ্বোধন

প্রস্তাবনা*

স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্ব্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস অর্থাৎ রাজা-রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম-ক্রোধ-ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচলিত সামাজিক চিত্র হয়ত প্রাচীন ভারতে একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান্ অপ্রতিহতবুদ্ধি—নানাভাবপরিচালিত—একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতেই নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে—তাহার প্রতি পাদবিক্ষেপে, রাজাদিপুরুষবিশেষ-বর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তর-ব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাতাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই জাতি মধ্য আসিয়া, উত্তর ইউরোপ বা সুমেরু-সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে শনৈঃপদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারতবহির্ভূত-দেশ-বিশেষনিবাসী একটী বিরাট্ জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন—কতিপয় ইউরোপীয় জাতির ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই সকল সিদ্ধান্তের আর কোনও প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন্ জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এ সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই।

তবে, যে জাতির মধ্যে, সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে

* 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩০৫, মাঘ) প্রথম প্রবন্ধ।—উঃ সঃ

—সেইস্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর—মানসপুত্র—তাঁহাদের ভাবরাশির—চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় সূত্রে, ভারতীয় চিন্তারুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে।

হয়ত আমাদের ভাগে সার্ব্বভৌমিক পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালাপরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-বিভূষিত একটী ক্ষুদ্রদেশে, অল্পসংখ্যক অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশীসমন্বিত লঘুকায় অটল-অধ্যবসায়-সহায়, পার্থিব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব্বক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন।

অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে যবন বলিত; ইঁহাদের নিজ নাম—গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্য্যশালী জাতি এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্য্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেইস্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙ্গালী আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্দ্ধা অনুভব করিতেছি।

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমন কি, একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীকমনের সৃষ্টি।"

সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্ব্বত সমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; এবং যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা-রেখা সুদূর-সম্প্রসারিত, এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীন কালে একবার ভারতীয় দর্শন-বিদ্যা গ্রীক-উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরাণী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্দ্ধভূভাগ ঈশাদিনামাখ্যাত অধ্যাত্ম-তরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্ব্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান; যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্যকার্য্যকারিতা, একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ,' অপরের 'ভোগ'; একের সর্ব্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ব্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণ-লাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকে অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছে, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্ত্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।

এযুগে পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্ত্তমান।

ইউরোপ, আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত

মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্য্যকুলের গৌরব নহে।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?

পুনর্ব্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে রন্তিদেবের কীর্ত্তির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্ব্বার সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?—গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষ্যসম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে বা মান্দ্রাজাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে অথবা পাঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌন-সম্বন্ধ মনূক্ত ধর্ম্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃ প্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় এক বর্ণমধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমন কি, একই দেশে জাতি এবং বংশভেদে, আচারের ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণ-স্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই—তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিদৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তিসঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?

এ পেষণেরই বা কি ফল?

দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়-বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্ম্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্ম্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তককণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্ব্বিতচর্ব্বণে, এবং

সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্ত্তনে; সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় ? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে ? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে ?

অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম, সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিককল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা "উদ্বোধনে"র জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে এই পাশ্চাত্যবীর্য্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া ভারত-ভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙ্গের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া যাই।

এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে—অসাধারণ—সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্ব্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্ব্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক্ হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ! যাহা দুর্ব্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্য্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ কে করে ?

কত পর্ব্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুর-তরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিভিন্ন প্রকারের ভাব, কত শক্তিপ্রবাহ—দেশদেশান্তর হইতে কত সাধুহৃদয়, কত ওজস্বী মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়া নব-রঙ্গক্ষেত্র কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোত-বাহন ও তড়িৎসহায় ইংরাজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব, রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে—ক্রোধ কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে—এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজের নাই। যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত শর্করা পর্য্যন্ত সকলই বহুবাগাড়ম্বরসত্ত্বেও নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে, ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।

"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য "উদ্বোধন" সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধি-বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্য্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর।



স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪

ব্লক ও মুদ্রণ
বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

অনাদি সুষুপ্তি ও তাহার ভঙ্গ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ

জীবের প্রথম জাগরণ কখন হয় তাহার কাল-নির্দ্দেশ চলে না। কারণ যখন জীব প্রথম জাগিয়া উঠে বস্তুতঃ তাহার পক্ষে তখনই কালের গতি আরম্ভ হয়। যখন জীব সুষুপ্ত থাকে তখন কাল স্তম্ভিতবৎ, থাকিয়াও থাকে না। নিদ্রা বা সুষুপ্তি অনাদি ও আদি ভেদে দুই প্রকার। আদিসৃষ্টির প্রথমে জীব প্রবুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ পথে যাত্রা করে। এই জাগরণ যে নিদ্রা হইতে হইয়া থাকে তাহাই অনাদি নিদ্রা, কারণ ঐ নিদ্রার পূর্ব্বে জীব জাগিয়াছিল না—বস্তুতঃ ঐ নিদ্রার পূর্ব্বাবস্থাই নাই। যদি পূর্ব্বাবস্থা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উহাকে আর অনাদি নিদ্রা বলা চলে না। প্রলয়ান্তে যে সৃষ্টি হয় তাহা সাদি নিদ্রা হইতে জাগরণ-ক্রমে হইয়া থাকে। আদিসৃষ্টির পূর্ব্বে খণ্ড-প্রলয় বা মহাপ্রলয় কিছুই ছিল না। তথাপি যদি প্রলয় শব্দের ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে উহাকে অনাদি নিদ্রারই নামান্তর বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে 'আদিসৃষ্টি' বলার কোনই সার্থকতা থাকে না। জীবভাবের ক্রমবিকাশের প্রথম সূত্রপাত আদিসৃষ্টিতেই হইয়া থাকে। অনাদি সুষুপ্তি অবস্থায় অনন্ত জীব অপৃথগ্‌ভাবে লীন থাকে। অনাদি সুষুপ্তির ঊর্দ্ধে যেখানে নিত্য চৈতন্য বিরাজ করিতেছে সেখান হইতেই অব্যক্ত ভাবে সুষুপ্তি মধ্যে অনন্ত জীবের সূচনা হয়। এই সুষুপ্তিটি বিশ্বমাতৃকা মহামায়া। যিনি এই মহামায়ার ঊর্দ্ধে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন তিনিই পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী, শিব-শক্তি বা ভগবান্-ভগবতীর নিত্যমিলিত অদ্বয়স্বরূপ। পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যবশে তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তি ব্যক্তচৈতন্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। চৈতন্যের আত্ম-প্রকাশের পূর্ব্বে শক্তি পরমেশ্বরের স্বরূপে গুপ্ত থাকেন। তখন এক দিকে যেমন শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না, তেমনি অপর দিকে পরমেশ্বরেরও আত্মোপলব্ধি হয় না। শক্তির অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভবপর নহে

অতএব শক্তির দুইটি অবস্থা বুঝিতে পারা গেল—একটি গুপ্ত অবস্থা এবং অপরটি প্রকট অবস্থা। শক্তি যখন গুপ্ত তখন এক মাত্র স্বরূপই থাকে, কিন্তু তাহা না থাকার সমান। শক্তি থাকিলেও তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভূতি-গোচর হয় না। ইহাই শিবের শব অবস্থা। ইহা এক প্রকার জড়ত্ব। কিন্তু শক্তি যখন প্রকট তখন তাহাকে চৈতন্য বলে। ইহার প্রভাবেই সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের স্ফুরণ হইয়া থাকে। শক্তির প্রকট বা চৈতন্য অবস্থাকে বিশিষ্ট আগমবিদ্‌গণ পরনাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় জড় নাই—শুধু চৈতন্যই চৈতন্য। পরনাদ বা চৈতন্যের প্রভাবে মহামায়ার ঘুমন্ত সত্তা ঝঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠে। মহামায়ার গতি চৈতন্যের প্রভাবেই নিরন্তর শক্তির অধীন হইতেছে। দৃষ্টিই শক্তি। ক্ষণভেদে অনন্ত দৃষ্টি যেন সেই মহামায়াসত্তায় সুপ্ত অনন্ত জীবরূপে বিলীন রহিয়াছে। এক দিকে 'রহিয়াছে' বলা চলে, আর এক দিকে লৌকিক প্রজ্ঞার অনুরোধে নিরন্তর 'হইতেছে' বলাও

চলে। এই বিলীন ভাব বস্তুতঃ অনাদি নিদ্রারই একটি অবস্থা। ঐ যে পরনাদের কথা বলা হইল, উহাই যেন বিশ্বগুরু শ্রীভগবানের ডাক। ঐ ডাকেই বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে।

পরনাদের প্রভাবে মহামায়া বা বিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে মহামায়ার কার্য্যরূপে অপর নাদের সূত্রপাত হয়। অপর নাদ শব্দরূপ জ্ঞান, পরনাদ শব্দাতীত বোধরূপ জ্ঞান।

জ্ঞান বোধরূপ ও শব্দরূপ—এই দুই প্রকার। বোধরূপ জ্ঞানও শব্দরূপে আরূঢ় হইয়া প্রবৃত্ত হয়। নতুবা তাহার প্রবৃত্তি থাকিত না। যখন মহামায়া হইতে সুপ্ত জীবসকল জাগিয়া উঠে তখন তাহারা যে জ্ঞানভূমিতে অবস্থান করে তাহা পরনাদরূপ সাক্ষাৎ চৈতন্য নহে এবং মায়িক জ্ঞানরূপ ভেদজ্ঞানও নহে। কারণ তখনও মায়ার ক্ষোভ হয় নাই। উহাই শব্দরূপ জ্ঞান যাহা বিন্দুজনিত নাদ বা অপর নাদের দ্বারা অনুবিদ্ধ। এই অবস্থায় নাদাত্মক মহাজ্ঞান হইতে তাঁহার পঞ্চধারা অবলম্বন করিয়া পঞ্চ-স্রোতোময় জ্ঞানধারা উপদেশরূপে আবির্ভূত হয়। ইহাই আদিগুরু এবং আদি ঈশ্বরকল্প সিদ্ধ জীবগণ প্রাপ্ত হইয়া 'আদি বিদ্বান্' নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

পরনাদরূপ চৈতন্য হইতে বিন্দুক্ষোভের পর আহতনাদের অভিব্যক্তি হইলে পঞ্চস্রোতোময় শাস্ত্র বা উপদেশাত্মক জ্ঞান আদিসৃষ্টিতে আবির্ভূত অধিকারী পুরুষগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে—এই মহাজ্ঞানের উপদেশ কাহার জন্য—সৃষ্টিধারায় অবতরণশীল প্রবৃত্তি-প্রধান জীবের জন্য, অথবা সংহারধারায় উত্থান-শীল নিবৃত্তিপ্রধান জীবের জন্য? ইহার উত্তর এই যে উহা উভয়েরই উপযোগী। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"স পূর্বেষামপি গুরুঃ।" 'পূর্বেষাং' শব্দে সৃষ্টির আদিকালের ঋষি, সিদ্ধ, কার্য্য-ঈশ্বর প্রভৃতি সকলকেই বুঝাইতে পারে। ইঁহারা সকলে সেই পরম স্থান হইতেই জ্ঞানের সেই পরম ভাণ্ডার হইতেই, আপন আপন যোগ্যতা অনুরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্যই ঋগ্বেদে অগ্নিকে "পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিঃ ঈড্যঃ" বলা হইয়াছে। 'পূর্ব' বা 'প্রত্ন' ঋষি হলেন তাঁহারা যাঁহারা সৃষ্টির আদিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'নূত্ন' হলেন তাঁহারা যাঁহারা সৃষ্টির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন বা হইতেছেন। পরমেশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছেন। তারপর ব্রহ্মা স্বয়ং বেদার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার গূঢ়ার্থ অনুধাবন করা আবশ্যক।

মনে রাখিতে হইবে মহামায়ারূপ বিন্দুতে দুই প্রকার জীব সুপ্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণী নিবৃত্ত্যভিমুখ এবং অপর শ্রেণী প্রবৃত্ত্য-ভিমুখ হইয়া বিন্দুক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়। যে সকল জীবাণু মায়ারাজ্যে পতিত হইয়া সংসারজীবন যাপন পূর্ব্বক উহার অবসানে পুনর্ব্বার স্বস্থানে ফিরিবার জন্য নিবৃত্তিপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, যুগপৎ বা ক্রমশঃ সকল তত্ত্ব ভেদ পূর্ব্বক মায়াতত্ত্বকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারা মহামায়াতে সুপ্তভাবে বিলীন থাকে। মায়াভেদ যে প্রকারেই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। এই সকল জীব নিবৃত্তিমুখী। ইহাদের মধ্যে যাহাদের আণব মল প্রলয়ের মধ্যকালেই পরিপক্ব হয়, তাহারা ঐ থান হইতেই ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। তাহাদিগকে আর নূতন সৃষ্টিতে অধিকারী প্রভৃতি রূপে আসিতে হয় না, কিন্তু যাহাদের অধিকারাদির বাসনা আছে তাহারা ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া বৈন্দব দেহ ধারণপূর্ব্বক কার্য্য-ঈশ্বরাদি রূপে অধিকারাদি প্রাপ্ত হন। বাসনা একেবারে না থাকিলে অধিকার লাভ ঘটে

না। বাসনাও মল বটে, কিন্তু ইহা অনাদি মল নহে; ইহা সাদি মল। এই সকল জীব বা অণু পরনাদের প্রভাবে নিজ স্বরূপ চিনিতে পারে এবং বিন্দুক্ষোভজন্য শুদ্ধ দেহ প্রভৃতি লাভ করিয়া ঈশ্বর দেবতা প্রভৃতি পদে বৃত হয়। পঞ্চ স্রোতোময় মহাজ্ঞানের উপদেশ ইহারাই প্রাপ্ত হয়। এই উপদেশবশতঃ ইহারা সকলেই বিভুত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞত্ব না থাকিলে ইহাদের দ্বারা ভগবানের সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চকৃত্যের সম্পাদন সম্ভবপর হইত না। ইহাদের সকলের মধ্যে ভগবানের কর্তৃত্বশক্তি ও করণশক্তি সমরূপে প্রতিফলিত না হইলেও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞানশক্তি সমরূপেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন বৈদিক ঋষির ভাষায় বলিতে পারা যায়—ইহারা সকলেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের নিকট বেদজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

যে সকল জীব অনাদি সুষুপ্তি হইতে সর্ব্বপ্রথম জাগিয়া উঠে, তাহারা পরনাদের প্রভাবেই জাগে; কারণ পরনাদরূপিণী চৈতন্যশক্তির আঘাত ব্যতিরেকে মহামায়া হইতে সুপ্ত জীবের আবির্ভাব হয় না। ইহারা প্রবৃত্তিমুখী জীব। ইহাদের লক্ষ্য এখনও বহির্মুখ। ইহারা জাগিয়া উঠিয়াই আত্মবিস্মৃত ভাবে চলিতে থাকে। বস্তুতঃ এই জাগরণ অর্দ্ধ জাগরণ। দ্বিতীয় জাগরণ পূর্ণ জাগরণ।

প্রথম জাগরণের ফলে বহির্মুখে গতি হয়। দ্বিতীয় জাগরণের ফলে অন্তর্মুখে গতি হয়। প্রথম জাগরণের পূর্ব্বাবস্থা অনাদি সুষুপ্তি। প্রথম জাগরণ হইতেই স্বপ্ন আরম্ভ হয়—ইহারই নাম অর্দ্ধ জাগরণ। দ্বিতীয় জাগরণ হইতে স্বপ্ন সমাপ্ত হইয়া প্রকৃত বা পূর্ণ জাগরণ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় জাগরণের পরে অন্তর্মুখী গতি যেখানে শেষ হয় তাহাই পূর্ণতম জাগরণ। কিন্তু তাহাকে আর জাগরণ বলা চলে না। তাহাই বস্তুতঃ তুরীয়। সাধারণ লোকে যাহাকে তুরীয় বলে ইহা তাহা নহে। ইহাকে সচেতন ভাবে প্রাপ্ত হইলেই সুষুপ্তিতে প্রবেশ সম্ভবপর হয়। সুষুপ্তিতে প্রবেশ ব্যতিরেকে ভগবত্তালাভের কথা অলীক কল্পনা মাত্র। যেখান হইতে স্বপ্নরূপে সৃষ্টির প্রারম্ভ, পুনর্বার সেই খানেই স্বপ্নান্তে মহাজাগ্রৎকালে পুনঃ প্রবেশ। এই জন্য নিবৃত্তি পথের যাত্রাটিও ঠিক জাগরণ নহে। প্রথম জাগরণের ফলে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয় জাগরণের ফলে নিজস্থানে ফিরিয়া আসা—তাহার পর আবরণ পূর্ণ হইলে সম্মুখ-পশ্চাতে যাওয়া-আসা, ভিতর-বাহির কিছুই থাকে না। সেই খানেই সুষুপ্তি ও জাগরণের সমন্বয় হয়। তখন সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, সগুণ ও নির্গুণ, সকল ও নিষ্কল, এক ও অনন্ত, এই সকল ভেদ চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আত্মবিস্মৃত হইয়াই জীব বহির্মুখে ধাবিত হয়। ইহার মূলে চৈতন্য আছে। তাহা না থাকিলে কোন প্রকার গতি হইতে পারিত না। অনাদি সুষুপ্তিতেও আত্মবিস্মৃতি থাকে বটে, কিন্তু চৈতন্যের প্রেরণার অভাববশতঃ বহির্গতি থাকে না। তদ্রূপ আত্মস্মৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবের গতি অন্তর্মুখী হইতে থাকে। ইহার মূলে ও চৈতন্যের প্রেরণা থাকে। যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলে আত্মস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞান-কৈবল্যরূপী সুষুপ্তি অবস্থার উদয় হইত। বৈন্দব দেহ লাভ করিয়া অন্তর্মুখী গতি হইত না। বহির্গতির সমমাত্রায় অন্তর্গতিসম্পন্ন হয় বলিয়া, বহির্গতির সংস্কারটি দগ্ধ হইয়া যায়। তখন আর ব্যুত্থানের সম্ভাবনা থাকে না।

সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য-শক্তি বহু হওয়ায় খেলিতে থাকে। যতক্ষণ বহু ভাবের সম্যক্ বিকাশ না হয় ততক্ষণ এই ইচ্ছা কার্য্য করিতে থাকে। ইহা কালের ঈক্ষণরূপে বীজ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া মহামায়ার গর্ভে সুপ্ত থাকে।

ইহাই সুপ্ত জীবসমষ্টি। এই সমষ্টিতে অনন্ত জীবাণু আছে বা পর পর সঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু এই সকল জীব সুপ্ত বলিয়া এক প্রকার জড় পদার্থের ন্যায় অস্তিত্বহীন না হইয়াও অস্তিত্বহীনের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল অণু অনন্তসংখ্যক হইলেও ইহাদের পরস্পর পার্থক্য এখন পর্য্যন্ত বিকশিত হয় নাই। এইগুলি সমষ্টিরূপে একাকারে সুপ্তভাবে বিলীন থাকে। যে মহা ইচ্ছা হইতেই ইহাদের আবির্ভাব তাহার পূর্ণতা এখনও বহুদূরে। কারণ সেই পরমপুরুষ বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াই এই ভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। যতক্ষণ বহু পুরুষের আবির্ভাব না হইবে ততক্ষণ পরমপুরুষের বহু হইবার ইচ্ছা সার্থক হইবে না। সত্য সত্যই বহু হওয়ার অন্য জীবকে স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিতে হইবে। পরমেশ্বরের ইচ্ছা মাতৃশক্তিতে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। সুতরাং একদিকে যেমন মহামায়াতে অণুসমষ্টি সঞ্চিত হয়, অপরদিকে তেমনি মায়াতেও হয়। কারণ মহামায়ার ন্যায় মায়াও মাতৃশক্তি। স্বাতন্ত্র্যপ্রভাবে কালের দিক্ হইতে নিরন্তর অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গমের ন্যায় জীবসৃষ্টি হইতেছে। সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—মহামায়াতে অথবা মায়াতে অথবা মহামায়া হইয়া মায়াতে ঐ সকল অণু সুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। মহামায়ার আদি নাই, মায়ারও আদি নাই। তাই ঐ সকল জীবের সুষুপ্তিও অনাদি নিদ্রা বলিয়া অভিহিত হয়। সাক্ষাৎভাবে অথবা পরম্পরাতে এই নিদ্রা হইতে জীবকে জাগায় পূর্ব্ববর্ণিত পরনাদ বা চৈতন্য। অর্থাৎ চৈতন্যের প্রভাবেই সুপ্ত জীব সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্ববর্ণিত সুষুপ্তি বস্তুতঃ অণু-সকলের রোধ অবস্থা। ঐ অবস্থায় পরমেশ্বরের অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান ও ক্রিয়া অর্থাৎ চৈতন্য বা ভগবত্তা প্রতি অণুর মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত থাকে, মল অথবা আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে। যে কারণে জীবের অনাদি নিদ্রার কথা বলা হয় ঠিক সেই কারণে তাহার অনাদি মল সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়। ইহাকে আপাততঃ পরমেশ্বরের নিগ্রহরূপে গ্রহণ করিলেও বাস্তবিক ইহাও অনুগ্রহেরই প্রকার ভেদ। যেখানে মূলসত্তাই মঙ্গলময় সেখানে নিগ্রহের উদ্দেশ্যও মঙ্গলময় না হইয়া পারে না।

ভগবানের স্বাতন্ত্র্য কালরূপে খেলিতেছে, ইহা বলা হইল। উহা তেমনি চৈতন্যরূপেও খেলিতেছে। একদিকে কালরূপে জীবাণু সকল সঞ্চয় করা হইতেছে, অপরদিকে চৈতন্যরূপে উহাদিগকে অনাদি নিদ্রা হইতে জাগান হইতেছে। কালের খেলার সঙ্গে যেমন চৈতন্যের যোগ আছে তেমনি চৈতন্যের খেলার সঙ্গেও কালের যোগ রহিয়াছে। কালের খেলা নিগ্রহ, চৈতন্যের খেলা অনুগ্রহ। চৈতন্যের প্রভাবে অনাদি সুষুপ্তি হইতে জীব জাগিয়া উঠে সত্য, কিন্তু একসঙ্গে সব জীব জাগে না, ক্রমশঃ জাগে। ইহাই চৈতন্যের উপর কালের প্রভাব।

এই জাগরণটি যে দুই প্রকার তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অভিনব জীবসকল যখন জাগিয়া উঠে তখন তাহারা বহির্মুখভাবেই জাগে। কারণ সৃষ্টিকর্ত্তার বহু হইবার ইচ্ছা এখনও সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হয় নাই। বহির্মুখ না হইলে বহু হওয়া যায় না এবং নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশও হয় না। এই সকল জীব বা অণু জাগিয়া উঠিয়াই নিজের এবং নিজধামের জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে। জীব যখন সুপ্ত ছিল, তখন তাহার বোধ ছিল না, সে অচেতন ছিল, তাহাতে আমিত্বভাব ছিল না। কিন্তু যখন সে জাগে তখন আমি-ভাব লইয়াই জাগে। ইহাই আমিত্বের প্রথম আবির্ভাব। এই 'আমি' বা 'বোধ' পরিদৃশ্যমান অনন্ত জ্যোতির সঙ্গে নিজের অভেদ উপলব্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু যেটি তার নিজের প্রকৃত স্বরূপ, যাহা এই জ্যোতিরও অতীত, তাহা সে

ধারণা করিতে পারে না। কারণ জীব এখন বহির্মুখ। এখন নিজ স্বরূপের উপলব্ধির সম্ভাবনা তাহার নাই। কারণ বহির্মুখ গতি পরিসমাপ্ত করিয়া অন্তর্মুখ গতি প্রাপ্ত না হইলে স্বরূপ দর্শন হইতে পারে না।

এই যে জ্যোতিঃস্বরূপে নিজের উপলব্ধি ইহা স্থায়ী হয় না। জীব জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়াও বহির্মুখ বলিয়া উহাতে স্থিত থাকিতে পারে না। সে বাহিরে তাকাইয়া একটি ছায়ার মতন জিনিস দেখিতে পায় এবং নিজেকে উহার সহিত অভিন্ন মনে করিতে থাকে। এই প্রকারে ব্রহ্মভাব হইতে ক্রমশঃ মহাকারণ, কারণ এবং সূক্ষ্মভাব ভেদ করিয়া স্থূল পর্য্যন্ত সে অবতীর্ণ হয়। অবতরণের ইহাই চরম সীমা। ইহার পর ভোগ। তাহার পর নিবৃত্তির মুখে সদ্‌গুরুর কৃপায় উর্দ্ধে আরোহণ।

এই আরোহণেই পূর্ব্ববর্ণিত দ্বিতীয় জাগরণের তত্ত্ব। ইহার প্রভাবে চরম অবস্থায় নিজের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারা যায়। তখন আর বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ কোন ভাবের সহিতই সম্বন্ধ থাকে না।

সৃষ্টিমুখে জীবকে প্রেরণ করা চৈতন্য বা গুরুশক্তিরই কার্য্য। তিনি জীবকে জাগাইয়া বাহিরে পাঠান, বাহিরে যাইতে যাইতে যেখানে যাহা কিছু গ্রহণ করিবার আছে তাহা গ্রহণ করাইয়া তাহাকে পুষ্ট করেন। এই ভাবে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব পৃথক পৃথকরূপে ফুটিয়া উঠে, তখন পুরুষ-আকার প্রাপ্তির ফলে পরমপুরুষের প্রতিবিম্ব ধারণের যোগ্যতা জন্মে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় জাগরণের আবশ্যকতা হয়। দ্বিতীয় জাগরণের পর পুরুষরূপে তাহার দিব্যভাবে বিকাশ পূর্ণ হইতে থাকে। এই প্রকারে ক্রমশঃ সে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ ও কৈবল্য দেহ ভেদ করিয়া নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবরোহের মূলে যেমন চৈতন্যের ক্রিয়া অর্থাৎ প্রথম জাগরণ, তেমনি আরোহণের মূলেও চৈতন্যের ক্রিয়া বা দ্বিতীয় জাগরণ রহিয়াছে।

প্রথম জাগরণ হইতে অর্থাৎ অন্নময় কোষের প্রথম গঠন হইতে মনোময় কোষের বিকাশ পর্য্যন্ত জীবের গতি বহির্মুখী। মনোময় কোষে থাকিতেই বিজ্ঞানের সঞ্চার বশতঃ দ্বিতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। তাহার ফলে অন্তর্মুখী গতি চলিতে থাকে। ব্রহ্ম-অবস্থা হইতে যখন মহাকারণ শরীরে অবতরণ হয় তখনই সর্ব্বপ্রথম নরলোকের সাক্ষাৎকার হয়। মহাকারণটি বিশ্ব। ইহাই নর। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে নর হইলেও ইহাও একপ্রকার প্রতিবিম্ব, প্রকৃত নর-স্বরূপ এখনও বহুদূরে। এই আকার কারণ-অবস্থায় অবতীর্ণ হইয়া লিঙ্গাত্মক ভাবরূপে ব্যক্ত স্থূল সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। বীজ যেমন ক্ষেত্রে পতিত হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। ইহার পর ক্রমশঃ যোনিভেদে স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হইতে থাকে। স্থাবর হইতে মনুষ্যযোনির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৮৪ লক্ষ যোনির কথা প্রসিদ্ধ আছে। উদ্ভিদ্, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু প্রভৃতি অগণিত বৈচিত্র্য আছে। প্রকৃতির ক্রম-বিকাশের অন্তর্গত যে কোন দেহে শুদ্ধ দৃষ্টি সঞ্চার করা যায় সেখানে অন্তরের অন্তঃস্থলে মনুষ্যের আকার দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য আকারটি ক্রম-বিকাশের ফলে ধীরে ধীরে অন্তঃস্থিত আদর্শরূপ মনুষ্য আকারের সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে। তখন প্রকৃতির বিকাশ আপাততঃ স্থগিত হয়। মনুষ্যদেহ লাভ করা ও অন্নময় কোষ হইতে মনোময় কোষ পর্য্যন্ত বিকাশ হওয়া একই কথা। ৮৪ লক্ষ যোনিপর্য্যন্ত প্রথমে অন্নময় ও তারপর প্রাণময় কোষের বিকাশ হইয়া থাকে। শেষদিকে মনোময় কোষের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। যথার্থ মনোময় কোষের বিকাশ মনুষ্য দেহেই সম্ভবপর হয়। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইলেই কর্ম্মে অধিকার জন্মে। সৎ ও অসৎএর বিচার, পাপপুণ্যের বোধ, কর্ত্তব্যনিশ্চয়, আভাসমাত্র

হইলেও বিবেকজ্ঞানের উদয়, কর্তৃত্ব-অভিমান প্রভৃতি মনুষ্যদেহের ধর্ম্ম। মনুষ্য নিজে কর্ত্তা সাজে বলিয়া প্রকৃতি তাহার গৃহ-রচনার ভার নিজের হাত হইতে প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করেন। মনোময় কোষ বিকশিত হইবার পর জীবের সংসার-দশা চলিতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্ম করা ও তাহার ফল ভোগ করা, ইহাই এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য। যে পরিণাম-প্রবাহে মনোময় কোষ পর্য্যন্ত বিকাশ হইয়াছে তাহা তখন নিরুদ্ধ থাকে। মানুষ তখন স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করে। এই স্বপ্নভ্রমণের নামই সংসার। বিচিত্র বাসনা অনুসারে বিচিত্র ভোগ সম্পন্ন হয়। যেমন চাওয়া যায় তেমনই পাওয়া যায়। কর্ত্তা সাজার ফলে প্রকৃতির সরল সৃষ্টি হইতে সরিয়া আসিয়া জটিল বিকারময় জালে জড়িত হইতে হয়। এইভাবে দীর্ঘকাল স্বপ্নরাজ্য ভোগ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অতৃপ্তি ও অবসাদে চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। তখন ভোগ্য পদার্থের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। জ্ঞান ও আনন্দময় একটি নিত্য বস্তুর জন্য প্রাণ কাঁদিতে থাকে। স্বপ্নের মোহ আর তখন ভাল লাগে না। নিজে আর তখন কর্ত্তা সাজিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। নিজের অজ্ঞান ও অক্ষমতা মুহুর্মুহু চিত্তকে ক্লিষ্ট করে। তখন মিথ্যা কর্তৃত্বভার ত্যাগ করিয়া পুনরায় শিশু হইয়া প্রকৃতি-জননীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে ইচ্ছা হয়।

ইহার পর দ্বিতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়। গুরুরূপা প্রকৃতি তখন তাহাকে জাগাইয়া নিজের কোলে টানিয়া লন। তাহার এতদিনকার স্বপ্নের খেলা-ঘর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। সে তখন শিশু হইয়া মাতৃকোলে উপবেশনপূর্ব্বক দ্রষ্টারূপে মায়ের সকল খেলা দেখিতে থাকে। প্রকৃতিমাতা তখন আবার গৃহ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গৃহটি বিজ্ঞানময় কোষ। ইহা রচনা করিতে অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিতে হয়। জীব তখন আর জীব নহে, মুক্তপুরুষ, কেননা সে সাক্ষী হইয়া প্রকৃতির খেলা নিরীক্ষণ করিতেছে। প্রকৃতি স্বকার্য্যে আর বাধাপ্রাপ্ত হন না বলিয়া নির্ব্বিঘ্নে রচনাকার্য্যে অগ্রসর হন। দ্বিতীয় জাগরণ হইতে অন্তর্জগতে বিন্দু পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করাই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের বিকাশ। আনন্দময় কোষের বিকাশই ভগবত্তা-লাভ। মহাকারণ দশায় যে আকারের প্রথম সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় জাগরণের পর অন্তর্মুখী গতির শেষে জীব তখন সেই আকারে স্থিত হয়। প্রথম জাগরণের পর বহির্মুখী গতি, দ্বিতীয় জাগরণের পর অন্তর্মুখী গতি—দুইটি গতি সমান সমান হইয়া গেলে ভিতর ও বাহির এক হইয়া যায়। ইহাই পরম স্বরূপে অবস্থান।

অনাদি নিদ্রার পর প্রথম জাগরণের কথা বলা হইয়াছে। এই জাগরণের পর বহুবার নিদ্রা আক্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু উহা সাদি নিদ্রা। দ্বিতীয় জাগরণের পর সাদি নিদ্রাও থাকে না, যাহা থাকে তাহা নিদ্রার আভাস মাত্র। অন্তর্মুখী গতি শেষ হইয়া গেলে আভাসও থাকে না। সুতরাং সেই মহাজাগরণকে বস্তুতঃ জাগরণ বলাও চলে না।

জাতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায়

ডক্টর কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট

'উদ্বোধন' পত্রিকার অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ণ হল। সেই আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে আমাদের জাতীয় শিল্পের উদ্বোধন সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি বলে পূজনীয় সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দজীকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

১৩০৫ সালের ১লা মাঘ পাক্ষিক পত্রিকারূপে যার জন্ম তার **'উদ্বোধন'** নামকরণ করেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। তার আগে কয়েক মাস (১৮৯৮) তিনি ভগ্নী নিবেদিতার সঙ্গে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে কাটিয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পাদি অবলম্বন করে যেসব বহুমূল্য প্রবন্ধ পরে লিখেছেন তার বিষয়বস্তু নিয়ে স্বামিজীর সঙ্গে তাঁর এই সময়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। আরো বছর দুই আগে—অর্থাৎ ১৮৯৬ ডিসেম্বর মাসে—দেখি স্বামিজীকে তাঁর পাশ্চাত্য ভক্ত ও বন্ধুরা এক বিদায়-সভায় সম্বৰ্দ্ধনা করেছেন লণ্ডনের Royal Society of Painters পরিষদে। সুতরাং শিল্পি-মহলে যে স্বামিজীর অনেক অনুরাগী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। চার বৎসর ভারতীয় আদর্শ ও বৈদান্তিক ঐক্যবাদ প্রচারে প্রাণপাত পরিশ্রম করে স্বামিজী দেশে ফিরেছেন; আগাগোড়া জাহাজে এলে বিশ্রাম হত। কিন্তু তিনি এলেন শরীর জখম করার পথ ধরে প্যারিস, মিলান্, পীসা, ফ্লরেন্স, রোম, নেপল্‌স্ প্রভৃতি শহরের জগদ্বিখ্যাত শিল্প-সংগ্রহগুলি শিষ্য-শিষ্যাদের দেখিয়ে। লণ্ডন থেকেই ভগ্নী নিবেদিতা ছিলেন রাস্‌কিন্ (Ruskin)-পন্থী, সুতরাং স্বামিজীর সঙ্গে শিল্প-কেন্দ্র পরিদর্শন যে কত বড় আনন্দের কারণ হয়েছিল তা আমরা কল্পনা করিতে পারি।

১৮৯৯ জুন মাসে নিবেদিতাকে নিয়ে (Master as I saw Him এই যুগের অপূর্ব্ব সৃষ্টি) স্বামিজী শেষবার পাশ্চাত্য দেশের বেদান্তকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে বেরুন। লণ্ডন, নিউইয়র্ক হয়ে ক্যালিফর্ণিয়াতে এসে সাত মাস কাজ করেন। এই সময়ে দেখি, স্বামিজীর প্রেরণায়, নিবেদিতা দুটি অধুনাপ্রসিদ্ধ অভিভাষণ দেন—(১) ভারতীয় নারী, (২) প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা (New York, Aug. 1899); সঠিক সন তারিখ তখনকার স্থানীয় পত্রিকাদি ঘেঁটে নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন যে স্বামিজী ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে বক্তৃতা দিতে নিবেদিতাকে কেন উদ্বুদ্ধ করেন এবং সেদিকে কতটা সাড়া জেগেছিল। নিবেদিতার যে ফরাসী জীবনী সম্প্রতি লেখা হয়েছে, তার মধ্যে এবিষয়ে কোন নতুন তথ্য নির্ণয়ের প্রমাণ পাইনি অথচ এই যুগেও প্রশ্নটির গুরুত্ব যে খুব বেশী আমি দেখাতে চেষ্টা করব।

১৯০০ অক্টোবর মাসে প্যারিসে পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাস কংগ্রেস * (Congress of the History of Religions) বসে। ভারতের প্রতিনিধিরূপে স্বামিজী উহাতে যোগ দেন এবং অন্যান্য আলোচনার মধ্যে একটি গভীর বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন; সেটি

* [Complete Works of Swami Vivekananda, Vol IV, pp. 355-362]

"ভারতীয় শিল্পের উপর তথাকথিত গ্রীক-প্রভাব" নিয়ে। ঐতিহাসিক সংযোগের ভিতর দিয়ে আদান-প্রদান হওয়া স্বাভাবিক এবং গ্রীকরাও যেমন অনেক কিছু ভারতের কাছ থেকে নিয়েছে, তেমনি ভারতীয় শিল্পীরাও গ্রীক-শিল্পীর কাছ থেকে কিছু নিয়েছে; কিন্তু একথা সত্য নয় যে ভারতীয় শিল্পের প্রাণ গ্রীক-প্রভাবে কোন সময়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল। স্বামিজীর একথা ইন্দো-গ্রীক শিল্পবাদী ফরাসী অধ্যাপক Foucher শুনেছিলেন কিনা জানিনা। এ সব কথা ভারত-শিল্পি-বন্ধু হ্যাভেল তথনও স্পষ্ট করে লিখেননি এবং আনন্দকুমার-স্বামী তথনও শিল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষানবীসি করছেন। অথচ এত বৎসর আগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের গবেষণার পূর্ব্বাভাস দিয়ে গেলেন—তার সাক্ষী ছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও Prof. Patrick Geddes; স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস থেকে Miss Mc Leod, ভগ্নী নিবেদিতা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন শিল্প তীর্থ-পরিক্রমা (Oct-Dec-1900): এবার তিনি চিত্র ভাস্কর্য্যাদি শুধু দেখাচ্ছেন না, তুলনামূলক আলোচনা ও মন্তব্য করছেন। চোখের সামনে ভেসে চলেছে পাশ্চাত্য শিল্প-ধারা—Austria, Hungary, Servia, Rumania, Bulgariaর বড় বড় চিত্রশালা তন্ন তন্ন করে দেখে স্বামিজী ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রাচ্য-শিল্প-নিদর্শনগুলিও পরীক্ষা করেন। পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে শিল্প-প্রভাব কত ভাবে গিয়েছে, কী আগ্রহ সেটি বুঝবার ও বুঝাবার। মিশরের বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ও অন্য শিল্পবস্তু নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠলেন যে উদার প্রান্তরে সঙ্গীদের সে বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ভারতের তথা এশিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তথন শিল্পের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতার কল্পনাও জাগেনি, কারণ সেখানে শুধু শিল্পী নয়, শিল্পও যেন অস্পৃশ্য (untouchable)! স্বামিজী এক্ষেত্রে সত্যই পথিকৃৎ (pioneer); অথচ তাঁকে আমরা মনে রাখিনা যথন ভারতীয় শিল্পের নব জাগরণ বিষয়ে আলোচনা করি।

১৯০১ সালের গোড়ায় দেখি স্বামিজী বেলুড়ে ফিরেছেন। * ১৮৯৮ সালে ঠিক তিন বছর আগে গঙ্গাতীরে জমি কিনে যথন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন তথন নিজেই স্বামিজী এক বিরাট মন্দিরের পরিকল্পনা শুধু ধ্যানে নয় নক্সায় তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পে, তাঁর অধিকার পুঁথিগত নয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। পায়ে হেঁটে ভারতের প্রধান প্রধান সব মঠ মন্দির স্বামিজী যেমন তন্ন তন্ন করে দেখেছিলেন এমন কম প্রত্নতাত্ত্বিক বা শিল্পের ঐতিহাসিকরা দেখেছেন। ১৮৮৮-১৮৯২ সালের হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সব তীর্থই তিনি পরিদর্শন করেন। আবার জীবন-দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে শেষবার মায়াবতী থেকে কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ঘুরেছিলেন (১৯০১-২)। রোগে যথন প্রায় শয্যাশায়ী তথন হঠাৎ জাপানী ভিক্ষু Rev. Oda ও প্রাচ্য শিল্পের বিশেষজ্ঞ চৈনিক চিত্রকলার চরম সমজদার Count Okakura ১৯০১ সালের শেষে স্বামিজীর কাছে উপস্থিত হলেন। আট বৎসর আগে Chicago ধর্ম্ম-সম্মেলনে যোগ দেবার পথে স্বামিজী চীন থেকে জাপানে আসেন; এবং সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সাল থেকেই প্রাচ্য শিল্প ও জাপানী শিল্পীদের বিষয়ে স্বামিজী খবর রাখতেন। Oda ও Okakura এই স্বামিজীকে আবার জাপানের ধর্ম্মসম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন—কিন্তু সে আশা অপূর্ণ থেকে যায়। জীর্ণ শরীর নিয়ে তবু স্বামিজী জাপানী অতিথিদের ও সেই সঙ্গে মহাবোধি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অনাগারিক

* 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'—উত্তরকাণ্ড; পৃঃ ৭৯-৮৮, জুবিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাসগুপ্তের সহিত কথোপকথন।

ধর্ম্মপালকে নিয়ে বুদ্ধগয়া ও কাশী-পরিক্রমা শেষবার করেছিলেন। ভগ্নী নিবেদিতাও সঙ্গে ছিলেন। নিবেদিতার রচনাবলী থেকে আজ ভাল করে দেখা উচিত তিনি ভারতীয় শিল্প নিয়ে এত গভীর আলোচনা করেছিলেন কোন্ প্রেরণায়।

ভগ্নী নিবেদিতাই আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার প্রভৃতিকে নিয়ে আর একবার বৌদ্ধ-তীর্থ-পরিক্রমায় বিহার ভ্রমণ করেন। এবং জগদীশচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবাসী (১৯০১) ও Modern Review পত্রিকার সাহায্যে নিবেদিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্ম্মিরূপে ভারতের নব-শিল্পের প্রচারে নামেন (শ্রীমতী শান্তা দেবী: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৫৩, ৮৭, ৯৬, ১৫৩-৫৮)।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায় আধুনিক ভারত-শিল্পের ইতিহাসে পরম গৌরবের স্থান অধিকার করবে বলে আমার বিশ্বাস; অথচ এই দিকে গবেষণার যে উদার ক্ষেত্র রয়েছে সে বিষয়ে আজও অনেকে সচেতন হননি। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব ও শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বশিল্প-দরবারে আবির্ভাব; এ সালের Studio পত্রিকা লণ্ডন থেকে তাঁর অধুনাপ্রসিদ্ধ 'বুদ্ধ ও সুজাতা' প্রভৃতি চিত্রগুলি উপযুক্ত বর্ণবিন্যাসে প্রকাশ করে। সে যুগ থেকে ১৯১১ সনে যখন দেহত্যাগ করেন তখন পর্য্যন্ত ভগ্নী নিবেদিতা একা অবনীন্দ্রনাথের ও নন্দলাল প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের কত ছবির লিপি-ভাষ্য নানা প্রবন্ধে বিশেষতঃ প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকার "চিত্রপরিচয়ে" রেখে গেছেন! ভারতবাসীদের বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পি-সঙ্ঘের সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ নিবেদিতার উপযুক্ত স্মৃতি স্থাপন করে ঋণ পরিশোধের কথা ভাবা উচিত।

১৯ শতকের শেষ দশকে অবনীন্দ্রনাথও আভাসে জানিয়েছেন যে তাঁর জীবনে যেন এক বিপ্লবের ঢেউ জেগেছিল। পাশ্চাত্য শিল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করে কেরল-শিল্পী রবিবর্ম্মা প্রচুর সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জ্জন করেন। অবনীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য রীতিতে হাত পাকিয়ে তুলছেন, এমন সময় দেখা দিলেন মনীষী E B Havell; তাঁর সহানুভূতি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে এক নূতন পথের নির্দ্দেশ দিয়েছিল। ক্যানভাসে আঁকা বড় বড় তৈল-চিত্র বিসর্জ্জন দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আঁকতে লাগলেন "কৃষ্ণলীলা", রূপকথার নায়ক-নায়িকা এবং ক্রমশঃ ১৯০১-১৯০৫ সালের মধ্যে বুদ্ধ ও সুজাতা, ভারতমাতা প্রভৃতি অমর চিত্রাবলী। সেই বিরাট জাতীয় আন্দোলনের যুগে সংস্কৃতি-কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে আবার অতিথি হয়ে এলেন Count Okakura এবং তাঁর সঙ্গে চিত্রকর Taikwan যিনি জাপানী আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। রুষ-জাপান যুদ্ধের (১৯০৫) আগেই প্রকাশিত হয় Okakura র "Ideals of the East"; এবং ক্রমশঃ Havell সাহেবের "Indian Sculpture and Painting" প্রভৃতি বইগুলি ছাপা হয়ে ভারতীয় শিল্পের আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজ গুণী গগনেন্দ্রনাথ শুধু নিজেদের ছবির ভিতর দিয়ে নতুন করে জাতীয় জাগরণের ইতিহাস লিখে সন্তুষ্ট হননি; তাঁরা গড়ে তোলেন উপযুক্ত শিষ্যমণ্ডলী, যাঁদের মধ্যমণি হয়ে আছেন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু। তাঁকে দেখা মাত্র ভগ্নী নিবেদিতা যেন দিব্য দৃষ্টিতে চিনেছিলেন যে ভারত-শিল্পের ধুরন্ধর হবেন তিনি; অবনীন্দ্র-নাথের মানস-পুত্র নন্দলালকে তাই নিবেদিতা অজন্তা-গুহা-চিত্রাবলী নকল করতে পাঠান (১৯১০) Lady Herringham এর সঙ্গে।

ইতিমধ্যে Indian Society of Oriental Art প্রতিষ্ঠিত হল (১৯০৭-৮) কলিকাতায়। Justice Woodroff প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ ভারত-বন্ধু-ছাড়া দেখি Lord Kitchener ও পরে Lord Carmichael স্বদেশী শিল্পের বিদেশী সমজদার-রূপে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেমন অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ গুণীরা নানা শিল্প-প্রসঙ্গ করেছেন, তেমনি ভগ্নী নিবেদিতাও ভারত-শিল্প-সাহিত্যের মর্ম্মকথা তাঁর অনুপম ভাষায় লিখে গেছেন প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকায়। নিবেদিতা ও রামানন্দের সহযোগিতায়, সাধারণের বিরুদ্ধ-সমালোচনার মধ্যেও নব্যভারত-শিল্প কি ভাবে বেড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি। (Nivedita : The Civic and National Ideals, pp. 73-148); তার মধ্যে এসে হাজির হলেন সিংহল-ভারতের উপযুক্ত সন্তান আনন্দকুমারস্বামী; তিনি ছাপালেন তাঁর Art and Swadeshi, তারপর Mediaeval Sinhalese Art এবং তারপর, প্রায় তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৯৪৭), চল্লিশ বছর ধরে, কত বিচিত্র গভীর শিল্প-সন্দর্ভ! তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে নীরবে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়ে মনে পড়ল ভগ্নী নিবেদিতা সম্বন্ধে যে কয়ছত্র কুমারস্বামী লিখেছিলেন: "Sister Nivedita's untimely death in 1911 has made it necessary that the present work (Myths of the Hindus and Buddhists,* 1913) should be completed by another hand. A most sincere disciple of Swami Vivekananda who was himself a a follower of the great Ramakrishna, she brought to the study of Indian life and literature a sound knowledge of Westen educational and social science and an unsurpassed enthusiasm of devotion to the peoples and the ideals of her adopted country. Through these books Nivedita became not merely an interpreter of India to Europe, but even more, the inspiration of a new race of Indian students no longer anxious to be Anglicized, but convinced that all real progress, as distinct from mere political controversy, must be based on national ideals, upon intentions already clearly expressed in Religion and Art." অর্থাৎ ১৯১১ সালে ভগ্নী নিবেদিতার অকাল মৃত্যুর দরুণ তাঁর অসমাপ্ত 'হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণ-কাহিনী" গ্রন্থের সম্পাদন ভার আর একজনের (কুমারস্বামীর) উপর পড়ে। মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠা শিষ্যা ছিলেন নিবেদিতা। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী হয়ে তবেই ভারতের জীবন-প্রণালী ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতের আদর্শ বিষয়ে ও তার নরনারীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আন্তরিকতা সত্যই অতুলনীয়। নানা প্রবন্ধ পুস্তকাদির ভিতর দিয়ে লেখিকা নিবেদিতা পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারতের মুখপাত্রী হয়ে ছিলেন তা নয়, তিনি অনুপ্রাণিত করছিলেন

* গ্রন্থখানিতে অবনীন্দ্রনাথের ৫ খানি প্রসিদ্ধ চিত্র, নন্দলালের ১৬ খানি, ক্ষিতীশ মজুমদারের ৭ খানি, ভেঙ্কটাপ্পার ৭ খানি, সুরেন করের ২ ও অসিত হালদারের ১ খানি রঙীন চিত্র আছে।

এক অভিনব ভারতীয় ছাত্র-গোষ্ঠীকে যারা আর সাহেব হওয়াকে পরমার্থ মনে করবে না, যারা মনে প্রাণে বুঝেছিল যে রাজনৈতিক তর্ক-যুদ্ধের উপরে যে শাশ্বত প্রগতির ক্ষেত্র রয়েছে—তার আসল ভিত্তি জাতীয় আদর্শ চেতনা ও সাধনা যেটি ভারতের ধর্ম্ম ও শিল্পের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।"

ভারতের ধর্ম্ম শুধু পরকাল আর পরলোক আশ্রয় করে আছে এধারণা যে কত বড় মিথ্যা তা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অগ্নিময়ী বাণীর ভিতর দিয়ে ও চরম আত্মোৎসর্গের সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্যা নিবেদিতা সেই চিরন্তন ধর্ম্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মাধুর্য্যভরা ছোটখাট আচার-অনুষ্ঠানের যোগ কত গভীর সেটি তাঁর রচনায় তাঁর সেবায় প্রমাণ করে গেছেন। তাই নন্দলাল বসুর 'সতী' চিত্রখানির অমন গভীর ব্যাখ্যান তিনি লিখে যেতে পেরেছেন। সতী চিত্রখানি জাপানের সর্ব্বপ্রধান শিল্প-পত্রিকা *Kokka* তে প্রকাশিত হয় এবং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যেরা যে এক নব যুগের আরম্ভ করেছেন সেটি বিশ্বের শিল্পিমহলে প্রমাণ হয়ে যায়।

কালের ধর্ম্মে শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা ভিন্ন খাতে বইবে সেটা স্বাভাবিক এবং আধুনিক ভারতের শিল্প তার নূতন ভাষা ও ছন্দ খুঁজে নেবে। কিন্তু বিবেকানন্দ-নিবেদিতার তথা অবনীন্দ্র-নন্দলালের যুগকে অস্বীকার করে কোন শিল্প-ইতিহাস দাঁড়াতে পারবে না। যে গভীর ভাব-স্রোত থেকে অন্তহীন রূপলহরী ভেসে উঠেছে সেটি বুঝতে হলে রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সাহিত্য-সাগরে ডুব দিতে হবে।

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ-যুগের ভাব যে বাঙলার শিল্পে সার্থক রূপ পেয়েছে সে বিষয়ে আজ কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে ভগ্নী নিবেদিতাকে আমরা হারিয়েছি অকালে; এবং তাঁরপর শিল্প-ভারতীর সার্থক ভাষ্য আজ পর্য্যন্ত আমরা কমই পেয়েছি; শুধু অলিখিত ইতিহাসের জের টেনেই আমরা চলেছি, ভারত-শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস লেখা বাকী আছে।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-যুগ ও আধুনিক ভারতের শিল্পধারার মধ্যে যোগ-সেতু হয়ে আছেন একমাত্র অমর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। শরীর তাঁর ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু মনে প্রাণে আজও তিনি চিরতরুণ বিপ্লবী রূপদক্ষ যিনি 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন অরূপ রতন আশা করি'। অরূপলোকের আভাস ভরে আছে তাঁর অন্তহীন রূপজগতের প্রত্যেক সৃষ্টিতে। তাঁর ৭০ বছরের জন্মদিনে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে এই ক্ষোভ মনে জেগেছিল যে এত বড় সাধক-শিল্পী আমাদের দেশে জন্মে, কী ঐশ্বর্য্য কত বড় উত্তরাধিকার দিয়ে গেলেন অথচ আমরা তাঁর উপযুক্ত কিছুই করতে পারিনি! তিনি অবশ্য আমাদের নিন্দা প্রশংসার উর্দ্ধে আছেন; তাঁর সার্থক রূপ-সৃষ্টিতেই তিনি অমর। তবু এ যুগের তরুণ সৌন্দর্য্যোপাসক-উপাসিকাদেরও একটা দায়িত্ব আছে; তাঁরা শিল্পগুরুর কাছে বসে, তাঁর স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সাধনার কিছু কাহিনী, কিছু সঙ্কেত সংগ্রহ করে অনাগত যুগের শিল্পীদের উপহার দিয়ে যেতে পারেন। রূপরাজ্যে অবনীন্দ্রনাথের অভিসার-পদাবলী অরূপলোকের সন্ধান দেবে বলে আমার বিশ্বাস, তাই 'উদ্বোধনের' জয়ন্তী-সংখ্যায় একথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

ঠাকুর

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মানুষের মনে যত ব্যাকুলতা
অন্তর হোতে যত আহ্বান ওঠে
স্বর্গের পানে আকুল প্রার্থনায়,
মর্ম ছিঁড়িয়া রাঙা শতদলে
যুগ-যুগান্ত যত হোল তার পূজা ;
যত উদাত্ত গভীর মন্দ্রে
স্তবগান তার উঠিল গগন ভেদি'
সাধনার ধন পেয়েছে কি সবে
দেবতার পায়ে মিলিয়াছে আশ্রয় ?
মন্ত্রমুগ্ধ দেবতার মন
সকলের তরে হয়েছে কি চঞ্চল ?
সুখ-স্বর্গের রত্ন-আসন
পশ্চাতে ফেলি—মর্ত্তের ধূলি মাঝে
কদাচ কখনও দেবতা নামিয়া আসে।

সকল সাধনা হয়নি সফল,
কত শতদল শুকায়ে ঝরিল ভুঁয়ে,
কত যে মন্ত্র পেল না চরণ-ছোঁয়া ;
তবুও সাধনা নহেত বিফল
যুগ হোতে যুগে বহিছে তাহার ধারা
সেই সে ধারায় ভারত তীর্থভূমি ;
শত সাধকের পুণ্যে প্রবাহ এখনও অব্যাহত।

হেথা বাঙলার ভাগীরথী তীরে দেখেছিনু
ভগীরথে
হৃদয়-শঙ্খ বাজায়ে আনিল মরা গঙ্গায় বান !
দেখিনু গঙ্গাতীরে
বহুদিনকার স্মৃতির উজল রেখা
চির ভাস্বর অনুপম সুন্দর।
সেথা সূর্য্যের আলোয় দেখিনু
মায়ের দেউল-তলে
ধ্যান-নিমগ্ন দরিদ্র পুরোহিত,
আননে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতি
সে জ্যোতি মায়ের প্রসন্ন বরাভয় ;
নিশ্চল দেহ, অপলক আঁখি
সহাস্য মুখে পাষাণ-নিশ্চলতা
ধ্যানী বুদ্ধের খোদিত মূর্ত্তি যেন।
মনে হোল যেন দেবতার পায়ে
পূজারী সঁপেন চরম অর্ঘ্য তাঁর,
মনে হোল যেন ধীরে ধীরে সেথা
পাষাণ প্রতিমা হোতে
স্নেহময়ী মাতা এল বাহিরিয়া
বুক ভরা তাঁর অপার গভীর স্নেহ,
জ্যোতি-তরঙ্গে মন্দির আলোকিত।
পুলক-আবেগে সহসা মেলিয়া আঁখি
পূজার আসনে পূজারী মূর্চ্ছাহত।

জ্ঞান-প্রবুদ্ধ সফল-সিদ্ধি
পূজারী বসেন উঠে,
সম্বিৎ ফিরে আসে ;
সম্বিৎ যেন জাগিল স্তব্ধতায় ;
মুখে শুধু ধ্বনি—অমর মাতৃ-নাম ;
হৃদয়-আসন মেলিয়া দিলেন
দেবতা সেথায় হলেন আবির্ভূতা,
সাধনার মাঝে পূর্ণ মনস্কাম।

নহে সন্ন্যাসী ; জটাজূটধারী
ত্রিপুণ্ড্র ভালে, কটিতে বাঘাম্বর,
রুদ্রাক্ষের মালা নাই গলে
ত্রিশূল নাহিক ভয়বাসি যাহে চিতে,
এ যেন আমার একান্ত আপনার ;
যেন পরিচয় কতদিনকার
স্বীয় মহিমায় যেন আরাধ্যতম,
প্রশান্ত মুখে মৃদু হাস্যের তরঙ্গ ওঠে নামে,
যারে পায় তারে জড়াইয়া ধরে বুকে।
সে বুকের ছোঁয়া যে পেয়েছে তার
নবজন্মের অমৃত হয়েছে লাভ,
ঠাকুরের হাতে মায়ের প্রসাদ
নরজীবনের পরম আশীর্ব্বাদ।



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের বাণী

উদ্বোধনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে আমি আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত এই পত্রিকাখানি গত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ যে ভাবে ভারতের ধর্ম, দর্শন ও প্রাচীন সংস্কৃতির বার্তা দেশবাসীর ঘরে ঘরে বহন করিয়া আসিয়াছে তাহা সত্যই গৌরবের বিষয়। উদ্বোধনের এই সেবাব্রত ভবিষ্যতে আরও সুপ্রসারিত হইয়া বহুকাল অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হউক ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা।

বেলুড়—
১৬ই-কার্ত্তিক ১৩৫৪

বিরজানন্দ—

'উদ্বোধনে'র আদর্শ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সার্দ্ধ শতাব্দী পর 'উদ্বোধনে'র জন্মদিনে তাহার ঘোষিত আদর্শের কথাটাই আজ সর্ব্বাগ্রে মনে আসিল। এই আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, এবং 'উদ্বোধনে'র মধ্য দিয়া উহা প্রচারের ভার দিয়াছিলেন তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের উপর। 'উদ্বোধনে'র মধ্য দিয়া জাতির সেবায় যাঁহারা শক্তি সামর্থ্য মনীষা নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই জীবনের পুণ্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের পতাকাবাহী সেই সকল সাহসী যোদ্ধার কথা আজ বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে। সেদিন সামাজিক তীব্র বিরুদ্ধতা ছিল, বহুর তামসিক জড়ত্ব ছিল, না ছিল সহানুভূতি, না ছিল আনুকূল্য। গুরু-পুরোহিত-গণৎকার-শাসিত সমাজে লোকাচার ও দেশাচারের অন্ধ অনুগামী প্রস্তরীভূত কুসংস্কারের উপর স্বাধীনচিন্তার আঘাত হানিবার জন্য সেদিন 'উদ্বোধনে'র দুঃসাহসিক অভিযান আজ কল্পনা করা কঠিন।

বলা বাহুল্য কেবল পারলৌকিক মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করিবার জন্য বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠা করেন নাই; শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ বা আর্য্য-সমাজের মত কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। আর্য্য জাতির উদার সার্ব্বভৌমিক অধ্যাত্মসাধনাকে তিনি বহু শতাব্দীর বিকৃতি হইতে উদ্ধারের জন্য অদ্বৈতবেদান্তের দৃঢ়ভূমির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের এই ভয়াবহ বৈষম্য হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য বেদান্তের তত্ত্বগুলি কর্ম্ম-জীবনে প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক বোধ ছিল তীব্র ও তীক্ষ্ণ। কি ধর্ম্মচিন্তা ও সাধনা, কি সামাজিক ব্যবস্থা, কোনটাকেই তিনি সনাতন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সামাজিক অধঃপতন ও ধর্ম্মসাধনার বিকৃতি এ দুইকে তিনি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন। সামাজিক অধঃপতনের জন্য ধর্ম্মকে দায়ী করিয়া যাঁহারা ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্যর্থ প্রয়াসের সমালোচনা করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "হিন্দুরা নিশ্চয়ই তাহাদের ধর্ম্মত্যাগ করিবে না, তবে ধর্ম্মকে যথাযথ সীমার মধ্যে রাখিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতের সমস্ত সংস্কারকগণ এই এক মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন যে পুরোহিতকুলের বীভৎস বিধান ও অধঃপতনের জন্য ধর্ম্মই দায়ী, অতএব তাঁহারা সেই অবিনাশী সৌধ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিলেন। ফল কি হইল? ব্যর্থতা!! বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্য্যন্ত এই ভুল করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ-প্রথার ভিত্তি ধর্ম্মের উপর এবং তাঁহারা ধর্ম্ম ও জাতিভেদকে একসঙ্গে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ব্যর্থকাম হইয়াছেন। কিন্তু পুরোহিতদের সমস্ত প্রকার প্রলাপোক্তি সত্ত্বেও জাতিভেদ-প্রথা একটা অচলায়তন সামাজিক ব্যবস্থা মাত্র। উহা তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে, এই মৃতভার অপসারণ করিবার জন্য জনসাধারণকে তাহাদের সামাজিক ব্যক্তিস্বাধীনতা ফিরাইয়া দিতে হইবে।" (২রা নভেম্বর, ১৮৯৩)

ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত

বিবেকানন্দ কেবল কবির উদ্দাম ভাবাবেগ লইয়া তাঁহার জাতিকে ভালবাসেন নাই, সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি বর্ত্তমান ভারতের সমস্ত স্তরের প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কত উত্থান-পতন অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া এই জাতি বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার যেমন ঐতিহাসিক সম্বিদ ছিল, তেমনি ভাবী পুনরুত্থান সম্বন্ধেও তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না। ভারতের অধ্যাত্মজগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সহিত এইখানেই বিবেকানন্দের পার্থক্য। একের সাধনায় একের যোগবলে বহুর উন্নতি সম্ভব, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না, অপরকেও বিশ্বাস করিতে বলিতেন না। সমষ্টির দ্বারা সমষ্টিমুক্তি ইহাই ছিল তাঁহার সাধনা। সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার চিত্ত বিষাদে ভরিয়া উঠিয়াছিল, দীন দরিদ্র অজ্ঞ পদদলিতদের প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী যাহারা অত্যাচার করিয়া ভারতভূমিকে নরকে পরিণত করিয়াছে, সেই সকল ধনী শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয়কে কশাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন,—"আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই দেশকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছি। কারণ ভিন্ন কি কার্য্য হয়? পাপ না করিলে কি শাস্তি আসে? যাহা দেখিলাম, বিশেষভাবে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দেখিয়া আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। কন্যাকুমারীর মন্দিরের পাদদেশে, ভারতবর্ষের সর্ব্বশেষ প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া আমার মনে এক নূতন পরিকল্পনার উদয় হইল। আমরা লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসী লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বেড়াই—নিছক পাগলামী! আমাদের গুরুদেব বলিতেন, 'খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।' একমাত্র অজ্ঞতার জন্যই দরিদ্র ব্যক্তিরা পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে। আমরা যুগ যুগ ধরিয়া উহাদের রক্তশোষণ করিতেছি এবং পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিয়াছি।" (১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৪)

হিন্দুসমাজ ও সভ্যতার এই দুর্গতি একদিনে হয় নাই। জনসাধারণকে হতবীর্য্য ও পশুপ্রায় রাখিয়া প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাসের কলঙ্কমলিন কাহিনী উদ্ঘাটন করিয়া স্বামিজী বলিয়াছেন,—"কোথায়, ইতিহাসের কোন্ স্তরে তোমাদের দেশের ধনী ও অভিজাতবর্গ, তোমাদের পুরোহিত ও সামন্ত নৃপতিরা দরিদ্রের জন্য কিছু চিন্তা করিয়াছেন? অথচ ইহাদের শ্রম অপহরণ করিয়াই উহাদের শক্তি! * * ক্রমে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, প্রকৃতির অভিশাপ নামিয়া আসিল। যাহারা দরিদ্রদের রক্ত শোষণ করিয়াছে, তাহাদের অর্থে জ্ঞানবিদ্যা করায়ত্ত করিয়াছে এবং তাহাদের দারিদ্র্যের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্যের সৌধ গড়িয়াছে—তাহাদেরই শত সহস্র দাসের মত বিক্রীত হইতে লাগিল, তাহাদের স্ত্রী-কন্যা অপমানিতা হইল, তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল—তোমরা কি মনে কর গত এক সহস্র বৎসরের এই সব ঘটনার কোন কারণ নাই?

"ভারতের দরিদ্রদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যায় মুসলমান কেন? তরবারী-বলে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, একথা বলা মূর্খতা। জমিদার ও পুরোহিতের দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্যই তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ তোমরা দেখ, বাঙ্গলাদেশে কৃষকদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক; কেননা বাঙ্গলায় জমিদারের সংখ্যা অধিক। পদদলিত অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উদ্ধারের কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার গ্রাজুয়েট লইয়া একটা নেশন তৈয়ারী হয় না। সত্য কথা, আমাদের সুযোগ সঙ্কীর্ণ—তথাপি অন্নবস্ত্রের দিক হইতে ত্রিশ কোটি লোকের উন্নতি করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন লোক অশিক্ষিত—কে ইহা চিন্তা করে? তথাকথিত দেশপ্রেমিক বাবুর দল?" (১৮৯৪, নভেম্বর)

অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর অদ্বৈত বেদান্তী শঙ্করাচার্য্য যে প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন, ঋগ্‌বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বৈদিক সভ্যতার ছয় হাজার বৎসর পরেই তাঁহার সমসাময়িক সামাজিক ভেদনীতিকে যেভাবে কৌশলপূর্ব্বক ঋষিদের দোহাই দিয়া সমর্থন করিয়াছেন; সেই বেদ-বেদান্তের যুক্তি ও সত্য লইয়াই বিবেকানন্দ পারমার্থিক ও লৌকিক সত্যের ব্যবধান বিলুপ্ত করিবার জন্য তাহার জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহা যে কতবড় বৈপ্লবিক পরিকল্পনা, আজিও আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। কেননা সামাজিক সমুন্নতির জন্য বিবেকানন্দ যে আমূল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম-পরিগ্রহে অসমর্থ হইয়া আজ পর্য্যন্ত আমরা কেবল জলচল, মন্দির-প্রবেশ, এক পংক্তিতে ভোজন প্রভৃতিই নিম্নবর্ণীয়ের উন্নতির কার্য্যক্রম বলিয়া ভাবিতেছি। "ধর্ম্মকে অবিকৃত রাখিয়া তোমাদের সামাজকে ইয়োরোপীয় সমাজে পরিণত করিতে পার?" বিবেকানন্দের এই মর্ম্মঘাতী প্রশ্নের আজ পর্য্যন্ত আমরা কোন সদুত্তর দিতে পারি নাই, অনুসরণ করা তো দূরের কথা।

ভারতে নবযুগ-প্রবর্ত্তক বলিয়া আমরা যাঁহাকে বন্দনা করি তাঁহার সামাজিক সমস্যা সমাধানের মূলসূত্রটি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই 'উদ্বোধনে'র আদর্শের আমরা নিকটবর্ত্তী হইব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচার সমসাময়িক কালে বিবেকানন্দের মত কেহই করেন নাই; উভয় সভ্যতার দোষ-ত্রুটি তিনি তুলনা করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের শোষণ-ধর্ম্মী সাম্রাজ্যবাদী বণিকের নির্ম্মম নিষ্ঠুর রাষ্ট্রনীতির অন্তরালে তিনি দেখিয়াছিলেন অপূর্ব্ব ব্যক্তি-স্বাধীনতা। জ্ঞানের সাধনায় স্বাধীন চিন্তার ধারক ও বাহক ইয়োরোপ বিচিত্র—বুদ্ধির আলস্য নাই, চিন্তার জড়ত্ব নাই, অতীতের অন্ধ অনুকরণ নাই, তন্ত্রমন্ত্র ও কল্পনার মোহিনী মায়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করিবার কুহকজাল নাই, সত্যের সাধনায় তার বুদ্ধি নির্ম্মল। ধর্ম্মের নামে পাদ্রী-পুরোহিতের অনুশাসন সে ভাঙ্গিয়াছে, নব-সমাজের নির্ম্মাণশালায় সে নিমন্ত্রণ করিয়াছে সকল মানুষকে। তাহার বাণী—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা।

এই জ্ঞানের সাধক, বিজ্ঞানের সাধক, শক্তির সাধক পাশ্চাত্যের সহিত, জড়ধর্ম্মী ইহবিমুখ প্রাচ্যের ভাব ও আদর্শের আদান-প্রদান ব্যতীত এই 'শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদেব' অভ্যুত্থান অসম্ভব। আমরা পাশ্চাত্যকে আমাদের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প-কলার সমুন্নত সম্পদ দিব, তাহার নিকট শিখিব বিজ্ঞান, সঙ্ঘগঠন, ক্ষিপ্র কার্য্যকুশলতা। ভারতের স্থবিরত্বের অচলায়তন ভাঙ্গিবার জন্য চাই ইয়োরোপের চিন্তা ও বুদ্ধির জঙ্গম-শক্তি। পরানুকরণপ্রিয় আত্মবিস্মৃত একটা মহান্ জাতির বংশধরগণ "রাজচক্রবর্ত্তী ইংরাজের" 'ভারবাহী পশু'তে পরিণত হইয়াছে। অথচ বাহ্যজগতের আঘাত-সংঘাতে কিঞ্চিৎ স্বাধীন চিন্তারও উদয় হইয়াছে। এই সময় শ্রেয়ের পথ কি, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই লৌকিক উন্নতিকে মুখ্য লক্ষ্য রাখিয়া বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠা করেন। এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে (অনুকরণ নহে) নূতন সমাজ, নূতন জাতিগঠনের কথা আলোচনার জন্য সুধীজনকে আহ্বান করেন। ভারতবর্ষ তাহার গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, স্বকীয় বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিশ্বকে বরণ করিবে, বিশ্ব-মানবের মুক্তিসাধনার সহিত একাত্ম হইবে, ইহাই ছিল বিবেকানন্দের মিশন। এবং 'উদ্বোধন' তাহার উত্তর সাধক।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত নবযুগের নূতন সন্ন্যাসী, যাঁহারা ব্যক্তিগত মুক্তি বা মোক্ষলাভের জন্য লোকালয় ত্যাগ না করিয়া 'বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়' লোকসমাজের মধ্যে থাকিয়া

সর্ব্বমানবের কল্যাণকেই যুগধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সার্দ্ধশতাব্দী ব্যবধানে 'উদ্বোধনে'র সেবক সেই সকল শুক্লকর্ম্মা কর্ম্মবীরের সাধনা ও ঐকান্তিক সেবা সমাজ-জীবনে কতটুকু সার্থকতা লাভ করিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত প্রত্যেকেরই আজ তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিবার দিন। "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য ইষ্টদেবী হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের ভুলিলেও ক্ষতি নাই"—এই উদাত্ত আহ্বান দ্বারা যিনি ভারতবর্ষের যৌবনকে বিঘ্নবহুল দুর্গমপথের যাত্রী করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজনৈতিক সাধনা আজ সিদ্ধির বন্দরে উত্তীর্ণ। আজ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকার আমাদের হাতে আসিয়াছে। তথাপি ভারতের স্বাধীনতা যে পথে যে ভাবে আসিল, তাহা কেহই প্রত্যাশা করেন নাই। সমাজ-জীবনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে যে ক্লেদপঙ্ক স্তরে স্তরে সঞ্চিত ছিল, ইংরাজ শাসনের ধারা শুখাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অতি কুৎসিতভাবে প্রকট হইয়া উঠিল। আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষের বৃহৎ মানব-সমাজের এক স্তরের সহিত অপর স্তরের চিত্ত ও বুদ্ধির শ্রেয় ও কল্যাণ ভাবনার কি গভীর অসহযোগ। এক বর্ব্বরতা নির্দ্দয় হইয়া আজ চারিদিকে নির্লজ্জভাবে উদ্ঘাটিত হইতেছে। স্বাধীন ভারতের এই ভয়ঙ্কর দুর্গতির মধ্যে দাঁড়াইয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সন্তানদিগকে অকুতোভয়ে বলিতে হইবে, এই দুর্য্যোগময়ী রজনীরও পরপার আছে—যেখানে নির্ম্মল প্রভাত মানব-মুক্তির সাধকগণের শিরে সমুজ্জ্বল রশ্মিমালার আশিস বর্ষণ করিবে।

যুগান্তপট বিদীর্ণ করিয়া আজ যে অভাবনীয়ের আবির্ভাব ঘটিল—তাহাকে আমরা বিবেকানন্দের সাধনার সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিব। মহান যুগ-প্রবর্ত্তকের নির্দ্দেশ ও নিয়োগ আমরা শক্তির স্বল্পতা সত্ত্বেও অঙ্গীকার করিতে পারিয়াছি, আমরা ধন্য ও কৃতার্থ। একটা অতিক্রান্ত যুগের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া, নবযুগের উদ্বোধনের মঙ্গল-মুহূর্ত্তে 'উদ্বোধনে' বিবেকানন্দের বীরবাণী বজ্রস্বরে মন্দ্রিত হউক। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু ঔদ্ধত্যের পীড়ন হইতে ভারতের অগণিত দুর্গত নরনারীকে মানবীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার যে সাধনা দায়স্বরূপ বিবেকানন্দ আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্মকথা আজ আমরা নূতন করিয়া অনুভব করিব। পর্ব্বে পর্ব্বে যে নূতন মহাভারত রচিত হইতেছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সন্তান আমরা 'উদ্বোধনের' মধ্য দিয়া তাহার উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করিব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের আশীর্ব্বাদ এবং বর্ত্তমান সঙ্ঘনায়কগণের শুভেচ্ছা 'উদ্বোধনের' এই বীরের ব্রতকে প্রত্যক্ষ সার্থকতায় ভরিয়া তুলুক।

সমতটেশ্বর শ্রীধারণের কইলান তাম্রশাসন

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ-ডি

প্রাচীন তাম্রশাসনাদির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, লেখবিদ্যা এবং প্রত্নলিপিবিদ্যাতে উপযুক্ত রকমের বিশেষ-শিক্ষা না থাকিলে ইহা সন্তোষজনক রূপে সম্পাদন করা সম্ভব নহে। দুঃখের বিষয়, কোন কোন যশঃপ্রার্থী ব্যক্তি লেখবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী না হইয়াও প্রাচীন শাসনাদির বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই প্রকারের আলোচনায় অনেক ক্রটি না থাকিয়া যায় না। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অপর কেহ কোন ক্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, প্রবন্ধ-লেখক উহা দূর করিতে প্রয়াসী হন না, বরং নানাভাবে উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক প্রবীণ পণ্ডিত বৈণ্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল কোয়ার্টার্লী' পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত ১৩৫৩ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আমি নবাবিষ্কৃত কইলান তাম্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করি; প্রসঙ্গক্রমে আমার প্রবন্ধটিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গুণাইঘর শাসনের পাঠসম্পর্কে আমি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইরূপ সন্দেহ দূর করিবার উপায় কেবল ঐ শাসনের মূল অথবা নির্ভরযোগ্য প্রতিলিপি পণ্ডিত-সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করা। কিন্তু তাহা না করিয়া পণ্ডিত মহাশয় (তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালাধ্যক্ষ) 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' (৫৩শ ভাগ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪১-৫৪) আমার কইলান শাসনবিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা দ্বারা আমার অপদার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য এই সমালোচনা পাঠ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের প্রকাশিত গুণাইঘর লিপির পাঠ সম্পর্কে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়াছে। যাহা হউক, আমার প্রবন্ধটির উপসংহারে আমি পণ্ডিত-সমাজকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, তাঁহারা উক্ত তাম্রশাসনের ব্যাখ্যাদি সম্পর্কে কোন আলোকপাত করিলে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে। সুখের কথা, এই আমন্ত্রণের উত্তরে স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কইলান শাসন সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল কোয়ার্টার্লী' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য ভট্টশালী মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ ঘটিতে পারে; কিন্তু সহজভাবে ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমালোচনার প্রেরণা আমার ঐ আমন্ত্রণ হইতে নহে। তিনি লিখিয়াছেন, "তাঁহার (অর্থাৎ আমার) আলোচনায় ঐতিহাসিকোচিত অভিনিবেশ ও যুক্তিবিচারের অবতারণা থাকিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের (অর্থাৎ তদীয় মূল্যবান্ প্রবন্ধটির) আবশ্যকতা ছিল না।" অবশ্য এজন্য আমরা তাঁহার দোষ দিতেছি না; কারণ অন্যের যুক্তি বুঝিবার শক্তি ও শিক্ষা সকলের একরূপ থাকে না। যাহা হউক, কইলান শাসন সম্বন্ধে আমার মতামত জগতের পণ্ডিত-সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য আমি

'ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল কোয়ার্টার্লীতে' প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি বাঙালী ঐতিহাসিকগণের বিচারের জন্য তাঁহার কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কে আমার মতামত সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

প্রথমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যুক্তি-প্রয়োগের উদাহরণ দিতে চাই। তিনি আলোচনার সূত্রপাতে লিখিয়াছেন, "ত্রিপুরার লোকনাথশাসন রচনা কালে (৬৬৩-৬৪ খ্রীঃ) রাত শাসনোক্ত শ্রীধারণের পিতা জীবধারণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যাঙ্ক কিছুতেই ৬৭৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না।" দুঃখের বিষয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমালোচনার মূল স্তম্ভস্বরূপ এই উক্তিটিতে একেবারেই কোন যুক্তি নাই। কইলান শাসনটি সমতটের রাতবংশীয় নরপতি শ্রীধারণের অষ্টম রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হয়; শ্রীধারণের পিতা ছিলেন সমতটেশ্বর জীবধারণ। আবার লোকনাথের শাসন ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল; উহাতে লিখিত আছে যে, কোন সময়ে লোকনাথের সহিত জীবধারণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সংঘর্ষ লোকনাথ কর্ত্তৃক শাসনদানের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, ইহাই কেবল প্রমাণিত সত্য; কিন্তু উহা কতকাল পূর্ব্বের ঘটনা, তাহার প্রমাণ নাই; অর্থাৎ ঐ সংঘর্ষ দশ দিন পূর্ব্বে কি দশ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। এ অবস্থায় জীবধারণের কবে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা স্থির করা কেবল অনুমান দ্বারা সম্ভব এবং ঐ অনুমানমূলক সিদ্ধান্তকে ধ্রুব সত্য মনে করা বাতুলতা মাত্র। ধরুন, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের একখানি দলিলে যদি আকবরের সম্বন্ধে লিখিত হয় যে, তিনি পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হেমুকে পরাজিত করেন, তবে কি প্রমাণ হয় যে, ঐ যুদ্ধটি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে হেমু জীবিত ছিলেন? আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ একটি কল্পনামূলক অসার সিদ্ধান্তের জোরেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার সমস্ত প্রবন্ধটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন!

এবার তাঁহার যুক্তি-বোধের উদাহরণ দিতেছি। আমার প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমি খড়্গবংশীয় রাজগণকে সপ্তমশতাব্দীর শেষভাগ এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থান দিয়াছি; পরে দেখাইয়াছি যে, খড়্গবংশীয় দেবখড়্গ ও তৎপুত্র রাজভট বা রাজরাজভট্ট এবং রাতবংশীয় জীবধারণ ও তৎপুত্র শ্রীধারণ সকলেই সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। ধরুন, আমি—দেবখড়্গ আনুমানিক ৬৬০-৭৫ খ্রীঃ, রাজরাজভট্ট বা রাজভট আঃ ৬৭৫-৭০০ খ্রীঃ, জীবধারণ আঃ ৬৩৫-৬০ খ্রীঃ, শ্রীধারণ আঃ ৬৬০-৭০ খ্রীঃ —এইরূপ রাজত্বকাল কল্পনা করিয়াছি এবং দেবখড়্গকর্ত্তৃক রাতবংশ উৎসাদনের তারিখ ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটে বলিয়া অনুমান করিয়াছি। ইহার সহিত ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময় লোকনাথের সহিত জীবধারণের সংঘর্ষ ঘটার কোন বাধা নাই, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু এবিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার কি বলিতেছেন, শুনুন। তাঁহার ধারণা এই যে, আমার যুক্তি অনুসারে নাকি—ই-সিঙের (৬৭১-৯৫) কিছু পূর্ব্বে সেং-চি ও রাজভট, তৎপূর্ব্বে দেবখড়্গ, তৎপূর্ব্বে শ্রীধারণ ও তৎপূর্ব্বে জীবধারণ —এই ক্রমানুসারে রাতরাজগণ ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন এবং রাতখড়্গ সংঘর্ষ হর্ষ-শশাঙ্ক-ভাস্করবর্ম্মার জীবনকালে গিয়া পড়ে! গিয়া পড়িলে কোন দোষ হইত কিনা, সেটা আলোচ্য বিষয় নহে; তবে গিয়া যে মোটেই পড়ে না, এটাই তিনি বুঝিতে পারেন নাই! শশাঙ্ক ৬২০ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পরে, হর্ষ ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভাস্করবর্ম্মা ঐ সময়ের কিছুকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ই-সিং ৭০০-১২ খ্রীঃ মধ্যে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; উহাতে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে (অর্থাৎ ৬৫০ হইতে ৭০০ খ্রীঃ মধ্যে কোন সময়ে) ভারত ভ্রমণকারী সেং-চির ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সমতটপতি রাজভটের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার সহিত আমার উক্তির বিরোধ কোথায়? ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোধ হয় ভাবিয়াছেন যে, সেং-চি ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমতটে গিয়াছিলেন; কিন্তু এই ধারণা নিতান্তই অমূলক।

তাঁহার যুক্তিবোধের আর একটি নমুনা দেওয়া যাইতে পারে। আমি লিখিয়াছিলাম যে, হিউএন-সাং সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মহাজ্ঞানী শীলভদ্রকে সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশের সন্তানরূপে উল্লেখ করিয়াছেন; ঐ ব্রাহ্মণ রাজবংশ রাতরাজবংশ হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার সমালোচনায় পণ্ডিতজী কি বলিতেছেন, শুনুন।—"ডক্টর সরকারের প্রবন্ধে বহুতর নিষ্প্রমাণ উক্তি স্থানলাভ করিয়াছে। ইহাদের স্বরূপপ্রকাশ ও আলোচনা অনাবশ্যক। কিরূপে অনবহিতচিত্তে তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি মাত্র নিদর্শন প্রদর্শিত হইল। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন, 'শীলভদ্র সমতটের যে ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন, উহাই কি কইলান লিপির রাতরাজবংশ?' হিউএন সাঙের সহিত সাক্ষাৎকালে শীলভদ্র অতিবৃদ্ধ ছিলেন, কোন কোন চীনদেশীয় প্রামাণিক উক্তি অনুসারে তৎকালে তাঁহার বয়স ছিল ১০৬ বৎসর। অর্থাৎ তাঁহার জন্মাব্দ প্রায় ৫৩০ সন এবং তিনি রাতবংশীয় হইলে রাতশাসন অবশেষে বৈণ্যগুপ্তের রাজত্বকালীনই (৫০৭ খ্রীঃ) হইয়া পড়ে!" ধরুন, জীবধারণের শাসনকাল ৬৩৫-৬০ খ্রীঃ; তিনি ও তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে গৌড়েশ্বরের সামন্ত ছিলেন; ৬২০-৩৩ খ্রীঃ মধ্যে কোন সময়ে হর্ষ ও ভাস্করবর্ম্মার হস্তে গৌড়পতির পরাজয়ের ফলে শক্তিশালী হইয়া রাতবংশ প্রায় স্বাধীনভাবে সমতট শাসন করিতে থাকেন। আবও কল্পনা করুন যে শীলভদ্র (ইঁহার বৌদ্ধ হইবার পূর্ব্বেকার নাম অজ্ঞাত) সম্পর্কে জীবধারণের পিতামহের ভাই হইতেন এবং শীলভদ্র ৫৩০-৩৫ খ্রীঃ মধ্যে এবং জীবধারণ ৫৭৫-৮০ খ্রীঃ মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি এই প্রকার অবস্থা কল্পনা করা যায়, তবে ৬৩০-৪২ খ্রীঃ মধ্যে হিউএন-সাং শীলভদ্রকে রাতরাজবংশজাত বলিলে দোষটা কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, রাতবংশীয় রাজগণ মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ ছিলেন। কিন্তু "প্রাপ্তপঞ্চ মহাশব্দ" উপাধিটি যে কেবলমাত্র সামন্তরাজগণ ব্যবহার করিতেন, এ তথ্য তাঁহার অজ্ঞাত বলিয়াই তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং আমার আলোচনাকে "মূল্যবান্ যুক্তিপরম্পরা" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানের অভাব তাঁহার প্রবন্ধের নানাস্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি "জয়স্কন্ধাবার", "বিজয়স্কন্ধাবার" প্রভৃতি কয়েকটি কথা কোন কোন তাম্রশাসনে দেখিয়াছেন; তাই স্থির করিয়াছেন যে "জয়কর্ম্মান্ত" কথাটিতে যেহেতু "জয়" শব্দের পরে "কর্ম্মান্ত" আছে, সেজন্য কর্ম্মান্ত কোন নগরের নাম হইতে পারে না। যে সকল তাম্রশাসনে 'বিজয়কাঞ্চীপুর", "বিজয়-দশনপুর" প্রভৃতি নগরের নাম উল্লিখিত আছে, সেগুলি অবশ্যই তিনি পাঠ করেন নাই। অন্যত্র তিনি "পদ" এবং "অর্দ্ধত্রিক" শব্দদ্বয়ের অর্থ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন লেখাবলীতে এই দুটি শব্দ যথাক্রমে "এক-চতুর্থাংশ" এবং "আড়াই" অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। আবার কামরূপরাজ ভূতিবর্ম্মার বড়গঙ্গালিপির তারিখ ২৪৪ অব্দ সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে করেন যে, এখানে সম্ভবতঃ কামরূপের কোন বিশিষ্ট সংবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে, গুপ্তাব্দ নহে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি হর্জ্জর বর্ম্মার তেজপুর লিপি পাঠ করেন নাই; কারণ

ঐ লিপির তারিখে ৫১০ বর্ষের সহিত "গুপ্ত" কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং বড়গঙ্গা ও তেজপুর লিপিতে যে একই সংবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

এইবার পণ্ডিত মহাশয়ের ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি আধুনিক কায়স্থ সমাজের 'রাউত' ও 'রাহা' পদ্ধতি দুটিকে 'রাত' বংশনামটির পরিণতি স্থির করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা লেখবিদ্যা এবং ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সংস্কৃত 'রাজপুত্র' হইতে প্রাকৃত 'রাঅউত্ত' ও 'রাউত্ত' এবং বাংলা 'রাউত' আসিয়াছে; ভারতের অন্যান্য অনেক অঞ্চলেও শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত আছে। প্রাকৃতে 'রাধারাণী' স্থলে 'রাধারাহী' শব্দের প্রয়োগ হইতে 'রাহা' পদ্ধতিটিকে 'রাজা' শব্দের অপভ্রংশ মনে হয়; এই সংস্কৃত শব্দ হইতে 'রায়', 'রাও' প্রভৃতি আরও কতিপয় বংশনামের প্রচলন হইয়াছে। পাল, সেন, ঘোষ প্রভৃতি পদ্ধতি নরপাল, বজ্রসেন, মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি নামের শেষাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বপ্যটের পুত্র গোপাল রাজ্য লাভ করিলে তদ্বংশধরগণ আপনাদিগকে গোপাল নামটির অনুরূপ পাল-নামান্তে পরিচিত করিতে লাগিলেন; এইরূপ প্রথা হইতে 'পাল' বংশনাম সৃষ্টি হইবার পরে উহা হইতেই আধুনিক অমুকচন্দ্র পাল ইত্যাকার নামের উদ্ভব হইয়াছে। 'রাত' বংশনামটিও দেবরাত প্রভৃতি নামের শেষাংশ হইতে উদ্ভূত; গুণাইঘর লিপিতে বজ্ররাত নাম দেখা যায়। এই বংশনামটি হয় লোপ পাইয়াছে, নতুবা অন্য কোন আকার ধারণ করিয়াছে।

চীনদেশীয় ভাষাতত্ত্বের আলোচনাতেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি বলেন যে, সেং-চির উল্লিখিত সমতটপতি Ho-lo-she-po-t'a প্রকৃতপক্ষে 'হর্ষভট' হইবে, 'রাজভট' নহে। তাঁহার মতে রাজভটের মায়া কাটাইতে না পারায় আমার "সমস্ত প্রবন্ধটি প্রমাদগ্রস্ত ও শিথিলযুক্তি হইয়াছে"। তা হইতে পারে; কিন্তু হিউএন-সাং কর্তৃক হর্ষবর্দ্ধন ও রাজবর্দ্ধন (রাজ্যবর্দ্ধন) এই দুটি নাম যথাক্রমে Ho-li-sha-fa-tan-na ও Ho-lo-she-fa-tan-na লিখিত হইয়াছে। তিনি রাজপুর নামটিকেও Ho-lo-she-pu-lo রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং Ho-lo-she-po-t'aকে যাঁহারা 'রাজভট' স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের যুক্তি হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবার মত নহে। অবশ্য খড়্গবাজের প্রকৃত নাম রাজরাজভট, আর সেং-চি লিখিয়াছেন 'রাজভট' বা 'রাজভট্ট'। কিন্তু বিদেশীয়ের পক্ষে এইটুকু ত্রুটি মারাত্মক মনে করা যায় না। বিদেশীয়গণ আমাদের দেশের স্থান ও ব্যক্তির নাম লিখিতে যে কত ভুল করিতেন, তাহা সকলেরই জানা আছে! আমাদের দেশেও লক্ষ্মীকর্ণ, গয়াকর্ণ প্রভৃতি নামকে অনেক স্থলে কেবল 'কর্ণ' আকারে দেখা যায়। এই জন্যই কোন নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত 'রাজভট'কে বিদায় দিয়া একজন 'হর্ষভট'কে আমদানী করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, আমার বিবেচনায় এইগুলি ছাড়াও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাঠ ও ব্যাখ্যায় অনেক ত্রুটি আছে। বিশেষতঃ, শাসনের শেষাংশ (যাহা আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি ব্যাখ্যা করি নাই) তিনি ঠিক বুঝিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। তবে অগণিত তুষের মধ্যে দু'একটি তণ্ডুলকণাও যে নাই, সে কথা বলিতে চাহি না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রধান ত্রুটি এই যে, যে স্থানে কিছুই পড়া যায় না সেই অস্পষ্ট স্থানেরও যাহ'ক একটা পাঠ উদ্ধার করিতে তিনি উৎসাহ বোধ করিয়াছেন।

ক্রমবিকাশ জন্মান্তর ও সমাজ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

(১)

একজন বিশিষ্ট আধুনিক বৈদান্তিকের সঙ্গে শিরোনামালিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁর মতে ক্রমবিকাশের ক্রমে যে একবার মানুষ হয়েছে সে কখনও আর পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণের নিম্ন স্তরে ফিরে যেতে পারে না। আমি বলেছিলুম, উপনিষদে মানুষের মৃত্যুর পর—"অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" (ছা উ, ৫।১০।৭)—অর্থাৎ যাদের ইহলোক-অর্জিত অশুভ কর্ম্মফল অবশিষ্ট আছে, তারা কুকুরযোনি বা শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়—এইরূপ গতির কথা আছে। কিন্তু তার উত্তরে তিনি বলেন যে ও সব মনুষ্যশরীরেই পশুচরিত্রের লোক বুঝতে হবে। কিন্তু সে যাই হোক, বৃহদারণ্যকে একটা উপাখ্যান আছে, বৈদেহ জনক আশ্বতরাশ্বি বুড়িলকে বলেন, "যন্নু হো তদ্ গায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি"—(বৃ উ, ৫।১৪।৮) —তুমি বলিয়াছিলে আমি গায়ত্রীবিদ্, কিন্তু হায়! তুমি হস্তী হয়ে আমায় বহন করছ কেন? আর যদি উচ্চস্তর হতে নিম্নস্তরে আগতি সম্ভব না হয় তা হলে গীতোক্ত কৃষ্ণা গতির পুনরাবর্ত্তন কি করে সিদ্ধ হয়? মাটি যদি ঘট হতে পারে, তা হলে ঘটের মাটি হওয়াতে দোষটা কি? যে সব ভোগায়তনের ভেতর দিয়ে এই মনুষ্যনিকায়টি পাওয়া গেছে সেই সব অবস্থায় জীবের ফিরে যাওয়ার অযৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন।

অতি প্রাচীন পাশ্চাত্য দর্শনে যেটুকু জন্মান্তরের কথা খুঁজে পাওয়া যায় তা পতঞ্জলির জাত্যন্তর-পরিণামের (যোগদর্শন ৪।২) ছায়া মাত্র। প্লেটো তাঁর Phaedrus-এ বলেছেন—"সমগ্র সৃষ্টির প্রভু এবং পিতা জিয়াস্ সকল বিষয়ে উপদেশ ও ব্যবস্থা করতে করতে এক পক্ষযুক্ত রথে স্বর্গে বিচরণ করে বেড়ান।···জীবেরা যখন তাঁর অনুসরণ ও সত্যের আলোক সহ্য করতে অসমর্থ হয়, তখনই তাদের পতন হয় এই বিস্মৃতি ও পাপের তলদেশে।" নিম্নস্তরে আসাটা ঊর্দ্ধ দেহীদের খুব কষ্টকর। ডুবুরীকে জলের তলায় নামতে গেলে যেমন তার ভারি পোষাক দরকার তেমনি নিম্নস্তরের ভোগায়তনও হয় স্থূল হতে স্থূলতর—যত অধিক সে তলিয়ে যায়। এই যে শাস্ত্রে পাতাল থেকে ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবনের বর্ণনা দেখা যায়, এগুলো চেতনার সর্ব্বনিম্ন স্তর হতে সর্বোচ্চ স্তর—পাতাল হলো প্রস্তর বৃক্ষাদি স্থাবর পর্য্যন্ত, চেতনা যেখানে জড়ীভূত, মধ্যস্তর ভূলোক অর্থাৎ মনুষ্যলোক এবং সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোক—চেতনার আনন্দের উৎকৃষ্ট প্রকাশ। প্লেটো বলছেন, "সেই স্বর্গীয় আকাশে জীবপক্ষী যখনই ক্লান্তি অনুভব করে তখনই তার পাখাদুটি খুলে পড়ে, আর অমনি তার পৃথিবীতে পতন হয় এবং সে পুনঃ পুনঃ মানুষ বা পশু হয়ে জন্মাতে থাকে।"

পাইথাগোরাস প্লেটোরও পূর্ব্বেকার লোক, তাঁর দুটো চারটে কথা যা আমরা কুড়িয়ে বুড়িয়ে পাই, তার এক জায়গায় আছে, "মৃত্যুর

পর বিবেকী আত্মা দেহশৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে একটা অতি সূক্ষ্মশরীর (etherial vehicle) প্রাপ্ত হয়, তার পর পূর্ব্বতন মৃতদের আবাসে গমন করে। যতদিন না তাকে পুনরায় পৃথিবীতে কোন মনুষ্য বা পশুশরীরে বাস করবার জন্য ফেরৎ পাঠান না হয় ততদিন সে সেখানে বাস করে। তার পর নানা কৃচ্ছ্রতার (purgations) মধ্য দিয়ে যখন সে খুব পবিত্র হয়ে ওঠে তখন সে দেবতাদের মধ্যে একজন বলে গণ্য হয় এবং ধীরে ধীরে সে তার অনাদি উৎপত্তিস্থলে, যেখান থেকে তার সংসরণ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, ফিরে যায়।

আবার দেখ উচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তরে আসাটা যদি অযৌক্তিক হয়, তা হলে সেই হেতুতেই নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে যাওয়াটাও অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। কিন্তু দৃশ্য জগতে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে স্থিতি ও গতিকে (matter and motion) যেরূপ আবেষ্টনীতে আমরা পরিণত করব, তার পরিণামগুলিও ঠিক ঠিক তারই অনুপাতী হবে। বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা জলকে উদ্‌যান ও অম্লযানে বিশ্লিষ্ট করা যায় এবং সেই প্রক্রিয়ার দ্বারাই একই উদ্‌যান এবং অম্লযানে জলরূপ রাসায়নিক সংশ্লেষ-পরিণামটার পুনরাবর্ত্তন করা যায়।

পশুর মত ব্যবহার করতে করতে জীবাত্মার অন্তর্বাহে সেই সব সংস্কার প্রধান হয়ে পড়ে। ভাবী জীবনের দেহের বিধাতা পরে হয়ে পড়ে এরাই। এই ভাবেই জীবের অবস্থান্তর ঘটে থাকে। প্রতি জীবনের আদিম সহজাত বোধগুলোকে আমরা instinct বলে উড়িয়ে দিলেও স্বামীজী তাঁর জ্ঞানযোগে বলছেন, "Instinct is the degeneration of a past rational mind. It has been converted into a habit automaton. It can be reconverted into a rational conscious action."—সহজাত বোধটা হলে প্রাক্তন বৌদ্ধ জীবনের অভ্যাস হেতু একটা যন্ত্রবৎ স্বারসিক বৃত্তি—এটাকে পুনরায় একটা বুদ্ধিক্রিয়াতে পর্য্যবসিত করা যেতে পারে।

ইউরোপে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মান্তরবাদটা বেশ জাঁকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সম্রাট জাষ্টিনিয়ান Council of Constantinople এ (৫৩৮ খৃঃ) এর বিরুদ্ধে এক ফারমান বের করলেন'—"যারা আত্মার পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে প্রবাদ (mythical presentation) সমর্থন করবে এবং তার ফলস্বরূপ পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত মতবাদ স্বীকার করবে তারা সংঘ (church) এবং ভগবানের অভিশপ্ত (anathema) বলে জানবে।"

(২)

ডারুইন ও স্বামীজীর ক্রমবিকাশবাদের মূল সূত্রে অনেক ভেদ। স্বামীজী একবার আলিপুরে প্রাণিশালা (Zoological Garden) দেখতে গিয়ে সেখানকার ব্যবস্থাপকের সঙ্গে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। তাতে এক জায়গায় বলেছিলেন, "The struggle for existence and natural selection have only their full and rigorous application in the inferior orders of nature, where they play the determining part in the evolution of species. But at the next stage which is the human order, struggle and competition are a retrogression rather than a contribution to progress." অর্থাৎ জীবনসংগ্রাম এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, এই আইনদ্বয় প্রকৃতির নিম্নস্তরে বেশ অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যকরী এবং যার ফলে প্রাণের নিম্ন স্তরের জাত্যন্তর-পরিণাম বিষয়ে ঐ আইনদ্বয়ের সহকারিতা খুবই প্রধান, কিন্তু প্রাণের অভিব্যক্তি যখন মনুষ্যস্তরে পৌছয় তখন

যুদ্ধ ও প্রতিযোগিতা প্রগতির অগ্রগতির পরিবর্ত্তে পশ্চাদ্গতিই অধিক বিধান করে। স্বামীজী রাজযোগের ৪।৩ সূত্রের ব্যাখ্যাকালে ঐ তত্ত্বটা খুব সুন্দররূপে দেখিয়েছেন। মানবপ্রগতি যদি মাত্র যৌননির্ব্বাচন এবং জীবনসংগ্রামের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণকে ত একেবারে মানবেতিহাস থেকে মুছে ফেলতেই হয়। ঐ 'জোর যার মুলুক তার' মতবাদকে বনিয়াদ করেই German Superman, English Imperialist Philosopher সব সৃষ্টি হয়েছিলেন। এঁরা বলতে চান যে যেহেতু তাঁদের বোমার অন্তর্নিহিত আণবিক শক্তি সব চাইতে বেশী সেই জন্যই তাঁরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। এই শ্রেষ্ঠ মানবেরা সকল দুর্ব্বল এবং অনুপযুক্তদের একেবারে নিঃশেষ করে কেবলমাত্র একটি সম্পূর্ণ বণিক জাতি (bomber race) রক্ষা করতে চান। কিন্তু জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই সব সেকন্দর, চেংগিস্, তৈমুর, নাদীর প্রভৃতি দিয়ে মানুষের শিল্পকলা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কৃষ্টি প্রগতি কোন কিছুই শ্রীসম্পন্ন হয় না এবং তাঁরাও বেশী দিন টাঁকেন না। নানা দুঃসহ কৃচ্ছ্রতার ভেতর দিয়ে নিরপরাধ জাতিরাই মহিমোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভগবান তাঁদের রক্ষা করেন আমরা বিশ্বাস করি। সৃজনী ও পালনী শক্তির তাৎপর্য্য কেবল ধ্বংসে নয়। আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হয় ঐ ত্রিশক্তি অন্ধ। কিন্তু যার চক্ষু আছে সে সর্ব্বদাই দেখে ঐ creative evolution এর পেছনে এক ন্যায়বান করুণাময় চৈতন্যের সাক্ষিত্ব সদা বর্ত্তমান। যখনই কোন জাতি নিজেদের ওপর অতিমানবতার অধ্যারোপ করেছে, তখনই দেখা যায় পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতার উপপ্লাবন এবং ঐ উপপ্লাবনে সেই তথাকথিত অতিমানবতারও চিরতরে নির্ব্বাপণ। এইরূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বুদ্ধ খৃষ্ট শংকর চৈতন্য রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। প্রভু মনে করেন দাসেদের মঙ্গলের জন্য প্রভুত্বটি চিরকালই কায়েমী হয়ে থাকা দরকার; সংখ্যাগুরু মনে করেন লঘুরা যখন দুর্ব্বল তখন আমাদের পশু অর্থাৎ আহার্য্য। এই সব মনোবৃত্তিগুলি যা মানুষের অতি নিম্নস্তরে দেখা যায় পশুজীবনের অবশেষ (savage survival) বলেই অঙ্গীকর্ত্তব্য; নচেৎ "fit" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়চর্যা কুটচর্য্যা এবং পেশীচর্য্যার পরাকাষ্ঠাই হয়ে পড়ে।

(৩)

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মানুষের পশ্বাদি নিম্নস্তরীয় শরীরপ্রাপ্তি স্বীকার করেন নি বটে, কিন্তু তিনি তাঁর Life Beyond Death এ বলছেন, "But there may be some people who may live like animals even when they have human bodies."—অর্থাৎ এই মানুষশরীরেই পশুর মত বাস করে। বলছেন, তারা হয়ত সাধারণ বেড়াল কুকুর সাপের চাইতেও ভয়ানক। কিন্তু পতঞ্জলি তাঁর—"জাত্যন্তরপরিণাম" সূত্রে স্থূলতর শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন (retrogression) অস্বীকার করেন নি। স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলেছিলেন, এ সম্বন্ধে অভেদানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর একদিন আলোচনাও হয়েছিল। স্বামীজীর ক্রমবিকাশতত্ত্বের ঐ পাতঞ্জলদর্শনের ওপরই ভিত্তি। অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে বিকাশ করাই evolution, আর সেটা চাপা পড়লেই যে কোন উচ্চাবস্থা থেকে পশ্চাদাবর্ত্তন অসম্ভব নয়। "The true secret of evolution is the manifestation of the perfection which is already in every being; that this perfection has been barred and the infinite tide behind is struggling to express itself···Competitions for life or sex-gratification are only momentary, unnecessary, extra-

neous effects caused by ignorance." অর্থাৎ ক্রমবিকাশের রহস্য হচ্ছে অনাদি অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে বিকাশ দেওয়া। এই পূর্ণ শক্তিসমুদ্র অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে তার প্রচণ্ড প্লাবন নিজেকে সদা বিস্তারে সচেষ্ট। কিন্তু এই যে দৃশ্য জগতের প্রতিযোগিতা, ইন্দ্রিয়লালসা এ সব ক্ষণিক, অনাবশ্যক, বাহ্যিক প্রবৃত্ত যথার্থ স্বরূপের অজ্ঞানতার ফল। প্রতিযোগিতাবাদ নিম্নযোনিতে (lower strata of life) দরকার; কিন্তু দেব-মানব যাঁরা তাঁদের নিকট দৃশ্য জগতের এ সব ব্যাপার খুবই গৌণ। পরন্তু 'জোর যার মুল্লুক তার' থিওরীর অনুপাতে নীট্শের ভাষায় এই Preachers of deathদের জগতে বাঁচা উচিত নয় এবং তাঁদের জীবন অনুসরণ করে যদি কোন জাতি তৈরী হয় তাদেরও গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হওয়া দরকার।

কিন্তু স্বামীজীর বন্ধুরা একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রতিযোগিতাটা যদি নিম্নস্তরের জন্যই প্রয়োজন, তাহ'লে আপনি বক্তৃতায় ভারতবাসীকে এত প্রতিক্রিয়াশীল হতে বলেন কেন?" তাতে স্বামীজী উত্তর দেন "তোরা কি মানুষ, তোরা হচ্ছিস মনুষ্যাকৃতি জানোয়ার। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবি যে মনুষ্যবুদ্ধির বিশেষত্ব হচ্ছে মৌলিকতা, আবিষ্কারপ্রবণতা—এ সব তোদের কিছুই নেই। আহার, বিহার নিদ্রা প্রভৃতি ছাড়া তোদের জীবনে উচ্চ চিন্তার কোন স্থানই নেই। তোদের দরকার competition and struggle."

(৪)

অনেকেরই সংশয় ও সমাধান হচ্ছে—ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ—ধর্ম্ম বিচিত্র—সম্প্রদায় বিচিত্র—আচার ব্যবহার বিচিত্র। এর মধ্যে একতা একরকম অসম্ভব। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং ভাষাভাষীদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান নেই বলে পরস্পর সহানুভূতির খুব অভাব। বর্ণবিভাগ না তুললে ভারতের সংহতি কোন কালেই সম্ভব হবে না। কিন্তু স্বামীজী এর সমাধান পূর্ব্বেই করে দিয়ে গেছেন। বর্ণ মানে জাতি। জাতি হলো ডারুইনের species ছাড়া আর কিছু নয়। এই স্পিসিসের বৈচিত্র্যই হলো প্রাণীর প্রাণস্পন্দের অভিব্যক্তি—নইলে বুঝতে হবে সে মৃত বা যন্ত্রবৎ হয়ে গেছে। স্বামীজীর একটী বাণী হচ্ছে "Unity is before creation—while diversity is creation." বস্তুর একরূপতা দেখা যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে; পরন্তু সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য। যতক্ষণ জাতির প্রাণস্পন্দন থাকে ততক্ষণই নানা বৈচিত্র্য তার পরমায়ুকে অলঙ্কৃত করে তোলে, কাজে কাজেই বর্ণটাকে আমাদের একটা ভুল বলে স্বীকার করে নেওয়া চলে না। প্রাচীন ভারতের মূল বর্ণতত্ত্বের ভিত্তি ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তদনুরূপ গোষ্ঠীর স্ব স্ব প্রকৃতির অনুপাতী আত্মাভিব্যক্তির স্বাধীনতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "এক ঘেয়ে হবি কেনে রে?" এরই উপর পুরাতন স্বাধীন ভারতের বিচিত্র বর্ণের উদ্ভব হয়। প্রাচীন মহাভারতের যুগে রক্ত ও আহারের আদান-প্রদান (inter-marriage & inter-dining) দেখতে পাওয়া যায় না কি? প্রাচীন বুদ্ধের সমন্বকার ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার অধ্যয়ন করলেই ভারতের সামাজিক স্বাধীনতাটী বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু আধুনিক বর্ণবিভাগটা একটা অতীতের ব্যাপার, সমাজের উন্নয়নে তার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে—পরন্তু কাল এবং অবস্থার অনুপাতী ঐ সেকেলে বর্ণবিভাগটা বর্ত্তমানে উন্নততর ভারতীয় জাতীয় জীবনপ্রবাহে একটা প্রকাণ্ড নিরেট পাথরের মত বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব নব বর্ণবিকাশ যতক্ষণ প্রাণের প্রসবশক্তিতে উদ্গত হয় ততক্ষণ দেখা যায় ধর্ম্মবিজ্ঞান সমাজ শিল্পাদি কর্ম্মে কোন অনুবাদ (imitation) নেই বা স্বাধীন স্বতঃপ্রবৃত্তির অপলাপ নেই।

ভারতীয় সমাজ অধঃপাতে গেল শ্রীকৃষ্ণের বাণী না শুনে। তিনি গুণ ও কর্ম্মের উপর বর্ণ-বিভাগ করে গেলেন, কিন্তু তার ব্যাখ্যা হলো বংশানুক্রমিকতার (heredity) ভিত্তিতে। পরন্তু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে ব্যক্তির আত্ম-প্রকাশের অনুকূলতার ভিত্তিতে। তাই স্বামীজী লক্ষ্য করলেন—"India fell because you prevented and abolished caste. Every frozen aristocracy or privileged class is a blow to caste and is not caste"—ভারতের অধঃপতন ঘটল কারণ তোমরা নব নব বর্ণবিকাশের পথ বন্ধ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্তিও নিরুদ্ধ হয়ে সমাজে এলো একটা যন্ত্রচালিত পুতুলের তৎপরতা। জমাটবাঁধা অতি প্রাচীন আভিজাত্য অর্থাৎ বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত শ্রেণীটা বর্ণ নয়, ও হলো প্রাণের ক্রমবিকাশের পথে, প্রগতির ও কৃষ্টির পথে এক বিরক্তিকর বাধা। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে জীবনে বৈচিত্র্য (variety) মানে কতকগুলো নিরর্থক যা খুসী তা-ই এর কাওয়াদ বা ফ্যানসি-শো নয় অথবা কোন বিশিষ্ট গ্রুপকে কতকগুলি করে বিশিষ্ট সুযোগ দেওয়া নয়, পরন্তু গোষ্ঠীর আত্মশক্তির স্ফুরণের দ্বারা সমষ্টির বলাধান। প্রত্যেক গ্রুপটা অপর গ্রুপকে সাহায্য করবে তাদের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যাতে বিরাট সমষ্টিসঙ্ঘের এক অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতার সুপ্রভাত হয়। বর্ত্তমান ভারতে যে তথাকথিত স্পিসিস্ দেখা যাচ্ছে, এ যেন একটা বিরাট হিন্দু পরিবারের 'ভেন্ন' হওয়া। কারুর সঙ্গে কারুর মুখ দেখা দেখি নেই, আর যেন একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ ভাগাভাগি করে করে চারি পাশে পাঁচিল তোলা। সেকেলে বর্ণবিভাগ হলো প্রাচীনদের সমাজ উন্নয়নের তাৎকালিক পরীক্ষা। তাদের কাজ শেষ হয়েছে। তবে আশার কথা ভারতের প্রাণপাখীটা মরে নি বলেই প্রাক্ স্বাধীনতার সাধনযুগ হতেই আবার নবনব বর্ণ-বিভাগ জাতীয় জীবনে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে।

(৫)

ব্যবহারিক জীবনে অনির্ব্বাণ ব্যক্তিত্বের বৃহত্তর অভিব্যক্তিই হচ্ছে পতঙ্গলির জাত্যন্তরপরিণামের মূল কথা। 'এই প্রথম ও শেষ' এইরূপ ন্যাজা মুড়ো বাদ দেওয়া ব্যক্তিত্ব এক চার্ব্বাক ছাড়া আর কোন ভারতীয় দর্শনই বিশ্বাস করেন না। একটা ক্ষুদ্র দেশকালাবচ্ছিন্ন গণ্ডির মধ্যেই আমার সকল প্রগতির অবসান, এ কথা বুদ্ধি স্বীকার করতে নারাজ। একটা গ্রাম্য রাজ-নীতিকের রুগ্ণ ব্যক্তিত্ব এবং গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিত্ব এক জীবনের প্রথম এবং শেষ সুযোগের ফল—এ তত্ত্বে সহানুভূতি আমরা দেখাতে পারি না। প্রকৃতির নৃত্যভঙ্গীর রেখা-পাতে বিচ্ছেদ বা ক্রমভঙ্গ নেই। ভবিষ্যৎই আজ বর্ত্তমান কাল আবার বর্ত্তমান অতীতে মিশে যাবে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ... ... সংবিশন্তি"—এই অগণিত কল্পকালস্থায়ী বৃত্তটীর মূল কথা হলো continuity—একেরই সুশ্রী বা কুৎসিত রূপান্তর। তবে এই অনাদি প্রবাহের মানবরূপটার সহিত অন্যান্য নিম্নস্তরীয় রূপের চারিত্রিক ভেদ অনেক। এই Zoological পশু পক্ষী মৎস কীট পতঙ্গ ওষধি পরভৃত স্তরে দেখা যায় কেবল perpetuation of species—বর্ণ ও ব্যক্তির অগণিত বিবৃদ্ধি ও ধ্বংস—সে গোষ্ঠী ও ব্যষ্টির মধ্যে প্রগতি-চেতনার সাড়া নেই, ব্যক্তিত্বের বিভিন্নমুখী বৈচিত্র্যবৃদ্ধির পরীক্ষাও নেই, আছে কেবল যান্ত্রিক আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি। পরন্তু যখন ঐ প্রবাহ সত্যিকার মনুষ্যস্তরে এসে পৌছয়, তখন বিচিত্র অভিনব বর্ণবিকাশ ত থাকবেই আর থাকবে যান্ত্রিক নিয়মানুবর্ত্তিতা

হতে ব্যক্তির মুক্তি। এই জুলজিকাল স্তরে ব্যক্তির যান্ত্রিক এবং uniform অর্থাৎ সমানাকার ব্যবহার হেতু একটিকে আর একটি হতে বিশেষিত করা যায় না। যে মানবগোষ্ঠীতে ঐরূপ mechanical uniformity এসে উপস্থিত হয় তাকে স্বামীজী বলছেন, "জানবে ও হচ্ছে মৃত্যুর লক্ষণ"—যেমন প্রাচীন ভারতীয় এক চঙে খাওয়া পরা ইত্যাদি—পচে মরবার লক্ষণ। দার্শনিকের ভাষায়—"One man is much more different in his inner life, character and personality from another man than one cow is from another and for the full development of such a unique individuality, the duration of life in a single body is not all enough."—একটা দেহাবচ্ছিন্ন মাত্র জীবনের দ্বারা বুদ্ধত্বের সাধনার পরিসমাপ্তি কি করে হতে পারে ?

অতএব ইভলিউসানে জন্মান্তর মানতে হয়। পূর্ব্বজন্মবাদ যে কেবল হিন্দু ও বৌদ্ধরাই স্বীকার করে তা নয়, গোপনে বা প্রকাশ্যে এ মত পৃথিবীর যাবতীয় বিবেকীর নিকট ছড়িয়ে আছে। গ্রীকদের ভেতর ছিল—Orphic religion-এর মধ্যে স্পর্শ পাওয়া যায়। পিথাগোরাস ও প্লেটোর কথা পূর্ব্বে বলেছি। এম্পিডোক্লিস ও আনাক্সাগোরাস বিশ্বাস করতেন—

"Who think aught can begin to
be which formerly was not,
Or, that aught which is, can
perish and utterly decay.
Another truth I now unfold :
no natural birth
Is there of mortal things, nor
death's destruction final ;
Nothing is there but a mingling, and
then a separation of the mingled.
Which are called a birth and death
by ignorant mortals".

তার পরবর্ত্তী যুগে আলেক্জেন্দ্রিয়ার নব্য-প্লেটনিকেরা বিশ্বাস করতেন, তাঁর মধ্যে হচ্ছেন প্লটিনাস প্রধান। হিব্রুদের ভেতর কাব্বালা (Kabbala) লেখকদের মধ্যেও এ মত দেখা যায়। বাইবেলে আছে, প্রফেট ইসায়াসই জন দি ব্যাপটিষ্ট হয়ে আসেন। সিজারের একটা বিবৃতিতে পাওয়া যায় খৃষ্টান চার্চ এর মধ্যে নোসটিক-(Gnostic)দের এবং মানিকিনদের (Manicheans) মধ্যেও এ মত ছিল, যাদের দখল করবার জন্য খৃষ্টান রাজারা নানাবিধ অর্ডিনান্স জারি করেন। আর তা ছাড়া আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যেও অনেকে এ মত নানা ভাবে ভাষায় ইঙ্গিতে স্বীকার করেছেন, যথা Origen, Bruno, Von Helmont, Swedenborg, Lessing, Herder, Mac Taggart ; আধুনিক থিয়সফিসটরাও এ স্বীকার করেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিম্নলিখিত কবিতাটী বিশেষ বিবেচ্য—

"Our birth is but a sleep and
a forgetting ;
The soul that rises with us,
our life's star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar ;
Not in entire forgetfulness
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory
do we come
From God who is our home."

বরণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ধরণ

বন্দী প্রাণে সুরধুনী—সুর শোনাবে কেমন ক'রে
অন্ধতার ঐ পাষাণ যদি সরিয়ে না দিস মুগ্ধ ওরে!
বাইরে কোথায় খুঁজিস তাকে
অন্তরে যে নিত্য জাগে?
লাজুক যে সে মনের মানুষ—কয় সে কথা একলা ঘরে
অন্তরালের ছন্দে জাগে—ভিড় দেখলেই যায় সে স'রে।

তৃণ নিরালা, ফুল নিরালা নিরালা নীল আকাশ তারা
তাই না চারু চাউনি তাদের দেয় সুগোপনের ইশারা।
মন্ত্রে তাদের দীক্ষা যদি
নিস মন, তুই—নিরবধি
শুনবি তারা গায়: "আমাদের মিটল অভাব
তারি বরে
সেই দানেরি গাই মহিমা আমরা রূপের কলস্বরে।"

দুঃখে আছে দাহ—মানি। বলব তবু: "নয় জীবনে
দুঃখের এজাহারই চরম তাপন-জ্বালার দুর্লগনে।"
দেখতে তোমায় শিখি যদি
ব্যথায়ো বয় শান্তি-নদী,
যার প্রতি ঢেউ প্রতিফলে চাউনি তোমার ক্ষণে ক্ষণে।
সেই আলো যার বিছায় প্রাণে—ডরায় সে কি
কাঁটাবনে।

অশ্রু তো নেই রূপের চোখে, রূপের মোহেই মরি
কেঁদে,
মুক্তির সুর শুনতে ভুলি—পরি বলে বাঁধন সেধে।
সুখের তৃষায় অভিধানে
পরম বাণী নেই—যে জানে,
সেই পেয়েছে কূল অকূলে—সেই জনতায় রয় বিজনে
প্রেমের বাঁশি যেথায় বাজে অন্তরেরি বৃন্দাবনে।

মুসলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভ্রাতৃবিরোধের দাবানলে আজ ভারতভূমি ভস্মসাৎ হতে চলেছে। যাবতীয় অন্যায় আজ ধর্মের নামে ন্যায়ের আকার ধারণ করে ভারতের সর্বত্র গৌরবের বস্তু বলে স্বীকৃত হচ্ছে। ধনি-দরিদ্রনির্বিশেষে আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী গৃহহীন, সর্বস্বহারা; লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছেন। ভারতবাসী আজ ধর্মের নামে হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য। এই তথাকথিত ধর্মান্ধতা উন্মত্ততার নামান্তর মাত্র। এই উন্মত্ততার আবেশে আমাদের অনেক দেশবাসী ভাবছেন—এ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভারতের অস্থিমজ্জাগত। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?

অবশ্য ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে মুসলমান-শাসকবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং তথাকথিত "কাফের"-দের দেবমন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস, ধর্মগ্রন্থাদির ভস্মীকরণ প্রভৃতি ইসলামানুমোদিত বিশিষ্ট

ধর্মকার্য বলে মনে করতেন। কিন্তু এ সঙ্গে ইহাও ভুললে চলবে না যে অনেক মুসলমান-শাসক ভারতীয় কৃষ্টির অনুরাগী ছিলেন এবং কৃষ্টি নষ্ট করার প্রয়াস মাত্র না করে তার প্রচার ও প্রসারের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হয়েছিলেন। আজ ভারতের স্বাধীনতাগমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আংশিক সত্যের প্রতি রুদ্ধদৃষ্টি হয়ে থাকলে চলবে না ; সত্য যা তাই প্রচার করতে হবে এবং হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর গৌরবময় কাহিনীকেও তার যথাযোগ্য মূল্য প্রদান করতে হবে।

ভারতীয় সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রায় সকল প্রাদেশিক সাহিত্যেই মুসলমানের দান অল্পবিস্তর আছে এবং ভারত-বর্ষের শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি—সব কিছুর প্রতি তাঁদের যথেষ্ট মমত্ববোধ ছিল। হুসেন সাহ, পরাগল খাঁ, ছুটী খাঁ প্রভৃতি যে প্রকার বঙ্গ-ভাষায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ-দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন এবং বহু মুসলমান আত্ম-পর বিস্মৃত হয়ে বৈষ্ণব-ধর্মের অপূর্ব তথ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহিমা কীর্তন করে গেছেন, তদ্রূপ ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষাও, যথা হিন্দী, সিন্ধী, গুজরাতী প্রভৃতি মুসলমানের প্রোৎসাহে সঞ্জীবিত এবং দানে সুসমৃদ্ধ হয়েছে। এ সমস্ত ভাষার মূল উৎস যেই সংস্কৃত ভাষা, তার প্রতিও স্বতঃই মুসলমান-রাজন্যবৃন্দ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতে মুসলমান-রাজত্ব-সময়ে বহু সাহিত্যমহারথ উদ্ভূত হয়েছিলেন এবং মুসলমান-রাজগণের সভায় তাঁরা মণিস্বরূপ ছিলেন। ফলতঃ, এ যুগেই কবিশিরোমণি ভাহুকর বা ভানুদত্ত, আকবরীয় কালিদাস বা গোবিন্দভট্ট, আলঙ্কারিকচূড়ামণি জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ, স্মৃতিশিরোমণি ভট্টনারায়ণ, কবিবর বংশীধর, লক্ষ্মীধর, হরিনারায়ণ মিশ্র, চতুর্ভুজ, উদয়রাজ, পুণ্ডরীক বিট্ঠল, শঙ্কর, কল্যাণমল্ল, নিত্যানন্দ, বেদাঙ্গরায়, পরশুরাম, কৃষ্ণদাস, রুদ্র কবি, মুনীশ্বর, ভগবতী স্বামী, ঈশ্বরদাস, রঘুনাথ প্রভৃতি[১] সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের শ্রেষ্ঠ মহারথেরা স্ব স্ব বিষয়ে স্বকীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন। সাহাবুদ্দিন, নিজাম সাহ, সের সাহ, আকবর, সাহ জাহান, মুদ্দাফর সাহ, বুর্হান খাঁ প্রভৃতি ভারতীয় মুসলমান নৃপতিবৃন্দ এঁদের নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করে গেছেন। এ যুগের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কবি ও অন্যান্য লেখকেরা তাঁদের পরিপালক মুসলমান শাসকবৃন্দের যে স্তুতিবাদ করে গেছেন, তাতে কৃত্রিমতার কোনও আভাস দৃষ্ট হয় না। আকবরের স্তুতিমূলক "তৎসত্যং শ্রীহুমাউ-কুলতিলকমণে ভাবণাদ্ ভীবণোঽসি" প্রভৃতি আকবরীয় কালিদাসের রচনাবলী, শাহ জাহানের স্তুতিমূলক "দিল্লীবল্লভ-পাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ" প্রভৃতি জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের শ্লোকাবলী মুসলমান নৃপতিবৃন্দের প্রতি সংস্কৃত কবিধুরন্ধরগণের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার দ্যোতক। শুধু কবিরা নন, স্মার্ত, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ মুসলমান নৃপতিবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

মুসলমান শাসকবৃন্দ নানাবিধ উপায়ে সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা করেন—(১) পণ্ডিত ধুরন্ধরগণের রাজসভায় সম্মানদান ও তাঁদের জন্য প্রভূত বৃত্তিনির্ধারণ ; (২) আরবী-ফার্সী গ্রন্থের সংস্কৃতে এবং সংস্কৃতগ্রন্থের আরবী-ফার্সীতে

১ শ্রীকৃষ্ণ উপাধ্যায় কৃত কবীন্দ্রচন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থে এ সময়কার বহু পণ্ডিতের নাম উদ্ধৃত আছে। এ গ্রন্থে শাহজাহান ও দারাশুকোর প্রশংসা আছে।

অনুবাদ; (৩) মুসলমানগণের সংস্কৃত সাহিত্যে দান এবং (৪) বিবিধ।

(১) পণ্ডিতদের সম্মান ও বৃত্তি

সের সাহ যদিও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন, তথাপি তিনি ভাস্করপ্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্মান প্রদর্শন ও সাহায্যদান করে গেছেন। তাই কবি ভাস্কর এক জায়গায় সের সাহের প্রশংসামুখর হয়ে বলেছেন যে সের সাহের কোটী কোটী অশ্বের মধ্যে যদি ৫।৬টী কানা বা খোঁড়া হয়, তাতে সের সাহের কি বা আসে যায়?—

"বাহাশ্চেদ্ গন্ধবাহাধিকমুভগবয়া পঞ্চষাঃ কাণখঞ্জাঃ।
কা হানিঃ শেরসাহক্ষিতিপকুলমণেরশ্বকোটীশ্বরস্য॥"

মোগল সম্রাট্‌গণের মধ্যে আকবর ও সাহজাহানই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। অনেক বড বড় সংস্কৃত কবি, দার্শনিক, আলঙ্কারিক, স্মার্ত প্রভৃতি এঁদের সভা অলঙ্কৃত করতেন। ফলতঃ, সম্রাট আকবর হিন্দুধর্মের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হন যে তিনি বৃন্দাবনস্থ ষট্ গোস্বামীদের তপশ্চর্যা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করার জন্য বৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং তাঁদের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন করেন। প্রথিত আছে যে দিল্লীশ্বরের রাজসভায় আহূত সমগ্র ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের পিতৃদেব বাঙ্গালী কাশীনাথ বিদ্যানিবাস দু' দু'বার পরাস্ত করেন। স্বকীয় সভায় ঈদৃশ পণ্ডিতবর্গের আমন্ত্রণ এবং শাস্ত্রচর্চ্চার সুযোগপ্রদান প্রভৃত রাজকীয় সহানুভূতি এবং উৎসাহের পরিচায়ক। জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ তখনকার দিনের এক বিশিষ্ট কাজিকে কোরাণসম্পর্কিত বিচারে পরাভূত করে সম্রাট্ সাহ জাহানের পরম প্রিয়পাত্র হন। এতেও দেখা যায় যে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরতনয় অত্যন্ত ন্যায়ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং নৃপতিহিসাবে সদ্বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ তাঁকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন যে, এ সব কারণেই জগতে মনোরথ পূর্ণ করতে সমর্থ মাত্র দুজন আছেন, দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর, অন্য নৃপতিরা শাক দিতে পারেন বা লবণ দিতে পারেন, এ মাত্র—

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথান্
পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যৈর্ন্ পালৈঃ পরিদীয়মানং শাকায় বা
স্যাল্লবণায় বা স্যাৎ॥"

এই জগন্নাথ পণ্ডিতরাজই যখন একদিন সিংহবোধে অন্যান্য কবিদের সামান্য মৃগ বলে সম্বোধন করেছিলেন, তখন তাঁর উত্তরমুখে কবিবর বংশীধর মিশ্র বলেছিলেন যে সম্রাট্ সাহজাহানরূপ শিবের বাহন জগন্নাথ বড় জোর "বৃষ" হতে পারেন, দেবীর (সাহজাহানপত্নীর) বাহন হিসাবে তিনি (বংশীধরই) সত্যিকার সিংহ—

"দিঙ্ নাগাঃ প্রতিপেদিরে প্রথমতো জাত্যৈব
জেতব্যতাং
সম্ভাব্যস্ফুটবিক্রমোঽথ বৃষভো গৌরেব
গৌরীপতেঃ।
বিক্রান্তৈর্নিকষং করোতু কতমং নাম
ত্রিলোকীতলে
কণ্ঠেকাল-কুটুম্বিনীকরুণয়া সিক্তঃ স কণ্ঠীরবঃ॥
বংশীধর-মিশ্রস্য।"[২]

২ মৎসম্পাদিত পদ্যামৃততরঙ্গিণী, পৃঃ ৪৯, কবিতা ২০১। জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের উক্ত কবিতা, পৃঃ ৪৯, কবিতা ২০০। উল্লিখিত কবিতার সোপানটীকায় গ্রন্থকার হরিভাস্করের পুত্র টীকাকার জয়রাম বলছেন—"অথৈতস্যাপ্যাপদেশস্য দিল্লীন্দ্রশাহজাহানমহিষ্যাঃ সেবকো বংশীধরনামা কবির্বৈনাস্যাপদেশপদ্যেন প্রত্যুত্তরমদাত্তদুপন্যস্যতি দিঙনাগা ইতি…। ' যদি বৃষভে গৌরীপতিসম্বন্ধেন-বিক্রমঃ সম্ভাব্যতে, তথা যদ্যপি কণ্ঠেকালকুটুম্বিনীসম্বন্ধেন স তুল্য এব, পরন্তু বৃষভে জাতিকৃতা বিক্রমসংভাবনা নৈব প্রাদুর্ভবেদিতি ধ্বনয়ন্নাহ কণ্ঠেকাল ইত্যাদিনা…।"

এর থেকে প্রতিপন্ন হয় যে সংস্কৃত কবিরা কেবল সম্রাট্‌দের প্রিয়পাত্র ছিলেন না, তাঁদের মহিষীদেরও প্রিয়পাত্র হতেন, এবং ফলতঃ তাঁরা ঈদৃশ বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে তাঁরা সম্রাজ্ঞীর অন্দরমহলে পর্যন্ত অবাধে যাতায়াত করতে পারতেন।

মুসলমান নৃপতিমণ্ডলীর আদেশে বা তাঁদের প্রীতির নিমিত্ত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়। উদয়রাজ সুলতান মামুদ গজনির দিগ্‌বিজয়াদি অবলম্বনপূর্বক রাজ-বিনোদ নামক সপ্তসর্গাত্মক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। কড়ার বাহাদুর মালিকের পুত্র মালিক সুলতান সাহির উৎসাহ ও আদেশে সঙ্গীত-শিরোমণি নামক গ্রন্থ ভারতের তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী রচনা করেন। শ্রীবরের রাজ-তরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে যে কাশ্মীররাজ জৈনুল-আবেদিন (১৪২০-১৪৬৯) বিভিন্ন স্থান থেকে বিশিষ্ট বিশিষ্ট পণ্ডিতদের আনয়ন করেন তাঁদের পঠন-পাঠন এবং জীবিকানির্বাহের সৌকর্যার্থে বৃত্তি নির্ধারণ করে দেন। আলমসাহি বা মানবের শাসনকর্তা হোসঙ্গ ঘোরির সভাকবি ও অমাত্য মণ্ডন স্বকৃত শৃঙ্গারমণ্ডন, কাব্যমণ্ডন, সারস্বতমণ্ডন ও সঙ্গীত-মণ্ডন নামক গ্রন্থে অলমসাহির অত্যুদাত্ত প্রশংসা করেছেন। সম্রাট আকবরের নির্দেশানুসারে গঙ্গাধর নীতিসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁরই আনন্দ বর্ধনের নিমিত্ত (অকবরনৃপরুচ্যর্থং) পুণ্ডরীকবিট্ঠল তাঁর নর্তননির্ণয় প্রণয়ন করেন। বিকানীর থেকে গঙ্গা ওরিয়েণ্ট্যাল সিরিজে প্রকাশিত পদ্মসুন্দর কৃত আকবরসাহি শৃঙ্গারদর্পণ নামক গ্রন্থ মহামতি সম্রাটের আনন্দবর্ধনের নিমিত্তই বিরচিত হয়েছিল। বিরুদাবলী নামক গ্রন্থ জাহাঙ্গীরের স্তুতিমূলক। এই সম্রাটের প্রীতির নিমিত্তই ইৎবর খানের আদেশানুসারে জাহাঙ্গীর-বিনোদরত্নাকর নামক জ্যোতিষের এক করণ গ্রন্থ জাহাঙ্গীরের সভাকবি পরমানন্দ রায় রচনা করেন। (বিকানীর অনূপ লাইব্রেরীর হস্তলিখিত পুঁথি ৪৪৮৪)। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বাবর, হুমায়ুন, আকবর ও জাহাঙ্গীরের প্রশংসা আছে। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে[৩] রুদ্র কবি জাহাঙ্গীরের স্তুতিমূলক নবাবখান-চরিত নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শাহ জাহান ও তাঁর মন্ত্রী ওয়াসফ খানের আদেশানুসারে ১৬২৮ সালে নিত্যানন্দ সিদ্ধান্তসিন্ধু নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৬৬ সালে ঈশা খানের পুত্র মুছা খাঁয়ের আদেশানুসারে মথুরেশ শব্দ-রত্নাবলী নামক অভিধান রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ দৈবজ্ঞ কৃত জাতকপদ্ধত্যুদাহরণ নামক গ্রন্থে খানিখান বাহাদুরের কোষ্ঠী বিচার আছে এবং এ গ্রন্থ নিশ্চয় তাঁর ইচ্ছা বা অনুমত্যনুসারে রচিত হয়েছিল।

মুসলমান নৃপতিদের কেউ কেউ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যথাযোগ্য উপাধি বিতরণ করতেন। মহামতি সম্রাট আকবর জীবচ্ছ্রাদ্ধ-প্রয়োগরচয়িতা নারায়ণ ভট্টকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য "জগদ্‌গুরু" উপাধি দান করেন; জ্যোতিষশাস্ত্রে নিষ্ণাত নৃসিংহ পণ্ডিতকে তিনিই "জ্যোতির্বিৎ-সরস" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কাদম্বরীর বিশিষ্ট টীকাকার ভানুচন্দ্রকে "উপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করেন।[৪] সম্রাট জাহাঙ্গীর হোরাশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষতার জন্য কেশবশর্মাকে "জ্যোতিষরায়" উপাধি দান করেন। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁর "পণ্ডিতরাজ" উপাধি সম্রাট শাহজাহানের থেকেই পান।

৩ শকে হ্মাগ্নিতিথৌ (১৫৩১) সৌম্যে বৈশাখে শুক্লপক্ষতৌ।
চরিতং খানখানস্য বর্ণিতং রুদ্রসূরিণা ॥
এই কবি আকবর-পুত্র দানিয়াল এবং জাহাঙ্গীর পুত্র সুলতান খুরমের স্তুতির নিমিত্ত ও দু'খানা গ্রন্থ রচনা করেন।

৪ সম্রাট আকবর শঙ্কর ভট্ট, দামোদর ভট্ট, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি পণ্ডিতদেরও যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

একথা তিনি তাঁর আসফ-বিলাস-আখ্যায়িকায় স্পষ্ট বলে গেছেন।[৫] সম্রাট শাহ জাহানই কবীন্দ্রাচার্যকে সর্ববিদ্যানিধান[৬] এবং পরশুরামকে বাণীবিলাসরায় উপাধি দান করেন। সারস্বত-প্রক্রিয়ার রচয়িতা চন্দ্রকীর্তি ভূপতি সালেম সাহির নিকট যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হন। আহমদ-নগরের নিজাম বুর্হান তাঁর সভাকবি পরশুরাম-প্রতাপ, ভৃগুবংশকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সাবাজিকে "প্রতাপরায়" উপাধি দান করেন। বঙ্গদেশেও রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দিন বৃহস্পতিকে ষট্ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং মহাসমারোহে "রায়মুকুট" উপাধি প্রদান করেন। চরণ মল্লিক সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে হুসেন খাঁয়ের থেকে কণ্ঠাভরণ উপাধি লাভ করেন (ভরতমল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা পৃঃ ২৪)।

(২) অনুবাদ প্রভৃতি

মুসলমান নৃপতিরা অনুবাদের মাধ্যমিকতায় ও সংস্কৃত সাহিত্যের বহুল প্রচারে ব্রতী হন। তাঁদের উৎসাহে বা তাঁদের প্রভাবান্বিত হিন্দু নৃপতিদের উৎসাহে সংস্কৃতগ্রন্থ আরবীফার্সীতে এবং আরবীফার্সী গ্রন্থ সংস্কৃতে অনূদিত বা সারাংশে লিখিত হয়। কাশ্মীরের মহম্মদ সাহের জন্য শ্রীবর নিজামির য়ুসুফজুলেখা অবলম্বনে কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কাশ্মীরের রণবীর সিংহের ইচ্ছানুসারে সাহিরাম আখ্লক-ই-মোহসিনি নামক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করেন; অনূদিত গ্রন্থের নাম বীররত্নশেখর-শিখা। এরূপে আরব্যযামিনী নামক গ্রন্থও সংস্কৃতে অনূদিত হয়। অন্যদিকে সংস্কৃত থেকে ফার্সীতে বহু গ্রন্থের অনুবাদ হয়। কেবল আকবরই মহাভারত, রামায়ণ, অথর্ববেদ, লীলাবতী, তাজক, রাজতরঙ্গিণী, পঞ্চতন্ত্র, দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সর্বদা এ সব গ্রন্থের অনুশীলন করতেন। উপনিষদ্-রস-পিপাসু দারা শিকোহ পণ্ডিতগণের সাহায্যে সির-উল-আকবর বিরচিত করেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বেদ ও উপনিষদের মাহাত্ম্য অনবদ্য ভাষায় অকপট সারল্যে বিবৃত করেছেন এবং এও অকপটভাবে স্বীকার করে গেছেন যে সুফীদর্শন পাঠে যতটুকু শান্তি তিনি পেয়েছেন তার থেকে অনেক বেশী পেয়েছেন উপনিষৎপাঠে। তাঁর প্রপিতামহ আকবর যোগবাশিষ্ঠের যে অনুবাদ করিয়েছিলেন, তা' সম্পূর্ণ তাঁর মতানুযায়ী না হওয়ায় তিনি উক্ত গ্রন্থের পুনরায় অনুবাদ করান। দারা শুকোহের মুকালমহ্-ই-বাবালালদাস নামক গ্রন্থ রাজতনয়ের সঙ্গে বাবালালদাসের কথোপকথন অবলম্বনে রচিত; এ গ্রন্থে হিন্দু সন্ন্যাস ধর্ম বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে জগতে চিরদিন বরণীয় হয়ে থাকবে। জয়পুরের জয়সিংহ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনেক আরবী জ্যোতিষ গ্রন্থ সংস্কৃতে এবং বহু সংস্কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ ফার্সীতে অনূদিত করেন।

ফলতঃ অনুবাদের মাধ্যমিকতায় সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক জ্ঞানের বহুল প্রসারের নিমিত্ত মুসলমান নরপতিরা প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন। একমাত্র মহাভারতের সচিত্র অনুবাদের জন্য তখনকার দিনেও মহামতি সম্রাট আকবর ছয় লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন।

৫ সার্বভৌম-শ্রীশাহজহাঁ-প্রসাদাধিগত-পণ্ডিতরাজপদবী-বিরাজিতেন...পণ্ডিত-শ্রীজগন্নাথেন...।

৬ কবীন্দ্রাচার্যের "জগদ্বিজয়চ্ছন্দঃ" নামক গ্রন্থ সম্প্রতি বিকানীর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

(৩) মুসলমানদের সংস্কৃত সাহিত্যে দান

এ স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। মুসলমানদের সংস্কৃত সাহিত্যে প্রভূত দান না থাকলেও যা পাওয়া যায়, তা' থেকেই মুসলমানদের সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রতীয়মান হয়। (ক) উপনিষদ্। সেখভিখন ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন; পরবর্তী জীবনে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উত্ত্যক্ত হয়ে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রতী হয়ে আল্লা উপনিষদ রচনা করেন—এ সত্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বদাওনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। (খ) দর্শন। ১৬১৫ সালে মহম্মদ দারা সুকোহ সমুদ্রসঙ্গম (অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মস্বরূপ দুই সমুদ্রের মিলনস্থল)[৭] নামক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে দারা স্ফুফী ও বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের সূক্ষ্ম তুলনা করেছেন। সুখের বিষয় এ গ্রন্থ পক্ষপাতদোষরহিত। এ গ্রন্থে হিন্দু ও মুসলমান সন্ন্যাসিমণ্ডলীর প্রশংসা সমভাবে দৃষ্ট হয়; ফলতঃ গ্রন্থকার বাবালাল বৈরাগীকে বিশিষ্ট স্ফুফী ফকিরদের থেকেও উচ্চতর আসন প্রদান করেছেন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক স্বয়ং বলেছেন—অজ্ঞানী ভিন্নমতপোষণকারীর অজ্ঞান নিরসনের জন্য এ গ্রন্থ তিনি লেখেন নি। নিজের কুটুম্বের প্রতি অনুকম্পাপ্রণোদিত হয়েই এ গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন।[৮] (গ) কাব্য। এ প্রসঙ্গে শায়েস্তা খাঁ, দারা শুকোহ, দরাফ খাঁ, আব্দার রহিম, খান খানান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দারা শুকোহ বারাণসীর নৃসিংহ গোস্বামী সরস্বতীর নিকট এক পত্রে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রপূর্বক নমস্কার নিবেদন করেছেন।[৯] (ঘ) সঙ্গীতমালিকার লেখক মহম্মদ শাহ সংস্কৃতশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ পুঁথি এখনও পাওয়া যায়নি; কিন্তু যতটুকু অবশিষ্ট আছে, তা' থেকেই তাঁর গ্রন্থের অনবদ্য সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ প্রকটিত হয়। (ঙ) জ্যোতিষশাস্ত্রে খান খানানের খেটকৌতুক মুসলমানদের বিশিষ্ট দান। এ গ্রন্থে ফার্সী বুলি সংস্কৃতবিমিশ্র হয়ে এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তজ্জন্য জনসাধারণের কাছে এ গ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

(৪) বিবিধ।

সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষার মধ্যে একটী নিকটতম সংপর্ক সংস্থাপন বিষয়ে সম্রাট আকবর প্রমুখ মুসলমান নৃপতি যত্নপরায়ণ হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর কৃষ্ণদাসকে পারসীপ্রকাশ নামক অভিধান ও ঐ নামের একটী ব্যাকরণ বিরচনে উৎসাহিত করেন। কবিকর্ণপুর সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশানুসারে পারসীপদ-প্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বেদাঙ্গরায় সম্রাট শাহজহানের আনন্দবর্ধনের নিমিত্ত পারসীপ্রকাশ নামে আরো একটী গ্রন্থ রচিত করেন। ছাত্রদের সহায়তার নিমিত্ত ফার্সী-সংস্কৃত বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থও রচিত হয়। কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্ব সময়ে কিছু কালের জন্য সংস্কৃত ভাষা রাজকীয় ভাষারূপে গৃহীত হয়। কাশ্মীরে বিশিষ্ট[১০] মুসলমানদের কবরের উপর সংস্কৃতে লিখিত প্রস্তরলিপিও খোদিত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত বাহাউদ্দিন সাহেবের কবরের উপরে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। হিন্দু মুসলমানদের পূর্ণ মৈত্রী বঙ্গদেশের বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রভুর শিক্ষার দিব্যালোকে এ মৈত্রী জগজ্জনসমক্ষে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছিল। আজ স্বাধীনতাগমে বঙ্গদেশকেই তাই পুনরায় এ পূর্ণ মৈত্রী সংসাধনের নিমিত্ত অগ্রণী হতে হবে। ইহা বঙ্গদেশের সাধনার অংশীভূত।

৭ অবশ্যং জ্ঞাতব্যানাং সফলানাং কতিপয়বাক্যানাং পরস্পরসংগ্রহমকরবং জ্ঞানিনোর্দ্বয়োরপি মতসমুদ্রয়োরিহ সঙ্গম ইতি নাম চাস্থাপয়ং সমুদ্রসঙ্গম ইত্থং কিলোপদেশো মহানুভাবানাং যন্নির্মৎসরতয়া তত্ত্ববিবেচনে।

৮ স্বানুভবেন নির্ণীয় তত্ত্বার্থং স্বকুটুম্বেম্বনুকম্পয়া কৃতোহয়মারম্ভঃ। ন পুনরজ্ঞানিনো বিভিন্নমতসম্বন্ধিনো বোধনেন মম প্রয়োজনম্।

৯ ...শ্রীগোস্বামিনৃসিংহাশ্রমেষু প্রকটিতপরমানন্দসন্দোহ-তত্ত্বজ্ঞানদূরীকৃতমহামোহ সমবগতসত্ত্বভূমিকাসমারোহ-মহম্মদ-দারা-শুকোহকৃতা "ওঁ নমো নারায়ণায়" ইতি অষ্টাক্ষরমন্ত্রপূর্বকা নমস্কারাঃ সন্তু।

১০ শ্রীমজ্জহাঙ্গীরমহীনহেন্দ্র······নিদেশরূপম্।
করোত্যদঃ সংস্কৃতপারসীকপদপ্রকাশং কবিকর্ণপূরঃ॥
রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি।



কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী

উদ্বোধন, স্বর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৬

শিল্পী
শ্রীনন্দলাল বসু

ব্লক ও মুদ্রণ বেঙ্গল অটোটাইপ কো

রাজা রামমোহন ও ধর্ম্মবিজ্ঞান

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, এম-এ, বি-এল

ধর্ম্মবিজ্ঞান

রাজা রামমোহন জীবিতকালে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দুরা তাঁহাকে বৈদান্তিক পণ্ডিত, খৃষ্টানেরা খৃষ্টান পাদরী, ও মুসলমানেরা তাঁহাকে জবরদস্ত্ মৌলবী, বলিয়া দাবী করিবে। একই মানুষকে একসঙ্গে হিন্দু-পণ্ডিত, খৃষ্টান-পাদরী ও মুসলমান-মৌলবী বলার তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ, রাজা হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান এই তিনটি ধর্ম্মের শাস্ত্র (বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ) অতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। তাঁহার সময়ে পৃথিবীতে কোন একজন মানুষ এত অধিক ভাষা জানিত না। হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থ যে যে ভাষায় লিখিত আছে, সেই মূল ভাষাতেই তিনি ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ মূল ভাষা হইতে তিনি নিজেই করিয়াছিলেন। এবং এই বিভিন্ন ধর্ম্মকে এ যুগে সর্ব্বপ্রথম তিনি তুলনামূলক বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিচারকে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। পণ্ডিত মোক্ষমূলার এবং ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের দ্বারা ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, রাজা রামমোহনই বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পূর্ব্বে এ যুগে এই কার্য্য এমন ভাবে আর কেহ করেন নাই।

অর্থের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ উহার প্রণালীবদ্ধ আলোচনা হইতেই অর্থ-নীতির উদ্ভব। রাষ্ট্রের সহিত মানুষের যে সম্পর্ক তাহার বিচার-বিশ্লেষণ হইতেই রাজনীতির উদ্ভব। এই জগতের স্রষ্টা ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা যে এক পরমেশ্বর, তাঁহার সহিত মানুষের সম্পর্ক লইয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি। এবং ঐ বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রণালীবদ্ধ আলোচনা হইতেই ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের উৎপত্তি। মানুষ স্বভাবতঃই অনেকে মিলিয়া একত্রে বাস করে। অতএব মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব এবং মানুষের সহিত সম্পর্কিত অর্থনীতি ও রাজনীতি যেমন সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি উপরে কথিত ধর্ম্ম-বিজ্ঞানও সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম্মের উৎপত্তি মানুষের মনে—ইহা যেমন সত্য, তেমনি ধর্ম্মের বিস্তার ও বিকাশ সমাজের জীবনে—ইহাও সত্য।

ধর্ম্মের উৎপত্তি

রাজা রামমোহনের মতে, এই জগতের স্রষ্টা ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এক পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি এই পরমেশ্বরে বিশ্বাসকে মানুষের সহজাত সংস্কার বা মনের স্বাভাবিক বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতির উপাসনা (মোক্ষমূলর) অথবা পরলোকগত আত্মার উপাসনা (হার্ব্বার্ট স্পেন্সর) হইতে রাজার মতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। রাজা মৃত্যুর পর পরলোকে বিশ্বাসকেও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এবং ইহাকেও মানুষের মনের স্বাভাবিক বিশ্বাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা বলিয়াছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস যেমন সকল ধর্ম্মেই স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সেই ঈশ্বরসম্বন্ধে ধারণা,

সেই ঈশ্বরের গুণাবলী ও কার্য্যকলাপ তেমন সকল ধর্ম্মেই প্রকাশ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। এবং বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এক ধর্ম্মে যাহা বিধি (হালাল্) অপর ধর্ম্মে তাহাই নিষেধ (হারাম্) বলিয়া ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মে যে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়, রাজা সেই সকল বিরোধের একটা সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা বলিতেছেন,—

"আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই উপলক্ষ্য করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ-সম্ভব হয় না, কেন না প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই বিশ্বাসপূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসকরূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাহারা কাল কিংবা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিংবা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের বিরোধী হইতে পারিবেন না, এবং চীন ও তিব্বৎ ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।"—(অনুষ্ঠান)

দেখা যাইতেছে—রাজা এসিয়ার চীন-তিব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপের সকল দেশের ধর্ম্মগুলিকেই তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন, পারস্য ও তুর্কীকেও তিনি বাদ দেন নাই। পৃথিবীর সকল দেশে সকল ধর্ম্মের উপর তাঁহার দৃষ্টি সমান সম্প্রসারিত রহিয়াছে। আবার যাহারা বুদ্ধ অথবা কালকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্মকেও তাঁহার অপক্ষপাত আলোচনায় সমান স্থান দিয়াছেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনা

রাজা কলিকাতা আসিয়া বসবাসের দশ বৎসর পূর্ব্বে, মুর্শিদাবাদে দেড় বৎসর ছিলেন। আমার ধারণা, এই সময়ে (১৮০৪ খৃঃ) মুর্শিদাবাদে থাকা কালে তিনি "তুহাপ্‌তুল মোহাদ্দিন্" নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থ পারস্যভাষায় লেখা হয়। এবং ইহার ভূমিকা তিনি আরবী ভাষায় লেখেন। রাজনারায়ণ বসুর অনুরোধে মৌলবী ওবায়েদ্-উল্লা এল্-ওবায়েদ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। মূলগ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। সুতরাং এই ইংরেজী অনুবাদই আমাদের এখন সম্বল। রাজা এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে,—"সকল ধর্ম্মেই কোন কোন বিষয়ে মিল আছে, এবং কোন কোন বিষয়ে মিল নাই, এমন কি মর্ম্মান্তিক বিরোধ আছে। অতএব প্রশ্ন—বিভিন্ন ধর্ম্মের এই বিরোধগুলির সমাধান কিরূপে হইবে?" যেহেতু বিরোধীয় জিনিষ এক সঙ্গে সত্য হইতে পারে না, এবং কোন বিশেষ ধর্ম্মের বিরোধীয় বস্তুকে একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে সেই ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়, সেইজন্য রাজা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই কিছুটা মিথ্যা আছে;—"Hence, falsehood is common to all religions without distinction."

প্রত্যেক ধর্ম্মের মিথ্যা-অংশ অপরিহার্য্য নয়, সুতরাং এই মিথ্যা-অংশ পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মের যে-অংশ সত্য, তাহার কোনই ক্ষতি হয় না; বরং, মিথ্যা পরিত্যাগের দরুন গৌরব বাড়ে। রাজা তাঁহার সময়ে প্রচলিত হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের এইরূপে সংস্কারপ্রয়াসী ছিলেন। এবং এই জন্যেই কোন ব্যক্তির ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রত্যেক

বিশেষ ধর্ম্মকে তাহার মিথ্যা-অংশ পরিহার করিয়া সকল ধর্ম্মের লোকের গ্রহণীয় করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মের স্তরভেদ ও অধিকারী ভেদ

এই তুলনা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কোন এক বিশেষ ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ বিশেষ ধর্ম্ম তার কোন এক বিশেষ স্তরে নিঃশেষিত হয় নাই। সুতরাং ইহাতে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ স্বীকার করা হইয়াছে। রাজা হেগেল পাঠ করেন নাই, হার্ব্বার্ট স্পেন্সরও তখন জন্মেন নাই। সুতরাং ধর্ম্মের এই স্তরনির্দ্দেশ ও ক্রমবিকাশ রাজার একটি মৌলিক আবিষ্কার।

ইহা প্রত্যক্ষ যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের ইতিহাস-পথে বিভিন্ন স্তর আছে। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনা করিতে হইলে ঐ সকল ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরগুলির উপর মনোযোগ দিতে হইবে। কেন এক ধর্ম্মের এক স্তরের সহিত অপর ধর্ম্মের সমান আর এক স্তরের তুলনা করিতে হইবে, ইহা বিশেষরূপে প্রণিধান-যোগ্য। স্তরভেদ প্রত্যেক ধর্ম্মে স্বীকার করার ফলে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই অধিকারী ভেদ স্বীকার করা হইল। প্রত্যেক হিন্দুই হিন্দুধর্ম্মের এক স্তরে থাকিয়া উপাসনা করে না। প্রত্যেক খৃষ্টান খৃষ্টানধর্ম্মের একই স্তরে এবং প্রত্যেক মুসলমান মুসলমানধর্ম্মের একই স্তরে নাই। সম্যক জ্ঞান ও তাহার বিরোধী অজ্ঞান মানুষকে ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। অতএব প্রত্যেক ধর্ম্মেই বিভিন্ন স্তর যুগপৎ বিদ্যমান, এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই স্তরভেদে বিভিন্ন অধিকারীও বিদ্যমান।

ধর্ম্মের শ্রেণীবিভাগ

এই শ্রেণীবিভাগ দুই প্রকারে করা হইয়াছে,—

(১) বিভিন্ন ধর্ম্মের স্তরগুলির মধ্যে যেখানে সাদৃশ্য আছে, বিভিন্ন ধর্ম্মের সেই সকল সদৃশ স্তরগুলিকে এক শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। যেমন, বিভিন্ন ধর্ম্মের মূর্ত্তিপূজার স্তরগুলিকে একই শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে; বিভিন্ন ধর্ম্মের বহু দেবদেবী-বাদকে সেইরূপ একই শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মের একেশ্বরবাদকেও একই শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। সেইরূপ নিরীশ্বরবাদকেও এক শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে, কেন না আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি চার্ব্বাক, জৈন, সৌগত, সাংখ্য ও মীমাংসক—এই পাঁচজন ঈশ্বরে বিপ্রতিপন্ন।

(২) স্তরভেদ ছাড়াও কতকগুলি ধর্ম্ম আকারে-প্রকারে গোড়া হইতেই এত ভিন্ন, এমন কি পরস্পরবিরোধী যে তাহাদিগকে স্তরভেদ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ফেলিতে হইবে। যেমন, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টানধর্ম্মে কিছুটা ঐক্য থাকায় এক শ্রেণীতে যাইতে পারে। অথচ বৈষ্ণবধর্ম্ম আর শাক্তধর্ম্ম এত পরস্পর-বিরোধী যে এক শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে না। তন্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত বৈদিক যাগ-যজ্ঞের যে সম্পর্ক, বৈষ্ণবধর্ম্মে তাহা নাই। সুতরাং এই দিক দিয়া তন্ত্রের ধর্ম্মকে বৈদিক ধর্ম্মের সমপর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

আর এক তৃতীয় প্রকারেও শ্রেণীবিভাগ করা যায়।—

(৩) বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মে মিল আছে, আবার গরমিলও আছে। বৌদ্ধ ঈশ্বরে বিপ্রতি-পন্ন, বৈষ্ণব ঈশ্বরে বিশ্বাসী ইহা গরমিল। আবার নীতির দিকে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব অহিংসা-বাদী। বৈদিক বা তান্ত্রিক ধর্ম্ম বৈধ হিংসা স্বীকার করেন। গীতাও করেন। যে কোন ধর্ম্মের লোক বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব হইতে পারে, এইদিকে উভয় ধর্ম্মে মিল আছে। এক

ঈশ্বর বিষয়ে গরমিল ছাড়িয়া দিলে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবকে অনেকটা একই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

রাজার বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক বিচারপ্রণালীর ইঙ্গিত ও সারসঙ্কলন তুলিয়া দিলাম। তাঁহার বহু গ্রন্থের বিস্তৃত রচনাবলী হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা স্থানাভাবে সম্ভবপর হইল না।

হিন্দুধর্ম্মের উপর মুসলমান ও খৃষ্টান বিজেতাদের আক্রমণ

রাজা ইতিহাস হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মুসলমান ও খৃষ্টান পর পর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে না বুঝিয়া বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিজেতা বিজিতদের ধর্ম্মকে স্বভাবতঃই লঘু মনে করিয়া উপহাস করে, রাজা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লিখিয়াছেন,—

"যখন মুসলমানরা এদেশ আক্রমণ করিল, তাহারাও এরূপ নানাবিধ ধর্ম্মগ্লানি করিত। চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর ন্যায় ছিল, তথাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইত ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোন ধর্ম্ম ছিল না—তাহারাও যখন বাঙ্গলার পূর্ব্বাঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল, সর্ব্বদা হিন্দুধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত।··· পূর্ব্বকালে, গ্রীকেরা ও রোমীরা—যাহারা অতি নিকৃষ্ট ও পৌত্তলিক, ও নানাবিধ অসৎ কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদীর ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত। অতএব, এ দেশে অধিকার প্রাপ্ত ইংরেজ মিশনরীরা এরূপ ধর্ম্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন, তাহা অসম্ভাবনীয় নহে।—" (ব্রাহ্মণসেবধি)

হিন্দুধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন স্তর

(১) রাজা হিন্দুধর্ম্মের মূর্ত্তিপূজাকে এই বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে, ইহা জড়ের উপাসনা নয়, মূলতঃ ইহা চৈতন্যের উপাসনা। কেন না, যাবৎ মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হয় তাবৎ কোন হিন্দুই তাহার পূজা করে না। বিশেষতঃ স্থূল চিত্ত স্থির হইলে পর, ক্রমে সূক্ষ্ম চিত্ত স্থির হইতে পারে।

(২) রাজা বহু দেবদেবীবাদ ও দেবদেবীর পূজা এই বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন যে, উপাসকেরা দেবদেবীকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা মনে করিয়া পূজা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা ঈশ্বরের পূজাই হইল। এই সকল দেবদেবীর পারমার্থিক সত্তা নাই, কেবল ব্যবহারিক সত্তা আছে।

(৩) সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাও "কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত হয়," কেন না, "ইহার অতিরিক্ত তাঁহার (পরব্রহ্মের) যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধিগম্য নহে।···কি শ্রুতি, কি যুক্তি, কেহই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন না।"

(৪) অদ্বৈত তত্ত্বে যে নিরাকার, নির্গুণ, নির্ব্বিকল্প পরব্রহ্মের উল্লেখ আছে রাজা তাহাকেই হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"যিনি যে ভাবে আত্মানুভব করেছেন তিনি সেই ভাবে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। উদ্দেশ্য সকলেরই কিন্তু আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

যোগতত্ত্বের এক পরিচ্ছেদ

শ্রীমতিলাল রায়

সৃষ্টি যার, দরদ তার অকৃত্রিম। সৃষ্টির স্বপ্ন একজনের। স্বপ্ন যখন রূপে পরিণত হয় তখনই দুইজনের ঐক্য। এমনই ভাবে সৃষ্টিবৈচিত্র্য বিকশিত হয়। এক অঙ্গীকে ধরেই সৃষ্টি—অঙ্গের বিকাশ। যাহা বিকাশ তাহার লয় আছে। যাহার বিকাশ তাহার লয় নাই। স্বপ্নও ভেদ-হেতু-স্বপ্ন ও স্বপ্ন-দ্রষ্টা। স্বপ্ন রূপ নিতে শক্তির প্রকাশ। স্বপ্ন তখন ভাব। কাহার ভাব? পুরুষের। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। পুরুষ ও পুরুষের স্বপ্ন যতটা অদ্বয়বোধ—স্বপ্নকে মূর্ত্তি দিতে যে শক্তির আবির্ভাব তাহার সহিত পুরুষকে অদ্বয়বোধে দেখা—ততটা সহজ নয়। এই হেতু দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বহু বাদ আমাদের দেশে পরিদৃষ্ট হয়। এ বিচার সর্ব্বপ্রথম ভারতেরই। তারপর ভারতের মনীষীরা এই একই বিচার-বুদ্ধির অনুসরণে রত হইয়াছেন।

পুরুষের স্বপ্ন প্রকৃতি মূর্ত্তি দান করেন। পুরুষের যেমন স্বপ্ন প্রকৃতিও তেমনই পুরুষের। ব্যতিরেক বিচারে স্বপ্ন হইতে পুরুষ যেমন পৃথক করিয়া দেখা—প্রকৃতিকেও তদ্রূপ পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দেখা যায়। এই দেখার ফলেই এ দেশে পুরুষবাদ ও শক্তিবাদের সৃষ্টি। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব লক্ষ্যে পুরুষের উপাসনা। সাবিত্রী, লক্ষ্মী, গৌরী—শক্তিসাধনার লক্ষ্য। উপাসনায় এই গভীর তত্ত্ব সনাতন ভারত ব্যতীত কুত্রাপি নাই।

পুরুষ ও শক্তিভেদ সম্প্রদায় ভেদের হেতু। অবশ্য ব্রহ্মবাদী সম্প্রদায় লক্ষ্যে পড়ে না। পুরাণ কাহিনীতে ব্রহ্মার প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপ আছে। বিষ্ণুবাদে ও শিববাদে বহু সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব ও শৈব মতের পথস্বাতন্ত্র্যে সম্প্রদায়-ভেদ অতি বিস্তৃত। শক্তির উপাসনায়ও ইহার অন্যথা হয় নাই। সম্প্রদায়সৃষ্টির গোড়ার কথা এই খানেই নিহিত।

সৃষ্টি হইতেই সব কিছু জাত। আবার লয় হইতেও সৃষ্টির মূল মিলে। এই জন্য সৃষ্টি ও লয় দুইই অতি গভীরতত্ত্ব। দৃশ্য সৃষ্টি লয়ে অদৃশ্য হয়। আবার ভবিষ্যতের সৃষ্টি ইহাতেই অবস্থিত। মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই বর্ত্তমান। বর্ত্তমানই অধিকতর ভাবে গ্রহণীয়। কিন্তু বর্ত্তমান উৎপত্তিও নাশশীল। যাহার উৎপত্তি ও লয় আছে তাহার একটা রূপও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাহা না হইলে উৎপন্ন বুঝা যাইবে কি প্রকারে? যাহা ছিল তাহা আর নাই বলিয়াই তো লয়ের মর্ম আমরা উপলব্ধি করি। এই ত্রিকালেরই পূজা আমরা করিয়া থাকি। ত্রিগুণের উপাসনায় সনাতন ভারত নিরত। মন্ত্র—উৎপন্নের স্মারক। মন্ত্রের তাই লয়ও আছে। এমনই গুরু, এমনই প্রতিমা বর্ত্তমানের আশ্রয়। বর্ত্তমানের ইহা সনাতন আশ্রয়। ইহাকেও অতিক্রম কেহ করে নাই। ভাষাভেদ বশতঃ বৃথা তর্ক, বৃথা বিতণ্ডা।

সম্প্রদায়গত ভেদের হেতুবাদ শাশ্বত। ভেদ দূর হইবে না কোন দিন। ঐক্য লক্ষ্যের

বিষয়। ঐক্যে পৌছান অর্থে লয়। এই লয় প্রাকৃত অপ্রাকৃত ভেদে দ্বিবিধ। প্রাকৃত লয়ের কথা শাস্ত্রাদিতে আছে এবং জগৎপ্রপঞ্চেও ইহা নিত্য দৃশ্যরূপে সতত দৃষ্টিগোচর হয়। আমি অপ্রাকৃত লয়ের কথা বলিতেছি; যাহা দিব্যলয় নামে অভিহিত হয়। সচেতন লয়ই দিব্য বা অপ্রাকৃত। অনুলোমক্রমে সৃষ্টি, অতএব বিলোমক্রমে লয় নিশ্চয় যুক্তিযুক্ত এবং বিজ্ঞান-সম্মত। যাহা হইতে সৃষ্টি তাহাতেই লয় এই সহজ জ্ঞান দিতে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রাকৃত লয় যেমন করিয়া হয়, দিব্য লয়ে তাহার অন্যথা হয় না, তবে পূর্ব্বোক্ত লয় হয় অজ্ঞাতে, অচেতনে। শেষের লয় জ্ঞাতসারে, সচেতনে সিদ্ধ হয়।

এইবার কথা চেতন, অচেতন লইয়া। লয় সমান হইলেও চেতন লয় অচেতন লয়ে ফলভেদ অবশ্যই আছে। ফলভেদ হেতু সাধুজনেরা চেতন লয় বাঞ্ছা করেন। অচেতন লয়ে কি হয়? দেহটা চেতনার আবরণ বা খোলস। চেতনার পরিণাম খোলসে প্রকটিত হয়। অচেতন লয়—চেতনার লয় নহে। প্রকৃতিবশে প্রাণকেন্দ্র মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অচেতন বশতঃ কোথায় লয় হইল তাহা বুঝা যায় না। ভিতরের এই বিলয় বাহিরে প্রকাশ হয়। শরীরটাকে মাটীতেই পোত, আর জলেই ভাসাও বা অগ্নিদগ্ধ কর—আবরণের রচনা যে উপাদানে সেই উপাদানসমূহে তাহার লয় অবশ্যই হইবে। এক্ষণে উহার অন্তর্নিহিত চেতনার সন্ধান করা যাউক।

এই লয়টা প্রাকৃত। হয় দৈব ব্যাধি, না হয় ভৌতিক ব্যাধি, যে কোন প্রকারে চেতনার অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতে এই যে লয় এখানে বিচার বা বিবেক নাই। হয়—কিন্তু কি হয় জানা থাকে না; তাই এই প্রাকৃত লয়ের পরিণাম ভূত নামে খ্যাত। প্রেতযোনি প্রাপ্তির কথাও প্রসিদ্ধ। অন্ধের হাতড়াইয়া বেড়ানর ন্যায় এই ভূত বা প্রেত পুনরাশ্রয়ে প্রকাশ হয়। অতীতের সংস্কারে পুনঃ পুনঃ আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। উপনিষদে ইহাকেই বলা হইয়াছে "অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে"। অচেতন আর জড় একই বস্তু। জড় ভিন্ন অন্য লক্ষ্য নাই যাহার তাহার চেতনা পুনঃ পুনঃ লয়ে জড়েরই অন্বেষণ করে। জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্ত এইভাবে অনুস্যূত। গীতায় বলা হইয়াছে—

"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

সচেতন লয়ের কথা এই শ্লোকে নিহিত আছে। অতঃপর আমি এই কথাই বলিব।

ঈশ্বর নিরাকার—চৈতন্য-স্বরূপ। ঈশ্বরনিষ্ঠা, ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা ততক্ষণ অর্থহীন, যতক্ষণ না এই অবাস্তব কাল্পনিক ঈশ্বরতত্ত্ব দিব্য-জন্ম, কর্মে অনুবাদিত ইষ্টের সাক্ষাৎ না মিলে। এই সুমহান্ সনাতন তত্ত্ব ভারতেরই সাধ্য হইয়াছে। ভারতই এই সনাতন পথে চলিয়াছে, নতুবা স্মৃতিকার বলিতে পারিতেন না—"গুরৌ মানুষবুদ্ধিং কুর্ব্বংস্তু নরকং ব্রজেৎ"; আর কবি নরোত্তমও ইহারই অনুবাদে গাহিতেন—

"গুরুকে মানুষ জ্ঞান করে যেই জন।
দারুণ নরকে তার হয় নিপাতন॥"

ভ্রান্তবুদ্ধি সাধকের প্রশ্ন এই অবাস্তব, কাল্পনিক ঈশ্বরতত্ত্বের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি—"তাঁহার গতির ইতিহাস কি?" উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন—যিশুর কণ্ঠেও তাহার প্রতিধ্বনি হইয়াছে—"যাহা বলি কর, আমার গতির ইতিহাস অনুসরণের প্রশ্ন তুলিও না। লয়লক্ষ্যে খাঁটি সাধকের আলোর পথে যাত্রাই বড় কথা। সংশয় ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া সময় ক্ষয় তিনি করেন নাই।

এই লয় দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত স্ববিষয়ে লয়, এখানে একটা অবলম্বন

আছে, তাই জ্ঞানাভাব হয় না। জ্ঞানের মৌলিক ভূমি থাকিয়া যায়। অসম্প্রজ্ঞাত—অবিষয়ী জ্ঞান-ভূমি পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। নূতন যুগের সাধকদের এই সম্প্রজ্ঞাত-অসম্প্রজ্ঞাত লয়যোগের কথা বিশেষ করিয়া বুঝিবার দিন সমুপস্থিত। বিষয়টি গভীর ও গুরুতর। কিন্তু এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ দেওয়া বক্ষ্যমাণ একটী প্রবন্ধে সম্ভব নহে; আমি তাই উপস্থিত নিরস্ত রহিলাম; ভবিষ্যতে এই গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিব।

এই যে লয়যোগের কথা বলিলাম—ইহা সাধ্যবস্তু। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই যোগ সিদ্ধ করিতে হইবে। ধর্মলাভ বহুজনের ভাগ্যে ঘটে, কিন্তু ধর্মপরায়ণ অল্প লোকই যোগ লাভ করে। ধর্মের সাধনা আনুষ্ঠানিক। একটি উদাহরণ দিলেই ইহার সত্যতা বুঝা যাইবে। যেমন সত্যধর্ম রক্ষা করার জন্য সত্যবাক্য, সত্য-চিন্তা ইচ্ছা করিলেই করা সম্ভব নহে—এই সঙ্গে চাই অন্তরের পরিপূর্ণ সন্তোষ। আর এই সন্তোষ লাভের জন্য মানুষের চাই আস্তিক্যবুদ্ধি—তবেই নিয়মিত পূজা, আরাধনা, উপাসনা আনুষ্ঠানিক ভাবে সুসিদ্ধ। এইগুলি সবই সত্য-রক্ষার অঙ্গ। এই সদ্‌গুণাবলী জীবনে আয়ত্ত করিতে হইলে ইন্দ্রিয় নিগ্রহেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই ধর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ বিধিনিষেধের অনুবর্ত্তী হইতে হয়। ধর্মাচরণ পরিপূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ হয় যে ক্ষেত্রে—যোগবীর্য সেইখানেই মূর্ত্ত হইতে পারে।

আমি এই যোগের কথাই বলিতেছি। ধর্ম লাভ না হইলে ধর্মত্যাগের কথাই আসিতে পারে না। এই জন্য গীতায় স্ব স্ব ধর্মপরায়ণ হওয়ার বহু প্রশংসা-বাক্য কথিত হইয়াছে। তারপর ধর্মের সাধনায় মানুষ যখন নষ্টমোহ হয়, স্বরূপের স্মৃতি লাভ করে, তখনই একজন আর এক জনের দিকে চাহিয়া বলে, "করিষ্যে বচনং তব," তখনই মহাপুরুষের পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিয়া বলে "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এক অন্যের অনুসরণে বহুবিধ সমাজ ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়—ইহা লয়যোগ ভিন্ন অন্য কি হইবে? তাই ভগবানের অমৃতশীতল কণ্ঠে বাণী ফোটে—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" ভারতের বেদে উপনিষদে এই যোগতত্ত্ব সুপ্রচারিত। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে এই বাণী অনুবাদিত হইতে চাহিয়াছে পার্থ-কৃষ্ণের আশ্রয়ে। ভারতের মুক্তি ধর্মে নাই কিন্তু ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় না হইলে যোগবীর্য্যও লাভ হয় না। যোগই এ জাতিকে মুক্তি দিতে পারে—তাই গীতার শেষ কথা—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতিমম॥"

ভারতের কুরুক্ষেত্রে যোগবীর্য্যের প্রচার। তারপর তার সাধনা—পাঁচহাজার বর্ষকাল ভারত করিয়াছে। এই যোগের সঙ্কেত আশ্রয় করিয়াই শিখজাতির অভ্যুদয়। মহারাষ্ট্রে শিবাজীর অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছে।

রাষ্ট্রের ভিত্তি আশ্রয় করিয়া যে যোগ অনুবাদিত হয় তাহার পরিণাম অতীতের ন্যায় বর্ত্তমানেও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে যোগের অভিব্যক্তি বাংলার সাধনায় মূর্ত্তি লওয়ার প্রচেষ্টা হইয়াছে। সাধনার সেই দীর্ঘ ইতিহাস এই ক্ষেত্রে আলোচনা করিব না। কুরুক্ষেত্রের যোগ দক্ষিণেশ্বরে রূপ লইতে চাহিয়াছে—ঠাকুর রামকৃষ্ণে ও বিবেকানন্দে। এক অন্যের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া যে বীর্য্য প্রকাশ করে, তাহা বাংলার পার্থ বিবেকানন্দে লীলায়িত হইয়াছে। বাঙ্গালী যোগের আস্বাদ পাইয়াছে. পূর্ণযোগের পরিপূর্ণ প্রকাশ যে শ্রীবিজয়ভূতি ও সত্যনীতি তাহা আজিও প্রকাশ হয় নাই। দক্ষিণেশ্বরে যাহা হইয়াছে—"ততঃ কিম্" বলিয়া একদল লোক চলিয়াছে বর্ত্তমান জাতির পুরোভাগে। ভারতের মুক্তি ও অভ্যুত্থান এই মানুষদেরই যোগযুক্ত জীবনে সম্ভব হইবে। বাঙ্গালী তাই ঈশ্বর-যুক্তির জন্য আকুল হইয়া ছুটিয়াছে। যাহা হইতেছে তাহা অংশ মাত্র, পূর্ণ নহে। জাতি ও দেশকে পূর্ণকাম করিবে—যোগ। বিশ্বমানবজাতি তাহারই আশ্রয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে। বাঙ্গালী আত্মলয়ের মধ্য দিয়া যোগ-যুক্তি চাহিয়াছে। বাংলার হিমালয় শিরে তাহাদেরই কণ্ঠে রব উঠিবে "শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ।"

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রেমেশানন্দ

কাশীপুর উদ্যান-ভবনে
ক্ষীণদেহে অন্তিম শয়নে
করুণার ছবিসম   সেই মুখ অনুপম
বারবার ভেসে ওঠে মনে।
বড় দুঃখময় ধারা   ক্ষণে হই শান্তিহারা
তুমি মম সান্ত্বনা জীবনে।

সুধাহেতু মথি সিন্ধুজল
দেবাসুরে লভিল গরল
ত্রিভুবন তপ্ত হেরি   হলাহল পান করি
দগ্ধ হ'ল তব কণ্ঠস্থল।
'নীলকণ্ঠ' তুমি দেব   আদি প্রেমমূর্তি তব
দেবতার সাধিতে মঙ্গল।
মানবের মানস-সলিলে
তীব্রতম গরল উথলে
তুমি তা' করিলে পান   দগ্ধকণ্ঠ দিলে প্রাণ
শান্তি তবু হ'ল না ভূতলে!
এত দয়া জীবতরে   সহ ব্যথা অকাতরে
হেরিলে-পাষাণ বুঝি গলে!
করুণাকাতর স্বর   কানে আসে নিরন্তর
স্মরি মুখ ভাসি অশ্রু জলে।

হেরি দেবতার অপমান
নিজ অস্থি করেছিলে দান
দধীচি তাপস তুমি   নিস্তারিতে দেব-ভূমি
ঋষিদেহ দয়া মূর্তিমান!

সেই লীলা কাশীপুরে   অস্থিদান জীব তরে
রক্ষিতে ভারতে ঋষি-দেবতা-সন্তান।
আজও এই সুরপুরে   অসুর নির্ভয়ে ফিরে
আজও বজ্র হলোনা নির্মাণ?

বহি মানবের পাপভার
তুমি যেন ক্রুশে বিদ্ধ যীশু অবতার
কতদিন কত মাস   তিলে তিলে দেহ নাশ
সহি নিত্য বেদনা অপার
এত দয়া এত প্রীতি   ব্যাধিজ্বালা প্রাণাহুতি
অন্ধ আঁখি খুলিল না হেরি।
বিরোচন-নন্দন   অসুর দনুজগণ
এল বুঝি নররূপ ধরি।

বড়ই নিঠুর এসংসার
লালসা অনলে ঘিরা হেরি চারি ধার
ভয়ে বুক উঠে কাঁপি'   কি আতঙ্কে দিন যাপি
লীলা তব স্মরি বার বার।
শত শঙ্কা জাগে মনে   এজীবন তোমা বিনে
হত যেন রুদ্ধ-কারাগার
হে জীবন-দেবতা আমার।

এই কাশীপুর উপবন
বুকে ধরে শোভা অতুলন
"প্রেমে দেহ প্রাণ বিসর্জন"
যেথা যত রূপ আছে   সব তুচ্ছ এর কাছে
ধ্যানে ধন্য মানব-জীবন।



শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪

ফ্রাঙ্ক্ ডোবাক্
অঙ্কিত

রোমীয় অক্ষর

ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ, এম-এ, পিএইচ্-ডি

কিছুদিন হইতে একটি প্রস্তাব শুনা যাইতেছে যে বাংলা লেখা রোমীয় অক্ষরের সাহায্যে সম্পন্ন করা হউক। এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। পূর্বে ইহার যে রূপই থাকুক বিগত বহুকাল যাবৎ ইহার রূপ প্রায় একপ্রকারই আছে। এই বর্ণমালা পৃথিবীর অন্যান্য বহু ভাষার বর্ণমালা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক প্রকাশপক্ষে এমন সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার উদ্ভাবন ভারতীয় সভ্যতার একটি মহামূল্য অবদান।

বর্তমান যুগে এই বর্ণমালার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হইয়াছে যে এই বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যা খুব বেশি। সেইজন্য ইহা সাধারণ শিক্ষা ও ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধাজনক। বাংলায় প্রায় সাড়ে ছয় শত অক্ষর আছে। এই গুলি আয়ত্ত করিতে শিশুর অনেক সময় যায়। কথাটি কতকটা সত্য। কিন্তু 'প্রথম ভাগ', 'দ্বিতীয় ভাগ' পড়িতে শিশুর যে সময় লাগে, তাহাতে শুধু বর্ণমালা শিক্ষাই হয় না; ইহার সহিত বিবিধ শব্দ ও বাক্য. তাহারা শিখিয়া থাকে। সুতরাং শুধু বর্ণমালা শিখিতেই যে তাহাদের দুই বৎসর লাগিয়া যায় ইহা ঠিক নহে।

ইংরাজী বর্ণমালা গ্রহণ করিলেই যে তৎসাহায্যে বাংলা লেখা সহজ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। অকারান্ত অক্ষরগুলিকে ইংরাজীতে সম্যক প্রকাশ করিতে দুইটি বা তিনটি অক্ষর প্রয়োজন হয়। যেমন, 'ক'। ইংরাজীতে এই একটি শব্দ প্রকাশ করিতে Kaw লিখিতে হইবে। ইংরাজী বর্ণমালা অতীব আদিম ও অসম্পূর্ণ। কণ্ঠস্বরের বহু স্বর ইহা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সেগুলি প্রকাশ করিতে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। ড, ঝ, প্রভৃতি প্রকাশ করিতে অন্ততঃ দুইটি করিয়া অক্ষরের প্রয়োজন। সাধ করিয়া এ সকল অসুবিধা ডাকিয়া আনা কেন? যে পাঁচটি স্বরবর্ণ আছে, তাহাতে কাজ তো চলেই না, বরং একটি অক্ষরের বহুবিধ উচ্চারণ থাকাতে, তাহার ব্যবহার আয়ত্ত করা কঠিন হইয়া উঠে। 'a' এর উচ্চারণ এ, আ, অ, অ্যা, সবই হইতে পারে। এগুলি আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ নয়। যদি বিভিন্ন চিহ্ন বা সঙ্কেত দিয়া এই পার্থক্য নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে তো অক্ষরের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিবে। অক্ষরের সংখ্যাল্পতার সুবিধা রহিল কোথায়?

ইংরাজী বর্ণমালা, তাহার স্বরবর্ণের বিবিধ উচ্চারণ, ডিপ্থং এর বানান ও উচ্চারণ প্রভৃতি শিশুদের পক্ষে সহজ নয়। তাছাড়া একথাও মনে রাখিতে হইবে যে ইংরাজ-শিশুর পক্ষে ইংলণ্ডের সমাজে ও ইংরাজ-পরিবারে যাহা সহজ, বাঙালীর পক্ষে তাহা তেমন সহজ নয়। আমাদের শিশুরা বাংলা ও ইংরাজী প্রায় এক সময়েই আয়ত্ত করে। পরে ক্রমশঃ ইংরাজী-শিক্ষার জন্যই বাংলা অপেক্ষা অনেক বেশি পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে। তথাপি বাংলার তুলনায় তাহারা ইংরাজী মোটেই বেশি শেখে না, শিখিতে পারে না। স্কুলের ম্যাগাজিনে বার চৌদ্দ বৎসরের ছেলের বাংলা রচনার যে সকল নিদর্শন আমরা পাই, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু দশ বার

বৎসর ক্রমাগত ইংরাজী শিখিয়াও তাহারা কিরূপ ইংরাজী লেখে তাহা ম্যাট্রিকের উত্তরপত্র দেখিলেই বুঝা যায়। এস্থলে অবশ্য শুধু বর্ণমালাই আমাদের আলোচ্য, ভাষার কথা প্রসঙ্গতঃ তুলিলাম।

বাংলা বর্ণমালার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগের কারণ ইহার যুক্তাক্ষর। যদি তাহাই সমস্যা হয়, তাহা হইলে, ইহার ব্যবস্থা তো সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণের মধ্যেই রহিয়াছে। সংস্কৃত বর্ণমালার ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণও মানব-সভ্যতার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। সংযুক্ত অক্ষরকে ভাঙিয়া হসন্ত বর্ণ দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং যে সকল যুক্তাক্ষরগুলিকে কঠিন বা অসুবিধাজনক মনে হয়, সেগুলিকে হসন্ত বর্ণদ্বারা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 'কর্ম্ম' যদি পছন্দ না হয়, তাহা হইলে কর্ম' লেখা যাইতে পারে। 'ম'য়ের দ্বিত্ব বিকল্প ব্যবস্থা। রেফও যদি অবাঞ্ছনীয় হয় (যদিও রেফ লেখা খুব সহজ এবং শিশুরাও রেফ খুব সহজে শিখিয়া থাকে), তাহা হইলে 'কর্‌ম' লেখা যাইতে পারে। ইহার পরিবর্তে ইংরাজী বর্ণমালা ব্যবহার করিয়া Karma, লিখিলে, ইহার উচ্চারণ কর্‌ম, কর্‌মা, কর্‌ম্যা, কের্‌মা, কেরম, কের্‌ন্যা, কার্‌মা, কার্‌ম, কার্‌ম্যা, ক্যার্‌ম, ক্যার্‌মা, ক্যার্‌ম্যা, সবই হইতে পারে। এ কর্মভোগ কেন? যে বর্ণমালায় নিঃসংশয়রূপে 'অ' লিখিবার ব্যবস্থা নাই, সেটি কি একটি গ্রহণযোগ্য বর্ণমালা?

বাংলা কথা বাংলা বর্ণমালায় না লিখিয়া ইংরাজী বর্ণমালায় লেখা মোটেই সহজ নয়। ঘুঘু সহজ না 'ghooghoo' সহজ? যদি ghughu লিখি, তাহা হইলে, ঘাঘা বা ঘাঘু বা ঘুঘা হইবে না, তাহা কিসে বুঝা যাইবে? বিশেষ চিহ্ন দিয়া বা একাধিক অক্ষরের সমন্বয় দিয়া যদি এই সকল অসুবিধা দূর করিতে হয় তাহা হইলে ইংরাজি বর্ণমালার তথাকথিত সহজত্ব থাকিবে কোথায়? ত, থ, দ, ধ, ড়, ঢ় প্রভৃতির কি গতি হইবে?

বাংলা বর্ণমালার বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ এই যে ইহা নাকি টাইপরাইটারের উপযোগী নয়। এ অভিযোগের প্রথম উত্তর এই যে বর্ণমালার জন্যই টাইপরাইটার, টাইপরাইটারের জন্য বর্ণমালা নহে। মানুষের জন্যই মোটর গাড়ী, মোটরগাড়ীর জন্য মানুষ নয়। এ যুক্তি বাদ দিলেও, বাংলা বর্ণমালা টাইপরাইটারের উপযোগী নয়, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। সাধারণ বাংলা প্রেসে প্রায় সাড়ে ছয় শত টাইপ ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু লাইনো-যন্ত্রে মাত্র একশতেরও কম টাইপে মুদ্রণ কার্য চলে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভার এই নিদর্শন বাংলা মুদ্রণ-জগতে তাহার নাম অক্ষয় করিয়া রাখিবে। চেষ্টা করিলে এই অক্ষর-সংখ্যা আরো কিছু কমানো যাইতে পারে। যদি তাহা নাও হয়, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এই একশত অক্ষর ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই, তাহা হইলেও এই সংখ্যা টাইপরাইটারের পক্ষে মোটেই বেশি নয়। লাইনো-মুদ্রণে যেমন বিভিন্ন চাবি টিপিয়া বিভিন্ন অক্ষর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়, ঠিক তেমনি চাবি টিপিয়া টাইপরাইটারে এই অক্ষরগুলি লেখা যাইতে পারে। আমার মনে হয়, লাইনোর Key-boardএর মত করিয়া টাইপরাইটারের Key-board প্রস্তুত করা সম্ভব। বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ টাইপ-রাইটারে প্রায় পঁয়তাল্লিশটি চাবি আছে। প্রত্যেকটিতে দুইটি চিহ্ন আছে। সুতরাং প্রায় নব্বইটি অক্ষর ব্যবহার করা যায়। শুধু চাবি টিপিলে একটি অক্ষর মুদ্রিত হয়, আর তৎসঙ্গে একটি লেভার চাপিলে আর একটি অক্ষর মুদ্রিত হয়। যদি পঞ্চাশটি চাবির ব্যবস্থা করা যায় এবং প্রত্যেক চাবিতে তিনটি অক্ষরের চিহ্ন থাকে তাহা হইলেই তো একশ পঞ্চাশটি অক্ষরের

ব্যবস্থা হইতে পারে। একটি লেভারের স্থলে দুইটি লেভারের ব্যবস্থা করা খুবই সহজ। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে ঠিক বর্তমান আকারের টাইপ-রাইটারেই বাংলা লেখার ব্যবস্থা হইতে পারে। মোটকথা বর্তমান টাইপরাইটারের নব্বইটি চিহ্নের স্থানে একশত চিহ্নের ব্যবস্থা করা বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিকগণের পক্ষে একটা সমস্যাই নয়। সুতরাং টাইপরাইটারের সুবিধার জন্য বাংলা বর্ণমালা বর্জন করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।

বাংলা বর্ণমালা বর্জন ও ইংরাজী বর্ণমালা গ্রহণের পক্ষে আর একটু যুক্তি এই যে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীরা যদি সকলেই এই ইংরাজী বর্ণমালা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরস্পরের ভাষা শিখিতে নূতন বর্ণমালা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। যাঁহারা একাধিক ভাষার সামান্য চর্চাও করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ভাষা শিক্ষার পক্ষে বর্ণমালা শিক্ষা প্রধান সমস্যা নহে (চীন দেশীয় বর্ণমালা ব্যতীত)। উর্দু, পারসিক ও আরবী ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগুলির বর্ণমালার পার্থক্য এত বেশি নয় যাহাতে ভাষা শিক্ষার পক্ষে সেটি প্রধান অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইতে পারে। হাতের লেখার কথা পৃথক, যে কোন ভাষার হাতের লেখায় অভ্যস্ত হইতে হইলে তজ্জন্য পৃথক্ অভ্যাস আবশ্যক। এ সকল কথা ছাড়াও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওড়িয়া, গুজরাটী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষাভাষীরা ইংরাজী বর্ণমালা গ্রহণে সম্মত হইবে না। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি মানুষের যেমন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তেমনি স্ব-ভাষার প্রতিও একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। সেটা বিসর্জন দেওয়ার মত তুরীয় অবস্থা সকল প্রদেশের হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-পরিভাষা যখন প্রণয়ন করি, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কলিকাতাস্থ কনসাল-অফিসগুলিতে গিয়া বিভিন্ন দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষায় ব্যবহৃত ভাষাসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এক তুরস্ক ব্যতীত কোন দেশই স্বীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ করে নাই। জাপান, রাশিয়া, চীন তাহাদের বর্ণমালা পরিত্যাগ করে নাই। চীনের বর্ণমালার সংশোধন হইতেছে শুনিয়াছি (যেমন আমাদের হইয়াছে লাইনো-যন্ত্রের প্রয়োজনে)। কিন্তু রোমীয় বর্ণমালা গ্রহণের কথা আমার জানা নাই। এমন কি ক্ষুদ্র গ্রীসও তাহার বর্ণমালা পরিত্যাগ করে নাই। জার্মান বর্ণমালা প্রায় ইংরাজীরই অনুরূপ। সামান্য একটু আলঙ্কারিক ধাঁচে লেখা। এই সামান্য অলঙ্কারটুকুও তাহারা সহজত্বের অজুহাতে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই (বিদেশে প্রচারিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী ব্যতীত)। আমার তো মনে হয়, সমগ্র পৃথিবীর কর্তব্য বাংলা বা সংস্কৃতের এই সুন্দর, রমণীয়, বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা গ্রহণ করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে বাংলা ভাষায় রোমীয় অক্ষর ব্যবহার করিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই। শুধু একটা খেয়ালের বশীভূত হইয়া আমাদের যুগ-যুগান্ত-অর্জিত এই সুন্দর বৈজ্ঞানিক বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া অতি আদিম অবৈজ্ঞানিক ইংরাজী বর্ণমালা গ্রহণ অত্যন্ত অন্যায় হইবে। বহুদিনের ফলে আমাদের রুচি ও মন একটা অস্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই এই ধরণের প্রস্তাবের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। যদিও কাহারও কাহারও মনে হয় যে ইংরাজীর শিখাপুচ্ছহীন কৃত্রিম আধ-আধ বর্ণমালা ব্যবহারে কোন প্রকারের কিঞ্চিৎ সুবিধা আছে, তাহা হইলেও রুচি ও স্বাজাত্যবোধ উপেক্ষা করিয়া উহা অবলম্বন করা সমীচীন নহে। বাংলায় সমগ্র নারী-সমাজকে এক একটি আঁট-সাট লংক্লথের সেমিজ পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে লজ্জানিবারণও

হয়, বস্ত্র-সমস্যার সমাধানও হয়। শাড়ী, ব্লাউজ, সাদা, ঢাকাই, বেনারসী, সিল্ক, জর্জেট, বিশ্বভারতী, মানে-না-মানা, কিছুরই বালাই থাকে না। যাঁহার বাংলা ভাষার প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাও আছে, তাঁহার নিকট রোমীয় অক্ষরে লেখা বাংলা মেমিজ-পরিহিতা নারীর মতই অসুন্দর ও নিষ্প্রভ মনে হইবে. হয়তো এটা ভাবুকতা। কিন্তু আহারান্বেষণ ব্যতীত মানুষের জীবনের আর সবই তো ভাবুকতা। এমন কি আহারান্বেষণেও মানুষের ভাবুকতা কম নয়। ক্ষীরের ডেলা এবং বহু কারুকার্যখচিত ক্ষীরের খাবারের স্বাদ একই। তথাপি মানুষ বলিয়াই ক্ষীরেও কারুকার্য চায়। মোটরগাড়ী অপেক্ষা গরুর গাড়ীর সুবিধা অনেক, ঝঞ্ঝাট অনেক কম। একটু জোরে চলে, ইহা ছাড়া আর কোন বিষয়েই মোটরগাড়ী গরুর গাড়ী অপেক্ষা সুবিধাজনক নয়। মোটর গাড়ী চড়িবার অন্য সমস্ত কারণই একটা ভাবুকতা।

লিখিতে, শিখিতে, পড়িতে, টাইপরাইটার ব্যবহারে, কোন বিষয়েই বাংলা বর্ণমালা অসুবিধা-জনক নহে। এই বর্ণমালা বিজ্ঞানসম্মত। এই বর্ণমালা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি গৌরবের বস্তু। ইহা ঘষিয়া মাজিয়া বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা বর্জন করা হীরক ফেলিয়া কাচ গ্রহণের মতই অন্যায় হইবে। আমার বিশ্বাস রামমোহন-কেশবচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরচ্চন্দ্র যে বাংলা গঠন করিয়াছেন, তাহার অধিবাসিবৃন্দ ইহাতে কোন মতেই সম্মত হইবে না।

স্বামীজির দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান

বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আজ অত্যন্ত আড়ষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এক সম্প্রদায়ের মনে আর এক সম্প্রদায়ের প্রতি অবিশ্বাস আর সন্দেহ। পরস্পরের প্রতি যেখানে এই অবিশ্বাস আর সন্দেহ সেখানে স্বরাজের কাজ কখনও অগ্রসর হ'তে পারে না। স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, অর্থাৎ ইংরেজ-শাসন থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। স্বরাজ আর স্বাধীনতা কিন্তু এক কথা নয়। স্বরাজ আপামর জন-সাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ। সেই কল্যাণের স্বর্গ এখনো দূরে। আজও কোটী কোটী মানুষ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, চতুষ্পদের সামিল। গ্রামগুলিতে জীবনের কোন স্পন্দন নেই। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথেই শুধু স্বরাজের স্বপ্নকে মূর্ত ক'রে তোলা সম্ভব।

এই মিলনের পথে সব চেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বে অশ্রদ্ধা। লেখাপড়া-জানা লোকের মুখেও বলতে শুনেছি, সাবধান, মুসলমানকে, মশাই, বিশ্বাস করবেন না। কেন তাকে বিশ্বাস করবো না? মুসলমানদের মধ্যে কি ঈশ্বর নেই? উত্তর পেয়েছি, থাকবে না কেন? বাঘের মধ্যেও তো ঈশ্বর আছেন। তাই ব'লে কি বাঘের সঙ্গে মিতালি সম্ভব? মানুষ সম্পর্কে মানুষের ধারণা অবাক ক'রে দিয়েছে।

মুসলমানেরা হিন্দুদের সম্পর্কে যাই ভাবুক—

হিন্দুরা কেন মুসলমানদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারবে না? হিন্দুর অন্তর্দৃষ্টিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যই পরম সত্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে। ব্রহ্মকে সে সর্ব্বত্র দর্শন করেছে। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" "Whatever exists in this universe, is to be covered with the Lord." এই তো হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা। হিন্দুধর্ম্ম মেঘনির্ঘোষে ঘোষণা করেছে—মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখাই যথার্থ ব্রহ্মদর্শন।

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

"সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি) তখনই পরমাগতি প্রাপ্ত হন।"

সমস্ত মানুষের মধ্যে যিনি রয়েছেন তিনি চিরন্তন এক—তিনি এক ছাড়া দুই নন। এই পরম সত্যের উপলব্ধিই শুধু মানুষের অন্তরে মানুষের জন্য প্রেম জাগাতে পারে। মেটার্লিঙ্কের রচনার মধ্যে একটা দামী কথা আছে: "To learn to love one must first learn to see." যার দৃষ্টি আছে সে-ই শুধু ভালবাসতে পারে। সমস্ত মানুষের মধ্যে একই পরমেশ্বরকে সমভাবে যে দেখতে পেরেছে কেবল তারই পক্ষে মানুষকে ভালবাসা সম্ভব। আর ভালবাসাই শুধু নররক্ত-সাগরে নিমজ্জমান এই সভ্যতাকে আজ বাঁচাতে পারে। বিপন্ন মানবসভ্যতাকে বাঁচাবার আর কোন রাস্তা খোলা নেই। এই প্রেমের আদর্শেরই উচ্ছ্বসিত জয়গান স্বামীজির পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে:

"আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রসমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা।" (পত্রাবলী—প্রথম)

স্বামীজি সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন, মানুষের জন্য মানুষের, সম্প্রদায়ের জন্য সম্প্রদায়ের, জাতির জন্য জাতির অগ্নিময় সহানুভূতিই শুধু ভেদবুদ্ধিতে জর্জ্জরিত পৃথিবীকে কল্যাণের স্বর্গে পৌছে দিতে পারে।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বরের এক চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন: "আর কিছুতেই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থে উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবন-গতি-নিয়ামক! আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও উহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ!"

স্বামীজি দেখেছিলেন, ইউরোপ তরবারি উঁচিয়ে যে পথে চলেছে সে পথ ভোগবাদের আত্মঘাতী পথ। উদ্দাম ভোগবাদের অনিবার্য্য পরিণতি কাটাকাটি হানাহানিতে। ক্ষমতাগর্ব্বে উদ্ধত ইউরোপ ভেদবুদ্ধির দ্বারা অভিভূত হ'য়ে সর্ব্বনাশ ডেকে আনছে আপনার মাথায়—দূরদর্শী স্বামীজি এই কথা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মাদ্রাজের এক বক্তৃতায় আছে: The whole of western civilisation will crumble to pieces in the next fifty years if there is no spiritual foundation. It is hopeless and perfectly useless to attempt to govern mankind with the sword.

স্বামীজি যা ভয় করেছিলেন তাই কিন্তু ঘটলো। স্বামীজির বক্তৃতার পঞ্চাশ বৎসরের

মধ্যে জগতে দুটো দুটো কুরুক্ষেত্র ঘটে গেল, আর পাশ্চাত্য সভ্যতা তো আজ ধ্বংসের মুখে। দিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন। তৃতীয় মহাযুদ্ধের ঝড় যদি অদূরভবিষ্যতে ভেঙে পড়ে জগতের মাথার উপরে—আমরা একটুও বিস্মিত হবো না। ইউরোপ তো আধ্যাত্মিকতাকে কোন মর্য্যাদা দিলো না। সে ষোড়শোপচারে পূজা করেছে বিজ্ঞানকে আণবিক বোমার মত পাশুপত অস্ত্র লাভের আশায়। সত্যের গলায় সে ছুরি দিয়েছে, অহিংসার আদর্শকে সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে সে মুখ ফিরিয়েছে। পাশ্চাত্যে কোন আশা নেই আলো নেই, আশ্রয় নেই।

আশা তবে কোথায়? স্বামীজি বললেন, আশা অগ্নিময় সহানুভূতির মধ্যে, আশা সমস্ত মানবজাতিকে আত্মার আত্মীয় ব'লে অনুভব করার মধ্যে। কিন্তু সমস্ত মানুষকে আত্মীয়বোধে ভালোবাসবো কেন? ভালোবাসবো—কারণ স্বামীজির ভাষায় "There is but one Soul throughout the universe, all is but One Existence." সকলের মধ্যে যে একই পরমেশ্বর সমভাবে বিরাজমান—'ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।' স্বামীজি বললেন, 'কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে।' তাই তো তাঁর কণ্ঠে অদ্বৈতবাদের শঙ্খনির্ঘোষ, বেদান্তের উচ্ছ্বসিত জয়গান। সমস্ত মানুষের মধ্যে যিনি রয়েছেন তিনি পরম এক এবং এই এককে যিনি সকলের মাঝে সমভাবে দেখেছেন তিনিই শুধু জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন। আর মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি জাগলে তবেই ভারতের দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের উদ্ধার সম্ভব, সাম্প্রদায়িক বিরোধের এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসানও সম্ভব। যেমন ক'রে পাষাণ অহল্যা কত যুগ ধ'রে অপেক্ষা ক'রে ছিল রঘুনাথের পাদস্পর্শে নবজীবন লাভ করবার জন্য, তেমনি ক'রে মুমূর্ষু মানব-সভ্যতা আজ উপনিষদের ধর্ম্মের দ্বারা উদ্ধার লাভের জন্য ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আছে। স্বামীজী বহুবর্ষ আগে বলেছিলেন: "And what will save Europe is the religion of the Upanishads." গান্ধীজীর কণ্ঠেও একই সুর। তিনি স্বামীজির উত্তর-সাধক।

আমরা হিন্দুরা ঘটা ক'রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্মোৎসব করবো, 'ভগবদ্গীতা গাইলো স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে' ব'লে গর্ব্বে ফুলে উঠবো, কথায় কথায় ভারতের আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেবো, আর মুসলমানদের জীবনকে কোন মর্য্যাদা দেবো না, মূল্য দেবো না—এ কেমনতর কথা? গীতার আর উপনিষদের গুণগানে যারা পঞ্চমুখ তারা কোটী কোটী মানুষকে অস্পৃশ্য ক'রেই বা রেখেছে কেমন ক'রে? 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ'—এই মহাবাণী যাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হোলো তাদের আচরণে ভেদবুদ্ধির কি উৎকট প্রকাশ! বড় দুঃখেই স্বামীজি লিখেছিলেন:

"আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহানিঃস্বার্থ নিষ্কামকর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারিনা।" (পত্রাবলী—প্রথম)

পত্রাবলীর প্রথমভাগের অন্যত্র আছে:

"হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতদের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্মও এরূপ করেনা।"

ভারতবর্ষের মুসলমানদের কয়জন এসেছে আরব থেকে? অধিকাংশই এদেশেরই অধিবাসী। আগে তারা হিন্দুই ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছিলো। এককালে যারা হিন্দু ছিলো এবং পরে যারা হাজারে হাজারে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেছে তাদের ইসলামধর্ম্মের বাহুর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছি আমরাই—তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। আমাদের পুস্তকে যে মহাসাম্যবাদ আছে—আমাদের আচরণে যদি তার কণামাত্রও প্রকাশ থাকতো—অত্যাচারজর্জ্জরিত হিন্দুরা কখনই লাখে লাখে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হোতো না এবং আজ এই বিংশশতাব্দীতে কোটী কোটী মানুষ অস্পৃশ্য হ'য়েও থাকতো না। আমাদের কথায় আর আচরণে কোন মিল নেই—তাই ভারতের ভাগ্যাকাশ থেকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের মেঘ কিছুতেই কাটতে চাইছে না।

কিন্তু সময় এসেছে যখন সমালোচনার সন্ধানী আলো নিজেদের উপরে ফেলতে হবে। আত্মবিশ্লেষণ করবার আজ অত্যন্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। যে ব্যবধান আজ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দুস্তর হ'য়ে দেখা দিয়েছে—তাকে বিলুপ্ত করবার পথ শুধু একটী মাত্রই আছে, আর এই পথ হচ্ছে অন্যের দোষ ত্রুটীকে ক্ষমা ক'রে নিজের দোষ ত্রুটীকে বড়ো ক'রে দেখা। আমরা হিন্দুরা নিজেদের যত ভালো ব'লে মনে করি, আমরা যে তত ভালো নই, আমাদের কথায় এবং কার্য্যে যে ঘোর অসামঞ্জস্য রয়েছে—সেই নিষ্ঠুর সত্যকে স্বামীজি কখনো চাপা দেবার চেষ্টা করেন নি। বন্ধুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এমার্সন বলেছেন: "A friend is a beautiful enemy." যে আসল বন্ধু সে তো সখার স্তাবকতা করবে না। স্বামীজি ছিলেন হিন্দুধর্ম্মের পরম বন্ধু—তাই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে যে দোষ ত্রুটী তিনি দেখেছিলেন তার সম্পর্কে তিনি নীরব থাকতে পারেন নি। আমরাও যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হই—হিন্দুদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে কখনও মৌনাবলম্বন ক'রে থাকবো না। একচক্ষু হরিণ যে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছিলো, সেই দিক থেকে এলো তার মৃত্যুবাণ। অপ্রিয় সত্য ব'লে নিজেদের দুর্ব্বলতার দিক থেকে দৃষ্টি যদি সরিয়ে নিই তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। আমরাই আমাদের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু—এ যেমন সত্যের একটা দিক, তেমনি আমরাই আমাদের সব চেয়ে বড়ো শত্রু, এও সত্যের আর একটা দিক।

কিন্তু মুসলমানদের একশ্রেণীর হিন্দুরা যত খারাপ মনে করে, বাস্তবিক কি তারা তত খারাপ? ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী নাইনীতালস্থ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে একখানি পত্র লিখেছিলেন। তাতে আছে:

"কিন্তু কর্ম্মপরিণত বেদান্ত (Practical Vedantism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকি আছে। পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ্যরূপে এই সাম্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পারে এবম্বিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপ যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইসলামপন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না,—এই মাত্র প্রভেদ।" এই পত্রেরই শেষের দিকে আছে:—"আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।" পত্রাবলী—তৃতীয়।

জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষের ব্যক্তিত্বকে গৌরবদান করবার এই যে মহানুভবতা—এই মহানুভবতাই তো স্বামীজীর জীবনের ও বাণীর বৈশিষ্ট্য। সকল দেশের, সকল কালেব, সকল মতের, সকল ধর্ম্মের মানুষের প্রতি এই যে শ্রদ্ধার ভাব—এই শ্রদ্ধার ভাব সম্পর্কে রোমা র‍ঁল্যা (Romain Rolland) তাঁর বিবেকানন্দের জীবনীতে লিখেছেন: "No other religion has possessed it to this degree and with Vivekananda it was part of the very essence of his religion." মানুষমাত্রেরই জীবনকে গৌরবদান করতে হিন্দুধর্ম্মের মত আর কোন্ ধর্ম্ম মানুষকে শিখিয়েছে? 'হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে'—এই অপূর্ব্ব ভাষায় আর কোন্ দেশের কবি মানুষকে দেবতা ব'লে বন্দনা করেছেন? তাই আজ এই সাম্প্রদায়িকতার দুর্য্যোগের রাতে যে ব্যক্তি কেবল টিকিতে নয়, ফোঁটা-তিলকে নয়, দৈনন্দিন আচরণেও নিজেকে খাঁটি হিন্দুর গৌরব দিতে চায় সে মহাকবির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইবে:—

"এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।"

বৈজ্ঞানিকের খেদ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

অসমাপ্ত ও অপূর্ণ মোর কাজ—
কি করিনু আসি এই বিশ্বের মাঝ?
বটে সামান্য নহে আমাদের দান;
বেড়েছে কি তাতে মানবের সম্মান?
আজও গ্রহে গ্রহে যেতে পারিল না নর,
আসে না পায় না তাদের কই খপর?
জড় দেহে জাগে কেমনে সুপ্ত প্রাণ
কই তো এখনো হল নাক সন্ধান?

প্রতি পরমাণু বিশ্ব একটা গোটা,
সদা গতি তার কার উদ্দেশে ছোটা?
ভাবি অদৃশ্য কোন্ সে রাসায়নিক
পরিবর্ত্তন আনে বুঝিনাক ঠিক।

অণু দিলে নাক স্রষ্টার পরিচয়
আণবিক 'বোমা' হাতে দিলে মহাশয়,
কল্পবৃক্ষ হয় না আবিষ্কার—
শক্তি পেলাম শুধু বন পোড়াবার।

এর চেয়ে ভাল অন্ধ ভক্তিভরে,
উৎসুক থাকা সদা ভগবান তরে।
তাঁহারে দেখরে তৃষ্ণা নয়নে বয়।
শ্রবণ বংশী শুনিতে ব্যাকুল রয়।
ভগবান ছাড়া কিছুই খোঁজে না আর—
তাদের চরণে জানাই নমস্কার।
বৃথা ঘুরে মরি মোরা তত্ত্বান্বেষী
না জেনে তাহারা মোর চেয়ে জানে বেশী।

'উদ্বোধনে'র সুবর্ণ জয়ন্তী

সম্পাদক

বর্তমান মাঘ মাসে 'উদ্বোধন' পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে ইহার সচিত্র সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইল। মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত ভাবাদর্শে ভারতের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় সাধনের উদ্দেশ্যে সকল নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন' প্রবর্তন করেন। এই কারণে ইহার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সর্বাগ্রে আমরা এই নব-যুগপ্রবর্তক আচার্যদ্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি এবং যে সকল দেশ-প্রসিদ্ধ মনীষীর সুচিন্তিত রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়া এই সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হইল, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আশা করি, ইহা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জন বিধান করিতে সমর্থ হইবে।

'উদ্বোধনে'র ইতিহাস ভারতের সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণ-ইতিহাসেরই একটি অধ্যায়। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য যে কয়টি সংস্কার-আন্দোলন উদ্ভূত হয়, উহাদের মধ্যে সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত আন্দোলন অল্পকাল মধ্যেই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং সুদূরসম্প্রসারী আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের মুখপত্ররূপে 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন যুগোপযোগী সংস্কার-বিরোধী রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহা ক্রমেই বিস্তৃত হইতে থাকে। যুগ-প্রয়োজনই ইহার একমাত্র কারণ। এইরূপে প্রয়োজনের প্রেরণায়ই ভারতবাসী অসংখ্য অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের মধ্যেও তাহাদের জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে। বর্তমান যুগের প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিপূর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহারা যুগধর্মাচার্য নামে অভিহিত। এই আচার্যদ্বয়ের প্রবর্তিত ভাবধারায় ভারতের চিরন্তন জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকটিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের প্রতি পরাধীন ভারতের পাশ্চাত্যভাববিমুগ্ধ শিক্ষিত নরনারীর দৃষ্টি প্রথমে আকর্ষণ করেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁহার কল্পনাতীত সাফল্য হইতে ইহার সূচনা। তিনিই প্রথমে ভারতের জাতীয় বিশেষত্বের প্রতি প্রতীচ্যেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার অসাধারণ স্বদেশ-প্রেমের মর্মস্পর্শী বক্তৃতাবলীতে তিনি যেমন ভারতবর্ষকে সকল বিষয়ে উন্নতির শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করিবার অপরিসীম আগ্রহ দেখাইয়াছেন,—ভারতের অতীত গৌরব এবং তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আলেখ্য দেশবাসীর সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, এরূপ আর তাঁহার পূর্বে কেহ করেন নাই। অর্ধ শতাব্দী যাবৎ 'উদ্বোধন' স্বামীজীর এই মহতী বার্তা উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছে।

অতীতের সেই পরাধীনতার তমসাচ্ছন্ন যুগে ভারতের সকল নরনারী যখন তাহাদের মহত্ত্বমণ্ডিত অতীত ভুলিয়া এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মোহনিদ্রায় অচৈতন্য, তখন একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই উপনিষদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'

মন্ত্রে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "জগজ্জননী তোমাদের স্বদেশ ও স্বজাতিরূপে প্রকাশিত। আগামী পঞ্চাশ বৎসর এই মাতৃভূমিই তোমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হউন। অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমাদের স্বদেশীয় জনসাধারণ, সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। কোন্ নিষ্ফল দেবতার সন্ধানে তোমরা ধাবিত হইবে, আর তোমাদের সম্মুখে, তোমাদের চতুর্দ্দিকে যে জাগ্রত দেবতাকে দেখিতেছ সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পার না? সেই দেবতার পূজা সম্পন্ন হইলে পরে তোমরা অপর দেবতার পূজা করিতে সক্ষম হইবে। * * ভারত-মাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। * যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত্তমুখে অন্ন প্রদান করবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে। * সহস্র সহস্র নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হয়ে দরিদ্র-পতিত, পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহ-বিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করুক, মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।" 'উদ্বোধন' বরাবর স্বামীজীর এই জলন্ত স্বদেশ-সেবার বাণী দেশবাসীকে নানাভাবে শুনাইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের এইরূপ অনুপ্রেরণায় বাংলার শিক্ষিত যুবকগণ এক অভিনব জীবন-চাঞ্চল্যে মাতিয়া উঠে এবং ইহার ফলে বাংলাদেশে এক অশ্রুতপূর্ব জাতীয় জাগরণ উপস্থিত হয়। তাঁহার অসাধারণ স্বদেশ-প্রেমকে আশ্রয় করিয়া বাংলাদেশে এক বিরাট জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠে। এই সাহিত্য-সৃজনে এবং ইহার পুষ্টি-সাধনে 'উদ্বোধনে'র অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'উদ্বোধন' হইতেই 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী' সৃষ্ট হয় এবং ইহা উত্তরোত্তর অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া বাংলার জাতীয় জাগরণকে ব্যাপক করিয়া তোলে। এই কালে 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী' ভিন্ন বাংলায় জাতীয় সাহিত্য অতি সামান্যই ছিল। এই সাহিত্য-প্রচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপে এই সময়ে প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের সংস্কার, অবনত অনুন্নত জাতি-সমূহের উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন, শিক্ষা-বিস্তার, শিল্পের প্রসার, সাহিত্য সংগীত ও চিত্র-কলাদির উন্নতিসাধন, দরিদ্র অজ্ঞ রুগ্ন দেশবাসীকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা, দুর্ভিক্ষ প্লাবন মহামারী প্রভৃতিতে রিলিফ-কার্য প্রভৃতির জন্য শত শত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং সহস্র সহস্র ত্যাগী সেবক কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই কালে বাংলার যে সকল শিক্ষিত যুবক তাঁহাদের ভোগবিলাসের প্রদীপ স্বেচ্ছায় নিবাইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম স্বজাতি ও স্বদেশের সেবারূপ মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দান করিয়াছিলেন, যাঁহারা দিবা-নিশি চিন্তা করিতেন ভারত-মাতার বন্ধন-মুক্তি এবং ধ্যান করিতেন ভারতের অধঃ-পতিত জনগণের অভ্যুত্থান সাধনের উপায়, তাঁহারা সকলেই স্বদেশ-প্রেমের মূর্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত জাতীয় সাহিত্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। বাংলার স্বদেশ-প্রেমিক শহিদ-মাত্রই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ।"

বাংলা দেশের এই সর্বতোমুখী জাতীয় জাগরণ ক্রমে সমগ্র ভারতে প্রসারিত হয়। বর্ত্তমান

জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর অক্লান্ত সাধনায় ইহা যথার্থ গণ-আন্দোলনের আকার ধারণ করে। স্বদেশ-সেবকগণ বৈদেশিক রাজশক্তির কল্পনাতীত নির্যাতন ভোগ করিয়াও স্বাধীনতা-আন্দোলন সংঘবদ্ধ ভাবে পরিচালন করেন। কেবল কংগ্রেসের কর্মিগণ নহেন, পরন্তু উহার বাহিরেরও বহু প্রতিষ্ঠানের বহু স্বদেশ-সেবকের কঠোর সাধনার ফলে এই গণ-আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী আকার ধারণ করে। এই আন্দোলনের প্রভাবে এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-রাজ বাধ্য হইয়া ভারতে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

ইহা পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলেও ইহাতে ভারতবাসীর সকল বিষয়ের উন্নতির দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহাকে যে কোন সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিণত করাও এখন ভারতের জনগণের ইচ্ছাধীন। পরাধীন অবস্থায় ভারতবাসীর বহু বিষয়ে উন্নতি লাভের দ্বার একেবারে রুদ্ধ ছিল। পরাধীন ভারতের ধর্মনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি শিক্ষানীতি শিল্পনীতি প্রভৃতিও জনসাধারণের উন্নতির অনুকূল ছিল না। তখন এইগুলি প্রকৃত পক্ষে জনগণের দাসত্ব-শৃঙ্খল সুদৃঢ় করিয়া তাহাদিগকে কঠোর শাসনাধীনে রাখিয়া শোষণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইত। ইহারই বিষময় ফলস্বরূপে আজও ভারতের জনসাধারণ সর্বহারা হইয়া অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত। তাহাদিগকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন স্বাধীন ভারতের অধিনায়কগণের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। ভারতবাসী পরাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধর্ম ও সমাজ প্রভৃতিও বহুলাংশে পরাধীন হইয়াছিল। ইহার কুফল স্বরূপে সমগ্র জাতির মধ্যে যেমন বহুবিধ গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের ধর্ম ও সমাজও তেমন গ্লানিপূর্ণ হইয়াছে। ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধর্ম ও সমাজও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এখন স্বাধীন ভারতের স্বাধীন জাতি এবং তাহাদের স্বাধীন ধর্ম ও স্বাধীন সমাজকে সকল গ্লানি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতেই হইবে। স্বাধীন ভারতে এই সকলের আমূল সংস্কার অপরিহার্য। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতি ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র শিক্ষা প্রভৃতি যেরূপ ভাবে সংস্কৃত করিতে উপদেশ দিয়াছেন, উহাই যে স্বাধীন ভারতের সম্পূর্ণ উপযোগী ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। পরাধীন অবস্থায় তাঁহার অমূল্য উপদেশসমূহ অনেক ক্ষেত্রে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নরনারীকে সংঘবদ্ধ ভাবে ইহা কার্যে পরিণত করিতেই হইবে। ভারতের জাতীয় অভ্যুদয় সাধনের জন্য 'উদ্বোধন' সকল বিষয়ে স্বামীজীর প্রচারিত সংস্কার-প্রণালী কার্যে পরিণত করিবার আবশ্যকতা অতি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ সর্ববিধ সংস্কার-সাধনে ধর্মের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কারণ, একমাত্র ধর্মই সত্য ন্যায় নীতি ত্যাগ সংযম সাম্য মৈত্রী সমদর্শন পরার্থপরতা প্রমুখ মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণরাশির একমাত্র আশ্রয় এবং কেবল এই গুণগুলিই পশুভাব নষ্ট করিয়া জাতি ও ব্যক্তিকে দেবভাবে অধিষ্ঠিত করিতে সক্ষম। কোন দেশের অধিকাংশ নরনারীর জীবন ধর্মভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে তাহারা অসংযত ভোগ-স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য সেই দেশের অত্যুদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মকেও অত্যন্ত অনুদার ও সাম্প্রদায়িক, চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রীপূর্ণ সমাজকে বিরোধ-বিদ্বেষপূর্ণ এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও স্বেচ্ছাতান্ত্রিক করিয়া তুলিবেই। এই জন্য জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

দেশের জনসাধারণের জীবন—বিশেষ করিয়া দেশ ও সমাজের পরিচালকগণের জীবন ধর্ম ন্যায় নীতি প্রভৃতি বর্জিত পশুভাবের প্রাবল্যে পরিচালিত হইলে কিরূপ হিংস্র আকার ধারণ করে, তাহা গত কয়েক বৎসর দেশময় দুর্ভিক্ষ-সৃষ্টি, কালবাজার-প্রবর্তন ও উৎকট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা পরিচালনের ভিতর দিয়া সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধর্ম নীতি ত্যাগ ও সংযম-হীনতায় পৃথিবীর বহু জাতি ও ব্যক্তি যে একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য। বর্তমানেও দেখা যাইতেছে যে সুশিক্ষিত মানব-সমাজের বহুগর্বিত সভ্যতার এই পূর্ণ জোয়ারের যোগেও অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্র-নায়কগণের জীবন ধর্ম-নীতি-বিবর্জিত পশুভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়াই প্রায় সমগ্র মানব-জাতি এখনও নানাবিধ অশান্তি ভোগ করিতেছে! এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ সার্বজনীন ধর্মাদর্শে সমাজ রাষ্ট্র প্রমুখ সকল বিভাগ—এমনকি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনের আবশ্যকতা উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই সার্বভৌম ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বিশেষত্ব। এই ধর্মকে সযত্নে রক্ষা করিয়া এবং ইহার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যুগে যুগে নানারূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আজও ভারতবর্ষ বাঁচিয়া আছে এবং ভবিষ্যতেও এই উপায়েই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে, মানুষের জীবন "বহুজনহিতায়—বহুজনসুখায়" অত্যুচ্চ আদর্শে নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং মানুষের শাশ্বত শান্তি-সুখ বিধান করিতে ধর্মের তুল্য আর কিছুই নাই। এই সকল কারণে 'উদ্বোধন' জাতি ও ব্যক্তির অভ্যুদয়ের উপায়রূপে ধর্মের উপর বরাবর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিতেছে।

ভবিষ্য ভারতের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে স্বামীজী সংক্ষেপতঃ "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ"-নীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক' বাক্যের ভাবার্থ—বেদান্তবেদ্য যে ধর্মভাব জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানব-জাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখিতে এবং তাহাদের সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেয়। স্বামীজীর মতে ইসলামপন্থীদের সমাজ-দেহ এই কল্পনাতীত সাম্য-মৈত্রীর অনেকটা সমীপবর্তী,—ইহাই 'ইসলামীয় দেহ' বাক্যের ভাবার্থ। স্বামীজী বলিয়াছেন, "আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ —একমাত্র আশা। * * আমি আমার মানস চক্ষে ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল অভেদ্য ভারতকে এই বিশৃঙ্খলা ও বিসম্বাদের মধ্য দিয়া বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া অভ্যুত্থিত হইতে দেখিতে পাই।" স্বামীজীর প্রদর্শিত এই নীতিই যে স্বাধীন ভারতের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের শ্রেষ্ঠ উপায়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 'উদ্বোধন' ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে এই নীতি প্রথম হইতেই প্রচার করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থ-নীতিকে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক (Socialistic) আকার প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চাষার কুটির, মুদীর দোকান, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ি এবং কারখানা হাট বাজার ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত হইতে ভবিষ্য ভারতের অভ্যুত্থান কামনা করিয়াছেন। তিনি এরূপ একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে বলিয়াছেন যাহাতে দেশের সকল নরনারী স্বাস্থ্যকর আবাস, পুষ্টিকর খাদ্য, উত্তম শিক্ষা এবং রোগে ভাল চিকিৎসা পাইবে। তিনি বলিয়াছেন, "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণ-

যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে, অথচ ইহাদের দোষ-গুলি থাকিবে না, তাহা হইলে তাহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে।" ইহার তুল্য সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা কেহ এ পর্যন্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। স্বাধীন ভারতে এইরূপ আদর্শ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা 'উদ্বোধনে'র একান্ত কাম্য।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে দেশে কৃষি শিল্প অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শিক্ষিত যুবকগণকে চাকরির মোহ ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া ঐ সকল বিষয় শিক্ষালাভ করিতে এবং পাশ্চাত্য হইতে এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আনয়ন করিয়া সমগ্র দেশে উহাদের প্রবর্তন করিতে বলিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের এই সকল বিভাগ অতি শীঘ্র সংস্কার করিতেই হইবে। আশা করি, এই সময়ে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়ে স্বামীজীর পরিকল্পিত সংস্কার-প্রণালী বিস্তৃতভাবে দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিবেন। 'উদ্বোধন' বরাবর এই সকল বিষয়ে দেশের যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছে।

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীন ভারতের পরিচালকগণকে কেবল স্বগৃহের উন্নতি সাধনেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, পরন্তু পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে তাহাদিগকে সকল বিষয়ে আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। অতীতে পরাধীনতার অন্ধকারময় যুগে ভারতবাসী আপনা-দিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি এবং ভারত-বহির্ভূত সকল জাতিকেই নিকৃষ্ট ম্লেচ্ছ ও যবন নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিল। ইহার ফলে সমুদ্র-যাত্রা রহিত হওয়ায় তাহারা কূপমণ্ডুকে পরিণত হইয়াছিল। এ যুগের স্বাধীন ভারতকে এই সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া অতীতের স্বাধীন ভারতের ন্যায় পৃথিবীর সকল জাতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ভারতের সেই গৌরবময় যুগে ভারতীয় ধর্ম-প্রচারকগণ যেমন বিদেশের প্রায় সর্বত্র ভারতের ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রচার করিয়াছেন, তদ্রূপ এই মহৎ কার্য অধিকতর সংঘবদ্ধ ও ব্যাপক ভাবে এখন পরিচালন করা আবশ্যক। ভারতবর্ষ বরাবর বিশ্ববাসীকে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি দান করিয়াছে। বিশ্বমানব-সভ্যতায় এই দান ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। ভারতে যেমন এই তিনটি বিষয় বিকাশ লাভ করিয়াছে, এরূপ আর পৃথিবীর কোন দেশে সম্ভব হয় নাই। জগতের সকল ধর্ম ও দর্শন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অস্ফুট প্রতিধ্বনি মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমার এই মাতৃভূমিই একমাত্র দেশ যেখানে ধর্ম জীবন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত এবং প্রাত্যহিক জীবনে আচরিত হইয়াছে, যেখানে নরনারীর জীবন চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য দুর্জয় সাহসে সমাধিগর্ভে মগ্ন হইয়াছে, যখন অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ দুর্বলের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া নিজ বাসনা পূরণের আশায় উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছে। * * সমগ্র মানব-জাতিকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করাই ভারতবর্ষের একমাত্র জীবন-ব্রত, তাহার চিরন্তন সঙ্গীতের সুর, তাহার জীবনের মেরুদণ্ড ও ভিত্তি তাহার অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য ও সার্থকতা। * আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছি, প্রত্যেক সভ্যদেশের কোটি কোটি নরনারী ভারতবর্ষ হইতে এই অমৃত বাণী লাভ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, যাহা ধন-দেবতার অর্চনার অনিবার্য পরিণামস্বরূপ জড়বাদের ভীষণ নরককুণ্ড হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে।"

পরাধীন ভারতের গ্লানিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রচার-কার্য আরম্ভ করেন। ইহা ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। স্বাধীন ভারতে ইহার পূর্ণ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপ এবং আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের ক্রমবর্ধমান প্রসারই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুসারে স্বাধীন ভারতের সকল বিভাগের সংস্কার-সাধন এবং বিদেশে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন প্রচারের আবশ্যকতা-প্রদর্শন 'উদ্বোধনে'র জীবন-ব্রত। এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনে এই মাসিক পত্র তাহার স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্বদেশ-হিতৈষী মনীষিগণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।

নিবেদিতা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

"মৎপ্রাণাঃ শ্রীগুরুপ্রাণাঃ মদ্দেবো গুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

(১)

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নাম দিয়া যে একটি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার ঐ নামটাও যেমন, তেমনই তাহার অন্তর্গত ভাবটি আমাদের মধ্যে একটা সাহিত্যিক প্রবাদের মত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রেও যেমন, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি, জাতির ইতিহাসে এমন অনেক 'উপেক্ষিতা' আছেন, যাহাদের নাম বিখ্যাতগণের আড়ালে পড়িয়া আমাদের স্মৃতিতে তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার, তথা হিন্দু ভারতের ইতিহাস যখন চিন্তা করি, তখন এমনই একজনের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ হয়, আবার ভুলিয়া যাই; আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সকলই স্মরণ করি, কীর্ত্তন করি—তাঁহাদের স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ ও স্মৃতি-কথা রচনা করিয়া এই নিত্যবিস্মৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতিভ্রংশ নিবারণ করি; কিন্তু তাঁহাদেরই সঙ্গে, বিশেষ করিয়া স্বামিজীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হইয়া আছে যে একটি অনন্যসাধারণ নারীচরিত্রের মহিমা, তাহাকে তেমন করিয়া আর স্মরণ করি না; এমন কি, যে মন্দিরের নবনির্ম্মিত চত্বরের একপ্রান্তে তিনি তাঁহার অন্তরের পূজা-প্রদীপ জ্বালাইয়া, নিজের সমগ্র দেহমন লুটাইয়া দুই করপুটে সেবার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন, মনে হয়, সেখানেও তাঁহার নামটি তেমন করিয়া কেহ স্মরণ করে না; এ যুগের বাঙালী-সন্তানকে সেই নিবেদিতার অপূর্ব্ব আত্মনিবেদনের কথা ভাল করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য কোনরূপ স্মৃতিপূজার আয়োজন হয় না, হইলেও বাহিরে তাহার তেমন প্রচার নাই।

জানি, তাহাতে সেই কল্যাণময়ী তপস্বিনীর—সেই সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনীর জন্য কিছুমাত্র আক্ষেপের কারণ নাই, যে নিজেই "নিবেদিতা" তাহাকে নিবেদন করিবার ত' কিছুই নাই। আমাদের মত যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল, তাঁহার সেই পুণ্যজীবনের সেই অতুল আত্মোৎসর্গের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়াছিল—এই জাতির দুর্গতিমোচনের জন্য তাঁহার সেই নীরব আকুলতা ও নীরব কর্ম্মযোগের কথা জানিত, তাহাদের হৃদয়—দুর্ব্বল বলিয়াই ক্ষুব্ধ হয়. মনে হয়, এত স্মৃতি-উৎসব—বারো মাসে চুরাশি পার্ব্বণের মত ছোট-বড়-মাঝারি কতজনের উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে—কই, ভগিনী নিবেদিতাকে তাহার কোনটাতেই তেমন করিয়া আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি না। এ্যানি বেসাণ্টকে আমরা স্মরণ করি, নিবেদিতাকে করি না। সেকালের এক কবি লিখিয়াছিলেন

"হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়বে ওলাই-চণ্ডী কি হায়?
বেসাণ্ট নেবে সে নৈবেদ্য অর্পিত যা' নিবেদিতায়!"

—ইহার কারণ কি? কারণ কি এই নয় যে, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমরা যে-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, সে মন্ত্রই অন্যরূপ; তাহাতে সেই হৃদয়ের সাড়ার প্রয়োজন আর নাই, যাহাতে খাঁটি মনুষ্যধর্ম্মের প্রেরণা আছে, যাহাতে প্রাণের সত্যই আর সকল সত্যের উপরে।

(২)

নিবেদিতার পরিচয় আশা করি দিতে হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও তাঁহার অলৌকিক



কীর্ত্তিকথা যাঁহারাই অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহার এই আত্মসৃষ্ট কন্যাটির কথাও না জানিয়া পারিবেন না। বিবেকানন্দের চরিতকার মহা-মনীষী মঃ রোঁলা বলিয়াছেন—

"The future will always unite her name of initiation, Sister Nivedita, to that of her beloved Master—as St. Clara to that of St Francis."

গুরুর সহিত এই শিষ্যার যে সম্পর্ক—অধ্যাত্ম-জীবনের সেই এক অভিনব আত্মীয়তার তত্ত্ব পরে কিছু আলোচনা করিব, তেমন আত্মনিবেদন-কাহিনী আমাদের কোন ভক্তমাল-গ্রন্থে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি কেমন করিয়া এই গুরুলাভ করিয়াছিলেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিজেই তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে (The Master as I saw Him) লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় গুরুবাদের একটা নূতন ভাষ্যও তাঁহার ঐ গুরু-পরিচয়-গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। সে যেন একটি শাণিত খড়্গ—যেমন দিব্যপ্রভাসমুজ্জ্বল, তেমনই নির্ম্মম; সেই খড়্গের নীচে নিবেদিতা তাঁহার আত্মাভিমানী দেহটাকে—তাঁহার যতকিছু পূর্ব্বসংস্কার, এবং প্রাণ ও মনের যতকিছু কামনাকে—বলি-স্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাকে ভারতের হিতার্থে উৎসর্গ করিবার কালে বলিয়াছিলেন—"যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমা-শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।"

ইহার পর নিবেদিতার যে জীবন আরম্ভ হইল, তাহা এমনিই সেবা ও আত্মদান-মূলক তপস্যার জীবন যে, বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজ-পতাকায় তাহার জয়-ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে অগ্নি তিনি আপন হৃদয়-পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবক শিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করিয়া, তিনি কেবল তাহার আলোক-টুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার কর্ম্মযোগ, গুরুনির্দ্ধারিত তাঁহার সেই ব্রত ও তাহার উদ্‌যাপন-পদ্ধতির কথা এখানে বলিব না, আমি তাহার উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিচারের অধিকারী নই। বাংলার মাটিতে হলকর্ষণের পর, যখন নব-জীবনের বীজবপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল; তাহারই মধ্যে এই আর একটি বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে—নিজেকেই ফলে-পুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়—অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্য্যন্ত পৌঁছায় না; সে কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে; সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসন্তী-শোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার এই নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল,—তাহা নির্ণয় করিবে কে?

এমন কত মহাজীবনের মহান্ আত্মোৎসর্গ যুগে যুগে সকল জাতির সাধনাকে সমৃদ্ধিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছে। ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না, সন্ধান চায়ও না; তার কারণ, ইতিহাসের লক্ষ্যই অন্যরূপ। যাহারা ইতিহাসকে গড়িয়া তোলে তাহাদের পরিচয় করা সহজ; যাহারা সেই গড়ার উপাদান হইয়া বা সেই গঠন-শিল্পীর যন্ত্র হইয়া, শিল্পীর কীর্ত্তিকে সম্ভব করিয়া তোলে, তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। যে গড়ে তাহার একরূপ আত্মাভিমান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই যাহাকে সেই গঠনের উপাদান, উপকরণ,

বা যন্ত্র হইতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিমান না থাকাই আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ সেই গঠন-শিল্পী ; ভগিনী নিবেদিতা আপনাকে তাঁহার হাতে যন্ত্রস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন—একজনকে যেমন দুর্দ্ধর্ষ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে হইয়াছিল, অপরকে তেমনি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করিতে হইয়াছিল।

সেই আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গুরুর নিকটে শিষ্যের আত্মনিবেদন একটা অসামান্য কিছু ত নয়ই, বরং অতিশয় সাধারণ। ভক্তির অর্থ তাহাই। কিন্তু সাধারণ-ভাবে, যে সকল কারণে, এইরূপ আত্মবিলোপ দুঃসাধ্য নয়—নিবেদিতার পক্ষে তাহার বিপরীত-গুলিই প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন, এবং বয়োধর্ম্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাব-জীবনে নয়—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়া প্রায় অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হইবে। ধর্ম্মান্তরিত হওয়ার জন্য যে আচার-অনুষ্ঠানগত পরিবর্ত্তন মানুষের জীবনে হইয়া থাকে, তাহার শতসহস্র দৃষ্টান্ত আছে ; কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর-গ্রহণ যে সম্ভব তাহা ভগিনী নিবেদিতাকে না দেখিলে কেহ কখনও বিশ্বাস করিত না। এই একটা দিক দিয়াও তাঁহার জীবন অনন্যসাধারণ—এমন বোধ হয়, আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন জাতিটাই বদলাইয়া গিয়াছে, তাঁহার রক্তেও যেন বাঙালী-হিন্দুর জন্মজন্মান্তরগত সংস্কৃতির অবচেতন ভাবধারা পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে ! ভারতের সেবায় এই শিষ্যাকে উৎসর্গীকৃত করিবার সময়ে গুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে তোমার পূর্ব্বজীবন, পূর্ব্বসংস্কার, পূর্ব্ব অভ্যাসের স্মৃতি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মুছিয়া-ফেলিতে হইবে, দেহের ও প্রাণের প্রতি তন্তুতে অনুভব করিতে হইবে যে, তুমি এই দেশের সন্তান, এই জাতিই তোমার জাতি।" গুরুর ঐ বাক্য এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া ? এ কোন্ যাদুশক্তির খেলা ! নিবেদিতার বয়স তখন আটাশ বৎসর—তিনি য়ুরোপীয় ভাব-চিন্তা, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছেন—আশ্চর্য্য ধীশক্তি ছিল তাঁহার ; সেই ধীশক্তি, চরিত্রবল ও স্বাধীন-চিন্তা এবং অধ্যয়নশীলতার বলে তিনি তৎপূর্ব্বেই একটা তত্ত্ব ও তাহার সাধনপন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব জন্মান্তর-গ্রহণের রহস্যভেদ করিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার গুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। সে কথাও পরে।

এই দেশ, এই জাতি ও এই সমাজে নিজেকে এমন করিয়া বিলাইয়া দেওয়া ত' কেবল ইচ্ছা ও সংকল্পমাত্রেই—সে যত দৃঢ় হৌক—একতরফা সম্পন্ন হইতে পারে না। বাঙালী হিন্দু-সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তিনি তাহার উঠানে একপাশে একটা স্থান করিয়া লইয়াছিলেন ; তজ্জন্য নিজেকে কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে করিতেন না ; সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ না করিলেও তিনি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া আমি এখানে কেবল একটি ঘটনা—সহস্রের একটি—উল্লেখ করিব। বাগবাজারে তাঁহার যে স্কুলটি ছিল, তাহাতে বালিকা, কিশোরী, কুমারী ও বিধবা—নানাবর্ণের কন্যারা শিক্ষালাভ করিত। ভগিনী তাহাদিগকে সেকালের প্রথা অনুযায়ী একখানি ঢাকা-গাড়ীতে করিয়া নানা দর্শনীয় স্থানে শিক্ষার্থে লইয়া যাইতেন। একবার তিনি কয়েক জনকে কলিকাতার যাদুঘর দেখাইতে লইয়া যান। প্রকাণ্ড বাড়ীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিবার পর কন্যাগুলি একটু শ্রান্ত ও পরে পিপাসার্ত্ত হওয়ায়, তিনি তাহাদিগকে জলের কলটির নিকটে লইয়া গিয়া নিজের বসন-মধ্য

হইতে একটি গেলাস বাহির করিলেন—গেলাসটি তিনি যাত্রাকালেই সকলের অগোচরে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এক্ষণে গেলাসটি ধুইয়া স্বহস্তে জলপূর্ণ করিয়া মেয়েদের ডাকিয়া পান করিতে বলিলেন। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কয়েকটি বয়স্কা কন্যাও ছিল,—তাহারা ঐ জল গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল; তখন একজন—বোধ হয়, ততখানি জাত্যভিমানের কারণ তাহার ছিল না—অগ্রসর হইয়া সেই গেলাস তাঁহার হাত হইতে লইয়া, অসঙ্কোচে সেই জল পান করিল। ভগিনী নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে গেলাসটি লইয়া নিজে তাহা ধৌত করিয়া, শূন্য গেলাসটি মাটিতে রাখিয়া দিলেন এবং প্রত্যেককে পর পর আপন হাতে তাহা ভরিয়া পান করিতে বলিলেন। মুখে এতটুকু ব্যথার বা অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নাই; সে মুখ তেমনই স্নেহোদ্ভাসিত, তেমনই প্রসন্ন ও প্রীতিপূর্ণ। এই জাতি ও এই সমাজের সেবা ও কল্যাণ-কামনায় ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ যে কিরূপ ছিল, তাহা উপরের ঐ একটি কাহিনী হইতে যিনি বুঝিয়া লইতে না পারিবেন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এ প্রসঙ্গ আরও দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই।

(৩)

এইবার আমি ভগিনী নিবেদিতার কিছু পরিচয় সেকালের সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করিব। তাঁহার উদ্দেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

> "প্রসূতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী,
> তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি—
> বিদেশিনী নিবেদিতা!…"

ঐ একটি উপমা ব্যতীত আর কোন যথার্থ উপমা কবির মনেও উদয় হয় নাই। নিবেদিতার মৃত্যুসংবাদে সত্যেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি সদ্য সদ্য রচনা করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙে হিমালয়ের কোলে অতিশয় অকালে তিনি দেহত্যাগ করেন, তাই কবিতার এই শেষ চারিটি পংক্তিও সত্যভাষণে যথার্থ হইয়াছে—

> "এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়,
> চ'লে গেলে অল্পআয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়
> দেহ রাখি' শৈলমূলে—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী!
> ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী!"

এইবার নিবেদিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে একটি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কোন কোন সভায় যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। পরে এই প্রবন্ধে, নিবেদিতার সহিত তাঁহার সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার কারণ বিশেষরূপেই অবগত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোন প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা, এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্ব্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব—কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।"

* * *

"বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্ত্তি ত ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। এ সম্বন্ধে যে কর্ত্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন

'our people', তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি ত লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয় ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।"

* * *

"কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্য লোকের অসঙ্গত আব্দার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল, পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপ্‌ল্‌"দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন, তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন।"

* *

"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্দ্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেক দিন অর্দ্ধাশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামিরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?"

(৪)

এইবার আমরা এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের—এই পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের রহস্য সন্ধান করিব। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতার সেই আত্মবিলোপ-কাহিনী যেমন বর্ণিত হইয়াছে, তেমন করিয়া বর্ণনা আর কেহ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগিনীর প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধা একান্ত তাঁহারই প্রতি; রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া ভগিনী নিবেদিতার অর্চ্চনা করিয়াছেন। এই অর্চ্চনায় একটা ফাঁক আছে, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে নিবেদিতার গুরুকে একবারও স্মরণ করেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ গুরুবাদকেই চিরজীবন অস্বীকার করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, নিবেদিতার জীবনে ঐ গুরুবাদ কোন্ অর্থে সত্য—গুরুবাদের তত্ত্বটাই ভ্রান্ত কিনা, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন; কারণ, নিবেদিতার ঐ নামটাও যেমন গুরুদত্ত, তেমনই তাঁহার সেই সমগ্র নিবেদিতা-জীবনই নিরবচ্ছিন্ন গুরু-মন্ত্রের

সাধনা; তাঁহার সেই আত্মবিলোপও—গুরুতেই আত্মবিলোপ। ইহার প্রমাণ নিতান্তই অনাবশ্যক। তাঁহার ভিতরে যে সত্য ছিল, যে অসামান্য ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি ছিল—যাহা রবীন্দ্রনাথকেও বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছে, সেই শক্তি এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহার গুরুই পারিয়াছিলেন, গুরুবাদের যদি কোন অর্থ থাকে তবে তাহা ইহাই। ভিতরে সেই বস্তু থাকা চাই; কিন্তু এক-একটি ক্ষণে, মানুষের জীবনের এক একটি দর্শন-লাভ হয়; বাহিরে ব্যক্তির রূপেও হয়, আবার অন্তরের একটা দিব্য উপলব্ধির (revelation) মতও হয়, যাহাতে মানুষ যেন দ্বিজত্ব লাভ করে। যাহার প্রকৃতি এবং প্রয়োজন যেমন, তাহার সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহিরের কোন অসাধারণ ব্যক্তি-পুরুষের সংস্পর্শেই অধিকাংশ ভাগ্যবান নর বা নারীর জীবনে আশ্চর্য্য রূপান্তর হইয়াছে তাহা আমরা জানি। আমাদের শাস্ত্রেও তাই শুধুই 'মনুষ্যত্ব' অর্থাৎ মনুষ্য-জন্ম, এবং 'মুমুক্ষুত্ব' অর্থাৎ পরমের পিপাসাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তাহার সঙ্গে 'মহাপুরুষ-সংশ্রয়' অত্যাবশ্যক বলা হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতার জীবন-কাহিনী যিনি সম্পূর্ণ জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি স্বামীজির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী জীবন তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার কেবল ঐ মহাপুরুষের সংশ্রয়টাই যেন বাকি ছিল, যেমন তাহা ঘটিল, অমনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের খোলসটি বিদীর্ণ করিয়া আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। সেই লগ্নের সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন-বেগ তাঁহাকে কিরূপ বিহ্বল করিয়াছিল—তাহাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। যে-মুহূর্ত্তে সর্ব্বত্যাগ—সেই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বপ্রাপ্তি! সে প্রাপ্তি যে কেমন, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি—সেই প্রাপ্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতেই ভগিনীর সেই অফুরন্ত দান। তেমন করিয়া না পাইলে, এমন করিয়া দান করিতে কেহ পারে না। কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন কোথায়, কাহার নিকটে?

সে কথা তিনিও বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। স্বামীজির নিকটে তিনি কি পাইয়াছিলেন এবং স্বামীজি তাঁহার কি ছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; সেই গ্রন্থ (The Master as I saw Him) জগৎ-সাহিত্যে মানবাত্মার এক অপূর্ব্ব আত্ম-কাহিনী হিসাবে অমর হইয়া থাকিবে। এই কাহিনীতে, এবং অন্যত্র, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একটি আত্মিক সম্পর্ক ফুটিয়া উঠিতে দেখি—আমাদের জ্ঞানে তাহার কোন নাম-নির্দ্দেশ করিতে পারি না। গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক আমাদের দেশে নূতন নয়; সেই সম্পর্কের যত প্রকার-ভেদ আছে—সাধন-মার্গ, অধিকার এবং শিষ্যের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চরিত্র অনুসারে, তাহাতে যে বৈচিত্র্য ঘটে তাহাও কিছু কিছু বুঝিতে পারি; কিন্তু স্বামীজির সহিত ভগিনী নিবেদিতার ঐ সম্পর্ক এমনই অপূর্ব্ব যে, তাহা চিন্তা করিলে দেহধারী আত্মার অনন্তলীলা একটা নূতন রসরূপে আমাদের হৃদয়-গোচর হয়। একদিকে স্বামীজির সেই দৃপ্ত পৌরুষ—যে-পৌরুষ সকল মমতা, সকল দুর্ব্বলতাকে নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, আর একদিকে তেমনই তেজস্বিনী নারী—সে তেজও যজ্ঞবেদীর হোমানলশিখার মত। স্বামী বিবেকা-নন্দের সেই প্রজ্বলন্ত পৌরুষই যে তেজস্বিনী নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই—ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে এই তেজ যে কি পরিমাণ ছিল, তাহা অন্তরঙ্গগণ সকলেই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এমনও বলিয়াছেন যে, এই তেজ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি লিখিয়াছেন—

"…নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দ্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারো প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত।"

এই যে তেজ, চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয়তা—ইহাই ছিল তাঁহার জন্মগত, প্রকৃতিগত সম্পদ; ইহাই ছিল তাঁহার নিজ আত্মার মূলধন। গুরু বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বলে, এই বস্তুটিকে তাঁহার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং ইহা যে হোমাগ্নির মতই পবিত্র, তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই ইহা ত' কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিবে না। যুবক নরেন্দ্রের মধ্যেও ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠিক এই বস্তুই দেখিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রও ঠিক সেই কারণে বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে নাই। অতএব গুরু ও শিষ্যের প্রথম দর্শনে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল—উভয় ক্ষেত্রে তাহা প্রায় এক। শেষে নরেন্দ্র যেমন বলিয়াছিল —"আমাকে জয় করিয়াছিল তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) সেই অদ্ভুত প্রেম," ভগিনী নিবেদিতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সেই দুর্দ্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম যে কিরূপ ছিল তাহা আমি অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি ("বাংলার নবযুগ")—পর্ব্বতের মত অটল, এবং পাষাণের মত কঠিন সেই পুরুষের অন্তরে যে প্রেমের সুধানিস্যন্দিনী নিত্য প্রবাহিত ছিল তাহা সকলের বোধগম্য হইত না। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন—তেমন করিয়া বোধ হয় আর কেহ করে নাই; কারণ সে প্রেম এমনই যে, তাহাকে অনুভব করিতে হইলে, অগ্নিশিখায় দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার জ্বালা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর প্রতি যে প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার মূলে যদি নারীপ্রকৃতিসুলভ কোন আকূতি মর্ম্মান্তিকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, গুরু বিবেকানন্দ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন; নিবেদিতা নিজেরই পুণ্যবলে তাঁহার গুরুর সেই ব্যক্তিসম্পর্কহীন মহাপ্রেমের (যে প্রেমের আমরা ধারণাই করিতে পারি না) অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা জানি, স্বামীজির পুরুষ-আত্মা প্রকৃতির বশ্যতা আদৌ স্বীকার করে নাই; মায়াকে একেবারে উড়াইয়া না দিলেও তাহাকে জয় করিয়া, বশ করিয়া, তিনি সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকেই কল্যাণী-মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে নারীপ্রকৃতি ছিল, তাহাকেও তিনি কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরম স্নেহে তাহাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই যে স্নেহ—ভগিনী নিবেদিতা তাহাতেই তাহার নারী-হৃদয়ের গভীরতম পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মঃ রোমা রোঁলা লিখিয়াছেন—

"But her love was so deep that Nivedita does not seem to have kept any memory of the harshness from which she suffered to the point of the greatest dejection. She only kept the memory of his sweetness. Miss Macleod tells us :

"I said to Nivedita : 'He was all energy.' She replied : 'He was all tenderness.' But I replied : 'I never felt it.' 'That was because it was not shown to you. For he was to each

person according to the nature of that person and his way to the Divine."

সর্ব্বত্যাগিনী তপস্বিনী নারী গুরুর চরণমূলে কেবলমাত্র সেইটুকুর আশ্বাসে নিজের জীবনটাকে পুষ্পাঞ্জলির মত নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি গুরুর সাক্ষাৎ সাহচর্য্য বা সঙ্গ খুব অল্পই পাইয়াছিলেন—তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের পর মাত্র চারি বৎসর স্বামীজি বাঁচিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একবার কয়মাসের জন্য অপর কয়েক জন গুরুভগ্নীর সঙ্গে, কাশ্মীরভ্রমণ উপলক্ষ্যে তিনি স্বামীজির কিঞ্চিৎ নিকটে অবস্থান করিতে পাইয়াছিলেন। গুরুর নিকটে থাকিবার কোন সুযোগই ছিল না। প্রথম কিছুদিন স্বামীজি তাঁহার এই শিষ্যার প্রতি এমন অতিরিক্ত কঠোর ছিলেন যে, নিবেদিতার সে ছিল একরূপ অগ্নি-পরীক্ষা; শুনা যায়, সেই কঠোরতায় তিনি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর তিনি প্রাণে যে কি বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মত মানুষের পক্ষে ধারণা করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা মাত্র, আমি চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই। আমার মনে হইয়াছে, সেই প্রেম মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাকে অশুচি করা হইবে। বোধ হয়, তাহা জগতে একটি মাত্র কবির কাব্যকল্পনায় কিঞ্চিৎ অভি-ব্যক্তি লাভ করিয়াছে; সেখানে দেহ ও মনের সমস্ত মলিনতামুক্ত হইয়া, অথচ মানব-হৃদয়ের আকুল রোদন-রবে বন্দিত হইয়া, সেই প্রেম অতি ঊর্দ্ধলোক হইতেও আমাদের চক্ষে দীপ্তি দান করে। বিয়াত্রিচের প্রতি মহাকবি দান্তের সেই যে প্রেম, তাহার নাম কি? তাহা ভগবদ্ভক্তির নীচে, না উপরে, না একই পদবীর? সেখানে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় অন্যরূপ বটে, কিন্তু ঐরূপ প্রেমে কি নারী-পুরুষ-ভেদ আছে? বৈষ্ণব বলিবেন, আছে, কারণ, প্রেমের আশ্রয়মাত্রেই নারীজাতীয়; তাহা হইলে দান্তেও সেখানে পুরুষ নহেন—নারী। আমি ভগিনী নিবেদিতার এই গুরুভক্তির মধ্যেই নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক মমতা কোন্ রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহার একটা অক্ষম অসম্পূর্ণ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি; মানুষের ভাষায় তাহার অধিক অসম্ভব। আবার, আমার মত মানুষের সাধ্য কি যে, তাঁহার মত মহীয়সী নারীর তপোবীর্য্য-মহৎ সেই অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ-লাভ করি! তথাপি সেই প্রেমের যে দিকটি একান্ত ব্যক্তিগত, সে দিকটি—অপর কেহ দূরে থাক,—গুরুকেও তিনি দেখিতে দেন নাই, সে অধিকার গুরুরও ছিল না। তাহার সম্পর্কে তিনি শেষ পর্যন্ত কি কঠিন মৌন রক্ষা করিয়া-ছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার গ্রন্থে (My Master as I saw Him) তিনি গুরুর শেষ-জীবনের শেষ দিন কয়টির কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সর্ব্বশেষে স্বামীজির তিরোধান-কথাও লিখিয়াছেন। কিন্তু সেইদিনের সেই ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ বিবৃতি ছাড়া এমন একটি কথাও তাহাতে নাই, যাহাতে তাঁহার নিজপ্রাণের এতটুকু হাহাকারও শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করার পর পাঠকমাত্রেই ঐখানে পৌঁছিয়া যতটুকু উদ্বেল না হইয়া পারে না, এবং সেই জন্য যে সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করে, লেখিকা তাহাতেও বিমুখ। আমারও রীতিমত আশাভঙ্গ হইয়াছিল। তারপর যখন স্বামীজির পৃথক জীবন-কাহিনীতে তাঁহার সেই তিরোধানের বিস্তৃত বিবরণ-প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি আচরণের কথা অবগত হইলাম, তখন নিজের বিমূঢ়তাকেই ধিক্কার দিলাম। মৃত্যুর পরদিন বেলা ১টা-২টা পর্য্যন্ত স্বামীজির শবদেহ একটি কক্ষে শয্যার উপরে সযত্নে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছিল; নিকটে ও দূরে তাঁহার সেই আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেরিত হওয়ার,

এবং অন্ত্যেষ্টিকালে সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব সুযোগ দিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতাও সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পক্ষে সে কেমন সংবাদ? কে তাহা বুঝিবে? বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি? পরে কেবল ইহাই দেখি যে, স্বামীজির সেই শবদেহের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একখানি পাখা হাতে লইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। সে মূর্তি ধীর-স্থির, একেবারে নিস্তরঙ্গ; চক্ষে অশ্রু নাই, অধরোষ্ঠও একটু কাঁপিতেছে না। তিনি কেবল একমনে গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন! তখনও সেই সেবার অধিকারটি ত্যাগ করিবেন না। বুদ্ধের পরম স্নেহাস্পদ ও নিত্যসহচর আনন্দের কথা মনে পড়িল। তিনিও তাঁহার গুরুর মহাপরিনির্বাণ সময়ে শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, সেই পুরুষ অপেক্ষা এই নারীর প্রকৃতি আরও কঠিন, এ ধাতু অগ্নিতেও গলে না। তাহার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারে কোন্ কবি, কোন্ সাধক, তাহা আমি জানি না।

* * *

উপরে আমি যে প্রসঙ্গ একটু সবিস্তারে করিয়াছি, তাহার প্রয়োজন ছিল। ভগিনী নিবেদিতার এই যে আত্মোৎসর্গ—এই জাতিকে তিনি যে এমন চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাকে এমন করিয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কারণ সন্ধান করিতে হইলে, কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইবে না। পদ্মফুল খুব বড় ফুলই বটে, তথাপি সূর্যের আলোক ব্যতিরেকে তাহা প্রস্ফুটিত হয় না। ভগিনী নিবেদিতা এই দেশকে যে এত ভালবাসিয়াছিলেন, এমন করিয়া তাঁহার জীবনটাকে তাহার সেবায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সেই গুরুরই প্রীত্যর্থে। তাঁহার গুরু যাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তিনিও তাহাকে ভাল না বাসিবেন কেমন করিয়া? স্বামীজি যে দৃষ্টিতে তাঁহার দেশকে দেখিয়াছিলেন, শিষ্যা নিবেদিতার চক্ষে সেই দৃষ্টি তিনি পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের হৃদয়খানিকেই এই শিষ্যার বক্ষগহ্বরে যেন বসাইয়া দিয়াছিলেন। নতুবা, এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিত না। গুরুর সহিত একাত্ম হইয়া, সেই গুরুর হৃদয়ে আপনার হৃদয় নিঃশেষে গলাইয়া মিলাইয়া দিয়া, তিনি যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে এই দেশের এবং তাঁহার গুরুর সেবা। এমনই হয়; জগতের ইতিহাসে নর-নারীর যত মহাবস্ত্ববদান-কাহিনী আছে—প্রেমই তাহার একমাত্র প্রেরণা। ঐ প্রেমের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব—আর সকলই জগতের পক্ষে মিথ্যা। সেই প্রেমকে আমরা একটা সাধারণ বস্তুরূপেই জানি, কখনও বা সেই সাধারণ বস্তুর একটা বিশেষরূপ দেখিয়া চমৎকৃত হই; কিন্তু তাহার পরমরূপ—সেই অপর রূপ—আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কারের অতীত; ভগবদ্‌প্রেমই বল, আর গুরুভক্তিই বল, কোন নামেই তাহাকে বিশেষিত করা যায় না। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য—এ সকল সম্পর্ক আমাদের সংস্কারের পোষকমাত্র; প্রেম একরূপ, তাহার দুইরূপ নাই। যাহার অন্তরে এই প্রেম নাই, সেই ব্যক্তি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা-কীর্তন করে, তাই গুরুবাদ তাহার নিকটে আর কিছুই নয়—সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবমাননা। আসলে গুরু যে আর কিছু নয়—বৃহতের বেদীমূলে মানুষের ক্ষুদ্র অহংকে বলি দিবার যজ্ঞযূপ, প্রেমের অমৃতপানে আত্মাকে আনন্দ-স্বরূপে অধিষ্ঠিত করিবার পানপাত্র, এবং তাহারই প্রয়োজনে অদ্বৈতের একরূপ দ্বৈতবিলাস ইহা যাঁহারা মানেন না, তাঁহারা মানবতার ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যতদিন মানুষ মানুষমাত্র, ততদিন ঐ হীনযান অপেক্ষা এই মহাযানই তাহার প্রশস্ততর পন্থা হইয়া থাকিবে, এবং "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" নয়—ভগিনী নিবেদিতার ঐ জীবন এবং তাঁহার ঐ অপূর্ব-সাধনাই মানুষকে সেই আশ্বাসে চিরদিন আশ্বস্ত করিবে।

বেদান্ত ও সূফী দর্শন

ডক্টর রমা চৌধুরী, ডি-ফিল্

বেদান্ত ও সূফী দর্শন যথাক্রমে ভারতীয় ও ইস্লামীয়, তথা সমগ্র জগতের, দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদ রূপে যুগে যুগে সম্মানার্হ হয়েছে। তজ্জন্য এই দুটী মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা সর্বতোভাবে শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী, সন্দেহ নেই।

'বেদান্ত' বলতে যেরূপ 'সূফী' মত বলতেও সেরূপ, কেবল একটী মতবাদই বুঝায় না। উপরন্তু বেদান্তের ন্যায় সূফী দর্শনেও বহু বিভিন্ন মতবাদ বা সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। বেদান্তে কেবলাদ্বৈতবাদ (শঙ্কর), বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (রামানুজ), দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (নিম্বার্ক), দ্বৈতবাদ, (মধ্ব) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ (বল্লভ), বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ (শ্রীকণ্ঠ), ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ (ভাস্কর), অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ (বলদেব) প্রমুখ নানারূপ মতবাদের বিস্তৃত প্রপঞ্চনা আছে। সমভাবে সূফী মতবাদেও কেবলাদ্বৈতবাদ (সাবিস্তরি প্রভৃতি), বিশ্বাত্মবাদ (ইবন্ আরবী প্রভৃতি), দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (রূমী প্রভৃতি), দ্বৈতবাদ (কালাবাধী প্রভৃতি) প্রমুখ বিভিন্ন মতবাদের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য সূফী মতবাদের সঙ্গে বেদান্তমতের তুলনাকালে এই সকল বিভিন্ন মতবাদকে স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য। পুনরায়, সূফী অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি যে বেদান্ত অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ এক নয়, সে কথাও সর্বদা স্মরণীয়, নতুবা ভ্রমপ্রমাদের উদ্ভব হ'তে পারে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পৃথক্ ভাবে তুলনা করা সম্ভবপর নয় বলে সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে বেদান্ত ও সূফী মতবাদের প্রধান প্রধান বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করা হচ্ছে।

অদ্বৈতবাদী ব্যতীত অন্যান্য বেদান্তসম্প্রদায়গণ নিম্নলিখিত বিষয়ে সাধারণভাবে একমত :—

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্—সর্বোচ্চ সত্য কিন্তু একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব নহেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত, নিত্য ও সর্বব্যাপী, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও অশেষকল্যাণগুণবিমণ্ডিত। অতএব তিনি সগুণ, সবিশেষ ও সক্রিয়। সকল হেয়-গুণবিবর্জিত হয়েও সকল মঙ্গলগুণাধার-রূপে তিনি সগুণ; সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য হয়েও স্বগতভেদবান্ রূপে তিনি সবিশেষ; নির্বিকার হয়েও বন্ধ ও মোক্ষকর্তা রূপে তিনি সক্রিয়। ব্রহ্ম জগল্লীন হয়েও জগদতিরিক্ত। জগতের উপাদান কারণ এবং অন্তর্যামী দেবতা-রূপে তিনি বিশ্বচরাচরের প্রতি অণু-পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে বিলীন হয়ে আছেন। কিন্তু অনন্ত অসীম ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশ একটী ক্ষুদ্র জগতে সম্ভবপর নয় বলে ব্রহ্ম জগদ্ব্যাপী হয়েও জগতের বহির্ভূত। ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—জীব-জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম বা কার্য। তথাপি ব্রহ্ম স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্তিতই থাকেন। ব্রহ্ম স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত ও আপ্তকাম হয়েও, স্বপ্রয়োজন ব্যতীতই জীবের কর্মানুসারে লীলাভরে সৃষ্টি করেন।

জীব স্বভাবতঃ ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্য ও সত্য, অনাদি ও অনন্ত এবং জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা; পরিমাণে অণু; সংখ্যায় অনাদি ও অনন্ত; প্রকারভেদে বদ্ধ ও মুক্ত। ঈদৃশ জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব ও অসংখ্যত্ব জীবের নিত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম বলে সর্বাবস্থাতেই অনুস্যূত হয়। তজ্জন্য মুক্ত জীবও জ্ঞাতা, কর্তা,

ভোক্তা—অবশ্য সাংসারিক অর্থে নয়—অণু ও অসংখ্য। জীব ব্রহ্মের গুণ, শক্তি, অংশ, কার্য ও পরিণাম। এরূপে জীব সম্পূর্ণ ভাবেই ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মান্তর্গত।

জগৎ জড়স্বভাব হয়েও জীবেরই ন্যায় নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, ব্রহ্মের গুণ, শক্তি, অংশ, কার্য ও পরিণাম, এবং সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মান্তর্গত।

ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ কারণের সঙ্গে কার্যের, অংশীর সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ কারণের সঙ্গে কার্যের, অংশীর সঙ্গে অংশের, বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের, আত্মার সঙ্গে দেহের বা শক্তিমানের সঙ্গে শক্তির সম্বন্ধের অনুরূপ। অর্থাৎ জীব-জগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে স্বরূপতঃ অভিন্ন হয়েও ধর্মতঃ ভিন্ন। মধ্বমতে অবশ্য জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ভিন্নাভিন্ন নয়।

জীব কর্মানুসারে বারংবার জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন আকার ও অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহাই বন্ধ। এই অনাদি সংসারচক্র বা জন্মজন্মান্তর থেকে মুক্তিই মোক্ষ, স্বর্গ নয়, কারণ স্বর্গও অনিত্য। মোক্ষ জীবের জীবত্বের বিনাশ নয়, পরিপূর্ণ বিকাশ। মুক্তি দুঃখাভাবই কেবল নয়, পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা। মুক্ত জীবও ব্রহ্ম সদৃশ মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন, অণু, সৃষ্ট্যাদিশক্তিহীন, ব্রহ্মের সেবক ও ভক্ত। জীবন্মুক্তি অসম্ভব, বিদেহমুক্তিই একমাত্র মুক্তি।

অজ্ঞান বা অবিদ্যাই বন্ধের মূল কারণ। নিষ্কাম কর্ম, সদ্‌গুরুর নিকট শাস্ত্রপাঠ বা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, তত্ত্বজ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, ভগবৎপ্রসাদ এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার মোক্ষের উপায় বা সাধনাবলী। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়জ্ঞানলভ্য, ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিগোচর নহেন।

অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীবজগৎ মিথ্যা, মায়া মাত্র। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। তিনি নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম মায়াশক্তি বলে মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করেন; অর্থাৎ মায়োপহিত সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগৎস্রষ্টা—জগতের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, পরব্রহ্ম নহেন। জীব-জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, পরিণাম নহে। জীবের ন্যায় ঈশ্বরও পারমার্থিক স্তরে মিথ্যা।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন এবং স্বয়ং ব্রহ্মরূপে নির্গুণ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, বিভু ও একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, এবং এতদ্রূপে জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, পরিচ্ছিন্ন, অণু ও অসংখ্য। অতএব জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব ও অসংখ্যত্ব ঔপাধিক মাত্র, স্বাভাবিক ও নিত্য নয়।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নয়, বিবর্ত মাত্র। অতএব পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মায়া মাত্র, সত্য তত্ত্ব নয়। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ ঈশ্বরের পরিণাম বা কার্য, এবং ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব-জগৎ ঈশ্বর থেকে ভিন্নাভিন্ন। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব-জগৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব।

অনাদি কর্মবশতঃ জীব দেহমন প্রভৃতি উপাধির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ করে ইহাই বন্ধ। এই অনাদি সংসারচক্র থেকে চিরমুক্তিই মোক্ষ বা চরম পুরুষার্থ, স্বর্গলাভ নয়। মোক্ষ জীবের জীবত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ, অর্থাৎ মোক্ষকালে উপাধিবিমুক্ত জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্নতা লাভ করে। অতএব ব্রহ্মের সঙ্গে একত্বই মোক্ষ। মোক্ষ কেবল দুঃখাভাবই নহে, চরম আনন্দাবস্থা।

অজ্ঞান, অবিদ্যা বা অধ্যাসই বন্ধের মূল কারণ। ব্যবহারিক স্তরে ঈশ্বর জীবের উপাস্য দেবতা। কিন্তু পারমার্থিক স্তরে জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। উপাস্য ও উপাসক ভেদ না থাকলে উপাসনা সম্ভবপর নয়। অতএব পরব্রহ্ম উপাস্য নহেন, জ্ঞেয়। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাধন বা উপায়। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়জ্ঞান-লভ্য, ইন্দ্রিয় বা সাধারণ বুদ্ধিলভ্য নহেন।

সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে. বেদান্তের ন্যায় সূফীমতেও ঈশ্বরই এক ও অদ্বিতীয়—তিনিই সর্ব্বোচ্চ সত্য। মতভেদে অর্থাৎ সাবিস্তরি প্রমুখ অদ্বৈত-বাদী সূফীদের মতে তিনিই একমাত্র সত্য। এই মতানুসারে শুদ্ধসত্তা পরমাত্মা অসত্তায় প্রতিবিম্বিত হলে তথাকথিত জগৎসৃষ্টি হয়। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে সৎরূপে প্রতিভাত হ'লেও জগৎ প্রকৃতপক্ষে অসৎ। অতএব জগৎ পরমাত্মা থেকে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হলেও বস্তুতঃ পরমাত্ম-স্বরূপ—দৃশ্যমান, জগৎ স্বপ্নবৎ, অলাতচক্রবৎ. কল্পনাবৎ মিথ্যা। সমভাবে জীবও ঈশ্বর থেকে অভিন্ন, ভিন্নরূপে প্রতীত জীব জগতেরই ন্যায় মিথ্যা।

কালাবাধি, হুজ্‌ঘিরি প্রমুখ সূফীদের মতে ঈশ্বর সর্বপ্রথম থেকে এবং সর্বদাই সগুণ অনন্ত কল্যাণগুণবিভূষিত; কোনো কালে ও কোনো অবস্থাতেই তিনি নির্গুণ, নির্বিশেষ, শুদ্ধসত্তামাত্র নহেন। কিন্তু ইবনুল্ আরবী. জীলী, জামী প্রমুখ সূফীদের মতে ঈশ্বর প্রথমে নির্গুণ, পরে সগুণ। এই মতে, ঈশ্বরের দুটী রূপ বা অবস্থা —(১) শুদ্ধস্বরূপ বা সত্তামাত্র। এই অবস্থায় তিনি নির্গুণ ও নির্বিশেষ, এবং ইহা তাঁহার অনভিব্যক্ত, অপ্রপঞ্চিত রূপ যখন তাঁর গুণাবলী তাঁরই মধ্যে অপ্রকটিত ভাবে নিহিত হয়ে থাকে। এইরূপেই তিনি "কেবলাত্মা", "পরমাত্মা" প্রভৃতি পদবাচ্য। (২) সগুণ ও সবিশেষ রূপ। ইহাই ঈশ্বরের অভিব্যক্ত ও প্রপঞ্চিত রূপ—যখন তিনি স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপকে গুণাবলীরূপে প্রকটিত করেন। এইরূপেই "দেবতা", "ঈশ্বর" প্রভৃতি পদবাচ্য।

ঈশ্বর নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। অধিকাংশ সূফীর মতে. ঈশ্বর জগল্লীন হয়েও জগদতিরিক্ত। অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী বলে তিনি পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণায়, প্রতি অণু-পরমাণুতে নিহিত হয়ে আছেন। তথাপি অনন্ত, অসীম ঈশ্বর ক্ষুদ্র-সসীম জগৎকে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত করেও জগতের বাহিরেও বিদ্যমান। মতভেদে সমগ্র ঈশ্বরই জগতে লীন হয়ে আছেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর জগল্লীনই মাত্র, জগদতিরিক্ত নহেন, এবং সমগ্র ঈশ্বর ও জগৎ এক, অভিন্ন ও সমপরিমাণ। ইবনুল আরবী প্রমুখ বিশ্বাত্মবাদী সূফীরা এই মতের সমর্থক। পুনরায় মতভেদে ঈশ্বর জগল্লীন নহেন, কারণ তিনি স্বয়ংই জগৎ। জীলী প্রমুখ একাত্মবাদী সূফীগণ এই মতের প্রপঞ্চক। পুনরায়, মতভেদে, ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভাবে জগদ্বহির্ভূত জগল্লীন একেবারেই নহেন। ইহা সনাতন ইস্‌লামপন্থী সূফীদের মত। পঞ্চমতঃ কোনো কোনো সূফীর মতে, ঈশ্বর জগল্লীন বা জগদ্বহির্ভূত কোনোটাই নহেন, অর্থাৎ তিনি পার্থিবপদবাচ্য নহেন।

অধিকাংশ সূফীর মতে ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা। তাঁদের সাধারণ মত এই যে, ঈশ্বর শূন্য থেকে নিমেষমধ্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। মতভেদে, জগৎ ঈশ্বরের স্বরূপ বা গুণাবলীর বাহ্যিক অভিব্যক্তি। এই মতানুসারে অব্যক্ত, সূক্ষ্ম পরমাত্মাই ক্রমান্বয়ে স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চে পরিণত হন। হাল্লাজের মতে এই বিশ্ব-চরাচর ঈশ্বরের প্রেম ও আনন্দের মূর্ত বিকাশ। পুনরায়, মতভেদে অসতে সতের প্রতিবিম্বনই জগৎ। ইহা সাবিস্তরি প্রমুখ অদ্বৈতবাদী সূফীদের মত।

অধিকাংশ সূফীর মতে, জীবজগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্তিরূপে ঈশ্বরেরই ন্যায় সত্য। মতভেদে

অর্থাৎ অদ্বৈতবাদী সূফীগণের মতে জীব-জগৎ মিথ্যা স্বপ্নমাত্র।

ঈশ্বরের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ বিষয়েও বিভিন্ন সূফীমত দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, কালাবাধী, হুজ্‌য়িরি প্রমুখ সনাতনপন্থী সূফীদের মতে ঈশ্বর ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ও গুণতঃ উভয়তঃই নিত্য ও সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেজন্য মুক্তজীবও ঈশ্বর ভিন্ন ও ঈশ্বরদাস। দ্বিতীয়তঃ জীলী প্রমুখ একাত্মবাদী সূফীদের মতে ঈশ্বর ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন, এবং জীব-জগৎ ঈশ্বরেরই ন্যায় সত্য। তৃতীয়তঃ, সবিস্তারি প্রমুখ অদ্বৈতবাদী সূফীদের মতে ঈশ্বর ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ও গুণতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন, কিন্তু জীব-জগৎ মিথ্যা। চতুর্থতঃ, রূমী প্রমুখ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সূফীদের মতে ঈশ্বর ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ভিন্ন, কিন্তু গুণতঃ অভিন্ন।

মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধেও নানারূপ সূফী মতবাদ আছে। সনাতনপন্থী সূফীদের মতে, মুক্তির অর্থ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন বা একত্ব নয়—কিন্তু একদিকে পার্থিব আসক্তির সমূল ধ্বংস এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা পরিহার, অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও সর্বাংশে তাঁর আজ্ঞাধীন দাসরূপে অবস্থান মাত্র। বিশ্বাত্মবাদী ও একাত্মবাদী সূফীদের মতে মুক্তির অর্থ পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সঙ্গে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অভিন্নত্ব লাভ; অর্থাৎ একদিকে জীবের জীবত্ব ও জীবোচিত গুণের বিলয়; অন্যদিকে ঈশ্বর স্বরূপলাভ ও ঐশ্বরিক গুণমণ্ডিতরূপে সংস্থিতি। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সূফীগণের মতে মুক্তির অর্থ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর গুণাবলী মাত্র লাভ, স্বরূপ লাভ নয়।

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত জীবের স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপ ঘটে কি না, সে বিষয়েও সূফীগণ ভিন্নমত। একমতে ঈশ্বরে স্বতন্ত্র সত্তাহীন শাশ্বত জীবনই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তিকালে জীবসত্তা ঈশ্বরসত্তায় বিলুপ্ত হ'লে জীব অনন্তকাল ঈশ্বরেই স্থিতি করে, অবশ্য স্বতন্ত্র সত্তাবান্ ব্যক্তিরূপে নয়। ইহা বায়াজিদ্ প্রমুখ সূফীদের মত। অন্য মতে ঈশ্বরে স্বতন্ত্র সত্তাশীল অস্তিত্বই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হবার পরও মানবের মানবত্ব বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটে না। ইহা হাল্লাজ, রূমী প্রভৃতির মত।

সব সূফীমতেই জীবেশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ উপাসক-উপাস্য সম্বন্ধ। যে সব সূফী দর্শনের দিক থেকে জীবেশ্বরের অভিন্নত্ব স্বীকার করেন, তাঁরাও ধর্মের দিক্ থেকে জীবকে ঈশ্বরভিন্ন ও ঈশ্বরোপাসক রূপে গণ্য করেন। অধিকাংশ সূফীর মতে—ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ ব্যতীত প্রেমিক-প্রেমিকার সম্বন্ধও বিদ্যমান। মতভেদে অর্থাৎ 'সনাতনপন্থী' সূফী মতে ইঁহাদের সম্বন্ধ প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধই মাত্র।

অধিকাংশ সূফীর মতে জীবন্মুক্তি সম্ভব। অর্থাৎ, মানব পার্থিব জগতেই ঈশ্বরের সহিত মিলিত হ'তে পারে। অবশ্য, এই মিলন প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী মাত্র। ভাবোন্মত্ত সমাধি অবস্থার অবসান হ'লেই একত্ব উপলব্ধিরও অবসান ঘটে, এবং ভেদভ্রম ও সাধারণ পার্থিব জীবনের পুনরুদয় হয়। মতভেদে অর্থাৎ সনাতন-পন্থী সূফীমতে ঈশ্বরের দর্শন ইহলোকে নয়, পরলোকেই কেবল লভ্য।

সূফীমতে অনুতাপ, দারিদ্র্য, সংযম, সন্ন্যাস, ধৈর্য, সন্তোষ, ঈশ্বরে বিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন সাধনমার্গের বিভিন্ন সোপান বা উপায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরানুগ্রহ বা ভগবৎপ্রসাদই মুক্তির মূল কারণ, যেহেতু উপরি উক্ত নৈতিক সাধনাবলী

স্বপ্রচেষ্টালভ্য হ'লেও পরিশেষে তা' ভগবদনুগ্রহেরই ফল। নামজপ, প্রাণায়াম, ধ্যান প্রভৃতি মুক্তির সহকারী অঙ্গ। ঈশ্বর ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিলভ্য নহেন, অতীন্দ্রিয় অনুভবলভ্য। মুমুক্ষু প্রথমে গুরু থেকে সাধনমার্গের নিগূঢ় স্বরূপ শিক্ষা করেন। কিন্তু পরিশেষে প্রত্যেকেই স্বয়ং ঈশ্বরের থেকে সাক্ষাৎ ভাবে বাণী ও আলোক প্রাপ্ত হ'তে পারেন।

অধিকাংশ সূফীর মতেই নামাজ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি বাহ্যিক আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তর পবিত্রতাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। সনাতন ইস্লামপন্থী সূফীদের মতে অবশ্য কোরাণোপদিষ্ট আচারানুষ্ঠান ও ক্রিয়াপদ্ধতি অবহেলা করা মহাপাপ; এবং সাধারণ মানব, ঈশ্বরমিলনেচ্ছু সাধক ও ঈশ্বর সম্মিলিত ভক্ত সকলের পক্ষেই ইহা অবশ্য কর্তব্য ও সমভাবে বাধ্যতামূলক। কিন্তু অধিকাংশ সূফীর মতেই ভগবৎসম্মিলিত সাধুর পক্ষে বাহ্যিক ধর্মাচার নিষ্প্রয়োজন, যদিও লোকশিক্ষার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় তা' পালন করেন। সূফীদের মতে ঈশ্বর এক এবং প্রত্যেক মানবই সেই একই ঈশ্বরের স্বরূপ বলে মানবে মানবে, মুসলমানে অমুসলমানে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোনো ভেদ নেই। পরমতসহিষ্ণুতা ও বিশ্বপ্রেম সূফীমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে, বেদান্ত ও সূফীমতের প্রভেদ এই রূপ:—সূফীগণ কর্মবাদী নন এবং জন্মজন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না; কিন্তু বৈদান্তিকেরা সকলেই কর্মবাদী ও জন্মজন্মান্তরবাদী। অধিকাংশ সূফীরা অসৎ-কার্যবাদী, অর্থাৎ শূন্য থেকে জগৎসৃষ্টি স্বীকার করেন; কিন্তু বৈদান্তিকেরা সকলেই সৎ-কার্যবাদী। অধিকাংশ সূফীর মতে জীব-জগৎ অনিত্য; কিন্তু সব বৈদান্তিকদের মতেই জীব-জগৎ ব্রহ্মরূপে বা ব্রহ্মের গুণ, শক্তি ও অংশরূপে ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্য। অধিকাংশ সূফী অবতারবাদ বিরোধী; কিন্তু বৈদান্তিকেরা অবতার স্বীকার করেন। ঈশ্বর কেবলই জগল্লীন, জগদতিরিক্ত নহেন, ইহা কোনো বেদান্তসম্প্রদায়েরই মতন ঈশ্বর পূর্বে নির্গুণ, পরে সগুণ, ইহাও কোনো বেদান্তসম্প্রদায়ের মত নয়। বৈদান্তিকদের মতে হয় ব্রহ্ম সর্বদাই নির্গুণ (শঙ্কর), নয় ব্রহ্ম সর্বদাই সগুণ (রামানুজ প্রভৃতি)। সূফীরা সকলেই মরমিয়াবাদী; কিন্তু শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণ প্রজ্ঞাবাদী। অর্থাৎ সূফী ও বেদান্ত উভয় মতেই অতীন্দ্রিয়বাদ উভয় মতেই ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞান ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিলভ্য নয়। কিন্তু বেদান্তমতে ঈশ্বরোপলব্ধি বুদ্ধিপ্রভূত না হ'লেও জ্ঞানমূলক। সাধারণ "বুদ্ধিশক্তি" ব্যতীত মানবের অপর একটী শ্রেয়ঃশক্তি আছে যাকে "প্রজ্ঞাশক্তি বলা চলে; এবং এই শক্তির সাহায্যেই ব্রহ্ম প্রমুখ অতীন্দ্রিয় লোকোত্তর তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। প্রজ্ঞা কিন্তু বুদ্ধি ভিন্ন হলেও বুদ্ধিবিরোধী বা বুদ্ধিনিরোধকারী নয়, উপরন্তু বুদ্ধিরই চরমোৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই হ'ল "প্রজ্ঞাবাদ"। কিন্তু সূফীমতে ঈশ্বরোপলব্ধি বুদ্ধিপ্রসূতও নয়, জ্ঞানমূলকও নয়, সম্পূর্ণরূপে আবেগমূলক। এই হৃদয়ই অনুভব বুদ্ধিজ জ্ঞান থেকে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাই কেবল নয়, বুদ্ধিবিরোধী ও বুদ্ধিনিরোধকারীও সমভাবে। বুদ্ধিশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'লেও হৃদয় ঈশ্বরালোকে আলোকিত হয়ে তাঁকে সাক্ষাৎ অনুভব করে। ইহা "মরমিয়াবাদ"।

উপার লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'বে যে, বেদান্তের সঙ্গে সূফীমতের সাধারণ ভাবে অনেকাংশে সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু যদি কোনো বিশেষ বেদান্তসম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনো বিশেষ সূফীসম্প্রদায়ের তুলনা করা যায়, তা হ'লে সর্বাঙ্গীণ সৌসাদৃশ্য

আবিষ্কার করা অসম্ভব, উপরন্তু বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট দৃষ্টি গোচর হয়। যথা সাবিস্তরি শঙ্করের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব প্রচার করলেও, তাঁদের পরস্পর প্রভেদ মূলগত। রুমী ও হাল্লাজ রামানুজ নিম্বার্কের ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হলেও তাঁদের মধ্যে বহু প্রভেদও বিদ্যমান। কালাবাধী ও হুজিয়িরি মধ্বের ন্যায় দ্বৈতবাদী হ'লে অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নমত। ইবন্ আরবী প্রমুখ বিশ্বাত্মবাদীরা বল্লভের ন্যায় জগতের সত্যত্বে বিশ্বাস হ'লেও ঈশ্বরের জগদ্বহির্ভূতত্বে বিশ্বাসী নহেন। পরিশেষে, সুফী মরমিয়াবাদ বহুলাংশে বৈষ্ণব মরমিয়াবাদের সমতুল হ'লেও অধিকাংশ সুফী মরমীগণ দর্শনের দিক্ থেকে অদ্বৈতবাদী ও বিশ্বাত্মবাদী; কিন্তু বৈষ্ণব মরমীগণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ও ঈশ্বরাধিকত্ববাদী। অতএব, বেদান্তমতবিশেষের সঙ্গে সুফী মতবিশেষের সর্বাংশে সাদৃশ্য স্থাপনের চেষ্টা বৃথা, কেবল সাধারণ সাদৃশ্যেই আমাদের সন্তুষ্ট থাক্‌তে হ'বে। সাধারণ ধারণা এই যে সুফীমত সর্বাংশেই অদ্বৈতবেদান্তমতানুরূপ। এই ধারণাও ভ্রমমাত্র।

বস্তুতঃ, সুফীমতবাদে বিভিন্ন বেদান্তসম্প্রদায়, বৌদ্ধমত এবং যোগদর্শন বিভিন্ন তত্ত্বাবলীর সমাবেশ দৃষ্ট হয়। দর্শনের দিক্ থেকে সুফীরা সাধারণতঃ অদ্বৈতবৈদান্তিকদের ন্যায় ঈশ্বরের একত্ব ও জীবেশ্বরের অভিন্নত্ব স্বীকার করেন। তৎসত্ত্বেও ধর্মের দিক্ থেকে সুফীরা বৈষ্ণব বৈদান্তিকদের ন্যায় জীবেশ্বরের ভিন্নত্ব ও উপাসক-উপাস্য সম্বন্ধেরই প্রপঞ্চনা করেন। পুনরায় তৎসত্ত্বেও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দিক্ থেকে সুফীরা বৈষ্ণব মরমিয়াবাদীদের ন্যায় ভাবারূঢ় অবস্থায় জীবেশ্বরের উন্মাদনবন, জ্ঞানমূলক নয়, একত্ব স্বীকার করেন। ইবনুল আরবী, সাবিস্তরি, জামী প্রমুখ সুফীগণ ক্ষণবাদী বৌদ্ধগণের ন্যায় জগতের ক্ষণিকত্বও প্রপঞ্চনা করেছেন। যোগদর্শনের প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান প্রভৃতি প্রক্রিয়াও সুফীরা সাধারণভাবে গ্রহণ করেছেন, অবশ্য পদ্ধতি বিশেষে তাঁদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যও বহু আছে।

জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে সুফী সাধকের দান অল্প নয়। দর্শনের দিক্ থেকে ঈশ্বরের একত্ব, জগতের ঈশ্বরময়ত্ব ও প্রত্যেক মানবের ঈশ্বরস্বরূপত্ব, ধর্মের দিক থেকে ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে সুমধুর প্রেম ও প্রীতির বন্ধন; নীতির দিক্ থেকে অর্থশূন্য বাহ্যাড়ম্বর ও আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তর পবিত্রতা ও অকপটতার উপর গুরুত্ব আরোপ উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা বিশ্বপ্রেম ও অহিংসাই সুফী মতবাদের মর্মোত্থ বাণী। এরূপে দর্শন, ধর্ম ও নীতি সকল দিক্ থেকেই সুফী সাধকেরা চরম শীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে মতভেদ থাক্‌লেও, সাধারণভাবে এই তিন দিক্ থেকেই সুফী মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় মতবাদের পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান; এবং মহাপ্রাণ সুফী ভক্তগণের মহতী ও কালবিজয়িনী বাণী ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিদেরই সাম্য মৈত্রী ও অহিংসার উদাত্ত ও পূত বাণী মাত্র।

অসীমের ন্যায়শাস্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

নিউটন স্থূল পদার্থের গতিবিধি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। ইউক্লিড স্থূল পদার্থ যে ক্ষেত্রের উপর বিচরণ করে তার বিবিধ পরিমাণ সম্বন্ধে বিধান দিয়েছেন। গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততল আবার মনের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্র বিধিবদ্ধ করেছিলেন। এই যে তিন রাজ্যের বিধি-বিধান তা এক রকম অকাট্য সনাতন অব্যভিচারী বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। এরা সব দিয়েছে গোড়াকার তত্ত্ব, ভিত্তির ছক--- এদের এড়িয়ে বা এদের বিরোধী কোন জ্ঞান বা সত্য থাকতে পারে না। এদের মেনে নিয়ে তবে, এদের মেনে নিয়েছে বলেই মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সৌধ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, মানুষের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা সত্যসন্ধ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কিছুদিন যাবৎ সন্দেহের অবকাশ হয়েছে, শুধু সন্দেহ নয় বিপরীত ও বিরোধী সত্য বিধি-বিধান মেনে নিতে হচ্ছে, পুরাতনকে সর্ব্বতোভাবে না হোক অনেকখানি নাকচ করে, অন্ততঃ অনেকখানি কোণঠেসা করে।

নিউটন যে বলেছিলেন প্রত্যেক জিনিষের আছে নির্দ্দিষ্ট ভর বা পদার্থ-পরিমাণ (mass) এবং জিনিষের গতিবেগ থেকে তার স্থান এবং স্থান থেকে গতিবেগ হুবহু গুণে বের করা যায় —এ সূত্রকে আর অচল অব্যয় সত্য বলে মানা চলছে না। এ-সত্য সত্য মোটা-মোটা স্থূল খণ্ড সম্বন্ধে আর তাদের অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগ সম্বন্ধে। কিন্তু খণ্ড যখন বিদ্যুৎ-কণা আর গতিবেগ যখন আলোক-রশ্মির বেগের মত কিছু, তখন নিউটনের সূত্র আর খাটে না। অন্য কথায় সান্তের সীমার মধ্যে যে নিয়ম সত্য, অনন্তের অসীমের মধ্যে তা আর সত্য নয়। অতিক্ষুদ্র আর অতিবৃহৎ অনন্তের অসীমেরই অঙ্গ। নিউটন যে প্রত্যেক অণু বা পদার্থখণ্ডের যথা নির্দ্দিষ্ট ভর আছে বলেছিলেন, কার্য্যতঃ দেখা গেল যে এক স্থানে অবস্থান সে-রকম নির্দ্দিষ্টতা কিছু নেই। জিনিষের গতির সঙ্গে জিনিষের ভর বেড়ে যায়—তা নজরে পড়ে না সচরাচর জিনিষ যখন মোটা ও গতি তার মন্দ; কিন্তু গতি যখন হয় আলোর বেগ তখন ভর হয় বহুগুণিত—আর এমন গতিবেগ যদি কল্পনা করা যায় যার মাত্রা অসীম, তবে সে গতিবেগে চলে যে অণু তার ভরও হবে অসীম। বিদ্যুতের বা আলোর কণা ("ইলেকট্রন" ও "ফোটন") পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর—সে-পরিমাণের তুলনায় তাদের ভর অত্যধিক বেশী। তারপর নিউটনে স্থান (কাল) ও গতিবেগের যে নির্ণীত অন্যোন্য-সম্বন্ধ, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় সে নির্ণয় অসম্ভব। স্থান ঠিক হিসাব করলে, গতির ঠিক হিসাব হয় না—গতির মাত্রা স্পষ্ট হলে স্থান হয়ে যায় ঝাপসা। সেখানকার স্থান ও গতির জ্ঞান বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কোন একটি ব্যষ্টির নয়, তা হল বহু ব্যষ্টির সম্মিলিত একটা গড়পড়তা স্থানের ও কালের হিসাব।

তারপর ক্ষেত্রের-- জ্যামিতিক আয়তনের কথা। জিনিষ সব দাঁড়িয়ে আছে, চলাফেরা করে একটা অবকাশের মধ্যে। এই অবকাশ,

আয়তন বা ক্ষেত্র হল সমতল। জিনিষ যেথানে যে-ভাবে থাকুক বা চলুক, এই স্থিতি গতি তার ঘটে সর্ব্বদা সমতলেরই উপর। অবশ্য বিভিন্ন সমতল আছে, সমতল আড়া-আড়ি পাশা-পাশি থাকতে পারে। এই সমতলের ধর্ম্মই নিয়ন্ত্রিত করে সমতলের উপরে জিনিষের স্থিতি ও গতিধর্ম্ম। ইউক্লিড দিয়েছেন এই সমতলের মূল গুণ বা ধর্ম্ম—জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিপাদ্য ইত্যাদি হল সেই গুণাবলীর সূত্র সব। এই ইউক্লিডের উপর প্রতিষ্ঠিত নিউটন। ইউক্লিডের একটা সূত্র হল এই যে ত্রিভুজের তিনটি কোণ মিলে দেয় দুই সমকোণের পরিমাণ অর্থাৎ ১৮০ অংশ (ডিগ্রী)। কিন্তু কথা উঠল জিনিষ যে সমতল ধরেই আছে বা চলে তার নিশ্চয়তা কি? স্পষ্টই চোখে দেখি গোলক (sphere) বলে একটা বস্তু আছে এবং তা সমতল নয়, বক্রতল। ফলতঃ বক্রতলকে কেটে কেটে হ্রস্ব করে দেখি বলেই তাকে মনে হয় সমতল। আসলে জিনিষ বক্রতলেই আছে ও চলে—ইউক্লিড দিয়েছিলেন একটা মন-গড়া তথ্যের কথা যদিও ক্ষুদ্রতর পরিমাপে তার উপযোগিতা আছে, যেমন নিউটনের সূত্রাবলীর আছে। আর এই বক্রতলের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ অন্য রকমের, কারণ এথানে ত্রিভুজের তিনটি কোণে মিলে ১৮০ ডিগ্রী দেয় না। আরও, বক্রতল পৃথিবীর উপরকার দ্রাঘিমাগুলিকে সমান্তরাল মেনে নিতে হয় কারণ পর-পর প্রত্যেকটি তারা অক্ষরেখার সঙ্গে ৯০° করে দাঁড়িয়ে—অথচ তারা সকলে মিলেছে দুই মেরুতে। আগে আমরা জানতাম আলোরশ্মি চলে সমতলে ঋজু রেখায় কিন্তু এখন নব্য বিজ্ঞানে বলে তা নয়, আলো সোজা চলে বটে কিন্তু বিষমতলের বাঁক অনুসরণ করে—কারণ সমস্ত অবকাশই হল সম নয়, বিষম বা বঙ্কিম।

অন্য কথায়, আমাদের মোটা দৃষ্টি জিনিষকে অনুভবগম্য সীমার মধ্যে ধরে রেখে তবে তার পরিচয় গ্রহণ করে—নিউটন ও ইউক্লিড তাই আমাদের দৈনন্দিনের শাস্ত্র। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সীমার সীমানা দূরে সরে যায়, তখনই এসেছে অন্য ধরণের শাস্ত্র—অসীমার শাস্ত্র। সীমার বিধান অনুসারে যা ঘটে না, ঘটতে পারে না, অসীমার মধ্যে ঠিক তাই ঘটে, এমন কি তা ছাড়া অন্য-কিছু ঘটে না। বুদ্ধি-জগতে অসীমের অঙ্ক-শাস্ত্র তাই এত আশ্চর্য্যজনক, এত বিভ্রান্তিকর। আজকালকার অঙ্কশাস্ত্রে অসীমের সমস্যা একটা অতি প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। কয়েকটি সহজ ও সাধারণ উদাহরণ ধরা যাক। আমরা জানি কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে ফল হয় শূন্য; কিন্তু অসীমকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে কি হয়? অঙ্কশাস্ত্র বলছে ফল হতে পারে এমন কি "এক" (সংখ্যা)। কিংবা শূন্যকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে (শূন্য অর্থ অসীম ক্ষুদ্র) ফল হয় ঐ একই। আরও, ধরা যাক একটা সরল রেখা—সরল রেখা অর্থ অসংখ্য বা অসীম-সংখ্যক বিন্দুর সমষ্টি, সেই সরল রেখারই খানিকটা একটা অংশ যদি গ্রহণ করা যায়, তবে সেই অংশের মধ্যেও রয়েছে সেই একই অসংখ্য বিন্দু—তা হলে এদিক দিয়ে অংশ আর সমগ্র হল সমান। আরও একটি উদাহরণ। পূর্ণ সংখ্যা, এক হতে বরাবর অসীম পর্য্যন্ত চলেছে—আবার, তার সঙ্গে সঙ্গে গুণে চলি যদি কেবল যুগ্ম বা অযুগ্ম সংখ্যা কিংবা মৌলিক সংখ্যা তাদেরও প্রত্যেকটি শ্রেণী সমানে চলবে অসীম পর্য্যন্ত, তাহলে সংখ্যায় এ সব শ্রেণীই সমান দাঁড়ায়! এখানেও দেখি অংশ সমগ্রের সমান।

মনের, চিন্তার জগতে যদি উঠে দাঁড়াই সেখানেও পাই অনুরূপ কথা। আরিস্ততল যে

ন্যায়ের অঙ্গ কটি বেঁধে দিয়েছিলেন তা হল সসীম বুদ্ধির তথ্য—ইন্দ্রিয়-পরিচিতির উপর যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তা ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে পারে না সে তথ্য। আরিস্ততলের প্রথম সূত্র হল, একটা জিনিষ একই স্থানে কালে সেই জিনিষই থাকে (ক=ক, A is A), দ্বিতীয় সূত্র হল একটা জিনিষ অন্য জিনিস নিজের বিপরীত হতে পারে না (ক নয় না-ক, A is not not A), তৃতীয় সূত্র হল একটা জিনিষ যুগপৎ সেই জিনিষ এবং অন্য জিনিষ হতে পারে না (ক হয় ক, নয় না-ক)। এ সবই সত্য সীমা ও সীমানার ক্ষেত্র—মনের তর্কবুদ্ধির ক্ষেত্রে। কারণ মনের ধর্মই এই যে এক সময়ে দুটি জিনিষ এক সঙ্গে ধারণ করতে পারে না। সান্ত বুদ্ধি জিনিসকে গ্রহণ করে একটি একটি করে পৃথক ভাবে কালের পারম্পর্য্যে অথবা দেশের স্থানভেদে। বহুর সামগ্র্যকে যুগপৎ গ্রহণ তার সামর্থ্যবহির্ভূত। কিন্তু অসীম ও অনন্ত সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। অনন্ত যা তা অন্ত ও সান্ত যুগপৎ, অসীম যা তা অসীম ও সসীম যুগপৎ। ভগবান সাকার ও নিরাকার, ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ যুগপৎ (নির্গুণো গুণী), তৎ হল সৎ ও অসৎ যুগপৎ। বৈদিক ঋষি এমন বস্তু বা অবস্থার কথা বলছেন।

ন সদাসীৎ নাসদাসীত্তদা।

"আছে" ছিল না আবার "নাই"ও ছিল না সেখানে,—মৃত্যুও ছিল না, অমৃতত্বও নয়

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি।

উপনিষদের বস্তুও এমন যাতে বিপরীত ধর্ম্ম সন্নিবিষ্ট যুগবৎ

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তা চলে আবার তা চলেও না, তা দূরে তাই আবার কাছে।

এখানে জ্ঞানের বিধিবিধান বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। তাইত এমন জিনিষকে যদি বল তুমি জান, তবে তুমি কিছুই জান না, আর যদি বল জান না, তবে হয়ত সবই জান—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

অনন্তের অসীমের ধর্ম্মই এই—তা যেন দ্বন্দ্ব সমাস অর্থাৎ সকল বিরোধ বৈপরীত্য সমানে সে ধরে আছে; তা যদি না হত তবে অনন্ত অসীম সে কখন হত না, হত সান্ত সসীম।

দর্শনে-দর্শনে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধের হেতু ঠিক এইখানে। আমাদের সসীম মনবুদ্ধি একটি উপলব্ধিকে একটি সিদ্ধান্তকে সত্য বলে গ্রহণ করলে, অন্যবিধ বিরোধী বা বিপরীত উপলব্ধিকে সিদ্ধান্তকে সত্য বলে স্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনবুদ্ধির কল্পনা এই রকম একদেশ-দর্শী—"হয় নয়" ছাড়া সে চলতে পারে না। কিন্তু অনন্ত অনন্ত কারণ তা হল যুগপৎ এক ও বহু, খণ্ড এবং সমগ্র। অনন্তের এই অনুরূপ আম্রাক্ষিকীই বলতে পারে -

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

পূর্ণ থেকে পূর্ণ যদি তুলে নাও তবে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

সত্যের পথ

এস ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেন্টাব), বার-এট-ল

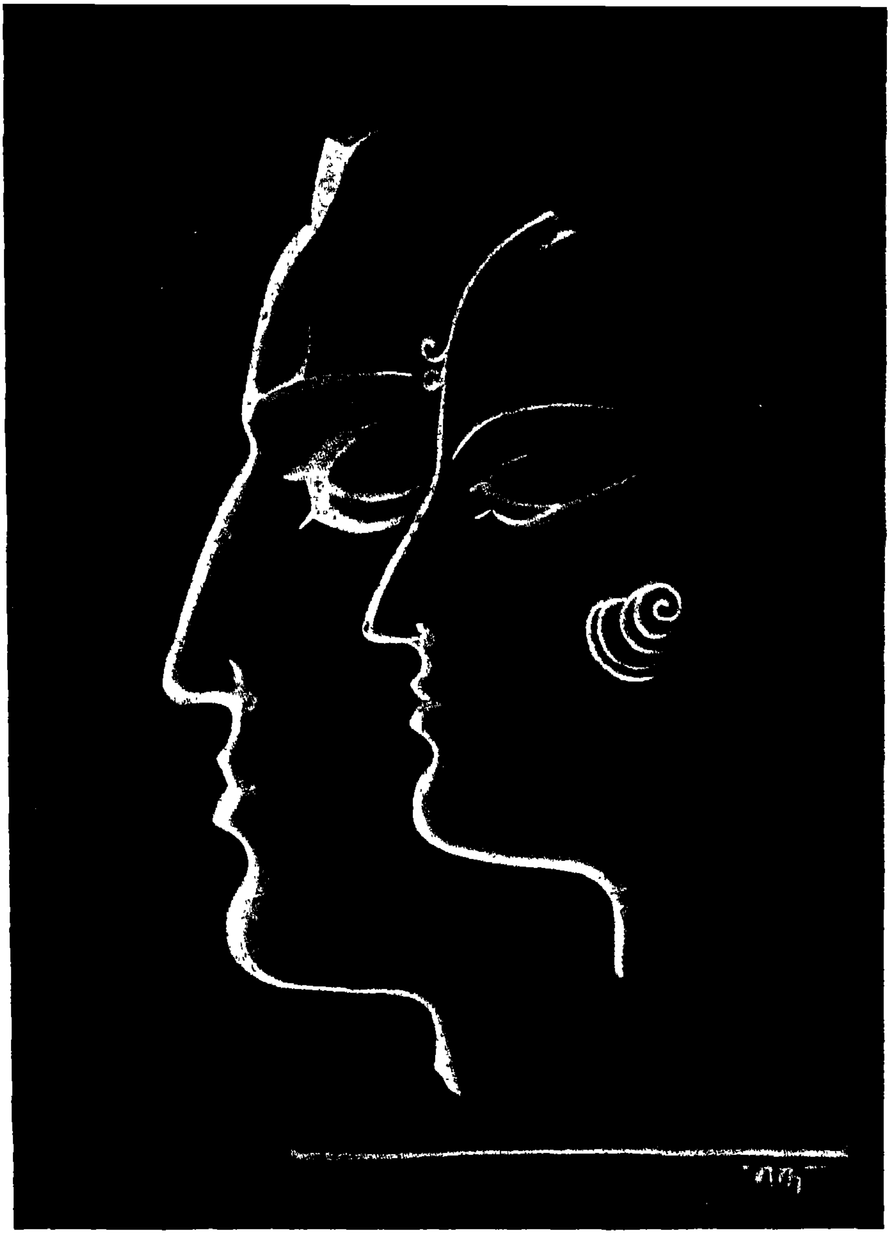
বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বিশ্বমানবতা নিয়ে যদিও আমরা অনবরত কথা বলে যাচ্ছি, বিদেশে কে কোথায় গণস্বার্থের বিরুদ্ধে, বিশ্ব-শান্তির বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের তীব্র সমালোচনায় নিজেদের উত্তেজিত করে তুলছি, কিন্তু আমাদের এই নিজের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কি করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারা যায়, দেশের সর্ব্ব প্রতিষ্ঠানকে সাধারণ মানুষের, সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের মঙ্গলের সাধনায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা যায়, তার আলোচনায় যথোচিত কৃতিত্ব আমরা দেখাতে পারছি না। মহাত্মা গান্ধী অবশ্য শান্তির বাণী অবিরাম প্রচার করে যাচ্ছেন এবং দেশের লোককে শান্তি এবং মৈত্রীর পথে ফিরে আসবার আহ্বান নিত্যই জানাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর কথা আপাততঃ অরণ্যরোদনেই পর্য্যবসিত হচ্ছে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দেশে যতদিন না ঐক্য এবং মৈত্রীর আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন আমাদের মঙ্গল নেই। এই ঐক্য এবং মৈত্রী না এলে আমাদের স্বাধীনতা থেকে মঙ্গল আসবে না, পক্ষান্তরে সে স্বাধীনতা অশেষ দুঃখেরই কারণ হবে। কি উপায়ে এই একান্ত প্রয়োজনীয় ঐক্য এবং মৈত্রী ফিরিয়ে আনতে পারা যেতে পারে তাই নিয়েই এখানে দু-এক কথা বলা যাক।

আমাদের দেশে বহু ধর্ম্মমত আবহমান কাল থেকে চলে আসছে, আর ধর্ম্মমতের এই বহুত্বই হল ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। ভারতের দুইজন শ্রেষ্ঠ নরপতি অশোক এবং আকবর ধর্ম্মমতের এই বহুত্ব মেনে নিয়েছিলেন, আর এরই উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের অতুলনীয় সৌধ গড়ে তুলেছিলেন। বহু শতাব্দী পরে আবার আমাদের তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। পরমতের প্রতি তাঁদেরই মত সহিষ্ণুতা, ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি তাঁদেরই মত উদারতা দেখাতে হবে।

রামকৃষ্ণদেব মানুষের সেবাকে, নর-নারায়ণের সেবাকে, জীবনের প্রধান আদর্শরূপে প্রচার করেছেন। তার সেই মহান আদর্শকে অকপট মনে গ্রহণ করতে হবে, আর মানুষের মঙ্গলের কাজে, তা সে মানুষ যে ধর্ম্মাবলম্বীই হোক না কেন, একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব ধর্ম্মের এবং সর্ব্ব জাতির উর্দ্ধে আছেন ভগবান, সে কথা একান্ত ভাবে স্বীকার করতে হবে, আর অশেষ যত্ন এবং নম্রতার সঙ্গে আমাদের অন্তরের মধ্যে তাঁর ইঙ্গিত, তাঁর নির্দ্দেশ খুঁজে বের করতে হবে, এবং অবিচলিত পদে সেই নির্দ্দেশ মেনে চলতে হবে। যখন কোন দেশ, কিংবা জাতি ক্ষমতার গর্ব্বে, স্বার্থের মোহে ভগবানকে ভুলে, অহমিকাকে পথ-বর্ত্তিকারূপে গ্রহণ করেছে, তখনই তাদের পতন ঘটেছে। ইতিহাসের এই চূড়ান্ত শিক্ষা সর্ব্বদা মনে রেখে ভগবানের পথে অর্থাৎ ন্যায় এবং সত্যের পথে আমাদের চলতে হবে।

দুঃখী জনের স্বার্থকে, নরনারায়ণের সেবাকে আমাদের সব কাজের, সব সাধনার মাপ-কাঠি করতে হবে। রাষ্ট্র এখন আমাদের হাতে, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভার এখন আমাদের উপর; আমাদের এখন বিচার করে দেখতে হবে, যা



শিব-উমা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক কৃষ্ণবর্ণ মর্মর প্রস্তরে অঙ্কিত ও শ্রীযুক্ত মঙ্গল ভাস্কর কর্তৃক খোদিত

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৪৪

ব্লক ও মুদ্রণ
বেঙ্গল অটোটাইপ কো

আমরা করছি, যা করতে দেশবাসীদের আমরা বলছি, তা থেকে দুঃখী জনের মঙ্গল হবে কিনা? যদি তা থেকে দুঃখী জনের মঙ্গল হবার প্রকৃত সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সে কাজে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে; আর তা যদি না হয়, তা হলে সে কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

শরীরকে সুস্থ এবং সবল করে তোলবার উপদেশ এখন অনেকেই দিয়ে থাকেন। আমার মনে হয়, মনকে, আত্মাকে সুস্থ এবং সবল করে তোলবার প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী। মনের বিকার থেকেই এসেছে আজ মানুষের এই দুর্দশা। এর প্রকৃত ঔষধ হচ্ছে মনের স্বাস্থ্য। মনের স্বাস্থ্যের মানে কি?

হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে গণ্ডীগত সংকীর্ণতা থেকে মনকে মুক্ত করা, ভূমার উদার বাতাসে মনকে প্রফুল্ল করা, চিরন্তন সত্যের সঙ্গে আত্মার নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা, দেহের ক্লেদ এবং আবিলতার ভিতর যে দেবতা প্রচ্ছন্ন আছেন তাঁকে দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে চেনা, আর তাঁর সেবায় তৎপর হওয়া। এই সবই হচ্ছে সুস্থ মনের পরিচায়ক। এই স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে আর একে ভগবানের সেবায়, মানুষের সেবায় নিয়োগ করতে হবে।

মানুষ এখন একটু বেশী করে মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, আর এযুগের রাজনীতি, অর্থ-নীতি, বিজ্ঞান—এমন কি দর্শন পর্য্যন্ত এ মোহকে আরও গভীর করে তুলছে। ভুলে যাওয়া ধর্ম্ম-নীতিকে আবার ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন আমি বিশেষ ভাবে অনুভব করছি।

পাঠক বলবেন, 'ওসব কথা এখন শুনবে কে?

আমার মনে হয়, কেউ না কেউ শুনবেই, আর এখানে কেউ যদি না শুনে তাতেই বা কি আসে যায়? আমার দায়িত্ব তো কেবল সাধারণ মানুষের প্রতি নয়? আমার দায়িত্ব যে ভগবানের প্রতি, আমার দায়িত্ব যে ভূমার প্রতি, আমার দায়িত্ব যে চিরন্তন সত্যের প্রতি। সে স্থানে আমার কথা নিশ্চয় পৌঁছে যাবে।

শিব-রুদ্র

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

তুমি শুধু মৃত্যু নহ, মৃত্যুঞ্জয় তুমি মহাকাল,
তুমি শুধু রুদ্র নহ শিব তুমি বিশ্ব-লোকপাল।
নহ শুধু ফণিধর চন্দ্রলেখা শোভে ভাল 'পরে'
নয়নে কৃশানু বটে জটাজালে হিমগঙ্গা ঝরে।
অট্ট অট্ট হাস্য বটে হাস্য তব কুন্দেন্দু-সুন্দর,
কণ্ঠে তুমি ধর বিষ বাণী তবু অমৃত-নির্ঝর।
শ্মশানে সংসার তব ইন্দ্র তবু পদ সেবা করে,
চিরনিঃস্ব দীন তুমি অন্নপূর্ণা পত্নী তব ঘরে।
হে স্মরারি ত্রিপুরারি ক্ষিপ্তোদ্ধত দীপ্ত তব রোষ,
তবু তুমি ভোলানাথ দয়াময় চির আশুতোষ।

হে সংহার, মহাকাল, রুদ্র তোমা নাহি আর ডরি,
রূঢ় বাহ্য আবরণে মঙ্গলের সূত্র আছো ধরি।
ত্রিশূলে দুরিছ তুমি বিশ্ব হতে ত্রিতাপ অশুভে,
নিত্যেরে অমৃত করি বিষ তব দহিছে অধ্রুবে।
অট্টহাস্য ঊর্ম্মি ক্ষোভে শঙ্কা তুমি জাগাবে কতই!
মাভৈঃ সান্ত্বনা তব নাচে তায় তাথৈ তাথৈ।

তোমার চণ্ডিমা মাঝে বাৎসল্যের চন্দ্রমা যে ভায়
খদ্যোত-জীবন মম নিভে জলে ভয়ে ভরসায়।

লালসার লোল বক্ষে নিত্য তব প্রচণ্ড তাণ্ডব,
তোমার চিতাগ্নি-তৃষ্ণা তৃপ্ত করে দেহের খাণ্ডব।
তোমার পিনাক হতে নিত্য ছুটে বজ্র অভিশাপ,
বাষ্প হয় ভস্ম হয় বিশ্বগ্রাসী, বিশ্বত্রাসী পাপ।
কে বলে তোমার ধর্ম্ম ধ্বংস মাত্র, বুঝে সেত স্থূল
হুঙ্কৃত শাসন-বজ্র প্রতিকূলে কর অনুকূল।
তব শূল-বশীভূত সে যে হয় সৃষ্টির সহায়,
মোরা তারে ধ্বংস ভাবি মূঢ় কণ্ঠে করি হায় হায়।

শক্তি লভে রূপান্তর তব তেজে, সৃষ্টির বাধক
তোমার মঙ্গল ব্রতে হয় তব উত্তর-সাধক।
হে শঙ্কর, ত্রাণ তুমি, মুক্তি তুমি এসংহার লোকে,
ত্রিপুরের দ্রোহ হ'তে রাখ নিত্য আত্মার দ্যুলোকে
বাসনা-পিশাচী নিত্য পীড়িতেছে তোমার সন্তানে,
ক্ষিপ্র করে তাই রুদ্র আকর্ষিছ তারে বক্ষপানে।

কোন্ পথে ?

স্বামী পবিত্রানন্দ

এক সমরানল নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই অন্য এক সমরের অস্ফুট ধ্বনি শোনা যাইতেছে। বিভিন্ন দেশ আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিগত যুদ্ধের প্রসিদ্ধ সামরিক নেতা জেনারেল আইসেনহাওয়ার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় আইন করিয়া আমেরিকার সমস্ত যুবকমণ্ডলীকে সমরবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বাধ্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে অদূর ভবিষ্যতে আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। তাহাতে আমেরিকা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন হইলেও যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই বিপদের জন্য প্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কেহ কেহ বলেন, আগামী আট দশ বৎসরের মধ্যে নূতন যুদ্ধ বাধিবে। অন্যান্য লোকে বলেন, তাহার পূর্ব্বেও যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত, যে কোন মুহূর্ত্তে নূতন যুদ্ধের ঘোষণা হইতে পারে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশও জাতির মধ্যে বিদ্বেষাগ্নি এখন এত প্রবল এবং ইহা ক্রমেই এত বর্দ্ধিত হইতেছে যে, যে কোন সময়ে ইহা দাবানলে পরিণত হইতে পারে।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এই কথাই বা বলা যায় কি? আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ হইতেছে না বটে, যুদ্ধের নব নব পরিস্থিতির উত্তেজনা-প্রদ সংবাদে দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতেছে না বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপের বিষয় যদি চিন্তা করা যায়, পূর্ব্ব-এশিয়ার ঘটনাবলী যদি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা যায়, তবে পরিষ্কার মনে হয়, এই পরিস্থিতি যেন যুদ্ধেরই আর এক রূপ। প্রকাশ্য যুদ্ধ নয় বলিয়া ইহা অধিকতর ভীষণ।

যে জার্ম্মেণী কিছুদিন পূর্ব্বেও অতি প্রবল শক্তিশালী ছিল, তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে—সমগ্র জার্ম্মেণী এখন একটি যুদ্ধবন্দীর বিরাট কারাগারে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে জাপান জাতির মেরুদণ্ড এরূপভাবে ভাঙ্গিয়া দিবার আয়োজন ও ষড়যন্ত্র চলিতেছে যাহাতে আগামী এক শত বৎসরের মধ্যেও ইহা মস্তক উত্তোলন না করিতে পারে। বিগত যুদ্ধে জার্ম্মেণী ও জাপান বহু অন্যায় কার্য্য করিয়াছে এই কথা কেহই অস্বীকার করিবে না।—(যুক্তশক্তিই কি নির্দ্দোষ ছিল?) —কিন্তু তাহা বলিয়া সমগ্র দেশ ও জাতির স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা এবং সংস্কৃতিকে চাপিয়া রাখা কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহার ভবিষ্যৎ ফলও ভাল হইবে আশা করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান আর নাই বলিলেই হয়। তাহাতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমশঃই একীভূত হইতেছে। সুতরাং একটি দেশ বা জাতিকে বেশী দিন দাবাইয়া রাখা আর সম্ভবপর নহে। নির্য্যাতিত জাতি যখন সুযোগ লাভ করিবে এবং নূতন বলের সন্ধান পাইবে, তখন তাহা দুর্দ্দমনীয় তেজে প্রতিহিংসা লইতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ চিন্তা করা অপ্রীতিকর হইলেও ইহা অবিসংবাদিত সত্য। ইহা প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম—এক দিন যে প্রপীড়িত, নির্য্যাতিত, সেই এক দিন প্রবল শক্তিশালী হইয়া প্রতিশোধ লইবার সুবিধা

ও সুযোগ লাভ করিবে। বিশেষতঃ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে কোন্ জাতি কোন্ সময়ে কোন জাতির শত্রু হয়, কোন্ দেশ কোন দেশের মিত্র হয়, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

বিগত যুদ্ধের পরাজিত দেশগুলিকে শক্তিহীন করিয়া রাখিবার জন্য বিজেতা দেশসমূহকেও কতই না শক্তি ক্ষয় করিতে হইতেছে। এই শক্তি ও অর্থ অন্য অনেক সৎকার্য্যে ও সদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতে পারিত। পরাজিত দেশগুলির বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া যে কোন লোক নিরপেক্ষভাবে যদি চিন্তা করেন, তবে তিনি তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়, অনেক সময় মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের অহমিকা, হঠকারিতা বা দুরভিসন্ধির জন্য, কিন্তু তাহার ফল ভোগ করিতে হয় সমস্ত দেশকে—যুদ্ধের অবস্থায় এবং যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী সম্প্রতি বলিয়াছেন, জার্ম্মেণীর সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা প্রায় ১৯৪৩ সালে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের অবস্থা হইতেও শোচনীয়। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু জার্ম্মেণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার সব সংবাদ বাহিরে প্রকাশিত হইতে পারে না। ইতালীর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ।

যাহারা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে, তাহারাও অনেক দুর্ব্বল গিয়াছে। ইংলণ্ডে খাদ্যকষ্ট, বস্ত্র-সঙ্কট, অর্থনৈতিক সমস্যা দেশের নেতৃবৃন্দকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। আমেরিকাতেও এখন প্রাক্-যুদ্ধের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই।

এই সব কারণে যুদ্ধের নামে সর্ব্বত্রই জনসাধারণ আতঙ্কিত হইয়া উঠে। কিন্তু সাধারণ লোক ত আর স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করে না? তাহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের নামে মিথ্যা প্রচার দ্বারা অন্য দেশ ও জাতির প্রতি যে বিদ্বেষ-ভাবের সৃষ্টি করা হয়, জনসাধারণ তাহার কবলে পতিত হইয়া যুদ্ধে সম্মতি প্রদান করে। বিগত যুদ্ধের সময় বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষাগ্নির সৃষ্টি হইয়াছিল, সমস্ত ইউরোপকে অৰ্দ্ধেক ধ্বংস করিয়াও তাহা নিঃশেষিত হয় নাই—ইন্ধন পাইলেই তাহা পুনরায় দ্বিগুণবেগে প্রজ্বলিত হইবে। তাহার জন্য ইন্ধনও দিন দিন সঞ্চিত হইতেছে।

যাঁহারা শুধু নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন না, পরন্তু সমস্ত দেশের জন্য, সমস্ত মানবজাতির জন্য ভাবেন, এরূপ লোক পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতি দর্শন করিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তবে কি সভ্যতার ধ্বংস নিকটবর্ত্তী? সমস্ত মানবজাতি কি পশুত্বের স্তরে নামিয়া পরস্পরের বিনাশের কারণ হইবে? ইহার প্রকৃত জবাব কেহই দিতে পারিতেছেন না।

অনেকের অভিমত আগামী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বেশী দিন তাহা স্থায়ী হইবে না—অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সংহারের প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহা সমাপ্ত হইবে। ধ্বংস করিবার আর কিছু থাকিবে না বলিয়াই যুদ্ধ শেষ হইবে। আগামী যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হইবে, আণবিক বোমা। এই বোমা সম্বন্ধে অবিশ্রান্ত গবেষণা চলিয়াছে, সুতরাং আশা করা যায়, ইহার প্রচণ্ডতা আরও প্রবল হইবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বেশী দিন লুক্কায়িত রাখা সম্ভবপর নহে; প্রত্যেক দেশের বৈজ্ঞানিকই উপযুক্ত সাহায্য পাইলে নূতন নূতন প্রণালীর আণবিক বোমা বাহির করিবে। আর সে সাহায্যের অভাবও হইবে না। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দুই পক্ষই সমান বেগে আণবিক বোমা প্রয়োগ করিবে। তাহাতে যুদ্ধ বেশী দিন চলিতেই পারে না। যতদিন নূতন নূতন মারণাস্ত্র

আবিষ্কার করিবার এরূপ তীব্র প্রতিযোগিতা চলিবে, ততদিন বলিতে হইবে, মানবজাতি ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে চলিয়াছে।

কিন্তু এই ধ্বংসের গতিরোধ করিবার কি কোন উপায় নাই? মানবজাতি কি সত্যই এত অসহায়? মানববুদ্ধির মধ্যে যেমন ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে, সৃজনী শক্তিও ইহার মধ্যে তেমন বিদ্যমান। এক এক সময়ে এক এক শক্তির বিকাশ হয় মাত্র। সুতরাং মানুষ কেবল পশুবৃত্তি বৃদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিবে, অন্য কোন উচ্চ ভাবের অভিব্যক্তি তাহার মধ্যে হইবে না, এরূপ হইতে পারে না! ইহা ঠিক যে বর্ত্তমান সময়ে আসুরিক ভাবেরই ক্রীড়া পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে অন্য কোন উচ্চ আদর্শ নাই—তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই না কি যে যে জাতি কোন দুর্ব্বলতর জাতির উপর অত্যাচার ও অবিচার করিতে অগ্রসর হইয়াছে, সে-জাতির মধ্য হইতেই প্রতিবাদ উত্থিত হয়, দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার কত দূষণীয় ও লজ্জাকর? হইতে পারে, এই প্রতিবাদ ক্ষীণকণ্ঠ—ইহা অন্যায় রাষ্ট্রনীতির কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না; কিন্তু তবু ইহা বলিতে হইবে যে, এই প্রতিবাদ প্রমাণ করে যে মানুষের মধ্যে সভ্যতার বীজ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। আশা করি এই ক্ষীণ রশ্মিই এক দিন আমাদিগকে দিনের আলোর সন্ধান প্রদর্শন করিবে।

যাঁহারা ধর্ম্মচর্চ্চা বা ধর্ম্মানুশীলন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন, "পৃথিবীর এই পরিস্থিতির মূল কারণ—লোকে ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাহারা স্বীকার করে না, ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের ভক্তি বিশ্বাস নাই।" পৃথিবীর বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যেক ধর্ম্মের লোকই এই এক কথা বলিয়া থাকেন। যদি ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হওয়াতেই জগতে সভ্যতার প্রাসাদ চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথম প্রশ্ন এই দাঁড়ায়—ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হইল কেন? ধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণ আস্থাহীন হইল কেন? ধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণ উদাসীন, যেহেতু দৈনন্দিন জীবনে তাহারা ধর্ম্মের কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। যে জিনিষ ক্রেতার কোন উপকারে লাগিতেছে না—অন্ততঃ ক্রেতাগণ তাহা মনে করে না—সেই জিনিষ জোর করিয়া বাজারে চালান সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মের বেলা তাহাই হইতেছে। ধর্ম্মের যে বর্ত্তমান রূপ, তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া অধিকাংশ লোকই স্বীকার করিতে রাজী নহে।

ধর্ম্ম এক কল্পনারাজ্যের সুখ-সুবিধার কথা বলে, কিন্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহার প্রাণের কোন সম্বন্ধ নাই। মানুষ যখন ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক বিষয়ে কঠিন পরীক্ষায় পতিত হয়, তখন ধর্ম্ম তাহাকে কোন রকম সাহায্য প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছে না। সুতরাং ধর্ম্মের প্রতি চিন্তাশীল, দৃঢ়চেতা ও নির্ভীক লোকদের কোন প্রকার আগ্রহ নাই। যাহারা ভীরু, দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক, জীবন-সংগ্রামে সহজেই পরাজয় স্বীকার করে, তাহারাই ধর্ম্মের সহজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজদের দুর্ব্বলতার বৃশ্চিকদংশন হইতে রক্ষা পাইতে চেষ্টা করে।

ধর্ম্মের প্রতি বহু লোকের যে উপরোক্ত এই অভিমত, তাহার জন্য যাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা, প্রধানতঃ তাঁহারাই দায়ী; তাঁহারা ধর্ম্মকে এরূপ শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না, যাহাতে সাধারণ লোক ধর্ম্মের উপকারিতা নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ধর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বারা লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে না—লোক চায় তাহার প্রকৃত ফলাফল প্রত্যক্ষ করিতে। লোকের এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্ম

তৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। অতীতযুগে কোন কোন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, যাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মের আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা এত প্রাচীন যুগের মানুষ যে তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া অনেক লোকই কোনপ্রকার উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মই যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের প্রতিষ্ঠাতার উপদেশ কিংবা আদর্শের কোন ছাপ নাই। ধর্ম্ম-স্থাপয়িতার বিধান ও ধর্ম্মের বর্ত্তমান আকারের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ—এই দুই এর মধ্যে কোন সম্বন্ধ বাহির করা কষ্টসাধ্য। একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, যীশুখৃষ্ট যদি এখন ফিরিয়া আসিতেন, তবে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাকে খৃষ্টসম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রহণ করিতেন কিনা সন্দেহ। বুদ্ধদেব যদি এখন জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন যে তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষার কি পরিণতি হইয়াছে। বেদান্তের উচ্চ উপদেশ এবং হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে কত পার্থক্য! ইসলাম ধর্ম্মের নামে ভারতবর্ষে যে সব শোণিত-পাত ও নৃশংসতা হইতেছে তাহার গভীরতা ভেদ করিয়া ভগবানে একান্ত নির্ভররূপ ইসলাম ধর্ম্মের আসল রূপটি আবিষ্কার করা অনেক লোকের পক্ষেই দুঃসাধ্য হইয়াছে। নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিলে বলিতে হইবে কোন ধর্ম্মই বর্ত্তমান কালে তাহার প্রকৃত শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না। ফলে ধর্ম্মকে বাদ দিয়া অথবা ধর্ম্মের বন্ধন হইতে সমাজ ও দেশকে নির্ম্মুক্ত করিয়া সমাজনেতাগণ দেশ ও সমাজকে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই নীতি অনুসরণ করিয়া তাহারা সফল হইতে পারিবে কিনা—সে প্রশ্ন আলাদা।

বহুলোক সত্যকে অস্বীকার করিলেও সত্য সত্যই থাকিয়া যায়। একজন লোকও যদি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তবে সত্য বিনষ্ট হয় না—তাহা অন্য আর একজনের নিকট প্রত্যক্ষীভূত হইবে এবং তাহার জীবনে কার্য্যকরী হইবে। আমরা ইহা অস্বীকার করিতে পারি না যে জগতে যে-সব মহামানব আদর্শ জীবন যাপন করিয়াছেন, মানবজীবনের উচ্চতম আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন ও কার্য্যপ্রণালীর মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম। তাঁহারা ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন বলিলে কথাটি ঠিক বলা হইল না—তাঁহারা ধর্ম্মকে গঠন করিয়া গিয়াছেন। তাহারা আদর্শ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন; সেই জীবন ও উদাহরণের ইঙ্গিত হইতে তাঁহাদের অনুগামী ভক্তগণ এবং দেশ, সমাজ ও জাতি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—ধর্ম্ম। সেই লোকোত্তর পুরুষগণের আদর্শে যাহারা নিজেদের জীবন গঠন করিতে পারিয়াছে অথবা তাহার জন্য অদম্য চেষ্টা করিতেছে তাহারা ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিতেছে বলা যায়, অন্যান্য লোক বিশেষ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলে অথবা ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক নিয়ম-গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিলেও আসল ধর্ম্ম হইতে তাহারা অনেক দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিবার আন্দোলন করে এবং ধর্ম্ম বিলোপ হইয়া গেল বলিয়া আতঙ্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্ম বলিতে বুঝে একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, অথবা পরকালে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য একপ্রকার "জীবন-বীমা"—অর্থাৎ পারত্রিক জীবনে সুখ ভোগ করিবার আশায় এই জীবনে কিছু সৎ কাজ করা। বলা বাহুল্য, এইরূপ ধর্ম্মপ্রণালী সমাজের

উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠে, ভগবান বা পরমাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগ, ভক্তি ও প্রেমের উপর। কাহার অন্তরে কতটুকু সত্যিকার বিশ্বাস বা ভালবাসার উদয় হইয়াছে, বাহির হইতে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না—কিন্তু ঐ বিশ্বাস বা প্রীতির বহিরভিব্যক্তি হয় সাধকের জীবনে নিঃস্বার্থপরতা, নির্ভীকতা, পবিত্রতার ভিতর দিয়া। একজনের ভগবানের উপর বিশ্বাস আছে, অথচ সৎসাহস নাই, কার্য্যকালে সে স্বার্থপর, দেহ সর্ব্বস্ব, ভীরু কাপুরুষ—ইহা সম্ভবপর নহে। অথচ আমরা কত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, বাহিরে খুব ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেছে, কিন্তু উপরোক্ত দোষগুলি অতি মাত্রায় বিদ্যমান। আবার এমন অনেক লোক আছে, যাহারা গীর্জ্জার প্রার্থনায় যোগদান করে না, পরমাত্মবিষয়ক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করে না, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তাহারা ভয়হীন, পরের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে সদাই প্রস্তুত—নিজের বলিয়া তাহাদের কিছুই নাই, জীবনের সব শক্তি নিয়োগ করিতেছে তাহারা অন্যের মঙ্গলের জন্য। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কাহারা বেশী ধর্ম্মপরায়ণ?

প্রত্যেক সভ্যতার মূলেই থাকে, কোন না কোন উচ্চ আদর্শ। কোন দেশ বা জাতির মধ্যে যতদিন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উচ্চ আদর্শ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সেই দেশ বা জাতি নিশ্চয় বাঁচিয়া থাকিবে। ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে, এত দুঃখ দৈন্য অত্যাচার প্রপীড়নের মধ্যেও ভারতবর্ষ বাঁচিয়া আছে—যেহেতু ভারতবাসী তাহাদের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া যায় নাই। ঐ আদর্শ অনেক সময় ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে, কিন্তু তাহা একদম বিনষ্ট হয় নাই। উচ্চ আদর্শের প্রতি ঐ অনুরাগই ভারতবর্ষের জীবনশক্তি রক্ষা করিয়াছে, যাহার বলে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে এই জাতি অনবরত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ ততদিন আশাপ্রদ যতদিন অন্ততঃ কতিপয় লোকও তাহাদের জীবনকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিবে। চিন্তার শক্তি অপরিসীম—চক্ষুগ্রাহ্য না হইলেও ইহার প্রভাব অমোঘ। একজন নীরবে আদর্শ জীবন যাপন করিলেও তাহার ফলে অনেক লোকের প্রাণে উচ্চ আদর্শের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে এবং যখন ঐ আদর্শ হইতে তাহারা বিচ্যুত হয়, তখন তাহাদের মনে দুঃখ, পরিতাপ ও অনুশোচনা উপস্থিত হয়। এইরূপ লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে কলহ এবং স্বার্থের সংঘাত কমিয়া যাইবে। পৃথিবীর সম্মুখে যে-সমস্যা উপস্থিত, তাহার সমাধান একমাত্র এই ভাবেই হইতে পারে। গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বাহিরে যদি আমি দাঁড়াইতে পারিতাম, তবে ভারশঙ্কু (lever) সাহায্যে সমস্ত পৃথিবীকে আমি একাই অতি সহজে উত্তোলন করিতে পারিতাম।" নৈতিক জগতেও সে কথা প্রযোজ্য। একজন যদি সত্যিকার আদর্শ জীবন যাপন করিতে পারেন, তবে তিনি সমগ্র জাতিকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে পারেন। এইরূপ লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের আশঙ্কাও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

কিন্তু প্রশ্ন হইবে, সমস্ত পৃথিবীর নৈতিক ভার বহন করিবার শক্তি ধারণ করে এরূপ অসাধারণ পুরুষ কোথায় পাওয়া যাইবে? ইহা শুধু কবির কল্পনা নয় কি? উপনিষদে আছে, যখন সূর্য্যের কিরণ অদৃশ্য হয়, তখন চন্দ্রের

আলোক আমাদিগকে সাহায্য করে; যখন চন্দ্র অস্তমিত হয়, তখন নক্ষত্ররাজি আমাদিগকে জ্যোতিঃ প্রদান করে। সমগ্র পৃথিবীকে অত্যাচার, অবিচার, বর্ব্বরতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন মহামানব দৃষ্ট না হইলেও বহুলোকের সম্মিলিত চেষ্টায় সেই কার্য্য কতকাংশে করা যাইতে পারে।

সন্দেহ হইবে, এইরূপ আদর্শবাদী পুরুষ পৃথিবীতে কত জন দৃষ্ট হন? সাধারণতঃ পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর মানুষ বিদ্যমান। প্রথম শ্রেণীর লোকের ধর্ম্ম, বিনা প্রয়োজনে অন্যের অপকার করা। ইহাতে নিজের কোন লাভ নাই তবু অন্যের অনিষ্ট সাধন করার মধ্যেই ইহাদের আনন্দ। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের এক মাত্র লক্ষ্য, কি ভাবে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করা যায়। জীবনের প্রতিক্ষণে তাহাদের চিন্তা—কি প্রকারে আপনার ইষ্ট সাধিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক জীবন ধারণ করে, অন্যের উপকার ও কল্যাণের জন্য, তাহারা অন্যের দুঃখ-দৈন্যের ভার বহন করিয়াই জীবন পাত করিয়া যায়। তাহারা নিজের দেহে অন্যের জন্য জীবন যাপন করিয়া যায়। এই শ্রেণীর লোক যে একেবারে নাই—তাহা বলা যায় না। এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলেও এই আদর্শের প্রতি তাহাদের জীবনের স্বাভাবিক গতি—অন্ততঃ এরূপ লোক ত অনেক দৃষ্ট হয়।

পৃথিবীর বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান কাহারা করিবে?—পৃথিবীর গুরুভার কাহারা বহন করিবে? যাহারা শুধু নিজের জন্য চিন্তা না করিয়া অন্যের ভাবনা ভাবিয়া থাকে, যাহারা শুধু নিজ দেশের স্বার্থের জন্য ব্যগ্র না হইয়া অন্য দেশের স্বার্থকেও তাহার সঙ্গে মিলিত করে, যাহারা অপর জাতির অনিষ্ট করিয়া নিজ দেশের স্বার্থ সাধন করিতে প্রস্তুত নহে। জগতে শান্তি তাহারাই আনয়ন করিবে, যাহারা সমগ্র মানব-জাতির স্বার্থ-চিন্তা একযোগে করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকের সম্মিলিত চিন্তা ও প্রার্থনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও উদ্যম পৃথিবীর সম্মুখে আগতপ্রায় দাবানলের উপর বারি সিঞ্চন করিবে। পৃথিবীকে রক্ষা তাহারাই করিবে, যাহারা নিজেদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে, যাহাদের চিন্তারাশি গণিতশাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলে না, যাহারা মনে করে, আত্মত্যাগেই নিজকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। এই শ্রেণীর লোকের প্রভাবই ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া মানবজাতিকে প্রকৃত পথে চালিত করিবে। এইরূপ লোকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে না কি?

চোখের জল

অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ

শুধু আমার আছে চোখের জল,
এই মোর সম্বল —
আমি তাই দিয়ে, মা কর্ব্বো পূজা,
সেই মোর পুষ্প বিল্বদল।
তোর ধৌত কর্ব্বো চরণ যুগল,
আমার অশ্রু জলে,
অর্ঘ্য দেবো, মা, তোর পায়ে,
(আমার) দুঃখের বোঝা ঢেলে।

মা, আমার তুই যা দিয়েছিস্
তাই নে মাগো,
আমার আর কি আছে বল?
গ্রহণ কর, মা, আমার পূজা,
আমার ব্যথার শতদল,
আমার এই যে মা সম্বল।

ন্যায়কল্পতরু

অধ্যাপক শ্রীশীতাংশুশেখর বাগ্‌ছি, এম-এ, বি-এল, সাংখ্যতীর্থ

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের ১।১।৫ সূত্রের শাবর ভাষ্যের ব্যাখ্যা বৃহতীতে প্রভাকরমিশ্র অখ্যাতিবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] এই বৃহতীর ব্যাখ্যাতে শালিকনাথ মিশ্র প্রভাকরসম্মত অখ্যাতিবাদ সুবিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রভাকর মতানুযায়ী নয়বিবেক-গ্রন্থেও ভবনাথমিশ্র অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া ভট্টপাদসম্মত অন্যথাখ্যাতিবাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ও অখ্যাতিবাদের সমর্থন করিয়াছেন।[২] নয়বিবেকের টীকা বিবেকতত্ত্ব গ্রন্থে রবিদেব এই অখ্যাতিবাদের রহস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ভট্টপাদকে বিপরীতখ্যাতিবাদী মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বিপরীত-খ্যাতি ও অন্যথা-খ্যাতি ভিন্ন বস্তু নহে। একটি খ্যাতিই এই উভয় নামে প্রসিদ্ধ। তাৎপর্য্যটীকা গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্র নৈয়ায়িকসম্মত অন্যথাখ্যাতিবাদ প্রদর্শন করিবার জন্য যথাহুঃ অন্যথাখ্যাতিবাদিনঃ এইরূপ বলিয়া ভট্টপাদবিরচিত শ্লোকবার্ত্তিকের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৩] কারিকাটি এই :—তস্মাদ্ যদন্যথা-সন্তমন্যথা প্রতিপদ্যতে। তন্নিরালম্বনজ্ঞানমসদালম্বনঞ্চ তৎ॥ শ্লোকবার্ত্তিক, ২৫০ পৃঃ কাশী সং। অন্যথাখ্যাতি প্রদর্শনের জন্য বাচস্পতিমিশ্র ভট্টপাদীয় কারিকা উদ্ধৃত করায় এবং ভট্টপাদকে সুস্পষ্টভাবে অন্যথাখ্যাতিবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তিনি যে অন্যথাখ্যাতিবাদী ছিলেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নৈয়ায়িকগণকেই বিপরীতখ্যাতিবাদী বলা উচিত। কারণ ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তত্ত্বজ্ঞানকে অবিপরীত জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবিপরীত বস্তুকেই তত্ত্ব বলিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় বিপরীতজ্ঞানই অতত্ত্বজ্ঞান। ইহাই মিথ্যা-জ্ঞান।[৪]

এস্থলে আমাদের দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে মুদ্রিত তাৎপর্য্যটীকাতে প্রদর্শিত শ্লোকবার্ত্তিকের কারিকাটি বিকলাঙ্গ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে ইহা ভট্টপাদের কারিকা বলিয়াই মনে হয় না। কারিকাটিকে গদ্যপদ্যাত্মক করিয়া কিম্ভূতকিমাকার করা হইয়াছে। তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ-খণ্ডে গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভাকরসম্মত অখ্যাতিবাদের সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। এজন্য আমাদের দেশের প্রাচীন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় এই অখ্যাতিবাদের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। ভট্টপাদ ও প্রভাকরমিশ্র উভয়েই শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যাতা। ভট্টপাদ বার্ত্তিককার নামে প্রসিদ্ধ এবং প্রভাকর টীকাকার বা নিবন্ধকার নামে প্রসিদ্ধ। বিধিবিবেকের ন্যায়কণিকা টীকাতে বাচস্পতিমিশ্র প্রভাকরকে টীকাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ন্যায়কণিকা, পৃঃ ৪৮, কাশী সং) এই বার্ত্তিককার ও টীকাকারের ব্যাখ্যেয় গ্রন্থ শাবরভাষ্য। এক শাবরভাষ্য অবলম্বন করিয়া বার্ত্তিককার ও টীকাকার পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি মত প্রদর্শন

১ বৃহতী, পৃঃ ৬৫

২ নয়বিবেক, পৃঃ ৮৯-৯৫

৩ তাৎপর্য্যটীকা, পৃঃ ৭৩ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ সং)

৪ বাৎস্যায়ন ভাষ্য, পৃঃ ২৫ (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ সং)

করিয়াছেন। উভয়েই স্ব স্ব সিদ্ধান্তের অনুকূলে শবরস্বামীর বাক্যকেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার এমনি চতুরস্রতা আছে যে, একটি সংস্কৃতবাক্য হইতে বিভিন্ন অর্থ অনায়াসেই প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

১।১।৫ জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী "সুপরিনিশ্চিতা বুদ্ধিঃ কথং বিপর্যস্যতি" এইরূপ বলিয়াছেন। এই ভাষ্যবাক্য অবলম্বন করিয়াই প্রভাকর অখ্যাতিবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রদর্শিত ভাষ্যবাক্যটি অখ্যাতিবাদের মূল, একথা ভবনাথমিশ্র ও নয়বিবেকে বলিয়াছেন।[৫] প্রভাকরমতে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করা হয় না। ইহার মতে জ্ঞানমাত্রই প্রমা। লোকপ্রসিদ্ধ শুক্তিরজতাদি জ্ঞানও ভ্রম নহে। কিন্তু শুক্তি ও রজতের বিবেকাখ্যাতি মাত্র। বিবেক শব্দের অর্থ ভেদ এবং অখ্যাতি শব্দের অর্থ "না জানা" বা "অগ্রহণ"। এজন্য বিবেকাখ্যাতি ও ভেদাগ্রহ একই কথা। শুক্তিরজতাদি ভ্রমে, প্রভাকরমতে বিবেকাখ্যাতি মাত্রই স্বীকার করা হয়। অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ ভ্রম-জ্ঞানকে একটি বিশিষ্টজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করেন। অখ্যাতিবাদে বিশিষ্টবিষয়ক একটি জ্ঞান স্বীকার করা হয় না, কিন্তু অগৃহীতভেদ জ্ঞানদ্বয় স্বীকার করা হয়। ইদং রজতম্ এইরূপ চাক্ষুষ ভ্রমে ইদংবিষয়ক চাক্ষুষ অনুভব ও প্রমুষ্টতত্তাকরজতবিষয়ক স্মৃতি, এই দুইটি জ্ঞান মানা হয়। স্মৃতিমাত্রই তত্তোল্লেখিনী হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'তদ্ রজতম্' এইরূপ স্মৃতির আকার হইলেও ভ্রমে দোষপ্রযুক্ত তত্তাংশের উল্লেখ হয় না। এজন্য প্রমুষ্ট-তত্তাক স্মৃতি বলা হয়। প্রদর্শিত অনুভব ও স্মৃতি দুইটি জ্ঞান এবং ইহার বিষয়ও ভিন্ন। অনুভবের বিষয় ইদম্ ও স্মৃতির বিষয় রজত। দোষ-প্রযুক্ত এই জ্ঞানদ্বয়ের ভেদ গৃহীত হয় না এবং জ্ঞানদ্বয়ের ও বিষয়দ্বয়েরও ভেদ গৃহীত হয় না। ইহাই অখ্যাতিবাদীর কথা। এই দুইটি জ্ঞানের একটি জ্ঞানও ভ্রমরূপ নহে। কেবল দোষ-প্রযুক্ত ভেদের গ্রহণ না হওয়ায় উক্ত জ্ঞানদ্বয় বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে। বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক হয় বলিয়াই এই প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানকে লোকে ভ্রম বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ কোনও জ্ঞানই ভ্রম হইতে পারে না। ইহাই অখ্যাতিবাদীর বক্তব্য। তাৎপর্যটীকাগ্রন্থে এই অখ্যাতিবাদ বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে ও তাহার নিরসনও প্রদর্শিত হইয়াছে।[৬] এইরূপ ভামতী-গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠাতেও (নির্ণয়সাগর সং) এই অখ্যাতিবাদ অতিবিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ২৮-২৯ পৃষ্ঠাতে এই অখ্যাতিবাদের নিরসনও প্রদর্শিত হইয়াছে।[৭] ব্রহ্মসিদ্ধি-গ্রন্থে আচার্য মণ্ডনমিশ্র এই অখ্যাতিবাদের সমর্থনে ও নিরসনে যে অসাধারণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপর কোনও গ্রন্থে নাই। এই অখ্যাতিবাদ পণ্ডিতসমাজে সুপ্রসিদ্ধ হইলেও আমরা এই প্রবন্ধে অখ্যাতিবাদ সম্বন্ধে দুই একটি নূতন কথা বলিব।

মহামতি মণ্ডনমিশ্র তাঁহার বিধিবিবেক-গ্রন্থে জীবের সর্ব্বজ্ঞতা নিরসন প্রস্তাবে একটি নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন —চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাতা কেবল যে বর্ত্তমান বিষয়েরই গ্রহণ করিয়া থাকে এরূপ নহে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বর্ত্তমান বিষয়ের মত অতীতাদি বিষয় ও দূরস্থিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জৈমিনি যে চক্ষুরাদি জন্য প্রত্যক্ষকে বিদ্যমানবিষয়ক জ্ঞানের জনক বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। ইন্দ্রিয়দ্বারা বিদ্যমান বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হইলে যোগী পুরুষের অতীতাদি-

৫ নয়বিবেক, পৃঃ ১০৬

৬ তাৎপর্যটীকা। পৃঃ ৭১।৭২

৭ ভামতী (নির্ণয়সাগর সং

বিষয়ক প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না। আর তাহাতে যোগীর সর্ব্বজ্ঞতাও সিদ্ধ হইতে পারিত না। সর্ব্ব-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারাই যোগী সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। যোগীর সর্ব্বজ্ঞতা সমর্থনের জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বর্ত্তমানবিষয়-গ্রাহকত্ব নিয়ম স্বীকার না করিয়া কোনও দার্শনিক সম্প্রদায় এরূপ বলেন যে—নন্থ ন কালতোঽপি নিয়মশ্চক্ষুরাদীনাম্[৮]। এই দার্শনিকগণ স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে বলেন যে, রজতাদি ভ্রমে অবর্ত্তমান রজতাদিও উপলব্ধ হইয়া থাকে। রজতাদি ভ্রমে অবিদ্যমান রজতাদির চাক্ষুষ উপলব্ধি—সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। চক্ষুরাদি অতীতাদি রজতের প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তবে আর ইন্দ্রিয়ের বিদ্যমানোপলম্ভন নিয়ম, যাহা জৈমিনি, ১।১।৪ সূত্রে বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। এরূপও বলা যায় না যে, রজতাদি ভ্রমের বিষয় শুক্তিকাদিই বটে; কিন্তু রজতাদি নহে। রজতাদ্যাকার জ্ঞানের বিষয় রজতাদি না হইয়া শুক্তিকাদি হইবে, ইহা অসম্ভব। অন্যাকার জ্ঞানের বিষয় অন্য হইতে পারিলে, জ্ঞান মাত্রেই অনাশ্বাস হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে প্রবৃত্তিমাত্রের বিলোপ হইয়া যাইবে। এজন্য ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, রজতাদিবিষয়ক চাক্ষুষ ভ্রমের বিষয় অবর্ত্তমান রজতাদিই বটে; কিন্তু শুক্তিকাদি নহে। মণ্ডনমিশ্রের এই উক্তিসমূহের বিবরণ প্রসঙ্গে বিধিবিবেকের টীকা ন্যায়কণিকাতে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, জৈমিনিপ্রদর্শিত ব্যবস্থার উন্মূলনে কোনও প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিক প্রদর্শিত রূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মণ্ডনমিশ্র এস্থলে যে দার্শনিক দৃষ্টি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কোনও প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিকের। ইনি প্রভাকরের মত আংশিকভাবে সমর্থন করিয়াও জৈমিনিপ্রদর্শিত ব্যবস্থার উচ্ছেদই সমর্থন করিয়া থাকেন। প্রভাকর জৈমিনিমতানুযায়ী। তিনি জৈমিনিপ্রদর্শিত ব্যবস্থার বিরোধ করিতে পারেন না। এজন্যই এই দার্শনিককে প্রাভাকরগন্ধী বলা হইয়াছে কিন্তু প্রভাকর-মতানুযায়ী বলা হয় নাই। এই প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিকের নাম কি ও তাঁহার গ্রন্থই বা কি? কোন্ গ্রন্থে এই প্রাভাকর-গন্ধী দার্শনিক এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার কোনও উল্লেখই বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়কণিকাতে করেন নাই। আমরা অতঃপর এই বিষয়ে আলোকসম্পাত করিতে চেষ্টা করিব।

এস্থলে বিধিবিবেকের টীকা ন্যায়কণিকাতে বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিদ্যমানোপলম্ভনত্ব নিয়ম এই প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। কারণ "ইদং রজতম্" ইত্যাদি চাক্ষুষ ভ্রমে অবিদ্যমান রজতাদিরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। যদি বলা যায়—"ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রম পুরোবর্ত্তী শুক্তিকাকেই বিষয় করিয়া থাকে। কিন্তু অসন্নিহিত-দেশ ও অসন্নিহিতকাল রজতের উপলব্ধি, ইহা কিরূপে হইবে? রজত সন্নিহিতদেশে বা সন্নিহিতকালে নাই। অসন্নিহিত দেশবৃত্তি ও অসন্নিহিত কাল-বৃত্তি রজতের চাক্ষুষ উপলব্ধি কিরূপে হইবে? এ জন্যই রজতভ্রমে অসন্নিহিত দেশকালবৃত্তি রজত চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা বেদ্য হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে না। সন্নিহিতদেশ-কালবৃত্তি বস্তুই ইন্দ্রিয় বেদ্য হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। এইরূপ নিয়ম সিদ্ধ আছে বলিয়া যোগীরও সর্ব্ববিষয়ক ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে না।

এতদুত্তরে এই প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিকগণ বলেন যে, "ইদং রজতম্" এইরূপ ভ্রান্তি রজতের চাক্ষুষ উপলব্ধি। ইহা সন্নিহিত দেশ-কালবৃত্তি শুক্তিকাদির উপলব্ধি নহে। শুক্তি-রজতাদি ভ্রমে শুক্তিকাদি সন্নিহিতদেশকাল-বৃত্তি বলিয়াই শুক্তিকাদি রজত ভ্রমের বিষয় হইবে এরূপ বলা যায়

৮ বিধিবিবেক, পৃঃ১৫২

না। কারণ অন্য বিষয় অন্যাকার সংবিদের বিষয় হইতে পারে না। যদি অন্যাকার সংবিদের বিষয়ও অন্য হইতে পারিত, তবে বিষয়তার নিয়মই থাকিতে পারিত না। ঘটাকার জ্ঞানও পটবিষয়ক হইয়া পড়িত। আর তাহাতে ঘটার্থীর প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। এইরূপে কোন্ জ্ঞানের বিষয় কে হইবে? তাহার নিয়ম না থাকায় সকল জ্ঞানই সমস্তবিষয়ক হইতে পারিত। আর তাহাতে অযত্নসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতা সকলেরই হইয়া পড়িত। যোগীর সর্ব্বজ্ঞতার খণ্ডনের জন্য মীমাংসকগণ যে প্রয়াস করিয়া থাকেন, তাহাও নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়িত। কারণ সর্ব্বজ্ঞানই সর্ব্ববিষয়ক, ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য জৈমিনি-মতানুযায়ী মীমাংসকগণকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, রজতাকার বিজ্ঞানের বিষয়ও রজতই বটে। বিজ্ঞান যদাকার হইবে, বিষয়ও তাহাই হইবে। রজতাকার বিজ্ঞানের বিষয় শুক্তি, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। যে জ্ঞান যাহার বেদনরূপ নহে, তাহা সেই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না—এরূপ স্বীকার করিলেই জ্ঞান-মাত্রই অনাশ্বাস হইয়া পড়িবে। অন্যাকার সংবিদ যদি অন্যবিষয়ক হইত, তবে সংবিদের স্বার্থ ব্যভিচার অর্থাৎ স্ববিষয় না থাকিয়াও জ্ঞান হইতে পারে এইরূপ স্বীকার করায় সমস্ত জ্ঞানে অনাশ্বাস প্রসঙ্গ হইয়া পড়িত। আর তাহাতে কোনও প্রজ্ঞাবান্ পুরুষেরই কোনও বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইতে পারিত না। সুতরাং রজত চাক্ষুষ ভ্রমের বিষয় রজতই বটে, শুক্তিকা নহে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

ইহাতে শঙ্কা এই যে "ইদং রজতম্" এইরূপই রজতভ্রমের আকার হইয়া থাকে। কিন্তু 'রজতম্' এইরূপ ভ্রমের আকার নহে। এরূপ হইলে কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। ইহা রজত—এইরূপ জানিয়াই রজতার্থী পুরঃস্থিত বস্তুতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উদাসীনভাবে "রজতম্" এইরূপ জ্ঞান দ্বারা পুরঃস্থিত বস্তুতে রজতার্থীর প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এজন্য ইদম্ বস্তুর সহিত রজতের অভেদ জ্ঞান হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইদম্ রজতম্,—এইরূপ ভ্রম ইদম বস্তুর সহিত রজতের অভেদবিষয়ক, ইহাই বলিতে হইবে। আর তাহাতে ইদং রজতম্,—এইরূপ জ্ঞানের ভ্রমত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ইদম্-বস্তু পুরঃস্থিত শুক্তিকা। তাহাতে রজতের অভেদ নাই। অথচ ইদং রজতম্ এইরূপ ভ্রমে এইরূপ এই অভেদ ভাসমান হইয়া থাকে। এতদুত্তরে প্রাভাকরগুরুগণ বলেন, রজতভ্রমে ইদং বস্তুর সহিত রজতের অভেদগ্রহ হয় না। অর্থাৎ রজতের সহিত ইদং বস্তুর সামানাধিকরণ্য-বিষয়িণী ভ্রান্তি নহে। কিন্তু দোষবশতঃ ইদং বস্তুর সহিত রজতের ভেদাগ্রহ হইয়া থাকে। ইদং বস্তুর সহিত রজতের অসামানাধিকরণ্যের অগ্রহ হইয়া থাকে। দোষবশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাতে যদি প্রাভাকরগণ এরূপ বলেন যে, ইদং বস্তুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও রজতের স্মৃতি হইলে দোষবশতঃ এই জ্ঞানদ্বয়ের ভেদাগ্রহ হইয়া থাকে।

এইরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। রজত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়। রজতভ্রমে রজত স্মর্য্যমাণ হইতে পারে না। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা সাক্ষাৎ ক্রিয়মাণ। স্মৃতি পরোক্ষ জ্ঞান। রজতভ্রম রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে স্মৃতি বলা নিতান্তই অসঙ্গত। যদি বলা যায়, রজতভ্রমে রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সামগ্রী নাই বলিয়া রজতের স্মৃতিই বলিতে হইবে। এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। রজতভ্রম যে রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, ইহা সকলেরই

স্বসংবেদনসিদ্ধ। রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ কার্য্য সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া এই কার্য্যের উপপাদনের জন্য সামগ্রীও সকলেরই কল্পনা করিতে হইবে। সামগ্রী নাই বলিয়া সর্ব্বানুভবসিদ্ধ কার্য্যের অপলাপ করা যায় না। কার্য্যের জন্যই সামগ্রীকল্পনা। কার্য্যপ্রমিত হইলে সামগ্রীও অবশ্যই আছে—বুঝিতে হইবে। সুতরাং রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ কার্য্য থাকিতে সামগ্রী নাই—ইহা অবধারণ কোন রূপেই হইতে পারে না। কার্য্যানুসারেই সামগ্রী কল্পিত হইয়া থাকে। কার্য্যনিরপেক্ষভাবে সামগ্রী কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত সামগ্রীর অভাব প্রযুক্ত প্রমিত কার্য্যের পরিত্যাগ কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। সুতরাং রজতভ্রমে রজত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জন্য তাহার অনুকূল সামগ্রী অবশ্যই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—অবর্ত্তমান রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ কে হইবে? অসন্নিহিত দেশকালবৃত্তি রজতের চাক্ষুষ উপলব্ধির কারণ ত কেহই হইতে পারে না। এতদুত্তরে প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিকগণ বলেন যে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষমাত্রের কারণ চক্ষুঃ। প্রত্যক্ষমাত্রের কারণ মনঃ—ইহা সকলেরই স্বীকৃত। চক্ষুতে ও মনে যে প্রত্যক্ষকারণতা আছে, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এজন্য কৢপ্ত-সামর্থ্য চক্ষু বা মনই রজতপ্রত্যক্ষের কারণ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি বলা যায়, রজত ত বর্ত্তমান নহে। অবর্ত্তমান রজতের প্রত্যক্ষ চক্ষুঃ বা মনঃ দ্বারা হইবে কিরূপে? চক্ষুঃ বা মনঃ অবর্ত্তমান বস্তুকে ত গ্রহণ করিতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অবর্ত্তমান রজতের প্রত্যক্ষ যখন সর্ব্বানুভবসিদ্ধ তখন চক্ষুঃ অবর্ত্তমান রজতকে গ্রহণ করিতে পারে না—এইরূপ কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। সুতরাং চক্ষুঃ অবর্ত্তমান রজতাদিরও গ্রাহক বলিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিদ্যমান কালীন বস্তুরই গ্রাহক হইয়া থাকে এইরূপ নিয়ম অসঙ্গত। অসন্নিহিত দেশকালবৃত্তি বস্তুও ইন্দ্রিয়বেদ্য হইয়া থাকে। ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ কাল বা দেশের দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে না।

বিধিবিবেক ও ন্যায়কণিকাগ্রন্থে এই প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিকের মত যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাই চিৎসুখাচার্য্য প্রণীত তত্ত্বপ্রদীপিকা-গ্রন্থেও প্রদর্শিত হইয়াছে। চিৎসুখাচার্য্য এই দার্শনিককে প্রাভাকরগন্ধী না বলিয়া 'গুরুমতপরিমোষণ-নিপুণ-মতি' বলিয়াছেন[১]। অর্থাৎ এই দার্শনিকটি গুরুপ্রভাকরের সিদ্ধান্ত অপহরণে নিপুণ বুদ্ধি। বাচস্পতি এই দার্শনিকটিকে যাহা বলিয়াছেন চিৎসুখাচার্য্যও ভঙ্গ্যন্তরে তাহাই বলিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন এই দার্শনিক আধুনিক। ইঁহার মতানুসারে এইরূপ বলিতে হইবে যে, ইদং রজতম্—এইরূপ রজতের চাক্ষুষভ্রমে প্রভাকর যেমন ইদমাকার চাক্ষুষবৃত্তি ও রজতাকার স্মৃতির ভেদাগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন এবং অনুভূয়মান ইদম্ বস্তুর সহিত স্মর্য্যমাণ রজতের ভেদাগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই মতে তাহা স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই। রজতভ্রমে দুইটি জ্ঞান স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রভাকর দুইটি জ্ঞান স্বীকার করিয়া ঐ দুইটি জ্ঞানের ভেদাগ্রহ নিবন্ধন প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় বলেন এবং উক্ত জ্ঞানদ্বয় যথার্থ ইহাও বলেন। 'ইদম্ রজতম্' এইরূপ একটি জ্ঞান স্বীকার করিলে অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের মত ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে হইত—এইরূপ বলেন। কিন্তু এই প্রাভাকরগন্ধী দার্শনিক 'ইদম্ রজতম্' এইরূপ ভ্রমও একটি জ্ঞানই স্বীকার করেন। কিন্তু একটি জ্ঞান স্বীকার করিলেও এই জ্ঞানকে ভ্রমরূপ বলেন না। ইদং রজতম্—ইহা একটি জ্ঞান এবং ইহা চাক্ষুষ জ্ঞান। এই চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় সন্নিহিত ইদম্ বস্তু ও বিপ্রকৃষ্ট রজতবস্তু। সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুদ্বয়-বিষয়ক একটি চাক্ষুষ

১ চিৎসুখী। পৃঃ ৭৩



কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে বীর অভিমন্যু

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪

শিল্পী
শ্রীনন্দলাল বসু

জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটি চাক্ষুষ জ্ঞানেই পরস্পর অসংসৃষ্ট ইদম্ বস্তু ও রজত বস্তু ভাসমান হইলেও দোষবশতঃ একটি জ্ঞানের বিষয় দুইটির ভেদাগ্রহ-প্রযুক্ত অযথার্থ ব্যবহার উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রভাকর যেমন অনুভূয়মান ও স্মর্যমাণ বস্তুদ্বয়ের ভেদাগ্রহ রজতভ্রমে স্বীকার করেন। এই দার্শনিক তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু একটি চাক্ষুষ জ্ঞানে ভাসমান বস্তুদ্বয়ের ভেদাগ্রহ স্বীকার করিয়া ইদং রজতম্ এইরূপ সবিকল্পক চাক্ষুষ জ্ঞান স্বীকার করেন। গৃহ্যমাণ বস্তুদ্বয়ের অভেদ গৃহীত হয় না বলিয়া ইহার মতেও ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিতে হয় না। যে সমস্ত প্রাচীন অন্যথাখ্যাতিবাদিগণ এই গৃহ্যমাণ ও স্মর্যমাণ বস্তুদ্বয়ের অসৎ সংসর্গ ভাসমান হয় বলেন, ইহার মতে তাহাও বলিবার আবশ্যকতা নাই। ইহার মতে দোষবশতঃ অসংসর্গের অগ্রহ বা ভেদের অগ্রহ, ইহাই স্বীকার করা হয়। সুতরাং এই দার্শনিক ভেদাগ্রহ স্বীকার করায় এবং সমস্ত জ্ঞানকে যথার্থ বলায় প্রভাকর-মতানুযায়ী হইলেও প্রভাকরের ন্যায় ভ্রমে জ্ঞানদ্বয় স্বীকার করেন না, একটি জ্ঞান স্বীকার করেন। প্রভাকর অসন্নিহিত বস্তুর স্মৃতি স্বীকার করেন। ইনি অসন্নিহিত বস্তুরও ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। ইঁহার মতে ভ্রম স্মৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয় না। কিন্তু অনুভব দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে।[১০]

চিৎসুখীর টীকা নয়নপ্রসাদিনীতে এই মতটি ন্যায়কল্পতরুতে আছে বলা হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম বলা হয় নাই। মনে হয় এই ন্যায়-কল্পতরু গ্রন্থখানি ন্যায়মতের হইলেও উহাতে প্রাভাকরমীমাংসারই অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে বলিয়া উহাকে প্রাভাকরগন্ধী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রভাকর ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করেন না। ইনিও করেন না। কিন্তু প্রভাকর যোগীর সর্ব্বজ্ঞতার বিরোধী। ইনি যোগীর সর্ব্ব-জ্ঞতার অনুকূল। এই ন্যায়কল্পতরু গ্রন্থের কোনও উল্লেখ অন্য কোনও দার্শনিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এই ন্যায়কল্পতরুর সিদ্ধান্তের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কোনও গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন, এরূপ জানা যায় নাই। আমাদের দেশে যাহারা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তের আলোচনা করেন, তাঁহারাও এই ন্যায়-কল্পতরুকারের বিশেষ কোনও উল্লেখ করেন নাই। নিবিষ্ট চিত্তে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক গ্রন্থের আলোচনা করিলে বহু নূতন সংবাদ জানিতে পারা যাইবে। আমরা এই বিষয়ে যথার্থ পণ্ডিত-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

১০ চিৎসুখী। পৃ ৭২

আরব দর্শনের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, শাস্ত্রী

ইসলাম প্রবর্ত্তনের প্রথম চারিশত বৎসরের মধ্যে আরবী ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তৎকালীন আরবগণ গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, এবং তর্কশাস্ত্রকেই দর্শন আখ্যা দিত। তাহারা সমস্ত জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিত—প্রথম ভাগে ছিল সাহিত্য, দ্বিতীয় ভাগে সাহিত্য ব্যতিরেকে মানুষের অন্য সমস্ত জ্ঞান ও শাস্ত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে আরবী ভাষায় কোরাণ, কোরাণের টীকা এবং বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থেরই প্রাধান্য ছিল। পারস্যবিজয়ের পরবর্ত্তী যুগে ইন্দো-ইরাণীয় সাহিত্য দ্বারা আরব সাহিত্যিকগণ যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তখনও কোরাণশাস্ত্রেরই প্রাধান্য ছিল। কোরাণ-অতিরিক্ত জ্ঞানের জন্য আরবগণ গ্রীক-রোমান সাহিত্যের উপর নির্ভর করিত। মদিনা শহর হইতে যখন ইসলাম-কেন্দ্র সিরিয়া প্রদেশের দামাস্কাস শহরে স্থানান্তরিত হইল, তখন আরবগণ বিশেষ ভাবে গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া পড়িল, পূর্ব্ব-রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল দামাস্কাস—সেইখানেই বহু শতাব্দী হইতে প্রাচীন গ্রীক-রোমান সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার চিন্তাধারার সম্মেলন হইতেছিল। আরবগণ প্রথম যুগে অত্যন্ত বেশী ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ছিল বলিয়া তাহারা কোরাণ ভিন্ন অন্য কোন পাঠ্য বস্তুর অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না। তাহারা বিশ্বাস করিত যে কোরাণ ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কোন উৎস নাই, এবং ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন সত্য নাই। সুতরাং মুসলিমগণ উন্নততর গ্রীক-রোমান সভ্যতার সংস্পর্শে আসে কিন্তু পৌত্তলিকদের শাস্ত্রের অনুপ্রেরণায় কোন প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করিতে স্বীকার করে নাই। তাহারা গ্রীক-দিগকে পৌত্তলিক বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না : কারণ গ্রীকগণ অলিম্পিক দেবতার পূজা করিত। রোমান রাজধানী বাল্‌বেক নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইসলামের হস্ত-চিহ্ন এখনো দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করে। ধর্ম্মের উন্মাদনায় আরব বিজেতৃবৃন্দ যে বিরাট ধ্বংস সাধন করিয়াছিল তাহার চিহ্ন দেখিলে যে কোন ভদ্র মন বিদ্রোহ করে। গ্রীকদের সৌন্দর্য্যপ্রীতি, রোমকদের মহিমা আরবজাতির প্রাণে কোন আবেদন সৃষ্টি করে নাই। আরবগণ সৌন্দর্য্য-বোধ এবং অপার্থিব চিন্তাকে তাহাদের জীবনে বিরাট স্থান দেয় নাই, কারণ এই গুলির সঙ্গে ধর্ম্মের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম যুগে গ্রীক দর্শনের পক্ষে মরুনিবাসী নিরক্ষর আরব সন্তানদের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর হয় নাই। তারপর গ্রীক দর্শনের সূক্ষ্ম তথ্য অনুধাবন করিবার মতন মনঃশক্তি আরবদের ছিল না। যদিও কখনো বা আরব পণ্ডিতগণ গ্রীক দার্শনিকদের সঙ্গে তর্ক বা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা গ্রীক তার্কিকদের তর্ক-ধারা অনুসরণ করিতে পারিতেন না। সুতরাং যে চিন্তাধারার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁহারা পরাজিত হইতেন তাহার সঙ্গে অসহযোগ আরম্ভ

করিতেন। ফলে, আরবগণ গ্রীক পণ্ডিতদের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া চলিতেন এবং অন্যের সঙ্গে ধর্মাতিরিক্ত কোন আলোচনা না করাই সিদ্ধান্ত করিলেন।

অন্যদিকে গ্রীক-রোমান পণ্ডিতগণ আরবী-ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই অনেকেই আরবী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেন এবং ইসলাম সংস্কৃতি অনুযায়ী আরবী ভাষার মধ্য দিয়া কোরাণ হাদিস প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ অনুশীলন করিতে লাগিলেন। পরোক্ষে এই সমস্ত গ্রীক-রোমান ধর্মান্তরিতদের মধ্য দিয়া গ্রীক মতবাদ আরব সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে লাগিল। সিরিয়াবাসিগণ মাসিদোনানির্মিত আলেকজাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া, এন্টিয়োক প্রভৃতি শহরে ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রীক-রোমক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের পরবর্ত্তী যুগে সিরিয়াবাসিগণ খৃষ্টান দর্শনের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সমন্বয় করিয়াছিল। ক্রমশঃ সিরিয়ার উত্তর প্রান্তে নেষ্টোরিয়ান খৃষ্টান পণ্ডিতগণ প্লেটো এবং এরিসটটলের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, এবং দক্ষিণ প্রান্তিকগণ মিশরের নিউ প্লাটনিজম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বকালে সিরিয়ার প্রধান শহরগুলিতে রোমক সাম্রাজ্যের অস্তায়মান যুগে গ্রীক চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত। এডেসা, নিসিবিস ও হারান নগরে গ্রীক সুফীদের বহু শিক্ষাকেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। রোমান সম্রাটগণ গ্রীক নগরগুলি জয় করিলেও গ্রীক সংস্কৃতি বা শিক্ষা পর্য্যুদস্ত করে নাই। আরব বিজয়ীদের মত রোমানগণ চিন্তা ও ভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই। গ্রীক সভ্যতাকে তাহারা বহুভাবে আপনাশ্রিত করিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়ার প্রজাবর্গ গ্রীক ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া গ্রীক সাহিত্যকে বহুধা সমৃদ্ধ করিয়াছিল। গ্রীক সাহিত্য সংগ্রহের প্রতি সিরিয়ানগণ বিরাট আগ্রহ প্রকাশ করিত। সিরিয়ান ব্যবহার-জীবিগণ রোমান ব্যবহারশাস্ত্রকে সুশৃঙ্খল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। সিরিয়াবাসী খ্রীষ্টানগণ খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে নূতনরূপে সুসজ্জিত করিয়াছিল; বাইবেলের নানা প্রকার টীকা ও সার-সংগ্রহ গ্রীক দর্শনের অনুকরণে রূপান্তরিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী দেশগুলিতে গ্রীক-রোমান সভ্যতা বিকাশের অন্যতম কেন্দ্ররূপে সিরিয়া প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিয়াছিল। ইসলাম ধর্ম্ম ও আরবী ভাষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেক সিরিয়াবাসী তাহাদের প্রাচীন আরেমিক ভাষা ত্যাগ করে নাই। এখনো দামাস্কাসের চতুষ্পার্শ্বে এবং লাকর্জা পর্ব্বতের সানুদেশে মেরোনাইটগণ তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আরেমিক ভাষা ব্যবহার করে এবং আরেমিক ভাষায় প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করে। দামাস্কাসে খিলাফতের রাজধানী স্থাপনের কিছুকাল মধ্যেই সিরিয়াবাসিগণের সংস্পর্শে আসিয়া মরুবাসী আরবগণের জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। এই সমস্ত গ্রীক ভাবাপন্ন ধর্ম্মান্তরিত সিরিয়াবাসীদিগকে ওমাইয়াদ খলিফা রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। আরবগণ প্রধানতঃ তরবারী, রক্ত, যুদ্ধ, জয়, পরাজয় বুঝিত। রাষ্ট্র-সংগঠন বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে তাহারা নবদীক্ষিত স্থানীয় মুসলমানগণের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। এই সমস্ত নবাগতদের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি আরব সাহিত্য ও চিন্তাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আরব বিজেতৃগণের মধ্যে যুদ্ধজয় ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম উন্মাদনা শিথিল হইয়া আসিলে সিরিয়াবাসিগণ আরবী সাহিত্যের মধ্য

দিয়া গ্রীক-রোমান চিন্তা পরোক্ষে প্রচার করিতে লাগিল। সিরিয়ার মুসলিম পণ্ডিতগণ আরবী ভাষায় গ্রীক সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতিষ-শাস্ত্রাদি অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। ওমাইয়াদ বংশীয় খলিফাগণ চিকিৎসার জন্য ইউনানী অর্থাৎ গ্রীক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন; গ্রন্থাগার সংগঠনে আরব খলিফাদের একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রত্যেক খলিফার একটী ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ ছিল। সেই সমস্ত গ্রন্থাগারের পরিচালক বা গ্রন্থাগারিক ছিল গ্রীক। রোগাক্রান্ত মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, কারণ মৃত্যু মানুষের সম্মুখে রোগ-রূপেই দেখা দেয়। সেই চরম মুহূর্ত্তে মহাশক্তিশালী মানুষও চিকিৎসকের উপর নির্ভর করেন। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসকের প্রভাব অপরিসীম। ওমাইয়াদ খলিফাগণ চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য ইউনানী বা গ্রীক চিকিৎসা-শাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করেন। বাগদাদ নগরেও আব্বাসীয় খলিফাগণ ভারতীয় চিকিৎসকগণের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় গ্রন্থাদি অনুবাদ করান, তাহার ফলে ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে অতি অল্প কালের মধ্যেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ওমাইয়াদ যুগেও এই ভাবেই পূর্ব্ব-ইউরোপের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

আরবী ভাষার একটা বিশেষত্ব এই যে, সে অন্যের ভাষাকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইতে পারে এবং ধাতুকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে যে মূলশব্দের কোন চিহ্নই থাকে না। আরবজাতি খুব সাহসী, এবং ভ্রমণশীল। তাহারা ধর্ম্মের ও দেশ-জয়ের উন্মাদনায় নানা দেশ পরিভ্রমণ করিত এবং প্রাচীন ফিনিসীয় জাতির মতন যেখানে যাহা গ্রহণযোগ্য, তাহা আহরণ করিত, ক্রমশঃ উহাকে আপন সাহিত্যে স্থান দিত। কিন্তু তাহাদের মন ছিল সংস্কৃতিক্ষেত্রে অত্যন্ত অনুদার; তাহারা সাধারণতঃ কোন বিদেশী বা বিধর্ম্মী গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত না, বা তাহাদের গ্রন্থে অপরের নাম উল্লেখ করিত না। অবশ্য লেখক যদি মুসলমান হইতেন তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম উল্লেখ করিত; তাহাও খুব স্বচ্ছন্দ মনে নয়। অথচ এই ব্যাপারটী অবশ্য আশ্চর্য্য যে অনারব মুসলমানই আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আরব মুসলমানগণ ক্রমশঃ বিদেশী ও বিধর্ম্মী চিকিৎসা, জ্যোতিষ গ্রন্থাদির অনুবাদ আরম্ভ করিল, কারণ, মূল গ্রন্থরূপে তাহারা বিদেশী বিধর্ম্মী ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিতে সাহস করিত না; তাহাতে ইসলাম ধর্ম্মের অবমাননা হইত। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের পক্ষে অন্য ধর্ম্মের আলোচনা করাও পাপ। অথচ পণ্ডিতের চিন্তারাজ্য ধর্ম্ম-সীমাকে সর্ব্বদাই অতিক্রম করিয়া যায়। সুতরাং বিধর্ম্মী শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ না লিখিয়া তাহারা বিধর্ম্মী গ্রন্থাদির অনুবাদের মধ্য দিয়া জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিতে লাগিল।

এই সমস্ত অনুবাদকদের মধ্যে ইসাক ইবন্ হুনাইন, তাহার পুত্র হুনাইন ইবন্ ইসাক, ছাবিৎ ইবন্ কা-আনা এবং মা-আতা ইবন ইয়ুনুস বিখ্যাত। তাহারা প্লেটো, সক্রেটিস, পিথাগোরাস, প্লটিনাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সমস্ত পুস্তক অনুবাদ করিলেন। আরিস্টটলের তর্কশাস্ত্রকে আরবগণ খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিত এবং তর্কশাস্ত্র (আল্ মন্তেক) বলিতে তাহারা "আল্ আরিস্তোকো"ই বুঝিত। একদা আল্ ফারাবীকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"আপনি শ্রেষ্ঠ, না আরিস্তো শ্রেষ্ঠ?" ফারাবী নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন—"আমি যদি আরিস্তোর সময় জন্ম নিতাম তবে আমি তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হইতাম।" গ্রীক চিকিৎসকগণ দামাস্কাস, এন্টিয়োক, এডেসা,

টায়ার, সিডান জেরুজালেম প্রভৃতি নগরে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বহু আরবী ছাত্র শিক্ষা লাভের জন্য সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিত। তাহাদের জন্য প্রয়োজন হইল চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুবাদ। অনুবাদ সংক্রামক জিনিষ। একবার আরম্ভ হইলে তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে না। চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতির অবাধ গতিতে অনুবাদ চলিল।

বাগদাদে আরবীয় খিলাফতের রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মক (আল্ বরমেকা) নামীয় একটী ভারতীয় পরিবার প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হয়। তাহাদের অনুগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় ভারতীয় পণ্ডিতগণ বাগদাদে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বহু ভারতীয় চিকিৎসক ও পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি সেখানে অনুবাদ করেন। পূর্ব্বে ওমাইয়াদ খিলাফতের সময় দামাস্কাসে গ্রীক চিকিৎসা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি অনূদিত হইয়াছিল—বাগদাদে অনূদিত হইল ভারতীয় গ্রন্থাদি। দুইটী বিভিন্ন চিন্তাধারায় আলোচনা করিয়া আরবী পণ্ডিতগণ তুলনামূলক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহারা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিধর্ম্মী ও বিদেশী গ্রন্থাদি আলোচনা করেন। এই সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যে আমরা আলবেরুণীর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত।

পূর্ব্বে আরবী পণ্ডিতগণ কোন গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতেন না; কোন প্রবন্ধের অনুচ্ছেদ (প্যারাগ্রাফ) বা ব্যবচ্ছেদ চিহ্ন দিতেন না; বক্তব্য বিষয়ের বিভাগ করিতেন না; কোন ব্যাখ্যার উপর মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত করিতেন না। গ্রীক প্রথানুযায়ী আরবগণ মহম্মদের ৩০০ বৎসর পর হইতে বক্তব্যবিবরণী নূতন ধরনে লিখিতে আরম্ভ করেন; যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সুশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন; এমন কি আরবী ব্যাকরণও তাঁহারা গ্রীক পদ্ধতিতে সংকলন আরম্ভ করেন, আরবগণ মৃত-মানবের কোন প্রতিকৃতি রক্ষা করাকে গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করে। সুতরাং মৃতমানবকে অনুকরণ করিয়া কোন নাটক প্রদর্শন করিতে চাহে না. গ্রীকগণ নাটককে সমাজ-জীবনের অন্যতম অঙ্গরূপে বিবেচনা করিত। ক্রমশঃ আরবগণ গ্রীক প্রথানুযায়ী নাটক লিখিতে আরম্ভ করে; অবশ্য নাটককে আরবগণ "ধর্ম্মদ্রোহ" বলিয়াই বিবেচনা করে। ছোট গল্প লেখা অথবা উপন্যাস রচনা করাও আরবগণ গ্রীক সাহিত্য অনুকরণে আরম্ভ করে। কিন্তু পরে ভারতবর্ষের সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া গ্রীক পদ্ধতিতে গল্প রচনা আরম্ভ করে তাহারই ফলে "আলফ্ লাইলা ও লাইলা" (অ্যারেবিয়ান নাইটস্) এবং পরিশেষে "কলিলা দমনা" পঞ্চতন্ত্রের "করটকদমনক" কথার অনুবাদ করেন। সিন্ধুবাদ নাবিকের কাহিনী ভারতীয় গল্প হইলেও তাহার আরবীয় রচনাভঙ্গী গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণেই হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ করিয়া তুলনামূলক সমালোচনা করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে আরবী সাহিত্যের উপর ভারতবর্ষ ও গ্রীক দেশীয় প্রভাবের সুন্দর সুদীর্ঘ আলোচনা করা যাইতে পারে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক যুক্তির অনুকরণে আরবীয় পণ্ডিতগণ কোরাণের ব্যাখ্যা করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ কোরাণের সূত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে,—

কোরাণে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপে বলা হইয়াছে "ঈশ্বর আছেন, তাহা না হইলে হে আরববাসিগণ, তোমাদিগের জন্য স্বর্গ মর্ত্ত হইতে কে খাদ্য ব্যবস্থা করিত? কে তোমাদিগকে শুনিবার ও দেখিবার শক্তি দিত? কে তোমাদিগকে জীবনী শক্তি দিত? কে জীবিতকে মৃত্যু দিত? ঈশ্বর আছেন, কেন না তিনি সৃষ্টি-কর্ত্তা।"

কিন্তু গ্রীক যুক্তির অনুকরণে পরবর্ত্তী যুগে আরবী পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বলিলেন—

'জগৎ অনিত্য, সকল অনিত্য পদার্থের একজন স্রষ্টা আছেন, সুতরাং এই অনিত্য জগতেরও একজন স্রষ্টা আছেন। সেই স্রষ্টাই ঈশ্বর।' এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী আরব সাহিত্যে গ্রীক চিন্তারই অবদান।

ভারতের কৃষি-সম্পদ

ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ডি-এসসি

যদি বলি ভারতবর্ষের বাইরে গেলে তবে ভারতবর্ষকে ভাল করে দেখা যায় তা হ'লে হয়ত আপনারা বিস্মিত হবেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে তাই হয়েছিল। জন্মেছি বাঙলা দেশে, দেখেছি এর শস্য-শ্যামলা শোভা, পড়েছি ভারতবর্ষ সোনার দেশ, কিন্তু তার পণ্য যে কত সমৃদ্ধ, কত প্রয়োজনীয় এবং কেবল আমাদের দেশেই নয় বিদেশেও তার ক্ষেত্রজ ও বনজ সম্পদ কতখানি অপরিহার্য্য তা' অনুভব করলাম লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিট্যুট মিউজিয়ম দেখতে গিয়ে। ভারতবর্ষে উৎপন্ন যে সব পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় তার সবিশেষ ইতিবৃত্ত, ছবি, জিনিষের নাম, চাষের প্রণালী সব কিছুই চিত্রাকারে প্রদর্শিত হয়েছে। সুন্দর ভাবে সাজানো গোছানো, এবং পরম শিক্ষণীয় বিষয়।

আমরা জানি তুলার চাষে আমেরিকার পরই ভারতবর্ষের স্থান। আলমারীতে খানিকটা তুলা সুরক্ষিত হয়েছে, তুলার বীজ সামান্য দেখা দিচ্ছে, এবং কাপাস ও শিমূল উভয় জাতীয় তুলাই রাখা আছে। কাপাস গাছের ছবি, তার পাশে শুকনা কাপাস গাছের ডাল পাতা ও তুলার কোষ সহ দেখান হয়েছে। তার কাছে রয়েছে ছাপার হরফে তুলাসম্বন্ধীয় অবশ্যকীয় ইতিবৃত্ত। পড়ে গেলাম, কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে তুলা ভারতবর্ষের একটি সুবৃহৎ পণ্য। ৭৫০ লক্ষ বিঘা জমিতে প্রতি বৎসর তুলার চাষ হয়। যুদ্ধের আগে এক একটি পাঁচ মণ ওজনের ৬০ লক্ষ তুলার বস্তা বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই তুলা উৎপন্ন হয়ে থাকে। বোম্বাই, বেরার, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও মধ্য-প্রদেশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তুলার চাষের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের বিশেষ সম্বন্ধ আছে; মাটির রাসায়নিক অবস্থার উপরও নির্ভর করে। তাই তুলার আঁশ, রঙ, কোমলতা, দৈর্ঘ্য সব কিছুই ভিন্ন ক্ষেত্রবিশেষে উৎপন্ন তুলার উপর নির্ভর করে। ভারতের আদিম তুলার আঁশ ছোট ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে সরকারী কৃষি-বিভাগ ও কেন্দ্রীয় তুলা-সংঘের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা ভারতবর্ষে জন্মান সম্ভব হয়েছে। প্রতি বৎসরই ভাল জাতের তুলার চাষ বেড়ে চলেছে। সরকারও এ বিষয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন। আর তুলার চারা তৈরি করবার জন্য সরকার বাগান তৈরি করেছেন। শুধু তাই নয়, যাতে কোন রকমে নিকৃষ্ট জাতের তুলার বীজ না মেশে তার জন্য সরকার সতর্ক আছেন। এই সব যত্ন ও চেষ্টার ফলে ভারতীয় তুলা উন্নত হয়েছে। অধিকাংশ পরিমাণ তুলা ইংলণ্ডের কাপড়ের কলে চালান দেওয়া হয়। উৎপন্ন তুলার অর্দ্ধেক পরিমাণ দেশে বস্ত্র তৈরী করবার জন্য থাকে, আর বাকী অর্দ্ধেক রপ্তানি করা হয়। তুলা রপ্তানির পরিমাণও কম নয়,—১৬২,০০,০০০ মণ! এর দাম প্রায় ৩৫ কোটি টাকা।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ভারতীয় তুলা রপ্তানি হয়ে থাকে। ইংলণ্ড তো বটেই, তারপর জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইতালী, চীন, জাপান, এমন কি আমেরিকায় পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর ভারতীয় তুলা বিক্রি হয়ে থাকে।

জাপান ভারতীয় তুলার সব চেয়ে বড় ক্রেতা। এক জাপানই বাৎসরিক ১৭৷৷০ কোটি টাকার তুলা কিনে থাকে। ইউরোপের ভিতর ইংলণ্ডে সব চেয়ে বেশি পরিমাণ তুলা সরবরাহ করা হয়। ভারতবর্ষ থেকে যে সব বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করা হয় তার শতকরা ১৫ ভাগ কেবলমাত্র ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়ে থাকে। যুদ্ধের আগে জার্ম্মানী ও বেলজিয়ামে শতকরা ৭ ভাগ রপ্তানি হোত। এখন ইটালীতে কিছু বেশি পরিমাণ তুলা বিক্রয় হচ্ছে, তবে আমেরিকাতে সব চেয়ে বেশি হয়েছে। বার বছর আগে আমেরিকা নিত উৎপন্ন তুলার শতকরা ৬ ভাগ, এখন নিচ্ছে ১৫ ভাগ। ভারতীয় তুলার জাত ভাল হওয়ার জন্য তার পণ্যগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমেরিকায় ছোট আঁশের তুলার ব্যবহার করার ব্যবস্থাও হয়েছে। তাই ছোট ও বড় দুজাতের আঁশের তুলা আমেরিকা কিনে থাকে।

তুলার পরে ছবি রয়েছে পাটের গাছের। তার পাশে পাট, পাটকাঠি এবং পাটজাত দড়ি ও ছালা। পাট ভারতের একচেটিয়া ব্যবসা। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে পাট উৎপন্ন হয়। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে পাটের চাষ হয়। এর মধ্যে একমাত্র বাঙলা দেশেই শতকরা ৮৫ ভাগ পাট জন্মায়। দুজাতের পাটের বীজ বপন করা হয়,—ব্যবসা-কেন্দ্রে এরা শ্বেত পাট (Corchorus capsularis) ও দেশী পাট (Corchorus olitorius) বলে পরিচিত। প্রায় ৯ লক্ষ বিঘা জমিতে পাটের চাষ হয়, ও এক এক বছরে ৫ মণ ওজনের ৯০ লক্ষ বস্তা পাট উৎপন্ন হয়। মাঝে মাঝে রোদ ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে পাটের চারা বড় করার সুবিধা হয়। ছবিতে দিয়েছে দেখলাম কেমন করে পাটকাঠি থেকে পাটের ছাল খুলে নেওয়া হয়। গাছের ডালগুলি পুষ্টি পাবার আগে কেটে নেওয়া হয়, তারপর জলার বা ডোবার জলে ভিজিয়ে পচান হয়। আর ঠিকমত পচে উঠলে আছাড় মেরে বা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে পিটে ছাল খুলে নেওয়া হয়। পাট সস্তা বলে অন্য কোন মোড়কের জন্য ব্যবহার করা জিনিষের চাইতে সস্তা ও সুলভ হয়। পাটের সুতা ও দড়ি তৈরি করে চট ও ছালা তৈরি করা হয়। আমাদের দেশেও চট কিছু কম ব্যবহার করা হয় না। ১৯৩৩-৩৪ সালে এদেশে ব্যবহার করা চটের পরিমাণ ছিল ২০,৮১৭,০০০ মণ। পরে ১৯৩৮ সালে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩২,২৩৮,০০০ মণ।

এদেশে উৎপন্ন চট প্রায় সবটাই অন্য দেশে রপ্তানি হয়। ভারতের চট একটা বড় পণ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। রপ্তানি করা পাটের পরিমাণও বড় কম নয়,—২১৬,০০,০০০ টন। সারা পৃথিবীতে ভারতে উৎপন্ন পাট ও চট রপ্তানি করা হয়। এতে বাৎসরিক আয় হয় ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা। ইংলণ্ডই কেনে সব চেয়ে বেশি পরিমাণ পাট। তারপর কিনত জার্ম্মানী, এখনও কেনে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি আর বেলজিয়াম। ওদিকে সুদূর আর্জেণ্টাইন দেশে ও এদিকে অষ্ট্রেলিয়াতেও ভারতীয় পাট রপ্তানি করা হয়। গত বছরে ভারত সরকার পাট রপ্তানি একটু রাশটেনে করেন, তাতে বিভিন্ন দেশে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয় তার কিছু পরিচয় ওদেশে বসে পাই। ভারতীয় হাই কমিশনার অফিসে অষ্ট্রেলিয়া, এমন কি রুশদেশ থেকে বিশেষ প্রেরিত লোক এসে হাজির, পাট যাতে ওসব দেশে আবার চালান করা হয় তার তদ্বির করতে। নানা জাতের জিনিষপত্র দেশ-বিদেশে পাঠাতে হলে প্যাক করবার জন্যই পাটের তৈরি ছালা ও চটের খুবই চাহিদা। নইলে দেশজাত জিনিষ দেশান্তরে প্রেরণ করা সহজ হয় না।

নানাদেশে পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন উপযুক্ত জিনিষ খুঁজে বের করবার বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এত সস্তা ও উপযোগী তন্তু (Fibre) এখনও অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় নি। যদিও চটের বদলি অনেক স্থলেই মোড়ক হিসাবে কাগজ ব্যবহার করা হচ্ছে, তবুও চটের আধিপত্যের কথা অস্বীকার করা চলে না। তবে চটের ক্ষেত্রে কাগজ প্রতিযোগিতায় নেমে আসায় চট-ব্যবসায়ীরা খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ভারতীয় সরকারের কৃষি-বিভাগ ও কেন্দ্রীয় চট গবেষণা কমিটি প্যাকিং ছাড়াও অন্য কোন ক্ষেত্রে চট প্রচলন করা যায় কি না তার গবেষণায় প্রবৃত্ত আছে। গালিচার ও লিনোলিয়মের পটভূমি হিসাবে চট বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছি বিভিন্ন আলমারীর ধার দিয়ে। এসে পড়লাম নারিকেল ছোবড়ার উপযোগিতার ইতিবৃত্তের কাছে। মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুরের কুটির-শিল্প হিসাবে ছোবড়া সংগ্রহ অন্যতম। যাঁরা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ব্বাসিতের আত্মকথা পড়েছেন তাঁরা অবশ্যই অবগত আছেন ভারত-সরকারও দ্বীপান্তরের আসামীদের ছোবড়া সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করতেন। কালাপানিতে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মায়। সেই জন্য সেখানে প্রধানতঃ নারিকেল নিয়ে কারবার। নারিকেল ছোবড়া পিটে বেরা করা, ও তার থেকে দড়ি পাকান প্রধান কাজ। মালা সমেত নারিকেল শাঁস বের করে নিয়ে, ছোবড়া জলে মাস আষ্টেক ভিজিয়ে রেখে তারপর কাঠের হাতুড়ি দিয়ে পিটে পিটে তন্তু বের করে নেওয়া হয়। পরে শুকিয়ে পরিষ্কার করে তার রঙ অনুসারে ভাগ করা হয়। সোনালি রঙের তন্তুকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করা হয়। তারপর বিভিন্ন পণ্য, দড়ি, মাদুর বা ম্যাটিং ইত্যাদিতে রূপায়িত করা হয়। আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছরে প্রায় ১২ কোটি টাকার ছোবড়া রপ্তানী করা হয়। জার্ম্মানী, আমেরিকা, ক্যানাডা ও ইংলণ্ডে ছোবড়া, দড়ি, ম্যাটিং সব চালান দেওয়া হয়।

ক্রমে উপনীত হলাম তৈল বীজের আলমারির কাছে। তার ভিতরে যেন বেনে মশলার দোকান সাজিয়ে রেখেছে। লেখা রয়েছে, ভারতবর্ষই সবচেয়ে বেশি তৈলবীজ উৎপন্ন করে। সরিষা, মসিনা, তিল, নারিকেল, সবই পিষে তেল বের করা হয়। তারপর খোল গরু-মহিষের খাদ্য ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কল-কারখানাতেও তেল লাগে। যেমন, সাবান, শিল্পে, রঙ ও বার্নিশ শিল্পে। কর্ষিত ভূমির প্রায় শতকরা ৮ ভাগ বর্গক্ষেত্র প্রতিবছর বিবিধ তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। তুলার বীজ, রেড়ির বীজ, চিনাবাদাম, পপিবীজ ও মহুয়া। সব সমেত ৬ লক্ষ টন বীজ বছরে উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি যদিও বীজ উৎপন্ন অনেক বেশি পরিমাণে করা হচ্ছে, ভারতের বাহিরে বেশি পরিমাণে পাঠান হচ্ছে না। এদেশে তা' ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বছরে ২১০ লক্ষ মণ তৈলবীজ এখনও রপ্তানি হচ্ছে। আমেরিকা হোল সব চেয়ে বড় ক্রেতা। এর পরে ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইতালি ও হল্যাণ্ড।

তারপর এলাম একটা ছোট শো-কেসের কাছে। তাতে কৃষ্ণনগরের গড়া পুতুল রয়েছে, তামাকের চাষ, তামাক পাতা সংগ্রহ ও প্যাক করা দেখাবার জন্য। তামাক সম্বন্ধে বিশেষ আকৃষ্ট হলাম, নিজে সেবন করি বলে নয়, আমাদের বাঙলার অন্যতম পণ্য বলে। মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে ১৬০৫ সালে এদেশে পর্ত্তুগীজরা তামাকের চারা আনে।

এখন সারা দেশে তামাকের অল্পবিস্তর চাষ করা হয়। বাঙালা ও মাদ্রাজ প্রদেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে চাষ হয়। বিহারেও কতকটা হয়। তারপর বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে। তামাকের চারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। তিন মাসেই তামাকের পাতা পাকতে থাকে। সাধারণতঃ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে তামাকের পাতা চয়ন করা হয়। বিঘা প্রতি আড়াই থেকে দশ মণ পর্যন্ত পাতা উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রতি বৎসর দশ কোটি মণ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ এ বিষয়ে অগ্রণী।

মাদ্রাজ প্রদেশে গান্টুরে তামাকের ভাল চাষ হয়। বাঙলায় হয় রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে। উত্তর-গুজরাটেও কিছু পরিমাণে হয়। উৎপাদিত তামাক এ দেশে বেশি ব্যবহার করা হয়। সামান্য পরিমাণ, প্রায় ৪০ লক্ষ মণ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এর মূল্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা। অবশ্য গত পাঁচ বছরে রপ্তানির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আমেরিকাতে আমাদের দেশী তামাক যায় না। সে দেশের ভার্জিনিয়ার তামাক বিখ্যাত। আমাদের তামাক কেনে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ ও জাপান। তথাকথিত বর্মাচুরুটের তামাক রংপুর থেকে রপ্তানি হয়।

দেয়ালে আসাম ও দার্জিলিংয়ের চা-বাগানের বড় বড় ছবি রয়েছে দেখলাম। ভারতবর্ষে চায়ের চাষের অনেক আগে থেকে চীনদেশে চায়ের প্রচলন ছিল। আসামের জঙ্গলে চা-গাছ ছিল। পানীয় হিসাবে ব্যবহারের জন্য চায়ের চাষ সব প্রথম সুরু হয় ১৮৩৪ সালে চীনাদের চায়ের কারবার ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। পাঁচ বছর পরে লণ্ডনে ভারতবর্ষ থেকে সর্বপ্রথম চা রপ্তানি করা হয়। আটটি চায়ের বাক্স পাঠান হয়। ওজন সবশুদ্ধ ৩৫০ পাউণ্ড। ১৮৩৯ সালের ১০ই জানুয়ারী লণ্ডনে নীলামে ঐ চা বিক্রি হয়। এক পাউণ্ডের দাম ওঠে ১৬ শিলিং থেকে ৩৪ শিলিং পর্যন্ত! ভারতীয় চা বাঁধা কারবার হিসাবে পরিগণিত হোল এর প্রায় ৩০ বছর পরে। ৫০ বছর আগে চায়ের চাষ হোত ১২০০,০০০ বিঘা জমিতে। এখন হচ্ছে ২৪০০,০০০ বিঘাতে। তখনকার দিনে বাৎসরিক উৎপন্ন চায়ের ওজন ১২৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। আর এখনকার ৪১০,০০০,০০০ পাউণ্ড। অর্থাৎ জমির আয়তন যেখানে দ্বিগুণ হয়েছে, সেখানে উৎপন্ন চায়ের ওজন হয়েছে তিনগুণ। ইতোমধ্যে চা-চাষের প্রণালীর উন্নতি হয়েছে, চায়ের জাত ভাল করবার চেষ্টা হয়েছে, আর ভারতবর্ষের চা জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেছে। আজ ভারতবর্ষ চায়ের শিল্পে সব চেয়ে বড় হয়েছে। একা ভারতবর্ষই সারা পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ চা যোগায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে বেশির ভাগ চা আসাম, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে জন্মায়। আর কিছু হয় মালাবার উপকূলে। এখন এদেশে ৩,১০০ চায়ের বাগান আছে। প্রায় ১০ লক্ষ লোক এই শিল্পে কাজ করে। এই শিল্পের মূলধন অন্যূন ৫২০ কোটি টাকা। এই সব ইতিবৃত্ত ছাড়াও চা কেমন করে তৈরি হয় তা' ছবিতে পর পর দেখান হয়েছে। চা-বাগানের জীবন সম্বন্ধে এই মিউজিয়মে চলচ্চিত্রে মাঝে মাঝে দেখান হয়। ইংলণ্ডে এমন বাড়ীতে যাইনি যেখানে চা পানীয়রূপে ব্যবহার না হয়। অথচ ভারতবর্ষে লোকসংখ্যার অনুপাতে চায়ের চাহিদা তত বেশি নয়। বছরে মাত্র ৮০ কোটি পাউণ্ড। প্রতি বৎসর বিদেশে ৩০০ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। তার মধ্যে ২৫৫ কোটি পাউণ্ড কেবলমাত্র ইংলণ্ডে পাঠান হয়। পানীয় হিসাবে চা তুলনায় সস্তা। এক পাউণ্ড চা-পাতা থেকে ২০০ পেয়ালা চা তৈরি হয়।

কফি ভারতের অন্যতম পণ্য। দক্ষিণ-ভারতের প্রায় ৬ লক্ষ বিঘা জমিতে কফির চাষ হয়। এই কারবারে একলক্ষ মজুর কাজ করে। যে সব জমিতে এখন কফি চাষ হয়, আগে সে সব পতিত জমি ছিল। তার থেকে সরকারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাৎসরিক প্রায় ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার মণ কফি উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে এদেশে ২ লক্ষ ১৬ হাজার মণ ব্যবহার হয়, আর বাকী ২ লক্ষ ৭০ হাজার মণ রপ্তানি হয়। ভারতীয় কফি ভারতীয় চায়ের মত বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। প্রায় একশ' বছর হোল কফিশিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে। ইংলণ্ড ছাড়াও, ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ডে কফি রপ্তানি হচ্ছে।

মশলা-দ্রব্য ভারতের প্রাচীন পণ্য। ইংরাজ আগমনের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন দেশে মরিচ, আদা, এলাচ, লঙ্কা ও দারুচিনি প্রভৃতি মশলা দ্রব্য রপ্তানি হোত। মরিচ একজাতীয় লতার ফল। মরিচ ফল রোদে শুকোলে কাল হয়ে যায়। দারুচিনি তেজ গাছের ছাল। বার বছর গত হলে এই গাছ পুষ্ট হয় ও তারপর থেকে বছরে দুবার করে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। বাজারে আমরা যা' দারুচিনি দেখি তার বেশির ভাগই দক্ষিণ-ভারত থেকে আসে। এলাচ আসে মালাবার উপকূল ও মহীশূর থেকে। লঙ্কা অবশ্য ভারতবর্ষের সব প্রদেশে জন্মায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পোর্তুগীজরা ব্রাজিল থেকে এদেশে লঙ্কা নিয়ে আসে। বললে হয়ত আপত্তি করবেন, মশলার কোন খাদ্যগুণ নেই। কেবল ভোজ্যের আস্বাদ বাড়াবার জন্যে এ সব ব্যবহার করা হয়। উৎপন্ন মশলার প্রায় সবটা দেশেই ব্যবহার করা হয়। সামান্য পরিমাণ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বৎসরে প্রায় ১৩ কোটি টাকার মসলা ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়।

বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে ধান জন্মায়। চাল আমাদের প্রধান খাদ্য। আমরা "ভেতো বাঙ্গালী" নাম পেয়েছি। সারা ভারতবর্ষের কর্ষিত ক্ষেত্রের তিন ভাগের এক ভাগে ধানের চাষ করা হয়। ধান-ক্ষেত্রের বর্গ-আয়তন কম নয়। সমগ্র ইংলণ্ডের আয়তনের চাইতে বড়। এদেশে বছরে ৭০ কোটি মণ চাল উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে চালের চাহিদা এত বেশি যে বিদেশে বেশি চাল রপ্তানি করা হয় না বরং ব্রহ্মদেশ থেকে আরও চাল আমদানি করা হয়।

উত্তর-ভারতে গম জন্মায়। ৯ কোটি বিঘা জমিতে গমের চাষ হয়। সরকারী কৃষি-বিভাগ গমের চাষের কিছু উন্নতিও করেছে। পাঞ্জাব প্রদেশে সব চেয়ে বেশি পরিমাণে গম উৎপন্ন হয়। তারপর যুক্তপ্রদেশে ও সব শেষে মধ্যপ্রদেশে। বছরে ২৭ কোটি মণ গম ভারতবর্ষে উৎপন্ন করা হয়। পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়ায় সব চেয়ে বেশি গম জন্মায়। তারপর জন্মায় আমেরিকায়। এদেশে উৎপন্ন গমের বেশির ভাগ এদেশেই ব্যবহার হয়। সামান্য কিছু, প্রায় দুই কোটি টাকার গম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বেশির ভাগই ইংলণ্ডে যায়। আর কিছু যায় মিশর, আরব ও পারস্য দেশে। ধান ও গম ছাড়াও অন্য খাদ্যশস্যও ভারতবর্ষে জন্মায়। যেমন কোদো, কলাই, বার্লি, ভুট্টা ইত্যাদি। তবে এ সব শস্য রপ্তানি করা হয় না।

ফলের মধ্যে আম অনেক দেশে চালান দেওয়া হয়। অবশ্য ঠাণ্ডা-রাখা ঘর ইত্যাদির তত বেশি প্রচলন আমাদের দেশে না থাকাতে এ চালানি ব্যবসায় আমাদের গরম দেশে তত সফল হয় নি। তা সত্ত্বেও কিছু পরিমাণ আম বিদেশে রপ্তানি হয়। বিলাতে বসে আম আস্বাদও করেছি। তবে দাম একটা আমের ১০ শিলিং অর্থাৎ সাড়ে

ছ' টাকা! আমসত্ত্ব, টিনের ভিতর আমের টুকরা পুরে, আর আমের চাটনি করে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে চালান যায়। এবার শুনলে বিস্মিত হবেন, ঢ্যাঁড়শ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। পরিমাণ খুব বেশি নয়। যতদূর মনে হচ্ছে ঢ্যাঁড়শই একমাত্র সবজী যা' বিদেশে চালান যায়। এর কারণ কি বলতে পারি নে। হয়ত ইউরোপীয়দের প্রিয় খাদ্য তাই।

যোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পোর্ত্তুগীজরা কাজুবাদামের ব্যবহার এদেশে প্রচলন করে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বহুল পরিমাণে কাজু বাদাম জন্মায়। কাজু বাদামের গাছ প্রায় ২০ থেকে ৩০ ফুট উঁচু হয়। তিন বছর বয়স হোলে প্রথম বাদাম ফলে। বাদামের খোসা ছাড়াবার জন্য খোসাশুদ্ধ অল্প উত্তাপ দেওয়া হয়। খোসাটি আধপোড়া হোলে সহজে ছাড়ান যায়। বাদাম ছাড়াবার কলে দৈনিক ১ হাজার মণ বাদামের খোসা ছাড়ান হয়। উপরের শক্ত খোসাটি ছাড়াবার পরও ভিতরে হলদে রঙের পাতলা একটা খোসা থাকে। সেটিকে ছাড়িয়ে ফেলবার জন্য বাদামটিকে আবার উত্তপ্ত করা হয়। তাতে উপরের পাতলা খোসাটি শুকিয়ে যায়। তখন হাতে করে সেই খোসা সরিয়ে ফেলা সহজ হয়। হলদে রঙের পাতলা খোসাটি ছাড়িয়ে ফেললে বাদামের গায়ের দুধে-রং দৃষ্টিগোচর হয়। এতবার উত্তপ্ত করার ফলে বাদাম একটু ভঙ্গুর হয়ে পড়ে তাই আবার তাকে ঠাণ্ডা করে জল সিঞ্চন করা হয়। তাতে বাদাম নরম হয়ে যায়। আর সহজে চূর্ণ হয়ে যায় না। এই অবস্থায় প্রায় ১২।১৩ সের বাদাম টিনে পুরে বায়ুর পরিবর্ত্তে কারবন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পুরে ঢাকনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর দ্বারা পচন নিবারণ হয়। দক্ষিণ-ভারতে কাজুবাদামের কারবারের বিশেষ প্রচলন হয়েছে। কাজু বাদাম, বাদামের চাইতে সস্তা। অথচ বাদামের বদলে ব্যবহার করা চলে। প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার মণ বাদাম প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। মূল্যের দিক থেকেও কম নয়, প্রায় ২ কোটি টাকা!

পণ্যহিসাবে হরিতকীর চাহিদা খুব বেশি। চামড়া ট্যান করবার জন্য হরিতকী অপরিহার্য্য। হরিতকী গাছের ছবি দেখলাম মিউজিয়মে, তার পাশে ছোট ছালা ভরা হরিতকী। তারপর হরিতকীর ব্যবহারের ইতিবৃত্ত। প্রায় ১৮ লক্ষ মণ হরিতকী এদেশ থেকে ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়। তারপর আর এক বনজ সম্পদ হোল লাক্ষা। লাক্ষা হোল এক জাতীয় পোকার রস। পোকা-গুলি কোন কোন গাছ ছিদ্র করে, গাছের রস টেনে নেয় এবং নিজের শরীর থেকে রস বের করে শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য ধূনার মত এক জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করে যা' লাক্ষা বলে পরিচিত। এই লাক্ষা কেমন করে জন্মায় তার সচিত্র ইতিবৃত্ত সেখানে দেখলাম। লাক্ষা শোধন করে পালিশ, বার্নিশ, গ্রামোফোন রেকর্ড ইত্যাদি তৈরি করে—তার বর্ণনাও দেওয়া রয়েছে দেখলাম। এর উপর কাঠের ব্যবসার কথা ত আছেই। ভারতে ও অন্তর্ভুক্ত ছোট ছোট মিত্ররাজ্যে বনজঙ্গলের অভাব নেই। সেগুন, শাল, শিশু, দেবদারু প্রভৃতি কাঠের তক্তা রয়েছে দেখলাম। সে সব কি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তা সব লেখা রয়েছে। পাশে গাছগুলির ছবি রয়েছে। এবং এ সব কাঠ কিনতে হলে, কোথায় আবেদন করতে হবে তার ঠিকানা পর্য্যন্ত দেওয়া রয়েছে। সেগুন কাঠ জাহাজ-নির্ম্মাণকল্পে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজও ইংলণ্ডে ব্যবহার হচ্ছে। আবলুশ কাঠ, রোজ-উড প্রভৃতি আসবাব পত্র তৈরী করতে ওদেশে ব্যবহার হচ্ছে।

ভারত এত কৃষি ও খনিজ সম্পদের অধিকারী হোল কি করে? এর কারণ অনুসন্ধান করতে হোলে ভারতবর্ষের আবহাওয়ার কথা ভাবতে হয়। ভারতের বিভিন্ন দিকে জলবায়ুর এত পার্থক্য যে বিবিধ শস্য সম্পদ ও গাছপালায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। দারুণ গ্রীষ্ম ও প্রবল শৈত্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দেখা যায়। হিমালয়ে আবহাওয়া ঠাণ্ডা আর স্যাঁতা। আবার উত্তর-ভারত খুব শুকনা। এদিকে দক্ষিণ-ভারতে শৈত্যের লেশমাত্র নেই। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ের আবহাওয়ায় শৈত্যের ভাগ খুবই কম। এদেশে সর্বপ্রধান তিনটি ঋতু, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কম নয়। আসাম অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, ৪৫০ ইঞ্চি বছরে, আর সিন্ধুদেশে মাত্র তিন ইঞ্চি। শস্য জন্মানোর দিক থেকে বর্ষা ঋতুই ভারতের প্রধান ঋতু। ভাল বর্ষা হলে শস্য ভাল হয়। শতকরা ৭০ জন ভারতবাসী কৃষিজীবী। পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে সব শস্য ও ফসল জন্মায় তার অধিকাংশই ভারতের মাটিতে উৎপন্ন করা যায়। এদেশের কৃষিজাত সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, এক হোল ধান, কলাই জাতীয় শস্য যা' প্রাণীর জীবন রক্ষা করে। আর হোল তুলা, পাট জাতীয় সম্পদ যা' দেশবিদেশ থেকে অর্থাহরণের সাহায্য করে।

যে দেশে এত সম্পদ এত স্বাচ্ছল্য সে দেশে আজ খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব। ভাবতে অবাক লাগে। আগেকার দিনে পরাধীনতার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতাম। আজ সেদিন নেই। আজ মনে হচ্ছে, আমাদের জাতির কাজে গোছ নেই, কোন শৃঙ্খলা নেই। তার উপর উর্বর শস্যশ্যামলা দেশ, স্বল্প শ্রমে বেশি ফল আমরা অনেক সময় পেয়ে থাকি। তাই অত্যন্ত অলস হয়ে গেছি আমরা এবং শ্রম-বিমুখতার ফলে নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের সততা, আমরা হয়ে গেছি পরনির্ভরশীল। আমি একটুও বাড়িয়ে বলেছি নে, যে কোন বয়স ধরে যদি অন্য দেশের লোকের সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখি, ত চোখে পড়ে আমরা খাটি অনেক কম, খাঁটিও কম, এমনি হয়ে পড়েছে আমাদের দুর্দ্দশা। এ সবের বড় কারণ আজ আমাদের ঘুচে গেছে, এবার দেখা যাক কত আমরা অগ্রণী হই। সারা পৃথিবী আজ আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে!

রাত্রি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আলোক-লুপ্তা গত-জাগরণা নিবিড়-তিমির-মগ্না
জটিল কুহেলি হানি দশ দিকে সংশয়-ভয়-ক্লিন্না।
অবসাদ-মোহ-বিস্মৃতিময়ী অলস-সুপ্তি-দাত্রী
সত্ত্ব-শৌর্য্য-হারিণী অন্ধা কৃষ্ণা কুটিলা রাত্রি।

অখিল ধরণী নিদ্রা-বিভোর দেহ-প্রাণ-মন ক্লান্ত
অবসর লভি ফিরিতেছে যত তস্কর দুর্দ্দান্ত।
বহুল-আয়াস-লব্ধ চিত্ত নিমেষে হরণ নেত্রী
অতি নির্দ্দয়া চতুরা ভীষণা নিষ্ঠুরা মূঢ়া রাত্রি।

পলকে ত্যজিয়া বহিরাবরণ শুদ্ধ-শান্তি-গাত্রা
তামস-দৃষ্টি-বিগতা সৌম্যা স্নিগ্ধ-প্রজ্ঞা-নেত্রা।
বাসনাশূন্য শুভ্রবৃত্তিগণে অন্তর-লোক-ধাত্রী।
জগৎ-স্বপ্ন-নিবারিণী শ্রেয়ো-নির্বৃতিময়ী রাত্রি।

ক্ষুদ্র প্রকাশ গিয়াছে মুছিয়া জ্ঞান-জ্যোতি অবিলুপ্ত
গহন আঁধারে নিখিল সত্ত্বা রহিয়াছে সদা দীপ্ত।
সেই আলো ধরি চলিতেছে ধীর অমৃতপথের যাত্রী
অসীম বিত্তদায়িনী শুভা আনন্দময়ী রাত্রি।



কেন্দুবিল্ব, জয়দেবের মেলা

শিল্পী : শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪

সেকাল ও একাল

স্বামী শর্ব্বানন্দ

উনবিংশ শতাব্দী পাশ্চাত্য জগতের পক্ষে এক নবীন অভ্যুত্থানের যুগ। এই শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞান এত উন্নতি সাধন করে যে, যাহার বলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বলবীর্য্য-প্রভাবে সমগ্র জগৎকে নিজেদের অধীন করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের পরাক্রমে জলে স্থলে সর্ব্বত্রই সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় এবং এই সাম্রাজ্য-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ঐহিক জীবনের সুখ-সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা লাভ করে। গত শতাব্দীর জড়বিজ্ঞান জগৎকে একটি বৃহৎকায় যন্ত্রবিশেষরূপে কল্পনা করিয়াছিল। সে যন্ত্রটী যেন আপনা হতেই ঘড়ির কাঁটার মত প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আপনি চলিতেছে; সেখানে কোন চেতনবান ব্যক্তি বা পুরুষের স্থান নাই। অতএব ধর্ম্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি অবৈজ্ঞানিক ভুল ধারণা বলিয়াই বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে বিবেচিত হইত। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বল, বীর্য্য, কর্ম্মনৈপুণ্য, সুখ-সম্পদ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাবতীয় ইহজগতের কাম্যবস্তু প্রায় সবই সঞ্চিত হইতেছিল, কিন্তু এই বিশাল সুখ-সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে ছিল না শান্তি, ছিল না স্থৈর্য্য, ছিল না দেবতার স্থান। তাই সাম্রাজ্যবাদের মাদকতায় প্রায় সব জাতিগুলিই উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং তলে তলে ঘনাইয়া আসিতেছিল ধনী ও নির্ধনের ভীষণ সংঘর্ষের তাণ্ডব নৃত্য। যদিও এই সংঘর্ষ তখনও পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তার আত্মপ্রকাশের সমস্ত আয়োজনই হইতেছিল। তাই ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজী ইউরোপ থেকে ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম, সমগ্র ইউরোপ এক প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরির শিখরে অবস্থান করিতেছে; যে কোন মুহূর্তে সেই আগ্নেয়-গিরির অগ্নি-উৎসে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে।

বাস্তবিকই স্বামীজী জগৎবিধ্বংসী মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা বুঝিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে ছিল সবই, কেবল ছিল না মনুষ্যজীবনের মূলসত্য,—উদার নীতি ও আধ্যাত্মিকতা, যার জন্য এই মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা হইয়াছিল।

সে সময় আমাদের ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যভাবে ভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য জগতের নাস্তিক্যবাদ এবং ঐহিক-পরতা শিক্ষিত সমাজকে খুবই উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে ভারতবাসী তাহার প্রাচীন সভ্যতা ভুলিতে বসিয়াছিল। শিক্ষিত-সমাজ পাশ্চাত্য অনুকরণেই বেশী যত্নশীল হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু সে অনুকরণে না ছিল প্রাণ, না ছিল চরিত্রের বল। তাই পাশ্চাত্য দেশের হাব-ভাব, চাল-চলন, বেশ-ভূষা এই সব অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুরই অনুকরণ হইতেছিল, কিন্তু তাহাদের শক্তি-সামর্থ্য এবং চরিত্রগত গুণের অনুশীলনের দিকে কাহারই দৃষ্টি ছিল না। দেশে বিলাসিতার স্রোত প্রবল ভাবে বহিতেছিল। ত্যাগ, তপস্যা, আত্ম-সংযম, দয়া-দাক্ষিণ্য, সেবা এই সব মহৎ গুণ যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল তাহা প্রায় দেশ থেকে লুপ্ত হইবার মত হইয়াছিল। বিশেষরূপে শিক্ষিত-সমাজ—যাঁহারা দেশের নেতৃ-স্থানীয় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই গুণগুলির

বিশেষ অভাব ছিল। শিক্ষিতদের ভিতর অধিকাংশ লোকই সরকারী চাকুরীই জীবনের প্রধান কার্য্য-রূপে গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন প্রায় নিজ পরিবারের ভরণপোষণে এবং সরকারী দপ্তরের কাজেই অতিবাহিত হইত। অন্য কোন রকম জীবনের উচ্চ আদর্শের অনুশীলন করিবার তাঁহাদের সময়ও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক, যাহারা সরকারী চাকুরী নিতেন না এবং অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে অবসর পাইতেন, তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ-দান। তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতের কংগ্রেসই চালাইয়া আসিতেছিলেন এবং এই আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রধান কর্ম্ম ছিল—তখনকার গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে দেখান, এবং তাঁহাদের ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য আবেদন ও নিবেদন। এই কংগ্রেসের অধিবেশন বৎসরে একবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় হইত কিন্তু সমস্ত বৎসর আর কংগ্রেসের কোন্ সাড়া-শব্দ থাকিত না। অধিকাংশ স্থলে কংগ্রেসী-নেতাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য সময় সময় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উচ্চপদ দান করিতেন। ইহা ব্যতিরেকে কংগ্রেসের আন্দোলনে বিশেষ কোন ফল লক্ষিত হইত না। নেতারা মনে করিতেন—আবেদন-নিবেদন করিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের শেষ হইল।

দেশের শতকরা পচানব্বই জন ছিল অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত। তাহাদের জীবন অনেকটা প্রাচীনকালের মতনই ছিল। কুসংস্কার, স্বার্থপরতা, পরপীড়ন, ভীরুতা এই সব অপগুণগুলি তাহাদের জীবনে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। যদিচ তাহাদের ভিতর ধর্ম্মে বিশেষ আস্থা লক্ষিত হইত, তথাপি তাহাদের সে ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচরণ কুসংস্কারেরই রূপান্তর ছিল। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবদের ভিতর দলাদলি বেশ প্রচণ্ডভাবেই চলিতেছিল। সমাজের মধ্যে জাতি-বিভাগ খুব হীনভাবেই জীবনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতের স্থানে স্থানে অস্পৃশ্যতার নামে সমাজের অঙ্গবিশেষের প্রতি হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহার, অনাচার, অত্যাচার প্রভৃতিও বেশ ভালভাবেই চলিতেছিল। এইসব ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া তখন স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, এখন হিন্দুধর্ম্ম ছুঁৎমার্গে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাদের দেবতা হইয়াছে রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি! প্রকৃত ধর্ম্মের অবস্থা পুরোহিত ও স্বার্থপর সঙ্কীর্ণমনা অজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হাতে পড়িয়া অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তখন লোকে বুঝিত ধর্ম্ম মানে কতকগুলো আচার অনুষ্ঠান মানিয়া চলা এবং পূজা-পার্ব্বণে মন্দিরে বা গৃহে দেবতার পূজা এবং কতকগুলি উপাসনার আবৃত্তি করা। সাধারণতঃ ধর্ম্মের সহিত জীবনের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি খুব কমই লক্ষিত হইত। ইহার ফলে ধর্ম্ম সমাজকে সঞ্জীবিত না করিয়া বরং নির্জ্জীবই করিতেছিল।

স্বামীজী আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া তদানীন্তন হিন্দুসমাজের এইরূপ অধঃপতিত অবস্থা খুব ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং এই অধঃপতনের মূল-কারণ কি তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃত অনুশীলন না করিয়া উহার নামে কতকগুলি ভ্রষ্টাচারের অনুবর্ত্তন করিয়াই দেশ এত পতিত ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। তাই তিনি চাহিয়াছিলেন হিন্দুজাতিকে আবার জাগাইতে বেদান্তের সিংহ গর্জ্জনদ্বারা। তিনি চাহিয়াছিলেন যে প্রত্যেক হিন্দু জানুক যে সে ইচ্ছা করিলে তাহার অন্তর্নিহিত মহাশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারে, সে ব্রহ্মস্বরূপই—এই

আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশ্রদ্ধার সহযোগে যদি পাশ্চাত্যদেশের অদ্ভুত আত্মনির্ভর ও আত্ম-প্রচেষ্টা হিন্দুরা নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহলে হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান অনিবার্য্য এবং এই সমন্বয়ের মহা সাধনা ভবিষ্যৎ ভারতকে করিতে হইবে। তখন ভারতবর্ষ পরাধীনতার নিগড়ে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াই পড়িয়াছিল। তাহাকে সচেতন করিতে হইলে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব সেবা-দ্বারা, প্রেমের দ্বারা এবং কর্ম্মযোগের দ্বারা কর্ম্মজীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। তাই স্বামীজী সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বার বার বলিয়াছিলেন যে বেদান্তকে যদি আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে না প্রতিফলিত করিতে পারি তাহা হইলে সব বৃথা হইবে। তাই তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন ঃ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

আর এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন,- -

কিছুদিনের জন্য এখন সমস্ত দেবদেবীর মন্দির তোমরা বন্ধ করে দাও। যে দেবতা প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন বুভুক্ষু নারায়ণ, আতুর নারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণ— এই নারায়ণের সেবা কর। এইরূপ নারায়ণ-সেবা এ যুগে তোমাদের ধর্ম্ম হউক। তাই তিনি এই ভাব, এই কর্ম্মজীবনে বেদান্ত প্রচার করিবার জন্যই ১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াই রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার শিষ্যদের এই বলিয়া প্রোৎসাহিত করিলেন যে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— ইহাই হোক তোমাদের জীবনের লক্ষ্য। তদবধি স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ নারায়ণ-জ্ঞানে নরের সেবারূপ পরম ধর্ম্ম সমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

১৮৯৭ সনে মধ্য-ভারতে প্রবল দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমার খুব পরিষ্কার স্মরণ আছে যে হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষপীড়ীত কঙ্কালসার হইয়া দলে দলে ৺কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি নগরে নগরে অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বিচরণ করিতেছিল। সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুঃখ নিবারণের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোন প্রতিষ্ঠানই চেষ্টা করেন নাই। এক সরকারী কর্ম্মচারীরাই স্থানে স্থানে সাহায্য দান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঝাঁসির একজন তহশিলদার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য সরকারী অর্থের তছ্রূপ করিয়াছিলেন। তাই নিয়ে কাগজে খুব লেখা-লেখি হয় এবং অবশেষে সেই তহশিলদারকে শাস্তি পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তখনকার দিনে দৈবদুর্বিপাক বশতঃ মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনাসকল উপস্থিত হইলে, তজ্জনিত মানুষের কষ্ট নিবারণের জন্য জনসাধারণ নিজেদের কোন দায়িত্বই অনুভব করিত না, বরং তাহারা মনে করিত এ সব কাজ গভর্ণমেণ্টেরই করা উচিত।

১৮৯৯ সনে যখন প্লেগ কলিকাতায় প্রথম দেখা দেয় এবং বিভিন্ন পল্লীতে মহামারীর ভীষণ প্রকোপ, তখন স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের এই প্লেগ-পীড়িতদের জন্য সেবাকেন্দ্র খুলিতে আদেশ দেন এবং সেই বৎসরই রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ হইতে রীতিমত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সেবাকার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্ব-বৎসর উত্তর-বঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল এবং স্বামীজীর প্রোৎসাহে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দজী ও স্বামী ত্রিগুণাতীতজী মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে যান এবং দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের দুঃখ-নিবারণে যত্নবান হন। এই সময় হইতে স্বামীজী আর্ত্ত বুভুক্ষু নারায়ণের সেবায় দেশবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করেন। তাঁহার বক্তৃতা, চিঠি-পত্র এবং

কথোপকথনের ভিতর দিয়া এই সেবাধর্মের উপরই সমধিক আস্থা দেখাইতেছিলেন।

পরে স্বামীজীর এই ভাবধারা ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া দেশবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল তাহার একটি সুন্দর নিদর্শন পাই পরবর্তী কালে: ১৯০৪ সনে পাঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া অঞ্চলে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে বহুলোক মারা যায় এবং সমগ্র জেলাটাই প্রায় গৃহহীন হয়। তখন সেখানে সেবাকার্য করিবার জন্য মাত্র দুইটি বেসরকারী সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একটি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন এবং অপরটি লালা লজপৎরায় গঠিত লাহোরের সেবা-সমিতি। পরে আমরা দেখিতে পাই ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশ স্বামীজীর এই সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এখন কোন স্থলে যদি এইরূপ দৈব-দুর্বিপাক উপস্থিত হয় তাহা হইলে শত শত প্রতিষ্ঠান বা সমিতি ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে সেখানে উপস্থিত হয় এবং আর্তদের আর্তি-নিবারণে যত্নবান হয়। এই পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর ভারতবাসী সম্যক বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহার প্রথম ও প্রধান ধর্ম হইতেছে—স্বামীজীর প্রদর্শিত দরিদ্রনারায়ণ, আর্তনারায়ণ, বুভুক্ষু-নারায়ণের সেবা—মানুষের ভিতর যে দেবতা আছেন, তাঁকে সেবার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা পূজা করা।

পরমহংসদেব তাঁহার কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ভারতবাসীকে দেখাইয়াছিলেন যে ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র কি এবং উহার প্রকৃত স্বরূপই বা কি। কারণ যে আধ্যাত্মিকতা গত পাঁচ সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সভ্যতা, সমাজ-জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের সঞ্জীবনী সুধারূপে বিদ্যমান তাহাই যেন শ্রীরামকৃষ্ণে পূর্ণভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ভারতীয় সভ্যতাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনা-লোকেই তাহা বুঝিতে হইবে এবং স্বামীজী ছিলেন যেন সেই আধ্যাত্মিক বাণীর ভাষ্য-স্বরূপ। তিনি দেখাইয়াছিলেন কেমন করিয়া ভারত নিজের পূর্ব গৌরব আবার ফিরিয়া পাইতে পারে, এবং তা পাইতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক চিন্তাকে সামাজিক জীবনের মূলকেন্দ্র করিয়া জাতীয় জীবনের সর্ব প্রচেষ্টায় উহা প্রতিফলিত করিতে হইবে। সর্বাগ্রে ভারতের আত্মসম্মান জাগাইতে হইবে তার নিজস্ব সম্পদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া। সেই আত্মসম্মানের সঙ্গে থাকিবে আত্মবোধ, স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন। তাই স্বামীজী বার বার বলিয়াছিলেন, "পরাধীন জাতির ইহকাল নেই, পরকালও নেই।"

স্বামীজী দেহত্যাগ করেন ১৯০২ সনে; তখন পর্যন্ত দেশ তাঁর বাণীর গূঢ় মর্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, তবে তাঁহার পাশ্চাত্যবিজয় দেশবাসীকে চমকিত করিয়াছিল নিশ্চয়। কিন্তু তিনি যে রামকৃষ্ণ মিশন-রূপ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন, উহা দ্বারা এবং তাঁহার বক্তৃতা-বলী প্রভৃতির দ্বারাও তাঁহার ভাবধারা দেশের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার অন্তর্ধানের তিন বৎসরের মধ্যে আসিল বাঙ্গলায় এক অদ্ভুত বন্যা ও নবজাগরণ। ১৯০৫ সনে তদানীন্তন বড়লাট কার্জন ভারতবাসীকে অসত্য-নিষ্ঠ ও তাহাদের ভিতর চারিত্রিক গুণের অভাব আছে বলিয়া গালি দেন এবং হঠকারিতার সহিত বঙ্গ বিভাগ করেন। এ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গলার প্রাণে আসিল ঘোর আলোড়ন। যদিও সে আলোড়ন রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবলভাবে দেখা দিল, কিন্তু সেই প্রবল ঝঞ্ঝায় জাগিল দেশের প্রাণ, জাগিল দেশের বোধশক্তি। এই ঘটনার ছয় মাস পূর্বেও কেউ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে বাঙ্গলায় এমন মহাশক্তি সুপ্ত ভাবে ছিল। ১৯০৫ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন

কাশীতে হয়, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই বৎসরই ভারতের কংগ্রেস এক নূতন রূপ নিল। সেই অধিবেশনে কংগ্রেসী নেতাগণ এবং দর্শকবৃন্দের ভিতরেও কি যে এক অদ্ভুত উন্মাদনার স্রোত বহিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন, তবে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে নূতন ভাবতের জন্ম সেই ১৯০৫ সনের ২৮শে ডিসেম্বর কাশীর কংগ্রেস-প্রাঙ্গণেই হইয়াছিল। সেই সঙ্গে সমগ্র বাঙ্গলার জাতীয়তার প্রবল তুফান বহিতে লাগিল এবং তাহার বেগ সমগ্র ভারতে ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইল। সেই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন একদল মহাপ্রাণ বিপ্লববাদী যুবক, যাঁরা এক হাতে লইলেন গীতা ও স্বামীজীর জ্ঞানযোগ এবং অপর হাতে লইলেন বোমা! তখনকার সকল বিপ্লববাদীই স্বামীজীর বাণীতে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর চরিত্রবল, সংযম, ত্যাগ ও আত্মনির্ভর প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইত। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রদর্শিত ভাবে খাঁটি ভারতবাসী হইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের এইসব ভাবধারা দেশবাসীর মনে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে উহার ফলে ইংরাজ-সরকারও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং উহার প্রতিরোধ করিতে গিয়া অন্যায় অত্যাচারের দ্বারা ভারতবাসীর প্রাণে স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রবলতরই করিয়াছিলেন। পরে সেই বিপ্লববাদ যেমন করিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল তাহা বোধ হয় ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই জানেন।

এই ঘটনার প্রায় দশ বৎসর পরে ভারতে আসিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং তিনি তাঁর সঙ্গে আনিলেন তাঁহার অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের নূতন প্রথা। চার পাঁচ বৎসরের ভিতরেই তিনি সমগ্র কংগ্রেসকে নিজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার সে প্রভাবের মূলে ছিল তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও অদম্য কর্ম্মোদ্যম। এই গুণগুলি তাহাকে করিয়া তুলিল "মহাত্মা"। সমগ্র দেশ দিল তাঁহার পায়ে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি। তাঁহার পূর্ব্বে কংগ্রেসের প্রথা ছিল আবেদন-নিবেদন করা এবং নেতারা ছিলেন পাশ্চাত্য রঙ্গে রঙ্গিন। সেই জন্য ভারতের বিপ্লবী দল কংগ্রেসকে একরকম তাচ্ছিল্যের চক্ষেই দেখিত এবং উহার সঙ্গে সংস্রব রাখিত না। কিন্তু মহাত্মাজী কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া ত্যাগ ও অসহযোগ মন্ত্রে দেশের ভিতর এক অদ্ভুত বিপ্লবের ঢেউ তুলিয়া দিলেন। সে বিপ্লবে ছিল না হিংসা বা যুদ্ধের সামরিক আয়োজন, কিন্তু ছিল প্রবল আত্মনির্ভর, ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক অসহযোগিতার সংগ্রাম। সমগ্র দেশ তাঁহার এই নূতন বিপ্লবের ভেরীতে আবার অভিনব ভাবে জাগিয়া উঠিল। স্বামীজী এক জায়গায় বলিয়াছেন, "Him I call a Mahatma whose heart bleeds for the poor" অর্থাৎ তিনিই ঠিক মহাত্মা যাঁর হৃদয় গরীবের দুঃখে গভীর বেদনা অনুভব করে। মহাত্মা গান্ধী সেই গরীব দুঃখী ও হরিজনদের দুঃখে সমবেদনা অনুভব করিয়া তাহাদের এবং নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের দুঃখ নিবারণের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার ভাব এবং কার্য্যধারার মধ্যে ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দুধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিল। সেই জন্যই অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত, কুলি-মজুর ও কৃষকের দল পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর আহ্বানে সাড়া দিল। কংগ্রেস জনসাধারণের সমবেত সহযোগে ক্রমেই মহাশক্তিশালী হইয়া উঠিল। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে কংগ্রেস এবং উহার

নেতাদের বহু কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। ভারত-সাম্রাজ্যের কর্ণধার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, তাঁহার জীবনের উত্তমাংশের প্রায়বিশ বৎসর কাল জেলে কাটাইয়াছিলেন। এইরূপ প্রায় সকল নেতাদেরই নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। অবশেষে এই গভীর ত্যাগ, তপস্যা ও সত্যাগ্রহের ফলে ভগবৎকৃপায় গত আগষ্ট মাসের ১৫ই তারিখে ভারতবর্ষ প্রায় দুই শতাব্দী পরে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও প্রাণে প্রাণে সকলেই গভীর ভাবে অনুভব করিতেছি যে এখন হইতে স্বাধীন ভারতকে তার প্রাচীন সাধনার সিদ্ধিগুলিকে নিজ জীবনে পুনঃ উজ্জ্বল করিয়া জগৎকে দেখাইতে হইবে। ভারতের বিশেষ দান,—আধ্যাত্মিকতার অমর বাণী জগৎকে আবার শুনাইতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে অসুরের কবলে পড়িয়া দেবতা বিধ্বস্ত ও মূর্চ্ছিত, সেই দেবতাকে আবার মানুষের ভিতর জাগ্রত ও পুনঃস্থাপিত করিতে হইবে। ইহাই ভারতের জীবনব্রত। স্বামীজী এক জায়গায় বলিয়াছেন, "The Leviathan is rising again, the future greatness of India shall surpass all her past risings. I hear the murmur of the tidal wave that is coming." কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, এই বিপুলকায় ভারত আবার জাগিতেছে, তার এবারকার উত্থান পূর্ব্বের সমস্ত উত্থান-গৌরবকে ম্লান করিয়া দিবে। বাস্তবিক সেই মহামনীষীর অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ বাণী যে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে আমরা সকলেই ইহা মনে-প্রাণে অনুভব করিতেছি।

প্রভুর নামই জয়যুক্ত হউক।

ভিক্ষা

শ্রীসৌরীন দে, এম-এ, বি-এল

গানে গানে
চলবে জানি
তোমার আমার জানাশোনা
না-ই যদি হয়
চোখের পরিচয়,

ব্যথার দিনে
সঙ্গোপনে
তাই তো ভাসাই গানের ডিঙা—
তোমার কূলে
পৌঁছুবে নিশ্চয়।

রুদ্ধ মেঘের
ঝঞ্ঝাপাতে
চিকুর মুখর বাদল রাতে
প্রদীপ যবে
হাওয়ায় নিভু নিভু,

ব্যাকুল চিতে
মনের বীণ
বাজিয়ে গেছি সঙ্গীহীন,—
তোমার সাড়া
হয় নি নীরব কভু।

তোমার ওপার
অনেক দেরী,
চলব' বেয়ে জীর্ণ তরী
জীবন ভ'রে
তোমার মিলন আশে,

আকাশ যদি
না দেয় আলো
মেলে আঁধার কালোয় কালো,
সুরের আলো
জ্বালবো পথের পাশে।

ভিক্ষা আমার
হে মোর প্রিয়
ইচ্ছা না হয়, নাই বা দিও
পথের মাঝে
তোমার দরশন,

শুধু তোমার
গানে গানে
দুঃখ সুখের সঙ্গীসম,
ভরুক আমার
পরাণ অনুক্ষণ।

তেজ-নির্গমন

অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সি

আদিম মানব যে দিন দুইখণ্ড কাষ্ঠঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইল সেদিন হইতে তাহার জয়যাত্রা সুরু হইল। রাসায়নিক দহন-ক্রিয়ার সাহায্যে উৎপন্ন তেজ তাহার করায়ত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং ক্রমে সে সভ্য হইয়া উঠিল। দীর্ঘ-কাল ধরিয়া এই অগ্নির সাহায্যে সে রন্ধন করিত এবং কঠিন শীতের দিনে এই অগ্নি তাহার গৃহের তাপ রক্ষা করিত। সেইজন্য সে অগ্নিকে পূজা করিত। তেজকে গতিতে রূপান্তরিত করা অনেক পরের ইতিহাস এবং মানুষের আদিম প্রবৃত্তি ধ্বংসকার্য্যেই এই রূপান্তর সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগ করিয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রজার বেকন্ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সোডা, অঙ্গার এবং গন্ধকের মিশ্রণে অতি দ্রুত দহনকার্য্য চলে এবং এই দহনকার্য্যের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করিয়া শত্রুপক্ষীয় জাহাজ এবং দুর্গাদি ধ্বংস করা চলে। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে এই উপায়ে এক জাহাজ অন্য জাহাজ ডুবাইয়া দিত, যদিও এই জাহাজসমূহ ছিল কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং পালে চলিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তেজের সাহায্যে বাষ্পচালিত যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হইল এবং আরও দুইশত বৎসর পর তৈলচালিত ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইল যাহাতে সোজাসুজি তৈলকে বাষ্পীভূত করিয়া সেই বাষ্পকে দহনক্রিয়া দ্বারা ইঞ্জিন চালনা করা হয়। বাষ্পীয় এবং তৈলচালিত যন্ত্রসমূহে দহনক্রিয়ার জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন তাহা তৈল বা কয়লার মধ্যে থাকে না; বায়ুমণ্ডল হইতে এই অক্সিজেন গ্রহণ করা হয়।

প্রায় এই সময়েই জানা গেল যে, এমন কতগুলি যৌগিক পদার্থ আছে যাহার মধ্যে অঙ্গার এবং অক্সিজেন বিদ্যমান। এই প্রকার যৌগিক পদার্থের দহনক্রিয়ার জন্য বাহির হইতে অক্সিজেন আমদানীর প্রয়োজন হয় না; পদার্থের অভ্যন্তরস্থ অক্সিজেনই দহনক্রিয়া চালায়। ফলে সম্পূর্ণ দহনকার্য্য নিমেষমধ্যে সংঘটিত হয় এবং যে গ্যাস নির্গত হয় তাহার চাপ অত্যন্ত অধিক। সুতরাং যে আবরণের মধ্যে এই পদার্থকে রাখা হয় তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গ্যাস নির্গত হয়। এই জাতীয় পদার্থকে বিস্ফোরক পদার্থ বলা হয়।

পদার্থের গঠন আলোচনা করিয়া জানা যায় যে পদার্থমাত্রই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। বিভিন্ন পরমাণুর বিচিত্ররূপ সমাবেশে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ গঠিত হয়। যেমন দুইটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু লইয়া একটি জলের অণু গঠিত। আটটি অঙ্গার ও আঠারটি হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা একটি পেট্রলের অণু এবং তিনটি অঙ্গার, পাঁচটি হাইড্রোজেন তিনটি নাইট্রোজেন ও নয়টি অক্সিজেন পরমাণু সহযোগে নাইট্রোগ্লিসারিণ নামক এক অতি বিস্ফোরক পদার্থের অণু গঠিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ায় যখন একটি যৌগিক পদার্থ অপর একটি যৌগিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয় তখন পরমাণু-সমূহের অবস্থানের পরিবর্ত্তনের জন্যই ইহা ঘটে। প্রায় সবক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্য

তাপের প্রয়োজন। এক টুকরা কয়লা উত্তপ্ত করিলে কয়লার উপরিস্থিত অঙ্গার পরমাণু বাতাসের অক্সিজেন পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া দহনক্রিয়া চালায় এবং তাপ উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপারটি অতি ধীরে সংঘটিত হয় কারণ পদার্থের বহিঃস্থিত পরমাণুসমূহই কেবল বাহিরের অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পায়। মোটরইঞ্জিনে যে পেট্রোল পোড়ান হয় তাহাতে অপেক্ষাকৃত দ্রুত দহনকার্য্য চলে কারণ পেট্রোলকে প্রথমে বাষ্পীভূত করা হয় বলিয়া পেট্রোল অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত হয় এবং অধিকসংখ্যক পেট্রোলের অণু বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে পারে। সেই কারণে কয়লাকে সূক্ষ্মচূর্ণে বিভক্ত করিলে দহনক্রিয়া দ্রুততর হইবে। পেট্রোলের অঙ্গার ও হাইড্রোজেন পরমাণু বাতাসের অক্সিজেন অণুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দহনকার্য্য সম্পন্ন করে, কারণ যে দুইটি অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগে অক্সিজেন অণু গঠিত হয় সেই পরমাণু দুইটির মধ্যেকার আকর্ষণ অপেক্ষা অক্সিজেন পরমাণুর উপর অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর আকর্ষণ বেশী। নাইট্রোগ্লিসারিণ বা অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থের ক্রিয়া একটু স্বতন্ত্র ধরণের। প্রত্যেক বিস্ফোরক পদার্থে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। যখন কোন বিস্ফোরক পদার্থকে বিশেষ এক তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয় তখন পরমাণুসমূহের স্পন্দন বর্দ্ধিত হইয়া এমন এক অবস্থায় পৌছায় যাহাতে পদার্থের অক্সিজেন পরমাণুসমূহ পদার্থের অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর অতি নিকটবর্ত্তী হয়। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত অক্সিজেন পরমাণুর অত্যধিক আকর্ষণ হেতু পরমাণুসমূহের পূর্ব্বের অবস্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন রকমের অবস্থান ঘটে এবং জটিল অণু মুহূর্ত্তমধ্যে ভাঙ্গিয়া প্রচুর তেজ উৎপন্ন করে। প্রকৃতপক্ষে দহন এবং বিস্ফোরণ একই ক্রিয়া। এক গ্রাম পেট্রোল বাষ্প ও অক্সিজেনের দহনে ২৫০০ ক্যালোরি তাপ নির্গত হয় অথচ এক গ্রাম টি এন্ টির (T. N. T.) বিস্ফোরণে ১০০০ ক্যালোরি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম ক্রিয়াটি ঘটিতে ১/১০ সেকেণ্ড সময় লাগে এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াটি ১/১০০০০০০ সেকেণ্ডে ঘটে। সেইজন্য বিস্ফোরণের ধ্বংসকারিতা এত অধিক। এখানে বলা আবশ্যক যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাইবার পূর্ব্বে পদার্থে বাহির হইতে তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেলে ঐ ক্রিয়া হইতেই তাপ উদ্ভূত হয়। সেইরূপ বিস্ফোরক পদার্থে বাহির হইতে এমন ভাবে তাপ বা প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে হইবে যাহাতে পরমাণুসমূহ বিশেষরূপে স্পন্দিত হয়। যদি বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ না করিয়াও রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিত তবে কাষ্ঠ, কয়লা বা বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত হইবার পর-মুহূর্ত্তেই দহনক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যাইত এবং এই দহনক্রিয়াকে সংযত করিবার কোন উপায়ই মানুষের থাকিত না।

পদার্থের উপর রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে তাপ উৎপন্ন করিয়া যন্ত্রাদি চালনা করা যায় এরূপ বস্তুসমূহের মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য—কয়লা ও তৈল। মানুষের ভাগ্য যে পৃথিবীর উপরিভাগের বিরাট পরিবর্ত্তনের সময়ে বৃহৎ অরণ্যসমূহ এবং সামুদ্রিক প্রাণী ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। উপরে জলের আবরণ থাকায় বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন অরণ্যের কাষ্ঠ এবং প্রাণীর চর্ব্বিকে দহন বা পচন ক্রিয়ার সাহায্যে কার্ব্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসে পরিণত করিতে পারে নাই। পৃথিবীর অভ্যন্তরের চাপে কাষ্ঠ ও চর্ব্বি কয়লায় এবং কেরোসিন তৈলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আমরা ভূগর্ভ হইতে কয়লা এবং কেরোসিন পাইতেছি। কয়লা এবং তৈলের জন্ম একটি আকস্মিক ঘটনা। যন্ত্রদানবের ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া আজ কয়লা এবং তৈলের উপর এমন চাপ

পড়িতেছে যে আর বেশীদিন এই উপায়ে চলা কঠিন। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া প্রকৃতি মানুষের জন্য যে ধনভাণ্ডার কয়লা এবং তৈলরূপে পৃথিবীর বক্ষে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল অমিতব্যয়ী উত্তরাধিকারীর মত মানুষ সেই ধন খরচ করিতেছে ভবিষ্যতের ভাবনা করে না।

এই সঙ্কটে মানুষের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কয়লা এবং তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে—তারপর? যে মানুষ যন্ত্রসাহায্যে দূরকে নিকটে আনিয়াছে, জীবনযাত্রা সহজ ও সুগম করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহা কি শেষ পর্য্যন্ত স্বপ্নই রহিয়া যাইবে? বিরাট আরশির সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া, কাষ্ঠ পুড়াইয়া বা এ্যালকহল হইতে যন্ত্র চালনার কথা চিন্তা করিলেও কয়লা বা তৈলের মত এত সহজে এবং এত প্রচুর পরিমাণে তাপ আর কিছু হইতে পাওয়া যাইবে না, সুতরাং ইহাদের অভাবে বর্ত্তমান সভ্যতা অচল হইয়া পড়িবে। মানুষের এতদিনের রচিত জগৎ কি নূতন রূপ নিবে—কোন অনিশ্চিতের মধ্যে ভবিষ্যতের মানুষ বাস করিবে? ভবিষ্যতের এই অন্ধকার দূরীভূত করিল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু এবং প্রকৃতিই আবার মানুষকে নূতন রত্নের সন্ধান দিল—বিরাট সম্ভাবনায় মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কয়লা বা পেট্রোল হইতে নিষ্কাশিত তেজ পরমাণুর উপরের আবরণের শক্তি। প্রত্যেক রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরমাণুসমূহের স্থান পরিবর্ত্তন হয় মাত্র, পরমাণু নিরেট নয়, বরঞ্চ ফাঁপা এবং ঋণতড়িৎ ও ধনতড়িৎ সম্পন্ন কণিকা দ্বারা নির্ম্মিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বলেন যে প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে একটি ভারী কেন্দ্রক আছে। এই কেন্দ্রকের বিদ্যুৎ ধনাত্মক এবং ইহাকে বেষ্টন করিয়া কয়েকটি ইলেকট্রন আবর্ত্তিত হইতেছে। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কেন্দ্রকের ধনাত্মক বিদ্যুতের সমান; ফলে পরমাণু বিদ্যুৎশূন্য। পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম্ম বহিঃস্থ ইলেকট্রনের উপর নির্ভর করে। হাইড্রোজেনের একটি ইলেকট্রন, হিলিয়মের দুইটি, লৌহের ২৬টি এইরূপে সর্ব্বাপেক্ষা ভারী মূলপদার্থ য়ুরেনিয়মের ৯২টি ইলেকট্রন। রাদারফোর্ডের কল্পিত কেন্দ্রক অনেকটা গ্রীকদার্শনিক ডিমক্রিটাস কল্পিত পরমাণুর মতই নিরেট এবং ইহা ভাঙ্গা চলে না। সুতরাং ইহাই যদি পরমাণুর গঠন বলিয়া ধরা হয় তবে পরমাণুকে ভাঙ্গার অর্থ ইহার বহিঃস্থ ইলেকট্রনকে সরান মাত্র। সুতরাং এই মতে এক পরমাণুকে অন্য পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত করা চলে না।

প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার অন্যরকম। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী রসায়নবিদ্ প্রাউট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে মূলতঃ সব পরমাণুই হাইড্রোজেন পরমাণুর দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের পরমাণু সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাউট অনুমান করিয়াছিলেন যে বিভিন্ন পরমাণুর ওজন পূর্ণ-সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। কিন্তু ক্লোরিণ গ্যাসের পরমাণুর ওজন ৩৫·৫; ইহা একটি ভগ্নাংশ হওয়াতে প্রাউটের মতবাদ ফাঁসিয়া গেল। ১৯১৯ সনে ইংরাজ পদার্থবিদ্ এ্যাসটন প্রাউটের মতবাদ প্রমাণিত করিলেন। তিনি পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়া দিলেন যে ক্লোরিণ পরমাণু দুই প্রকারের। একপ্রকার হাইড্রোজেন হইতে ৩৫ গুণ ও অপরটি ৩৭ গুণ ভারী। পরমাণু সম্পর্কে এ্যাসটনের এই আবিষ্কার অভিনব। এ্যাসটন ইহাদের নাম দিলেন আইসোটোপ। তিনি আরও প্রমাণ করিলেন যে অনেক মৌলিক পদার্থেই এরূপ আইসোটোপ

বিদ্যমান। ১৯৩২ সনে আমেরিকার বিজ্ঞানী এইচ উরে (H Urey) আবিষ্কার করিলেন যে সাধারণ হাইড্রোজেনও দুই প্রকার। একপ্রকার হাইড্রোজেনের পরমাণু অপর প্রকারের দ্বিগুণ ভারী। সুতরাং প্রাউট যে বলিয়াছিলেন যে সকল মৌলিক পদার্থের পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যক ভারী তাহা প্রমাণিত হইল। কাজেই কেন্দ্রক নিরেট না হইয়া কতকগুলি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক বা প্রোটন দ্বারা গঠিত। ১৯১৯ সনে রাদার-ফোর্ড পূর্ব্বের মত পরিবর্ত্তন করিলেন। রেডিয়ম হইতে নির্গত অতি বেগশালী আলফাকণিকা দ্বারা বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে যথার্থই পরমাণুর কেন্দ্রক কতকগুলি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রোটন দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেক প্রোটনের বিদ্যুত ধনাত্মক। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন যে পরমাণুর কেন্দ্রক শুধুই প্রোটন দ্বারা গঠিত নহে কারণ প্রোটনের বিদ্যুৎ এবং ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ সমপরিমাণ এবং মৌলিক পদার্থের আণবিক সংখ্যা পরমাণুর কেন্দ্রকের বহিঃস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান। এখন, অক্সিজেনের আণবিক সংখ্যা ৮ অথচ ইহার ওজন ১৬ বলিয়া কেন্দ্রকে ১৬টি প্রোটন থাকিবার কথা। সেরূপ লৌহের ইলেকট্রন সংখ্যা ২৬ বলিয়া ইহার আণবিক সংখ্যাও ২৬ অথচ ওজন ৫৪ বলিয়া ৫৪টি প্রোটন থাকিবার কথা। ইহা হইতে মনে হয় যেন যতগুলি প্রোটন লইয়া কেন্দ্রক গঠিত তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ প্রোটনের বিদ্যুৎ নাই। অর্থাৎ বিদ্যুৎশূন্য প্রোটন বা নিউট্রন না হইলে পরমাণু গঠন সম্ভব নহে। রাদারফোর্ড এই নিউট্রনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ১৯২০ সনে তিনি কেম্ব্রিজের গবেষণাগারে এবিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিয়া-ছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ইহার বার বৎসর পর জর্ম্মান পদার্থবিদ্ বোথে বেরিলিয়ম পরমাণু চূর্ণ করিয়া নিউট্রন নির্গত করেন কিন্তু তিনি ইহাকে একপ্রকার রশ্মি বলিয়া মনে করিয়া-ছিলেন। ফ্রান্সে আইরীণ কুরী (মাদাম কুরীর কন্যা) ও তাহার স্বামী জুলিয়েঁা প্রমাণ করেন যে এই নির্গত নিউট্রন কোন গ্যাসের মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই গ্যাসের পরমাণুকে অধিকতর গতিশীল করিয়া দেয়। তাহারা নিউট্রনকে 'গামা' রশ্মি বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহারাও ইহাকে একপ্রকার কণিকা বলিয়া ধরিতে পারেন নাই। আরও এক বৎসর পর অধ্যাপক রাদারফোর্ডের সহকর্ম্মী এবং ছাত্র জে চ্যাড্উইক প্রমাণ করেন যে এই নিউট্রন এক প্রকার বিদ্যুৎবিহীন কণিকা এবং প্রোটনের সমপরিমাণ ভারী।

নিউট্রন আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর গঠনে যেটুকু গোলযোগ ছিল তাহা মিটিয়া গেল। কেন্দ্রক প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। প্রোটনের সংখ্যা ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান এবং প্রোটন ও নিউট্রনের একত্রে যাহা ওজন তাহাই পরমাণুর ভর। যেমন অক্সিজেন পরমাণুতে আছে ৮টি প্রোটন ও ৮টি নিউট্রন। অতএব ইহার আণবিক সংখ্যা ৮ এবং ভর ১৬। লৌহ-পরমাণুতে ২৬টি প্রোটন ও ২৮টি নিউট্রন লইয়া কেন্দ্রক গঠিত। সুতরাং ইহার আণবিক সংখ্যা ২৬ ও ভর ৫৪। এখানে বলা আবশ্যক যে নিউট্রন প্রোটন বা ইলেকট্রনের ন্যায় মৌলিক কণিকা নহে; ইহা আসলে প্রোটন কিন্তু সাময়িক ভাবে ইহা বিদ্যুৎশূন্য।

কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া নূতন পরমাণু গঠন সম্ভব। অর্থাৎ এক পরমাণুকে অন্য কোন পরমাণুতে রূপান্তরিত করা চলে। বহুকাল পূর্ব্বে মিশরে এবং আরবদেশে একদল বৈজ্ঞানিক (!) ছিলেন যাঁহারা নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিতে

চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের এ্যালকেমিষ্ট বলা হইত। তাঁহারা মনে করিতেন যে প্রত্যেক মানুষ যেমন আপনার অসদ্‌গুণসমূহ বর্জ্জন করিয়া ক্রমে সৎ হইতে চেষ্টা করে, সুবিধা এবং সুযোগ পাইলে মানুষ আত্মার উন্নতি করিতে পারে, সেইরূপ নিকৃষ্ট ধাতুসমূহ ও উৎকৃষ্ট ধাতু অর্থাৎ স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে সর্ব্বদাই চেষ্টিত। এই পরিবর্ত্তনের সহায়তাকল্পে তাহারা নানাবিধ বৃক্ষের রস ধাতুর উপর প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। যে "পরশ পাথরের" অন্বেষণে তাঁহারা দীর্ঘদিন সাধনা করিয়াছিলেন রাদারফোর্ড পরমাণু ভাঙ্গিয়া সেই পরশ পাথরের সন্ধান দিলেন কিন্তু বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানী এই পরশপাথর দ্বারা নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত না করিয়া অন্য এক বস্তু সৃষ্টি করিলেন যাহা হইল তেজ এবং যাহার মূল্য স্বর্ণ অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রোটনও নিউট্রন সেই পরশপাথর।

রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে তেজ নির্গত হয় পদার্থের কেন্দ্রক ভাঙ্গিতে পারিলে তাহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক তেজ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া তেজ নিঃসরণ সম্ভব করিতে পারিলে কয়লা বা তৈল নিঃশেষিত হইলেও পৃথিবীতে মানুষের কাজের জন্য তেজের অভাব হইবে না—আরও সুবিধা এই যে যে কোন পদার্থের কেন্দ্রক ভাঙ্গিলেই তেজ পাওয়া যাইবে। এক গ্রাম জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করিতে এক ক্যালোরি তাপ প্রয়োজন। এক কিলোক্যালোরি তাপ ইহার হাজার গুণ অধিক। এক গ্রাম কয়লা পোড়াইলে ৮ কিলোক্যালোরি তাপ পাওয়া যায়। এক গ্রাম টি এন টির বিস্ফোরণে এক কিলোক্যালোরি তাপ নির্গত হয়। সুতরাং বিস্ফোরণ অপেক্ষা দহন ক্রিয়ায় তাপ অধিক নির্গত হয় কিন্তু বিস্ফোরণ মুহূর্ত্তমধ্যে ঘটে বলিয়া বিস্ফোরণের ধ্বংসকারিতা বেশী। এক গ্রাম এলুমিনিয়মের কেন্দ্রক হইতে ১৪ লক্ষ কিলোক্যালোরি এবং এক গ্রাম য়ুরেনিয়ম হইতে ১২০ লক্ষ কিলোক্যালোরি তাপ পাওয়া যায় অর্থাৎ এক গ্রাম য়ুরেনিয়ম নির্গত তাপ ১৯ টন টি এন টির বিস্ফোরণে নির্গত তাপের সমান।

কেন্দ্রকের প্রোটনসমূহ বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে চায়; তথাপি কেন্দ্রক ভাঙ্গা অত্যন্ত কঠিন। ইহাতে বোঝা যায় বিকর্ষণ সত্ত্বেও কেন্দ্রকের প্রোটন ও নিউট্রন বিশেষ কোন আকর্ষণ শক্তির সাহায্যে একত্রিত থাকে। এই আকর্ষণের ফলে কেন্দ্রকের প্রোটন ও নিউট্রন যথাসাধ্য অল্পস্থান অধিকার করিয়া থাকে। হিসাবে জানা যায় যে এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন এক গ্রাম কিন্তু এক ঘন সেন্টিমিটার প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন ২৪০০ লক্ষ টন। কেন্দ্রকের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের ফলে কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া যাইতে চায় বটে কিন্তু কেন্দ্রকের উপরিভাগ একপ্রকার আকর্ষণ শক্তির জন্য কেন্দ্রক অটুট থাকে। কেন্দ্রকের গুরুত্ব যত বৃদ্ধি পায় বিকর্ষণও তত বেশী হয় এবং অবশেষে বিকর্ষণ আকর্ষণ অপেক্ষা অধিক হওয়াতে কেন্দ্রক ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা ঘটে। রৌপ্য অপেক্ষা ভারী পরমাণুর কেন্দ্রককে বাহির হইতে শক্তিদ্বারা স্পন্দিত করিতে পারিলে দুইটি টুকরায় ভাঙ্গিয়া যাইবে; অপর পক্ষে রৌপ্য অপেক্ষা হালকা পরমাণুর দুইটি কেন্দ্রক একত্রিত হইলে নূতন কোন পরমাণু গঠন করিয়া প্রচুর তেজ নির্গত করিবে। একমাত্র রৌপ্যের কেন্দ্রকে কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরা যেন বিস্ফোরক পদার্থের উপর অবস্থান করিতেছি। যে কোন পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রচুর

শক্তি ঘুমন্ত আছে—ঘুম ভাঙ্গাইয়া বাহিরে আনিবার অপেক্ষা মাত্র। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সূর্য্য এবং নক্ষত্রসমূহ এই উপায়ে নিজ নিজ তাপ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ কাল হইল এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। মাত্র দুই তিন বৎসর হইল মানুষ এই রহস্য জানিতে পারিয়া এই শক্তি নির্গমনের কাজে লাগিয়াছে। একমাত্র ভবিষ্যৎই বলিতে পারে ইহার ফল কি হইবে।

একমাত্র রৌপ্য ব্যতীত যদি সব মৌলিক পদার্থেরই রূপান্তর সম্ভব তবে পৃথিবীতে একমাত্র রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকিত না। কেন্দ্রকের বিভাজনের জন্য বাহির হইতে খানিকটা শক্তি (কার্য্যকরী শক্তি) ইহার উপর প্রয়োগ করা প্রয়োজন নচেৎ বিভাজন ঘটে না যেমন বন্দুকের ট্রিগার না টানিলে গুলি বাহির হয় না। রাসায়নিক ক্রিয়াতেও এই কার্যকরী শক্তি দরকার যেমন এক টুকরা কাঠকে ঘর্ষণ করিলে বা সামান্য অগ্নি সংযোগ করিলে অথবা কোন বিস্ফোরক পদার্থকে আঘাত করিলে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়; বাহিরের এই কার্য্যকরী শক্তি রাসায়নিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সামান্য মাত্র। সেই জন্যই দেখা যায় যে প্রায় সমস্ত যৌগিক পদার্থে রাসায়নিক শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ আর ইহাতে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব নহে। কয়লা ও তৈলে যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে নাই তাহার কারণ ইহা মাটীর নীচে প্রোথিত থাকায় অক্সিজেনের সহিত সংযোগ ঘটিবার সুযোগ ঘটে নাই কিন্তু মাটী খুঁড়িয়া কোথাও বারুদের স্তূপ বা অতি বিস্ফোরক কোন পদার্থ পাওয়া যাইবে এ কল্পনা নিতান্তই অলীক, কারণ পৃথিবী সৃষ্টি হইবার পর এরূপ কোন পদার্থ থাকিলে এতদিনে তাহাতে রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া গিয়াছে।

কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাইলে যেমন প্রচণ্ড তেজ পাওয়া যায় তেমনি এই ক্ষেত্রে কার্য্যকরী শক্তিও অনেক বেশী। সেই জন্য আজ পর্য্যন্ত বহু মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। একমাত্র নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তাপ প্রচণ্ড বলিয়া কেন্দ্রক বিভাজন-দ্বারা রূপান্তরিত হইতেছে। কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটান কঠিন। এই বিভাজনক্রিয়া তীব্রবেগ-বিশিষ্ট প্রোটন দ্বারা হইতে পারে। একটা অসুবিধা এই যে লক্ষ লক্ষ প্রোটন বেগযুক্ত করিয়া পরমাণুর কেন্দ্রকের দিকে নিক্ষেপ করিলেও লক্ষ লক্ষ প্রোটনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করিবে—অবশিষ্ট প্রোটন পাশ দিয়া চলিয়া যাইবে অথবা কেন্দ্রকের নিকটবর্ত্তী হইলে বেগ মন্দীভূত হইয়া যাইবে। সুতরাং কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাইয়া তেজ নির্গত করিতে পারিলেও মোটের উপর প্রোটনকে বেগযুক্ত করিতে যে শক্তি প্রয়োজন বিভাজন-ক্রিয়ায় তাহা অপেক্ষা কম শক্তি পাওয়া যায়, কারণ মাত্র কয়েকটি প্রোটন আঘাত করে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় নির্গত তেজ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নহে।

১৯৩২ সনে নিউট্রন আবিষ্কৃত হইবার পর বোঝা গেল যে কেন্দ্রক ভাঙ্গিবার পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপযোগী। ইহা বিদ্যুৎবিহীন বলিয়া তীব্র গতিতে কেন্দ্রকের উপর পড়িতে পারে। কাজেই এই উপায়ে কেন্দ্রক চূর্ণ করিয়া তেজ নির্গমন করা সম্ভব যদি না নিউট্রন উৎপন্ন করিতে এবং ইহাকে বেগযুক্ত করিতে অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। কারণ যে শক্তিদ্বারা নিউট্রনকে গতিশীল করা হয় সেই শক্তি যদি কেন্দ্রক-নির্গত শক্তি হইতে বেশী হয় তবে মোটের উপর কোন লাভ থাকে না। কার্য্যক্ষেত্রেও তাহাই দেখা যায়।

১৯৩৮ সনের শেষভাগে জার্ম্মানীতে অটো হান ও এফ্‌ ষ্ট্রাস্‌ম্যান দেখিলেন যে য়ুরেনিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করিলে কেন্দ্রকটি দুইটি টুকরা হইয়া প্রচণ্ডবেগে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তেজ নির্গত হয়। প্রোটো-এ্যাকটিনিয়ম ও থোরিয়মেও এই বিভাজন লক্ষিত হয়। নিউট্রন্‌ কেন্দ্রকের উপর পতিত হইলে কেন্দ্রকে প্রচণ্ড স্পন্দন সৃষ্টি করে এবং পরমাণুর বিভাজন ঘটে। পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে এ্যাকটিনো-য়ুরেনিয়মে স্বল্পবেগ-বিশিষ্ট নিউট্রন পতিত হইলে বিভাজন সহজে ঘটে। সুতরাং আণবিক তেজ নির্গমনের উপায় হইতেছে এ্যাকটিনো-য়ুরেনিয়ম বা য়ুরেনিয়ম হইতে উৎপন্ন প্লুটোনিয়মের বিভাজন ঘটান। এই দুইটি পদার্থের কেন্দ্রকে একটি স্বল্পবেগবিশিষ্ট নিউট্রন আঘাত করিলে কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া দুইটি টুকরা হইয়া তেজ নির্গত করে এবং অন্ততঃ দুইটি নিউট্রন নির্গত হয়। সেই দুইটি নিউট্রন অপর দুইটি কেন্দ্রকের বিভাজন ঘটাইয়া চারিটি নিউট্রন নির্গত করে এবং এইরূপে বিভাজন চলিতে থাকে। হিসাবে জানা যায় যে প্রতিটি কেন্দ্রক বিভাজনে যদি দুইটি নিউট্রন জন্ম নেয় তবে এক গ্রাম এ্যাকটিনোয়ুরেনিয়মকে পরিপূর্ণরূপে বিভাজন ঘটাইতে ৮০ বার নিউট্রন জন্মান প্রয়োজন এবং সমস্ত ব্যাপারটি মুহূর্তমধ্যে ঘটিয়া প্রচণ্ড তেজ নির্গত হয়।

আণবিক বোমাতে এই উপায়ে তেজ নির্গত করিয়া ধ্বংসকার্য্য সাধিত হইয়াছে। যে মারণাস্ত্র আজ মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে ইহাকে সংযত করিতে না পারিলে মানুষের দীর্ঘদিনের সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। এইজন্যই মনীষী আইনষ্টাইন পৃথিবীর প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আবেদন জানাইয়াছেন—তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিতে না দেন। তিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত বলিয়াছেন যে ১৯৪৫ সনের ১৬ই জুলাই তারিখে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে যখন পরীক্ষামূলকভাবে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয় তখন যদি শত্রুপক্ষের সেনানায়কদের আমন্ত্রণ করিয়া উহা দেখান হইত তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন মিত্রপক্ষের হাতে কী ভয়ানক মারণাস্ত্র রহিয়াছে। তখন অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইত এবং হিরোসিমার বীভৎস ধ্বংসলীলা জগৎ প্রত্যক্ষ করিত না। হিরোসিমার আণবিক বোমার আঘাতে যে মেঘপুঞ্জ সৃষ্ট হইয়াছিল আজ তাহা দীর্ঘ কালো ছায়া মেলিয়া পৃথিবী ঘিরিয়া রাখিয়াছে। জাতিতে জাতিতে আণবিক শক্তি লইয়া দ্বন্দ্বে অবিশ্বাস জন্মিয়া উঠিয়াছে। মানুষ প্রকৃতির দান যে আণবিক অগ্নির অধিকারী হইয়াছে সেই অগ্নি জনকল্যাণে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। কয়লা ও তৈলের যুগ যেন চলিয়া যাইতেছে। আবার এখন আণবিক যুগ আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষকে হত্যা না করিয়া আণবিক তেজ সাহায্যে তাহার জীবন-সমস্যার সমাধান করাই প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য। লোককল্যাণে ইহা নিয়োজিত হইলে আজ পৃথিবীর ধ্বংসোন্মুখ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও রক্ষা পাইবে। নূতন আণবিক যুগে জগৎ যেন সুখের স্থান হয়।

স্বামী ত্রিগুণাতীত

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম-এ

স্বামী ত্রিগুণাতীত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সারদা চরণ মিত্র। ২৪ পরগনার এক অভিজাত কায়স্থ বংশে ১৮৬৫ সনের ৩০ জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা-মাতা উভয়ই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও সাধন-ভজনশীল ছিলেন। পিতা-মাতার ধর্মশীলতা পুত্রে সংক্রামিত হইয়াছিল।

বালক সারদাপ্রসন্ন কলিকাতা শ্যামপুকুরের মেট্রোপলিটান স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের গৃহী শিষ্য ভক্ত মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত; সকলের নিকট তিনি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত"-সংকলয়িতা 'শ্রীম' এই গুপ্ত নামেই পরিচিত। সারদাপ্রসন্ন প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমান ও মধুরস্বভাব ছাত্র ছিলেন। ১৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার দ্বিতীয় দিবসে অনবধানতা-বশতঃ তাঁহার সোনার ঘড়িটি চুরি যায়। ইহাতে পরীক্ষায় একটুকু ব্যাঘাত জন্মে এবং তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় আশানু-রূপ ফললাভ করিতে না পারিয়া তিনি অতীব দুঃখাভিভূত হইলেন। প্রিয় ছাত্র সারদাকে দুঃখভারাক্রান্ত দেখিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে বালক সারদা অতীব আকৃষ্ট হইলেন এবং তদবধি যখনই সময় পাইতেন তখনই এই মহাযোগীর শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতেন।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

প্রণাম, তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও সেবা দ্বারা প্রসন্ন হইলে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিবেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবী শিষ্য সারদাপ্রসন্নকে পাদ-প্রক্ষালনের জল আনিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে মহান্ লোকগুরু বালক সারদাপ্রসন্নকে গুরুসেবার এক প্রকৃষ্ট সুযোগ দান করিলেন। বালক তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সেবা করিয়া ধন্য হইলেন। তাঁহার আভিজাত্যের অভিমান চূর্ণ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে গুরুসেবার একনিষ্ঠ ভাব সঞ্চারিত হইল। মেট্রোপলিটান কলেজে ইণ্টার মিডিয়েট্ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিবার সময়েই বালকের পড়াশুনায় উদাসীনতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগ ও আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। পড়াশুনায় অমনোযোগ ও ধর্মার্জনে আগ্রহ দেখিয়া পিতা-মাতা তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিলেন। সংবাদ পাইয়া বালক বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের নিকট বাড়ী হইতে পলায়নের কথা গোপন করিয়া সারদা পুরীর দিকে চলিয়া গেলেন। পথে গভীর বনে অনশনে, অর্ধাশনে, দুঃখ-ক্লেশে দিন কাটাইতে লাগিলেন। পিতামাতা অনুসন্ধান করিয়া পুত্রকে বাড়ীতে ধরিয়া আনিলেন। গৃহে ফিরিয়া মাত্র একমাসের প্রস্তুতিতেই আই-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ



স্বামী ত্রিগুণাতীত, উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক



স্বামী শুদ্ধানন্দ

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪

হইলেন। পড়ার অমনোযোগ দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদার মন পরিবর্তিত করিবার জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন; পুরোহিতগণ ঘোষণা করিলেন যে, বালক সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন।

পুরোহিতগণের কথাই সত্য হইল। বালক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেবদুর্লভ ব্যক্তিত্ব ও অপার্থিব প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিলেন। মহান্ গুরুর উপদেশে শিষ্যের ধর্মজীবন গঠিত হইতে লাগিল। পরমহংসদেব যখন অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থ কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন সারদাপ্রসন্ন অন্যান্য গুরু-ভ্রাতৃগণের সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীগুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর অন্তর্ধানের পর বরাহনগর মঠে গুরুভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত নামে পরিচিত হইলেন।

নিঃসঙ্গভাবে তীর্থভ্রমণের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। ১৮৯১ সনে তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আজমীড, কাথিয়াবাড়, পোরবন্দর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পোরবন্দরে গুরু-ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হইল। পাঁচ বৎসর পর আবার তিনি উত্তরাখণ্ডের দুরতিক্রম্য তীর্থস্থান-গুলি ভ্রমণ করিলেন। কৈলাস, মানস-সরোবর প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণে তাঁহার অসমসাহসিক অভিযান-প্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বহুবার তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি প্রতিবারই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন। তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং গভীর অধ্যয়নে রত হন। অত্যধিক পরিশ্রম হেতু তিনি ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হন। অস্ত্রোপচারের সময় ক্লোরোফরম্ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নাই। তিনি মহাযোগীর মত প্রশান্ত ও নির্বিকার চিত্তে অস্ত্রোপচারক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বরাহনগর হইতে আলম-বাজারে স্থানান্তরিত হইলে স্বামী ত্রিগুণাতীত তথায় গুরুভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। আলমবাজার মঠের যে প্রকোষ্ঠে তিনি থাকিতেন উহাকে প্রকৃতপক্ষে একটি গ্রন্থাগার বলা যাইত। নিজ প্রকোষ্ঠে তিনি একাকী গভীর অধ্যয়নে ডুবিয়া থাকিতেন। অধ্যয়নস্পৃহা ছিল তাঁহার দুর্নিবার। ১৮৯৭ সনে দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

আলমবাজার হইতে বেলুড় মঠের বর্তমান স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থানান্তরিত হইলে নেতা স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছায় ও আদেশে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বভৌম উদার ধর্ম প্রচারের জন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত। 'উদ্বোধনের' মুদ্রণ, সম্পাদনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন, অপরিসীম কর্তব্যনিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 'উদ্বোধন' সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতের এই কঠোর পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা শুনিয়া নেতা স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে এরূপ অভাবনীয় পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধন লোককল্যাণরত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের পক্ষেই সম্ভবপর। কলিকাতা ও মফস্বলের সর্বত্র ভক্তমহল ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'উদ্বোধনে'র বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি যে যত্ন, চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন উহা 'উদ্বোধনে'র ইতিহাসে এক গৌরব-

ময় অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছে। 'উদ্বোধন'কে জনপ্রিয় করিবার জন্য তাঁহার কতই না আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল! তিনিই 'উদ্বোধনে'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৩০৫ সনের মাঘ হইতে ১৩০৯ সনের কার্তিক পর্যন্ত ক্রমাগত প্রায় চার বৎসর তিনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত 'উদ্বোধনে'র পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার বহন করিয়াছিলেন। আজ 'উদ্বোধনে'র জয়যাত্রার 'সুবর্ণ জয়ন্তী' উপলক্ষে তাঁহার অবদান ও কৃতিত্বের কথা আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি।

নেতা স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ত্রিগুণাতীতকে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো শহরে বেদান্ত প্রচারের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত গুরুভ্রাতার আদেশ শিরোধার্য করেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতাবস্থায় তিনি আমেরিকা যাইতে পারেন নাই। ১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক দেহাবসান হইল। এই শোকাবহ ঘটনার কয়েক মাস পর স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকা যাত্রা করিয়া ১৯০৩ সনের ২রা জানুয়ারী সানফ্রান্সিস্কো শহরে উপনীত হন। সদাপ্রফুল্ল, দৃঢ়চেতা, প্রেমিক সন্ন্যাসী অফুরন্ত উৎসাহ লইয়া সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বভৌম ভাবধারা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টাতেই সানফ্রান্সিস্কো শহরে হিন্দু মন্দির স্থাপিত হয়। ইহাই পাশ্চাত্য দেশে সর্বপ্রথম হিন্দু মন্দির। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্যে আমেরিকার বহু নরনারী আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কখন কখন তিনি কতিপয় নির্বাচিত শিষ্যসহ সানফ্রান্সিস্কো হইতে ১৮ মাইল দূরবর্তী কালিফর্ণিয়ার শান্তি আশ্রমে গমন করিয়া ধ্যান-জপ ও তপস্যায় মগ্ন হইতেন। সানফ্রান্সিস্কো হিন্দু মন্দির সম্বন্ধে স্বামী ত্রিগুণাতীত আবেগভরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"আমার বিশ্বাস কর, যদি এই মন্দির-নির্মাণে স্বার্থপরতার লেশমাত্র থাকে, তবে ইহার পতন হইবে। আর যদি ইহা প্রভুর কাজ হইয়া থাকে তবে ইহা স্থায়ী হইবে।" যে ১০।১২ জন পবিত্র উৎসাহী যুবক তাঁহার আশ্রমে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার অমূল্য উপদেশগুলি অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী কালে তাঁহার 'ব্রহ্মচর্য' নামক পুস্তিকাখানি রচিত হয়। আশ্রমের প্রতি প্রকোষ্ঠে এই কয়টি উপদেশ শোভা পাইত—"সাধুর জীবন যাপন করিবে কিন্তু কাজ করিবে অশ্বের মতো." "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন." "সতর্ক হও এবং প্রার্থনা কর"।

আশ্রমে তিনি একজন কঠোর নিয়মানুবর্তী আচার্য ছিলেন। তিনি স্বয়ং ধর্মাচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার আহার ছিল সাত্ত্বিক, শয়ন করিতেন সামান্য শয্যায়। সকল কাজে তিনি নিয়মনিষ্ঠা ও সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করিতেন। জগজ্জননীর ধ্যান-ধারণায় ভরপুর থাকিয়া তিনি সর্বত্র পবিত্রভাব বিচ্ছুরিত করিতেন। বেদান্তপ্রচারের জন্য তিনি "মুক্তির বাণী" (The Voice of Freedom) নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা সাত বৎসর স্থায়ী ছিল।

কঠোর পরিশ্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীতের শরীর বাতাক্রান্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তথাপি কেহ একদিনের জন্যও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে তাঁহার এই দিব্য জীবনের হঠাৎ অবসান হইবে। ১৯১৪ সনের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের (Christmas) তিন দিন পর স্বামিজী যখন সানফ্রান্সিস্কো হিন্দু মন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন এক অব্যবস্থিত-চিত্ত বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক বক্তৃতা-মঞ্চের সম্মুখে একটি বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি তৎক্ষণাৎ

বিস্ফোরিত হইয়া যুবকটির প্রাণনাশ এবং স্বামিজীকে গুরুতররূপে আহত করে। যুবকটি স্বামিজীর একজন পূর্বতন ছাত্র ছিল। হাসপাতালে যাওয়ার পথে ক্ষমাসুন্দর স্বামিজী করুণাভবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেচারা যুবকটি কোথায় আছে ?" তাঁহার এই প্রেমময় আকুল উক্তি ক্ষমার অবতার ক্রুশবিদ্ধ প্রভু যীশুর কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার দুর্বল শরীর এই আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। ১৯১৫ সনের ৯ই জানুয়ারী অপরাহ্নে স্বামিজী সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "আগামী কল্য ১০ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দজীর শুভ জন্মদিবসে আমি শরীর ত্যাগ করিব।" পরদিন বৈকাল ৭-৩০টায় মহাযোগী জীবনের মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার বহুসংখ্যক অনুরাগী ভক্ত, ছাত্র, শিষ্য-শিষ্যা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের জন্য স্বামিজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন।

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' উৎসৃষ্টপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান এইরূপে পাশ্চাত্যদেশীয় নরনারীর মুক্তির জন্য আত্মবলিদান করিলেন।

ব্যর্থ অর্ঘ্য

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

দেবতার কাছে
মানত করেছি
ছেলের মঙ্গল তরে,

পূজার সম্ভার
হাতে ল'য়ে তাই
চলেছি মন্দির দ্বারে।

পথটি রোধিয়া
দাঁড়াইল এক
ভিখারিণী দীন বেশে,

অশুচি ভাবিয়া
হেলাভরে তারে
চলে গেছি রেখে পাশে।

লোক অগণন
দাঁড়ায়ে বাহিরে
লয়ে পূজা-উপচার,

দেবতার পায়ে
দানিতে অরঘ
খুলিলে মন্দির দ্বার।

সচকিতে হেরি
প্রণাম করিয়া
দেবতারে করজোড়ে,

সজল নয়নে
ভিখারিণী বসে
দেবতার বেদী প'রে !

উদ্বোধন

মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

উদ্বোধন অর্থ জাগরণ। উৎ উৎকৃষ্ট বিষয়ে বোধন জাগরণ (ছাঃ ৩।১৭।৭) 'উদ্বয়ং তমসস্পরি, জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং।' নিদ্রাভঙ্গে জাগরণ ঘটে। 'পুরাণে শরৎকালে নিদ্রিতা দেবীর অকালে জাগরণ-প্রচেষ্টাকে বোধনাখ্য কার্য্যকাল বলে—'রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে ব্রহ্মণা বোধে দেব্যাস্তব পুরাকৃতম্। অহমেবাধুনা তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্', ইত্যাদি। ঈশ্বর ঈশ্বরী কথার কথা মাত্র। 'নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং ন পুংসকঃ। পুরুষঃ ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।' গীতা (২।৬৯) বলেন, 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।' যে বিষয়ে সর্ব্বভূত জাগ্রত তাহা সংযমীর রাত্রি, আর যে বিষয়ে সর্ব্বভূত নিদ্রিত তাহাতে সংযমীর জাগরণ। সর্ব্বভূত যে বিষয়-ব্যাপারে জাগ্রত, ইন্দ্রিয়ভোগ পরায়ণ, তাহাই সংযমীর রাত্রি। ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার নিরস্তে 'যেন সর্ব্বমিদং ততম্' তৎসম্বন্ধে সংযমী জাগ্রত হইয়া থাকেন। নিশা নিদ্রার জন্য, নিদ্রা-ত্যাগে জাগরণ। অর্থাৎ বিষয়ব্যাপার-ত্যাগে ঈশ যিনি সর্ব্বব্যাপী নিষ্ক্রিয়, তৎবিষয়ে জাগরণই উদ্বোধন। কেহ বলেন প্রাণিসাধারণ নিজ নিজ দেহ রক্ষার্থ জাগ্রত থাকে।

প্রতি দেহের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি ব্যতীত 'আমি'-নামা এক ব্যক্তি থাকেন। এই 'আমি'-নামা ব্যক্তি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়েই বিদ্যমান। তিনি মন-বুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টা বলিয়া উহা হইতে পৃথক। জাগ্রতে আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা, স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা। লোকে বলে, আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি। সুষুপ্তি হইতে উত্থান করিয়া বলে, আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। এই ত্রিকালস্থায়ী 'আমি' জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞাতা। গীতায় জ্ঞেয় পদার্থকে ক্ষেত্র বলিয়া এই 'আমি'কে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে—এই আমি কে? কোথা হতে আগত? কোথায় যাইবেন? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন? —ইহাও জানিতে হইবে। সর্ব্বদেহে 'আমি' বিদ্যমান আছেন, দেহে দেহে একই ধর্ম্মবিশিষ্ট 'আমি' পরিদৃষ্ট হন। তাঁহারা কি পৃথক্ পৃথক্ বা একেবই সর্ব্বত্র স্থিতি, ইহা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। যখন একজন বৃষ্টিতে অঙ্গন পিচ্ছিল হওয়ায় ভূমিতে পতিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি হাসিয়া উঠে। ইহাতে পৃথক থাকাই অনুমিত হয়। কেহ সরল, কেহ কুটিল, কেহ হিংসক, কেহ অহিংসক, এই নানাত্ব পৃথকত্বের পরিচায়ক। কপিলমুনি এই মতবাদে আস্থা রাখিয়া স্বীয় দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণবা-চার্য্যগণ এবং কোন কোন শৈবাচার্য্য এই মতে বিশ্বাসী। কেবল তাহাই নহে তাঁহাদের মতে জীব ও ঈশ্বর পৃথক—জীব নিত্যদাস, ইত্যাদি। বাইবেলে এডাম-ইভ স্বর্গীয় ইডেন উদ্যানের শ্রমিকরূপে জীবন যাপন করেন। দাসের স্বাধীনতা কল্পনা-জল্পনা মাত্র। জীব স্বাধীন ও শক্তিমান এরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে। জীব নিজ সাধন দ্বারা স্বারাজ্য

লাভ করে, এরূপ শ্রুতি বলেন। জীবের অস্বতন্ত্রতা সাময়িক অহঙ্কারজন্য ঘটিয়া থাকে। অহঙ্কার-মুক্তিতে সে স্বরাট। শ্রুতি বলেন, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। গীতার, 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত' ইত্যাদি বাক্য হইতে সর্ব্বদেহে এক জীববাদ প্রকট হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ কে? ক্ষেত্র বা দেহকে দৃশ্যরূপে দেখিয়া যে দেহবিষয়ক জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞাতাই ক্ষেত্রজ্ঞ।

প্রতি দেহে যে 'আমি'-নামা ব্যক্তি আছেন তিনিই দেহ ও মনবুদ্ধ্যাদির দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ ও 'আমি'র একত্ব আসিয়া পড়ে। প্রশ্ন-উপনিষদ্ বলেন, 'আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্ এতদ্ আততং মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে।' কঠ-উপনিষদ্ বলেন, 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তা ইতি আহুর্মনীষিণঃ।' তৈত্তিরীয় বলেন, 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' এই যে অনুপ্রবেশ তাহাই হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বভাবে স্থিতি। 'গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতম্। যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে যথা অপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে, ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।' এই সকল শ্রুতি হইতে প্রতিবিম্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাগবত পুরাণে 'যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতোগুণঃ। দৃশ্যতেঽসন্নপি 'দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ॥' 'ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রং। বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া স্বপ্নস্ত্রিধা গুণ-বিসর্গ-কৃতো বিকল্পঃ॥' 'বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো ন মে বস্তুতঃ। গুণস্য মায়ামূলত্বাৎ ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥' 'শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥'

কেহ বলেন, বিশ্ব দৃশ্য হইলেও ইহা সিনেমা-হলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ। কেহ বলেন, অলাতচক্রবৎ, জ্বলন্ত মশাল ঘুরাইলে আকাশে যে অগ্নিচক্র দৃষ্ট হয় তাহা যেমন ভ্রান্তিমাত্র তেমন জগৎ ভ্রান্তি মাত্র—মনের বিলাস মাত্র। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে সৃষ্টিসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' ইত্যাদি। সেই বা এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ, অপ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে কারণ-কার্য্যসম্বন্ধ আছে।

কার্য্য কারণেরই বিকাশ মাত্র। এই পঞ্চভূতমধ্যে আকাশ শব্দগুণবিশিষ্ট, বায়ু শব্দ ও স্পর্শ গুণযুক্ত। তেজ শব্দ স্পর্শ ও রূপগুণযুক্ত। অপ্ শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস গুণবিশিষ্ট। ক্ষিতি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ গুণবিশিষ্ট। ইহাতে কারণ হইতে কার্য্যে গুণাধিক্য দৃষ্ট হইতেছে। কার্য্যে যদি কারণ হইতে গুণাধিক্য ঘটে তবে তাহা বহিরাগত জানিতে হইবে। যেমন দুগ্ধ কারণ, দধি কার্য্য। কারণদুগ্ধের ধবলতা কার্য্য-দধিতে দৃষ্ট হয় এবং দধিতে অম্লগুণ অধিক। এই দধির অম্লত্ব কারণদুগ্ধ হইতে আসে নাই, কেননা, দুগ্ধে অম্লত্ব নাই, অম্লত্ব বহিরাগত। তেমনি আত্মার অস্তিতামাত্র আছে। এজন্য কার্য্য আকাশের অস্তিতা কারণ আত্মার অস্তিতায় বিকাশ বটে। আত্মা নির্গুণ। আকাশে শব্দগুণ অধিক আছে, সুতরাং কারণ হইতে গুণাধিক্য এই শব্দগুণটী বহিরাগত, ইহা বলিতেই হইবে। তেমনি আকাশে স্পর্শগুণ নাই। সুতরাং বায়ুর স্পর্শগুণ বহিরাগত। তেজের রূপগুণ কারণবায়ুতে নাই, সুতরাং বহিরাগত। অপের রসগুণ কারণতেজে

নাই, সুরতাং উহা বহিরাগত। ক্ষিতির গন্ধগুণ অপে নাই সুতরাং উহা বহিরাগত। অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ তন্মাত্র কারণস্বরূপ আত্মায় নাই ও তাহা হইতে আসে নাই, উহারা সবই বহিরাগত। সেই বহিরাগত নানা গুণময়ীকে মায়া বা প্রকৃতি বা তমঃ বলে। সুতরাং আত্মা হইতে সৃষ্টিকালে মায়া উপস্থিত ছিল, যাহা হইতে শব্দ স্পর্শাদি আসিয়াছে। অর্থাৎ মায়াসন্নিহিতে সৃষ্টি। অখণ্ডের অস্তিতা যেমন তেমনই আছে।

সৃষ্টিবিষয়ে গীতা বলেন 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানাণি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।' আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন, আবার 'তম আসীৎ' বলিয়া তম সমাগমে তমাবৃতে বা তমের অঞ্চল হইতে নানাত্বের উদ্ভব। তমাবৃতে হিরণ্যগর্ভ হিরণ্যবর্ণ জ্যোতিস্বরূপ মায়াবেষ্টনীতে গর্ভে স্থিত। দশম মণ্ডলে বেদ বলিয়াছেন—'ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্য অধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।' এই সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল কেহ কি ধারণ করে বা করে না? যিনি পরম ব্যোমস্থিত অধ্যক্ষ পুরুষ তিনি জানিতে পারেন অথবা তিনিও জানেন না? ভূতপঞ্চক মায়া হইতে আগত পুরুষ তাহা না জানিতে পারেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণু যখন ঘোর নিদ্রাভিভূত তখন তাঁহার অজ্ঞাতে 'সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত তৎপরত্বেন নির্ম্মল' অশরীর পুরুষের কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভনামা দৈত্যদ্বয় ও নাভি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটে। কর্ণমল মায়ামল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সৃষ্টি মায়িক হইলে সমাজ-জাতি তদতিরিক্ত হইতে পারে না। যতই দীর্ঘ হউক বিনশ্বর, এজন্য বৌদ্ধগণ 'ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যং' বলেন।

ভাগবত পুরাণ সৃষ্টি মনোবিলাস বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, যখন মন ক্রিয়াশূন্য তখন জগৎ নাই। যেমন ডাক্তার ক্লোরফরম করিলে, মূর্চ্ছাকালে, সুষুপ্তিকালে সমাধিদশায়। আর যখন মনস্পন্দন হয় তখন জগৎ ভাসে, যেমন স্বপ্নে ও জাগ্রতে। মন অন্তঃকরণ দেহাভ্যন্তরে থাকে, সেখানেই সে নিজ দপ্তরে কাজ করে—রচনা করে, যেমন টেলি-স্কোপের লেন্স নলের ভিতরে থাকিয়াই গ্রহাদি দেখায়, তেমনি মন দেহের মধ্যে থাকিয়াই সব দেখায়। স্বপ্নে মনে যে জগৎ ভাসে তাহা প্রাতিভাসিক। জাগ্রতেও মন যে জগৎ দেখায় তাহাও প্রাতিভাসিক। উভয়ই একই মনের স্পন্দন ব্যাপার। স্পন্দনের তারতম্যে যেমন কয়লা ও হীরক পৃথক মনে হয়, ইহাও তেমনি। কয়লা ও হীরক এক জাতীয় বলিয়াই গৃহীত হয়।

নব বিজ্ঞান বলে, 'Matter is a stage of motion.' জগৎটাও Matter, সুতরাং 'It must be a stage of motion.' কার motion বা স্পন্দন? মনের আবরক মনের স্পন্দনে জগৎ ভাসে, ইহা আবৃত চিদাভাসের কার্য্য বলিয়া গৃহীত হয়, যেমন চাঁদের নাচনি জলে দেখা যায়, জলের নাচনি চাঁদে আরোপিত হয়, তেমনি মনের নাচনি পুরুষে আরোপিত হয়। পুরুষ সাক্ষী—কর্ত্তা নয়। এজন্য ক্ষণিক জগতের মোহ ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় পুরুষই চিন্তনীয় এবং ইহাতেই মানবের কৃতকৃত্যতা। অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

স্বাধীন ভারতে শিল্পের স্থান

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

আজ ভারত স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের পতাকা গৃহে গৃহে উড়াইলেই স্বাধীনতা আসে না।

"তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি,
তোমার সেবার মহান দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি।"

কবি অবশ্য এ গান লিখিয়াছিলেন ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া। আজ স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়িতেছে; সুতরাং ভারতবর্ষকে উদ্দেশ করিয়াও আজ একথা বলিতে পারি।

বাহিরের শাসন চলিয়া গেলেই স্বাধীনতা আসে না। সেই স্বাধীনতা যদি আমাদের অন্তরে অনুভব না করি এবং সেই স্বাধীনতা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিফলিত না হয়, তবে কি তার সার্থকতা আছে? বিদেশী শুধু এতদিন আমাদের বাহিরে রাজত্ব করে নাই, তারা আমাদের মনোজগতে প্রবেশ করিয়া সাংস্কৃতিক জীবনেও বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। আজ সময় আসিয়াছে, সে সব তলাইয়া দেখিবার। আজ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে দেখিতে হইবে নূতন আলোকে। তাহাকে এখন করিতে হইবে পুনর্গঠন। সকল শিল্পকেন্দ্রকেই স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন ভারতের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে।

বিদেশীদের কাছে এতদিন যাহা ভুল শিখিয়াছি, আজ তাহার সংশোধন করিতে হইবে। তাহাদের আজ্ঞায় থাকিয়া আমাদের হইয়া গিয়াছিল inferiority complex; আমরা মনে করিয়াছি, আমাদের যা কিছু তা নিকৃষ্ট, আর পশ্চিমের যা কিছু ধার করিয়া পাওয়া সবই উৎকৃষ্ট।

আজ দেখিতে হইবে জাতীয় জীবন ও জাতীয় ভাব গঠনের পক্ষে কিরূপ শিক্ষা প্রয়োজন। আমরা স্বাধীনতাদ্বারা বুঝিয়া থাকি, সকলের জন্য ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানুষের রুটীর প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু A man does not live by bread alone. তাহার এই রুটীর সঙ্গে চাই আনন্দ। আমাদের রুটীর সঙ্গে আনন্দ থাকিলে স্বাধীনতা সার্থক হইবে। পশ্চিমের একজন মনীষী বলিয়াছেন, সকলে অর্থ-লালসার দিকে ছোটে, কিন্তু তাহারা কেবল তাহাতেই আনন্দ পায় না, কারণ একমাত্র অর্থই সুখ দিতে পারে না। তাহাকে কাজের সঙ্গে সৌন্দর্য্য দাও, আনন্দ দাও।

আমাদের প্রত্যেক কাজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঠিক করিতে হইবে, আমাদের আদর্শ কি? কবি যে বলিয়াছেন, "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" তাহা কি করিয়া সম্ভব হইবে? অন্যান্য দেশের রাজনীতির আদর্শে দেখিতে পাই, সাম্রাজ্যবাদ —পরদেশকে দলন ও লুণ্ঠন। আমাদের দেশ যখন উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তখন অন্যদেশে বিজয়বাহিনী প্রেরণ করে নাই, পাঠাইয়াছিল শান্তি ও ও প্রেমের বাণী। ভারতের রাজনীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে অশোকের নীতিতে। আজ স্বাধীন ভারত তাহার পতাকায় অশোকের চক্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদর্শকেই গ্রহণ করিল এরূপ ইঙ্গিত করিতেছে, আর ইঙ্গিত করিতেছে অগ্রগতি। আজ ভারত সকল পৃথিবীর সঙ্গে সমান ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিবে।

সারনাথের অশোকস্তম্ভে চক্রচিহ্ন দেখা যায় এবং আরো বৌদ্ধ কীর্তির সঙ্গে চক্র আঁকা আছে। বৌদ্ধদের কাছে চক্রচিহ্নের একটি বিশেষ অর্থ আছে। তাহাদের নিকট এই চিহ্নটি পরম পবিত্র। ইহাকে তাহাদের পরিভাষায় বলা হয়, ধর্ম্মচক্র। ইহার অর্থ হইল বুদ্ধ সারনাথে যখন প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহাই ধর্ম্ম-চক্র চিহ্নদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জৈন ও হিন্দুদের মধ্যেও চক্রচিহ্ন দেখা যায়। প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার লীলাভূমি মহেন জো দারোতেও চক্রচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কাজেই বর্ত্তমানের পতাকায় চক্রচিহ্ন ভারতকে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিল।

দিল্লীতে পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, এই চক্রচিহ্ন হইতেছে "A symbol of India's ancient culture and of many things India stood for." ভারতবর্ষ যাহার জন্য দাঁড়াইয়াছে তাহা এবং তাহার সংস্কৃতিকে এই চক্রচিহ্নদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন, "For my part I am exceedingly happy that indirectly we have associated with this flag of ours not only this symbol but in a sense the name of Asoka, one of the most magnificent names not only of India's history, but in the world history." অর্থাৎ আমি খুবই আনন্দিত যে এই পতাকার সঙ্গে শুধু একটি চিহ্নকে যুক্ত করিয়া ইহাকে অশোকের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। অশোক শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবময় নাম নহে, পরন্তু সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁহার নাম গৌরবান্বিত।

প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগকে পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া'তে ব্যক্ত করিয়াছেন—"It is well that at this moment of strife and conflict and intolerance our mind goes back to what India stood for in ancient days, and what it has stood for, I hope and believe, essentially throughout these ages inspite of mistakes and errors and degredations from time to time. For if India had not stood for something very great, I do not think that India would have survived and carried its cultural truth in a more or less continuous manner throughout these great ages." অর্থাৎ ইহা ভাল যে এখন এই সঙ্ঘর্ষ সংগ্রাম ও অসহিষ্ণুতার মুহূর্ত্তে আমাদের মন চলিয়া যায় ভারতের সেই প্রাচীন নিজস্ব সংস্কৃতির দিকে। আমি আশা ও বিশ্বাস করি, বিশেষ ভাবে এই সকল যুগের ভিতর দিয়া, ভুলভ্রান্তি এবং অধঃপতন সত্ত্বেও ভারত তাহার সংস্কৃতির উপর দাঁড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষ যদি একটা বড় আদর্শের জন্য না দাঁড়াইত, তবে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবন এই সকল যুগের ভিতর দিয়া বাঁচিয়া থাকিত না।

ভারতীয় শিল্পকেও এখন এই নূতন আলোকে দেখিতে হইবে। আমরা অনেক দিন পশ্চিমকে অনুসরণ করিয়াছি; এখন নিজের আদর্শকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "Go, ye Vikshus, for the benefit of the many, for the welfare of mankind, out of compassion, in the world. Preach the doctrine which is glorious

in the beginning, glorious in the middle, glorious in the end, in spirit as in letter."* হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের হিতের জন্য, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য বিচরণ কর। সদ্ধর্ম্ম প্রচার কর, যাহা আরম্ভে গৌরবময়, মধ্যে গৌরবময়, শেষে গৌরবময়।

এই আদর্শ হইতেই আমাদের প্রাচীন যুগের চিত্র অজন্তার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা ছিল বড় একটা আর্ট গ্যালারি। ইহা জনগণের ধর্ম্মবোধ, শিক্ষা ও আনন্দের জন্য ছিল।

শিল্প বা শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে "বহুজন-সুখায়, বহুজনহিতায়।"

আমরা প্রাচীন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া মুষ্টিমেয়ের জন্য শিল্প সৃষ্টি করিতেছি। এই মুষ্টিমেয় হইতেছে ধনতন্ত্রবাদী। আমরা পশ্চিমের আওতায় আসিয়া ধনতন্ত্রের উপযোগী শিল্প সৃষ্টি করিয়াছি। যে ইউরোপ এখন ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে, সেই দেশেই এখন দেখা যাইতেছে নব্য চিন্তাধারা; তাহারাই এখন বলিতেছে "ফেরো!" যে পথে আমরা চলিতেছিলাম তাহা শ্রেয়ের পথ নহে। আর্ট যদি সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা হইবে জনকল্যাণের নিমিত্ত। জনকয়েকের খামখেয়ালীর জন্য আর্ট সৃষ্টি হইতে পারে না।

আর্টকে শুধু ধনীর বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিলে চলিবে না। ইহা অন্তরের বস্তু। ইহা জনসাধারণের আনন্দ ও শিক্ষার বস্তু। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের একজন চিন্তা-নায়ক বলিয়াছেন, "Beauty is a social force," সৌন্দর্য্য হইতেছে সামাজিক শক্তি।

পশ্চিমের ভাব-নায়ক টলষ্টয় বলিয়াছেন, আর্ট হইতেছে জনকল্যাণের জন্য। টলষ্টয় তাহার সাহিত্যদ্বারা যাহা বুঝাইয়াছেন, ওলন্দাজ চিত্রশিল্পী ভ্যানগগ তাহাই বলিয়াছেন তাঁহার চিত্রদ্বারা।

আমাদের দেশে সামাজিক জীবনের সঙ্গে শিল্প এক সময় যুক্ত ছিল। যে সকল প্রাচীন মন্দির হিন্দু রাজারা করিয়াছিলেন তাহা শুধু ধনীর বিলাস-সম্পদ ছিল না, তাহা ছিল জনগণের জন্য।

* History of Indian Philosophy. Vol. I, by S. Radhakrishnan.

আমাদের বাংলাদেশে গ্রাম্যজীবনের সঙ্গেও একসময় আর্টের সংস্পর্শ ছিল। মেয়েরা বাড়ীতে আলপনা করিয়াছেন, পিঁড়ি চিত্র করিয়াছেন, পূজোর মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, পোটো ছবি আঁকিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ ছিল। সেই সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শ হইতে বিমুক্ত হইয়া গ্রাম এখন নিরানন্দ। তাহাকে শুধু রুটী দিলেই হইবে না, আনন্দ দিতে হইবে। ৫ম শতাব্দীতে বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক নাগরিকের অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে চিত্র করিবার দ্রব্যাদি রাখিতে হইবে। ইহাতে বোঝা যায়, প্রাচীন কালে চিত্রের সামাজিক সম্বন্ধ এবং শক্তি ছিল।

আমাদের হাতে এখন রাষ্ট্র আসিয়াছে। এখন ভাবিতে হইবে এই স্বাধীনতা কি প্রকারে সকলের কল্যাণপ্রদ হয়। শুধু রুটী চাই, বস্ত্র চাই বলিলে হইবে না, অন্তরকে শুষ্ক রাখিলে চলিবে না; অন্তরকে প্রাণবন্ত রাখিতে হইবে। তাহা পারে কে? আনন্দ, আর্ট! যাঁহারা সাহিত্যিক, কবি, তাহারা কাব্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে শিল্পিগণ দেশাত্মবোধ জাগাইতে কিছু করেন নাই।

রাষ্ট্রেরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। কংগ্রেস এবিষয়ে বিশেষ কিছু ভাবে নাই। আজ কংগ্রেসকে ভাবিতে হইবে শিল্প কিভাবে দেশাত্ম-বোধের উদ্বোধক হয়। কংগ্রেস তাহার প্রচার-কার্য্যে ছবির প্রচারপত্র বা পোষ্টার ব্যবহার করিতে পারে। শুধু শাদা কথায় কিছু না বলিয়া ছবি দ্বারা কোনো কথা বুঝাইয়া দিলে কথাটা আরো স্পষ্ট হইবে।

প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্র প্রভৃতির প্রতিলিপি করা উচিত স্কুল-কলেজের জন্য। বাল্যকাল হইতেই এগুলির সংস্পর্শে আসিলে বালক-বালিকারা প্রথম হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইবে। অল্প-ব্যয়ে এরূপ প্রতিলিপি জনসাধারণের জন্য করা উচিত। ছায়াচিত্র ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন দ্বারা প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্র এসকল ব্যবস্থা করিবে।

বাংলা সাময়িক-পত্র সম্পাদনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে যে-সকল বাংলা সাময়িক-পত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

'হিতবাদী'।—১৮৯১ সনের ৩০এ (?) মে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহার সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পত্রিকা-প্রকাশের প্রাক্‌কালে তিনি বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন :—

"ভ্রাতঃ—আমাদের হিতবাদী ব'লে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি বড় রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্চে। ২৫,০০০৲ টাকা মূলধন। ২৫০৲ টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং এক-শ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধেক অংশের গ্রাহক ইতি-মধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমল বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েচেন। যাই হোক, ইতিমধ্যে দু'তিন মাসের লেখা আমার হাতে জড় না হলে আমাকে ভারি মুস্কিলে পড়তে হবে। আবার, কথা হয়েছে প্রতি সংখ্যায় একটা করে ছোট গল্প থাকবে। তোমাকে এই সঙ্কটের সময় আমার সহযোগিতা করতে হচ্চে।..." ('বিশ্বভারতী পত্রিকা,' শ্রাবণ ১৩৪৯, পৃঃ ৩০)

২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী'র সহ-সম্পাদক শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 'হিতবাদী' সম্বন্ধে আর একটু সংবাদ আছে, তাহা এই :—

'সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল বাবু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিলেন। কৃষ্ণকমল বাবুও সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প, সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই, ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।" ('আত্মপরিচয়,' পৃঃ ১২৫)

'সাধনা'।—রবীন্দ্রনাথ ৪র্থ বর্ষের 'সাধনা' (অগ্রহায়ণ ১৩০১—কার্ত্তিক ১৩০২) সম্পাদন করেন। শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত তাঁহার পত্রে প্রকাশ :—

"সোনার তরী কবিতাগুলি প্রায় সাধনা পত্রিকাতেই লিখিত হইয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।" ('আত্মপরিচয়', পৃঃ ১২৪-২৫)

'ভারতী'।—১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৭৭) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' আদর্শে 'ভারতী' জন্মলাভ করে। ১ম—৭ম বর্ষের (১২৮৪-৯০) পত্রিকা সম্পাদন করেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; ৮ম-১৮শ বর্ষের (১২৯১—১৩০১)—

স্বর্ণকুমারী দেবী, ও ১৯শ-২১শ বর্ষের (১৩০২-০৪)—হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী। ২২শ বর্ষের (১৩০৫) পত্রিকা সম্পাদনের ভার পড়ে —রবীন্দ্রনাথের উপর। এক বৎসর পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। চৈত্র-সংখ্যায় প্রকাশ ঃ—

"এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম।... সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়া-কর্ম্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানা রূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরুদ্বিগ্ন অবকাশের অভাবে পাঠকদেরও আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই এবং সম্পাদকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি।

সম্পাদক যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কর্ণধারের মত পত্রিকার চূড়ার উপর সর্ব্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মত কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্র সম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মত,—সমস্ত দিন ক্ষেতের কাজে খাটিয়া কৃশ প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া যোগান্ দিতে হয়;— তাহাতে পরমধৈর্য্যবান্ জন্তুটারও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাঁহার বার্ষিক তিন টাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন।... এক্ষণে গত বর্ষশেষে যে স্থান হইতে ভারতীর মহভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় তাহা নামাইয়া লালটের ঘর্ম্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।"

'বঙ্গদর্শন' (নব পর্য্যায়)।—১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস (ইং ১৯০১) রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নব-পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। ১ম সংখ্যায় তিনি লেখেন ঃ—

"বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক যিনিই হউন না কেন, 'বঙ্গদর্শন' নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন। বঙ্গদর্শনের যে সকল প্রাচীন মহারথী এখনও ইহলোকে আছেন, তাঁহারা এই নামের পতাকা উড্ডীন দেখিলে, ইহার তলে সমবেত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এবং যে সকল আধুনিক লেখক বঙ্গদর্শনের গৌরবকালের ইতিহাস শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, বঙ্গদর্শনের নামে তাঁহারা নিজের রচনার আদর্শকে যথাসাধ্য চেষ্টায় উন্নত রাখিবার প্রয়াস পাইবেন।

পাঠকের দাবী যত কঠিন হয়, সম্পাদকের চেষ্টাও তত একান্ত হইয়া থাকে। বঙ্গদর্শনের নামে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, এবং সেই প্রত্যাশার বেগে সম্পাদককেও সর্ব্বদা সচেষ্ট-সচেতন থাকিতে হইবে। সম্পাদক একথা ভুলিতে পারিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।"

রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসর (১৩০৮-১২) 'বঙ্গদর্শন' পরিচালন করিয়াছিলেন। শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্রে 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে এই সংবাদটুকু আছে ঃ—

"আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষ্যে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই। তরুণ বয়সে ভারতীতে বৌঠাকুরাণীর হাট লিখিয়াছিলাম ইহাই আমার প্রথম বড় গল্প।... বঙ্গদর্শন পাঁচ বৎসর চালাইয়া তাহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে বিদ্যালয় লইয়া নিযুক্ত আছি।" ('আত্মপরিচয়', পৃঃ ১২৫-২৬)

'ভাণ্ডার'।—রবীন্দ্রনাথ যখন 'বঙ্গদর্শন'

সম্পাদনে নিযুক্ত, সেই সময় তিনি আর একখানি মাসিকপত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন ; উহা—'ভাণ্ডার'। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৯০৫)। পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১ম সংখ্যায় লেখেন :—

"আমাদের এই কাগজখানি যাহাতে অধিকাংশ লোকের অবসরের উপযোগী হয়, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভাণ্ডারের কর্ম্মকর্ত্তা নানা ছোট লেখা সংগ্রহের আয়োজন করিতেছেন। সেই সঙ্গে যদি দেশের লোকের উপকার হয় সে ত ভালই। কারণ শাস্ত্রে বলে—'যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী', যাহাতে মানুষের ইহকাল পরকাল দুইই রক্ষা হয়, সেই চাতুরীই চাতুরী।"

রবীন্দ্রনাথ দুই বৎসর 'ভাণ্ডারের' সম্পাদক ছিলেন—ইহাই সাধারণের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে তিনি ৩য় বর্ষের (১৩১৪) বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় যুগ্মসংখ্যাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরি সঙ্কলিত তালিকাতেও (৪র্থ কোয়ার্টার ১৯০৭) ইহার উল্লেখ আছে।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।—রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ হইতে ১৩২১ সাল (ইং ১৯১১-১৫) পর্য্যন্ত চারি বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মুসলমান কবি-রচিত চৈতন্য-বন্দনা

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, তত্ত্বরত্নাকর

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান বহু শতাব্দী ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কখনও কোন বিরোধ ছিল না, একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। তবে বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতব্যাপী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ, অবিশ্বাস ও ভ্রাতৃঘাতী উন্মত্ততা জঘন্য ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তুলনা বিরল। ইহা সমগ্র দেশের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের, অধিকন্তু উন্নতির পরিপন্থী সন্দেহ নাই।

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সেই সকল হিন্দু ও মুসলমানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যাঁহারা অন্তরের উদারতায় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া অপর ধর্ম্ম, ধর্ম্মগুরু ও ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

এদেশে বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বীদের পরশে পবিত্রকরা এই ভারত-তীর্থে,—এমন বহু হিন্দু ও মুসলমান সাধু-সন্ত ও কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যাঁহারা অপর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁহাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বাংলার প্রাচীন কবি ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস আনুষ্ঠানিক মনসা মঙ্গলের গীতারম্ভে দেব-দেবী-বন্দনা করিতে গিয়া মুসলমান পীর ও আউলিয়াদের বন্দনা করিয়াছেন :

"পাণ্ডুয়া বন্দিয়া গাইব শুতিখাঁ পীর ॥
শত শত আইল্যা বন্দো মস্তকের পাগে ॥
গীতের ভালমন্দ তোমারে সে লাগে ॥
সাহানা বকুলী বন্দো বাবুর মোকাম।
দক্ষিণে বড়খাঁ গাজী বড় গুণধাম ॥"[১]

মুসলমান ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা থাকিলে এমনটী সম্ভব হইত কি? মুসলমানদের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন বহু হিন্দু-কবির অনুরূপ রচনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকজন মুসলমান কবির কথা আলোচনা করিব।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ-পাদে[২] যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশ নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছে, সেই নদীয়া-নাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু ভক্ত পদাবলী রচনা করিয়াছেন এই জাতীয় পদাবলীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য সঙ্কলন-গ্রন্থ—"গৌরপদতরঙ্গিণী"। এই গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'আকবর' ভণিতাযুক্ত একটী চমৎকার পদ স্থান পাইয়াছে।

নৈষ্ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃঢ় ধারণা এই যে দ্বাপরে যিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এই কলিতে তিনিই শ্রীচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—

'নন্দসুত ছিল যেই শচীসুত হৈল সেই।'

মুসলমান কবিদের মধ্যেও চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এইরূপ নৈষ্ঠিক মতাবলম্বীর অভাব নাই। গরিবখাঁ রচিত—

'শরমে শরম প্যোলায়ে গেল
রাইকানু দুটী তনু যেমন দুধেজলে ম্যালায়ে
গেল ॥'

১ ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, মৎসম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ পৃঃ ৮-৯।

২ গৌরাঙ্গদেবের জন্ম ১৪০৭ শক ফাল্গুনী পূর্ণিমা = ১৪৮৬ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী।

গানে চৈতন্য অবতারে রাইকানুর এক হওয়ার কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে।"

চৈতন্য-জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া অথবা তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ, যাহারা পাণ্ডিত্যের ধার ধারে না, যাহারা পণ্ডিত চৈতন্যকে বুঝিবার মত পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে, তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল তাঁহার কীর্ত্তনে ও নর্ত্তনে। যাহারা কীর্ত্তনরত চৈতন্যের প্রস্ফুট কদম্বপুষ্পতুল্য প্রেমরোমাঞ্চিত কলেবর ও শিশির-সজল-পদ্মকোরক-সদৃশ প্রেমাশ্রুপূর্ণ অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন একবার দেখিয়াছে—তাহারাই ভুলিয়াছে।

'না খায় না লয় কারো না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন বিলাস ॥'

—চৈতন্যভাগবত

এই কীর্ত্তনবিলাসের বন্যায়ই
'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।'

এই কীর্ত্তন ও নর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীচৈতন্যদেব

৩ তুলনীয়—

কাঞ্চন গালিয়া কেবা　　যতন করিয়া গো
তমালের গাছে দিল বঙ্গ। * * *
উপমা দিবার চাই　　ত্রিভুবনে নাই গো
আঁখি ভুলে রূপের ঝলকে
গোপালের রাইকানু　　কে করিল এক তনু
এমন সন্ধানী ছিল কে।

[শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত মৎসম্পাদিত 'গোপাল ঠাকুরের পদাবলী'।

অথবা—

এসেছে সে ব্রজের বাঁকা কালসখা দেখবি আয়
তোদেরই এই নদীয়ায়।
তার রং গিয়েছে ঢং গিয়েছে কালই এখন চিনা দায়
তোদেরই এই নদীয়ায় ॥

—বিশ্বরূপ

তাঁহার শ্রোতা ও দর্শকদের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। সাহ আকবর এই কীর্ত্তন ও নর্ত্তনেই মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—

'জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রস ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া॥'

প্রেমপাগল চৈতন্যকে দেখিয়া কবিরও প্রেমাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, আনন্দোৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন—

'ঐছন পহুকে যাহু বলিহারী।
সাহ আকবর তেরে প্রেমভিখারী॥'

আরেক কবিও চৈতন্যের শুষ্ক পাণ্ডিত্যের বা তর্কশক্তির কথা না বলিয়া তাঁহার দৈন্যের কথাই সশ্রদ্ধ হৃদয়ে উল্লেখ করিতেছেন—

'আয় দেখে যা নূতন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীনধরা॥
গোরা হাসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই
সদাদীন দরদী বলে ছাড়ে হাই
জিজ্ঞাসিলে কয়না কথা হয়েছে কি ধনহারা।
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে
মরি হায় কি লীলা কলিকালে বেদবিধি চমৎকারা
সত্যত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়
অধীন লালন বলে, ভাবুক হলে সে ভাব জানে
তারা॥'

অপর এক কবি সম্ভবতঃ জগাই মাধাই প্রভৃতির কাহিনী অবগত হইয়া, গৌর-অবতারে কত লোহার মানুষ সোনা হইল দেখিয়া গাহিয়াছেন—

'সোনার মানুষ ন'দে এলরে
ভক্ত সঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে, ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে
(ও তার) সোনার বরণ, রূপের কিরণ,
দেখতে নয়ন ঝরে
(গৌর) হরিনামের বন্যা আনি, ধন্য করেছে ধরণী
বিরাম নাই আর দিনরজনী,
নামের স্রোত চলেছে ধীরে ধীরে,
কলির জীবকে ভাসাইয়া নিচ্ছে প্রেমসাগরে।
সোনার মানুষ, সোনার বরণ, সোনার নূপুর,
সোনার চরণ,
চারিদিকে সোনার কিরণ, ছুটেছে আলোকিত করে,
কত লোহার মানুষ সোনা হ'ল গৌর অবতারে।
যাঁরা ভজে সোনার মানুষ, তাঁরাও হবে
সোনার মানুষ,
লালমামুদের হৈল না হুস্ এখন আর
দোষ দিবে কারে ?
সে যে সারা জীবন কাটাইল রাঙ্গের বাজারে।'

ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট মানুষ চৈতন্য যেমন দেবত্বে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তদ্রূপ একাধিক মুসলমান কবির কবিতায় গৌর নামটী কবির আরাধ্য দেবতার নামভেদ রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। খতিসা রচিত—

'গৌরচান্দের নাম শুনিতে নাই তার বাসনা॥
ও তারে বুঝাইলে বুঝে না গো সই জপাইলে
জপে না॥ * * *
যেই নামে পাষাণ গলে সেই নামে তার
অঙ্গ জ্বলে
এ গো লইরে না সে নামটী মুখে
করিয়াছে কল্পনা।

ছৈয়দ আলী রচিত—

'গৌর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবার তার দরশন।
এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন॥'

হুছন রচিত—

'গৌর চান্দ্ আমার।
তোমার লাগি আমি ঘরের বার॥'

প্রভৃতি পদে গৌর নামটী কবির আরাধ্য দেবতার নামান্তর রূপেই পরিগৃহীত হইয়াছে।

উদ্বোধন

শ্রীচিত্ত দেব

ডাক দিয়ে যায় সকাল বেলার সূর্য
মানুষের ঘুম ভাঙে,
ঘুম ভাঙে কি ?
নব-জীবনের হয় কি উদ্বোধন
আলোর মন্ত্র চেতন পরশে
জাগে কি জীব ?

হাতে তুড়ি দিয়ে মুখে তুলে হাই
দুর্গা-নামের জপমালা জপে
বিছানা গুটোয়
ঘোর কাটে কি ?

আলস-জড়ানো চোখে মুখে ঐ
জাগরীর বাণী ফুটে কি
তন্দ্রা মরে কি
তখনও ?

একা-জীবনের আরামের ছবি
মুছে যায় হৃদিপাতে ?
সংসার — শুধু আপনার
শুধু একাকীর ?

নিজের ভাগ্যে যা পড়েছে দুখ
সব ঠেলে দিতে চায়
যাকে পায় কাছে
ঠিক তো ?

তিন ভাগ জল এক ভাগ মাটি
এ বিশাল পৃথিবীর

লোভীরা ভোগীরা ছেয়েছে স্থল
জলে ভাসে বহুলোক
তারা কি মরবে ?
হাততালি দিয়ে নিলাজের হাসি হাসে
এখনও ঐ যে ডাঙায় যারা থাকে
ঐ চেয়ে দেখো
জীবন-নাশের খেলা দেখাতেই
মজা তাদের ।

* * * *

মাথার উপরে মধ্যদিনের সূর্য
কী তার ইঙ্গিতে চমকায় ডাঙাবাসী
তবুও কি ভুল ভাঙে
মোহ ঘোচে কি ?

শোনে কান পেতে জোয়ারের গান
তিন ভাগ জলে বান ডাকে ঐ
ডুবায় সকল ;
বুঝি ঐ
অগ্নিগিরির মূলোৎপাটন
হবে খুব শীগ্‌গীর
জল হবে স্থল
স্থল হবে জল
ভূমিকম্পের উলট-পালট
পাইকারী মেশামেশি
সেদিন
হয় তো-বা দূরে নয় !

* * * *

ওগো পৃথিবী
বিবর্তনের ভাষায় তোমায়
ডাক দিয়ে যায়
অস্তাচলের সূর্য :

খনির তলায় তোমার মানুষ
সাগরের বুকে তোমার মানুষ
ক্ষেত চষে ঐ তোমার মানুষ
আরো আছে বহু সকলেরে জানো
তুমি ; জানো যে
তাদের
গায়েব মাংস ধুয়ে মুছে গেছে
জলে ভেসে ভেসে না-খেয়ে না-খেয়ে
ক্ষুধার সাগর-দেহেতে তাদের
শোষেছে শিরার রক্ত
নিজশক্তিতে দীর্ঘদিন।
তুমি কি দেখোনি ?

সূর্য দেখেছে সকলি
সকাল সন্ধ্যা, দুপুরে
শুধুই
সভা রেখেছে বজায় নিজের তেজেতে।

* * * *

খেতে-পাওয়া ক্ষেতে জমিতে ঐ যে
মাংস-শিকারী মানুষের যত বোঝা
পিণ্ড পিণ্ড প্রতারক আর দস্যু ;
লুঠ করে করে শুধু
জমিয়েছে ধন গায়েতে গরেতে যত
এবারে সকল ফেরত দিতেই হবে ;
সমভাগে সব ভাগ করে করে
জলে ভাসা মানুষেরে।

* * * *

আর রাত নেই
আঁধার কেটেছে
নতুন সকালে আবার ডাকিছে সূর্য
নতুন কী কথা বল্‌তে এসেছে
সকলে কি জানে ?
…সাজাও সাজাও সাজো সাজো রব
উঠেছে আকাশে বাতাসে ··
আস্‌ছে বিবর্তন
গণ-দেবতার মন্দির হল তৈরি ?
চল্লিশ কোটি নর-জীবনের
হবে যে উদ্বোধন !



উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী, ১৩৫৪ বোধিসত্ত্ব শিল্পী : শ্রীনন্দলাল

বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ

ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট্‌

ধর্মমাত্রের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রশ্ন ওঠে—গুরুর পরিচয়ে শিষ্যের এবং শিষ্যের পরিচয়ে গুরুর পরিচয় আদৌ হয় কি না? প্রচলিত মতানুসারে যেমন গুরু তেমন শিষ্য—যেমন শিষ্য তেমন গুরু। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যাঁরা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন এবং যাঁরা সুবিচারক তাঁদের মতে জগতে বুদ্ধই একমাত্র বৌদ্ধ, কৃষ্ণই একমাত্র হিন্দু, যীশুখৃষ্টই একমাত্র খৃষ্টান এবং হজরত মহম্মদই একমাত্র মুসলমান। এই মতানুসারে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধের মধ্যে, বুদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে আছে ভিন্ন ভিন্ন সংঘভুক্ত, দলভুক্ত, নিকায়গত বা সম্প্রদায়গত বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য এবং উপাসক-উপাসিকাগণের জ্ঞানাবদান, চরিত্রাবদান, কর্মাবদান ও পুণ্যাবদান। যুগে যুগে কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জ্ঞান-গরিমা, মনীষা, চরিত্র-মাহাত্ম্য, ব্যাখ্যা-শক্তি, কর্মকুশলতা এবং দানবহুলতার দ্বারা এই অবদানগুলি সমুজ্জ্বল। বুদ্ধধর্মের ইতিহাসে আছে ব্যক্তিবিশেষের জীবনে জ্ঞান, সত্য ও মুক্তির সন্ধান, তাতে সাফল্যলাভ, এক অভিনব চিন্তাধারার উদ্ভব ও সৃষ্টি, এক নতুন রকমের মানবাদর্শের উৎপত্তি, নবভাবে মানব-প্রগতির নির্দেশ এবং এক প্রভাবশীল ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মহিমা। বুদ্ধ-ধর্ম শ্রদ্ধামূলক এবং বৌদ্ধধর্ম ভক্তিমূলক। বুদ্ধ-ধর্ম আত্মাশ্রয়ী, আত্মনির্ভরশীল, বৌদ্ধধর্ম পরাশ্রয়ী, পরনির্ভরশীল। বুদ্ধ-পন্থার নাম বুদ্ধ-উপনিষৎ, বৌদ্ধধর্ম এক বিশিষ্ট রকমের বুদ্ধ-ভাগবত ধর্ম, যেমন বৈষ্ণবধর্ম এক জাতীয় বিষ্ণু-ভাগবত ধর্ম, শৈবধর্ম শিব-ভাগবত ধর্ম, শক্তিধর্ম শক্তি-ভাগবত ধর্ম, জৈনধর্ম জিন-ভাগবত ধর্ম, খৃষ্টানধর্ম খৃষ্ট-ভাগবত ধর্ম এবং ইসলাম আল্লাহ্-ভাগবত ধর্ম। যদি কেহ বৌদ্ধ স্থবির পারাপর্যের ভাবে মনে করেন যে বুদ্ধের পরবর্তী শিষ্য-প্রশিষ্যগণ তাঁর সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিত হয়ে বিপথগামী হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সমসাময়িক শিষ্যগণের অবস্থা অন্যরূপ ছিল, তারা শাস্তার নেতৃত্বাধীন থেকে যথার্থ আর্যমার্গে চলতে পেরেছিলেন,[১] এই মতটা কতটা সত্য, যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন তা সংক্ষেপে আলোচনা করাই বক্ষ্যমাণ সন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

যেমন অন্যান্য ধর্মের তেমন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটা প্রামাণিক গ্রন্থ স্বীকৃত হয়েছিল। তা মূলগ্রন্থ বলে পরিচিত। এর অপর নাম ত্রিপিটক বুদ্ধবচন, প্রবচন বা ভগবদ্‌বাক্য। সম্প্রদায়ভেদে এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রণীত হলেও, সকল সংস্করণই বুদ্ধবচন। সব সংস্করণেই আছে বুদ্ধের দোহাই, তাঁর সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণের দোহাই, সমস্তই তাঁর শ্রীমুখের বাণী। তথাপি কোন্‌টী তাঁর যথার্থ বাণী, কোন্‌টী নয় তা নিয়ে ওঠে সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা। ঐ বাণীসমূহের ব্যাখ্যাদি বিষয়েও দারুণ মত-

১ থেরগাথা, ৯২১ঃ

অঞ্‌ঞথা লোকনাথম্‌হি তিট্‌ঠন্তে পুরিসুত্তমে।
ইরিয়ং আসি ভিক্‌খুনং, অঞ্‌ঞথা দানি দিস্‌সতে॥

ভেদ, মতভেদে আদর্শভেদ, আদর্শভেদে কার্যভেদ, কার্যভেদে আচারভেদ।

ঐতিহাসিক বিচারে সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে রক্ষিত পালি ত্রিপিটকই বুদ্ধ-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতা রক্ষা করেছে। অপরাপর সংস্করণে পরবর্তী কালের ছায়া এত অধিক যে, তাতে মনে হয় যেন আমরা বুদ্ধ-যুগ ও প্রাচীন বৌদ্ধযুগ হতে বহুদূরে এসে পড়েছি। কিন্তু পালি ত্রিপিটকও যে সম্প্রদায়বিশেষের প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাতেও যে যথেষ্ট পরিমাণে সাম্প্রদায়িকতা আছে। "পালি ত্রিপিটকই একমাত্র বিশুদ্ধ থেরবাদ (স্থবিরবাদ)," এও যে একটা মস্ত রকমের সাম্প্রদায়িক দাবী। এর মানে বুদ্ধের সমসাময়িক শিষ্যগণ তাঁর মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পরে রাজগৃহে সমবেত হয়ে যে ধর্ম-বিনয়-সংগ্রহ প্রস্তুত করেছিলেন তার সঙ্গে সমতা ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে অবশেষে যে গ্রন্থ প্রণীত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে তাই যথার্থ প্রামাণিক গ্রন্থ, আর সব বাজে। এই ত্রিপিটকের ইতিহাসও এর উৎপত্তি-কাল হতে শেষ পরিণতি পর্যন্ত অন্যূন ছয় শত বছরের। বুদ্ধের জীবিতকালও এর অন্তর্গত। বুদ্ধের জীবদ্দশায়ও কেন্দ্রে কেন্দ্রে বুদ্ধবচন ও তাঁর শিষ্যবচন সংগৃহীত হচ্ছিল। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে যাঁরা ছিলেন ধর্মকথক, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাতৃকাধর তাঁরা নানাস্থানে থেকে ও বিচরণ করে বৌদ্ধ প্রামাণ্য-গ্রন্থের উপাদান-রচনায় নিরত ছিলেন। রাজগৃহে আহূত প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবচনের কলেবর-বৃদ্ধি ঘটেছে উত্তরকালে। সিংহলের রাজা বট্টগামণির রাজত্বকালে, খৃঃ পূর্ব ১ম শতকের শেষার্ধে পালি ত্রিপিটক পুস্তকারূঢ় বা লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে মুখপাঠবশে বা আবৃত্তির সাহায্যে আচার্য-পরম্পরায় বুদ্ধাগম আনীত ও কলেবর-পুষ্ট হয়েছিল। আবৃত্তির সাহায্যে বুদ্ধবচন রক্ষার ভার অর্পিত ছিল কতকগুলি ভাণকসম্প্রদায়ের ওপর। স্বরবিধিমতে আবৃত্তির সৌকর্যের জন্য হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদ, গুরু-লঘু মাত্রাভেদ, এবং বর্ণচ্ছেদ-বিষয়ে পারদর্শিতা-লাভের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। ছয়শ বছরের মধ্যে বুদ্ধবচনের গঠন-গাঠনে বানাতুনাও কম হয় নি। তা যা হোক্ না কেন, সাবধানে নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করলে পরিণত পালি ত্রিপিটকের মধ্যেও বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য-গণের মধ্যে বৈলক্ষণ্যগুলি সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর শিষ্যগণ যে গণনার নিয়ম অবলম্বন করেছিলেন তাতে ঐ ত্রিপিটকে বুদ্ধপ্রমুখাৎ গৃহীত বচনের পরিচ্ছেদ-সংখ্যা বিরাশী হাজার এবং শিষ্যপ্রমুখাৎ গৃহীত বচনের পরিচ্ছেদ-সংখ্যা মাত্র দু হাজার, মোট সংখ্যা চুরাশী হাজার।

আমাদের কাছে বিশেষ মননযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে থের-থেরী-গাথা এবং থের-থেরী-অবদান। প্রথম গ্রন্থে আছে বুদ্ধের সমসাময়িক কতিপয় নেতৃস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয়া শিষ্য-শিষ্যার স্বগতোক্তি, আত্মা-প্রকাশক উদান-গাথা। স্ব স্ব অধ্যাত্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা, অপরোক্ষানুভূতি, আত্মপ্রত্যয় ও মুক্তি-জ্ঞান-জনিত অপার আনন্দ ও আত্ম-তুষ্টির পরিচায়ক কবিত্ব। সকল ক্ষেত্রে গাথাগুলি স্বরচিত না হলেও, তাদের মাঝে তাঁদের জীবনেতিহাসের অভিব্যক্তি আছে। কতিপয় পরবর্তী প্রশিষ্যের উদান-গাথা উক্ত সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান পেলেও, ওদের রচনার উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ও অভিব্যক্তি সমজাতীয়। মিলিন্দ-পঞ্‌হ (মিলিন্দ-প্রশ্ন) নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থে যে সকল থের-থেরীর গাথা উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি থের-থেরী-গাথা নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে নিবদ্ধ স্বগতোক্তির সঙ্গে ঠিক এক না হলেও, তাদেরও রচনার প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য ভিন্নরূপ নহে। সংযুক্ত-নিকায়ের ১ম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট ভিক্ষুণীদিগের গাথাগুলি সম্বন্ধেও এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য।

অবদানগুলি আমরা যে ভাবে ও যে আকারে পাই তাতে মনে হবারই কথা যে, সমস্তই পরবর্তী কালের রচনা। তথাপি অস্বীকার করা চলে না যে, অবদানের সূচনা আছে, স্থবির-স্থবিরার উদান-গাথাগুলির মধ্যে। যোগজ জাতিস্মরজ্ঞান (বৌদ্ধ পরিভাষায় পূর্ব-নিবাস-অনুস্মৃতি) যেমন বুদ্ধের জাতকগুলির ভিত্তি তেমন স্থবির-স্থবিরার অবদানগুলির ভিত্তি। উত্তরকালে বিরচিত অপরাপর বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থের মধ্যে বুদ্ধাবদান থাকলেও, কোথাও স্থবির-স্থবিরার প্রাক্তনজন্মবৃত্তান্তকে জাতক আখ্যা দেওয়া হয় নি। কাজেই গ্রন্থের শ্রেণীভেদে জাতক ও অবদান-সাহিত্যের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে প্রভেদ আছে। জাতক এবং অবদান দুইই পূর্বপূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত হলেও, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধকবিশেষের সাধনার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য পূজা-বন্দনাদি সুকৃতির সুফল বর্ণনা। একদিকে অবদান অর্থে ইংরাজীতে ট্রেডিশন, হেরিটেজ্। মূল সর্বাস্তিবাদ নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিনয়বস্তুতে স্থবির-স্থবিরার গাথার স্থান অধিকার করেছে স্থবির-স্থবিরার অবদান।[২]

পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত অবদান নামক গ্রন্থের আদ্যাংশে আছে বুদ্ধাবদান ও পচ্চেকবুদ্ধাবদান। এস্থলে বুদ্ধাবদান অর্থে বুদ্ধক্ষেত্রের বা আদর্শ বৌদ্ধ শিক্ষায়তনের মাহাত্ম্য-বর্ণনা এবং পচ্চেকবুদ্ধাবদান অর্থে অতীতের পাঁচশ খ্যাতনামা ঋষি বা সিদ্ধতাপসের গুণ-গরিমার মহিমা-কীর্তন। ঐ সকল ঋষি বা সিদ্ধতাপসগণের প্রবচনগুলি খগ্‌গ-বিসাণ-সুত্ত (খড়্গ-বিষাণ-সূত্র) নামক এক সুন্দর কবিতায় সূত্রাকারে নিবদ্ধ হয়। মজ্‌ঝিম-নিকায়ের অন্তর্গত ইসিগিলি-সুত্তে ঐ পাঁচশ প্রাচীন ঋষির প্রাণস্পর্শী কিম্বদন্তী বা অবদান বর্ণিত আছে। বস্তুত কিম্বদন্তী-রক্ষিত প্রত্যেকবুদ্ধগণের গাথাগুলিই যেন বৌদ্ধ স্থবির-স্থবিরার গাথাগুলির পশ্চাতে ছিল এবং তা হতেই পরবর্তী সাধক-সাধিকাগণ প্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণের উদান-গাথা, মুনি-গাথা, বুদ্ধের উদান-গাথা এবং বৌদ্ধ স্থবির-স্থবিরার উদান-গাথা সমস্তই এক বিষয়ে সমজাতীয়। সমস্তেরই বলবার উদ্দেশ্য অনাসক্তিতেই মানবাত্মার অথবা মানবচিত্তের মুক্তি এবং আসক্তিই এর বন্ধন ও বন্ধনের কারণ। এই আসক্তি মূলতঃ বিষয়-বাসনা, পুত্রাকাঙ্ক্ষা, পরিবারাকাঙ্ক্ষা, ধনাকাঙ্ক্ষা, পার্থিব সম্পদাকাঙ্ক্ষা, যশোলিপ্সা, প্রভুত্ব ও আধিপত্যের অভিলাষ। এরই নাম সংসার—যার মূলে আছে ভবতৃষ্ণা, মোহ, মদ, মাৎসর্যাদি রিপুগণ এবং যা অধ্যাত্মজীবনের বিরোধী। প্রকাশ-ভঙ্গী যাই হোক্ না কেন, এ সকল উদান-গাথার বক্তব্য বিষয় এই, সারমর্মও এই। অর্থাৎ সমস্তই বৈরাগ্য-সূচক পুরাতন বাণী এবং বৈরাগীর গীত।

থের-থেরী-গাথায় এবং সমগ্র পালি ত্রিপিটকে রক্ষিত বৌদ্ধ স্থবির-স্থবিরার অবদানে আমরা কি কি পাই? যা যা পাই সমস্তই বুদ্ধ-শাসন প্রতিষ্ঠার, বৌদ্ধ সংঘ-গঠনের, বৌদ্ধ ধর্ম-বিস্তারের এবং বৌদ্ধ-সমাজ গড়বার প্রচেষ্টার অন্তর্গত ও অভিমুখী। বুদ্ধশাসনের ভিত্তি জর্মণ সৈনিক-নিয়মতন্ত্রকে পরাস্ত করে এরূপ একটা সুদৃঢ় বিনয়-বিধান, বিধি-বিধান, আইন-কানুন এবং আচার-গোচরের (সদাচারের) উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বুদ্ধের ধর্মরাজ্য। তফাতের মধ্যে বুদ্ধের জীবিতকালে বৌদ্ধধর্ম ধর্ম-প্রধান এবং তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর হতে তা হয় বিনয়-প্রধান। তখন বিনয়-বিধাননির্দিষ্ট শিক্ষাপদ, আইন-কানুন সমস্তই আদর্শানুযায়ী, আদর্শাভিমুখী, উপায়স্বরূপ, গৌণ, মুখ্য নহে। উত্তরকালে মুখ্য পরিণত হতে থাকে

২ ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত সম্পাদিত *Gilgit Manuscripts*, Vol. III, Part I, ভূমিকা।

গৌণে এবং গৌণ পরিণত হতে থাকে মুখ্যে। যা ছিল স্বচ্ছ ও তরল তা হয়ে গেল নিবিড় ও কঠিন। যে বিনয়বাদের বিরুদ্ধে এবং শীলব্রত-পরামর্শের প্রতিকূলে বুদ্ধ দাঁড়িয়েছিলেন কঠোর-ব্রতী ব্রাহ্মণ-শিষ্য মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে তা'ই বুদ্ধের আদর্শবাদের স্কন্ধে ভূত চেপে বসল। আদর্শবাদী বুদ্ধ আইনের শাসনের, বিনয়-বিধানের অনাগত ভয় দেখতে পেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন বলেই তিনি তাঁর মহাপরিনির্বাণের প্রাক্কালে বলে গেলেন, "ভিক্ষুগণ, যদি তোমরা ইচ্ছে কর ছোটখাট শিক্ষাপদগুলি অনায়াসে বাদ দিতে পার।" শিক্ষাপদগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টী ছোটখাট, কোন্ কোন্টী গুরুতর তা নিয়ে প্রথম সঙ্গীতিতে বেশ আলোচনা হল। এক এক প্রতিনিধি এক এক মত দিলেন, মতের বিষম অনৈক্য দেখে সভানেতা মহাকাশ্যপ নির্দেশ দিলেন —ওদের কোনটীই বাদ দেওয়া চলবে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ মন্তব্যও করলেন যে, যদি ছোট-খাট ভেবে কোন কোন শিক্ষাপদ এখন বাদ দেওয়া হয়, তা হলে লোকে বলবে শাস্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাঁর শাসন ওলট-পালট করে দিলাম। ফলে আদর্শবাদের গৌরবাসন অধিকার করে নিল বিনয়-বিধানের আধিপত্য এবং ভিক্ষু-সংঘ হয়ে দাঁড়াল স্থবিরবাদী ওরফে এক ভীষণ গোঁড়াদল এবং কঠোর শাসক-সম্প্রদায়।

বিনয়বাদ ও বিনয়বিধানের কুফল বুদ্ধ স্বচক্ষে বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। কৌশাম্বী শহরের উপকণ্ঠে নির্মিত এক বিহারে দু'দল ভিক্ষু বাস করত। একদলের নেতা ধর্মধুর অর্থাৎ আদর্শবাদী, অপরদলের নেতা বিনয়ধুর অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক। ধর্মধুর স্থবির পায়খানায় গিয়ে আসবার সময়ে ভুলে ঘটিতে কিছু জল রেখে এলেন, তা ছিল বিনয়-বিরুদ্ধ কায। বিনয়ধুর ঐ পায়খানায় গিয়ে দেখলেন ধর্মধুর ঘটিতে কিছু জল রেখে গেছেন। সে কথা বিহারে এসে ধর্মধুরকে জানালে তিনি বিনীতভাবে তাঁর কাছে ত্রুটি স্বীকার করলেন। তা সত্ত্বেও বিনয়ধুর তাঁর চেলাদের ধর্মধুর স্থবিরের অপকার্যের বিষয় জানালেন। তা শুনে তাঁর চেলারা ধর্মধুরের চেলাদের বল্লে— তোমাদের নেতা ধর্মধুর স্থবির ভুল করেও ত্রুটি স্বীকার করেন না। তারা ব্যথিত হয়ে বিষয়টি ধর্মধুরকে জানালে, তিনি বল্লেন, কেন, আমি ত বিনয়ধুর ভ্রাতার কাছে ত্রুটি স্বীকার করেছি। সে কথা জেনে তারা সরাসরি গিয়ে অপর দলকে বল্লে, তোমাদের বিনয়ধুর স্থবির মিথ্যাবাদী। যেই না তা বলা, লেগে গেল দু'দলে বিষম কলহ-বিবাদ, বাদ-বিসম্বাদ, নিন্দা, তিরস্কার ও অপবাদ। তা ক্রমে ছড়িয়ে গেল কৌশাম্বীর সকল ভিক্ষুদের মধ্যে। বুদ্ধ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ বিবাদ থামাতে বহু মূল্যবান উপদেশ দিলেন, অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু দু' দলের ভিক্ষুরা বল্লে, "ভন্তে, আপনি শান্তিবাদী, আপনি আপনার শান্তি নিয়ে থাকুন, আমরা কলহপ্রিয়, আমরা আমাদের কলহ নিয়ে থাকি।" নিরুপায় হয়ে বুদ্ধ গেলেন পারিলেয়্যক বনে বন্যপশুর আতিথ্যগ্রহণের জন্য। শাস্তার এই দুরবস্থার কথা জানতে পেরে স্থানীয় গৃহস্থগণ বিহারে এসে ভিক্ষুদের এই বলে ভয় দেখালেন, "যদি আপনারা সবাই ক্ষমা চেয়ে ভগবানকে কৌশাম্বীতে আনতে না পারেন, তা হলে আপনাদের পিণ্ড-ভোজন বন্ধ করে দেবো, আর কিছুতেই খেতে দেবো না।" গতিক ভাল নয় দেখে ভিক্ষুরা বল্লে, "আমরা স্বীকার করছি আমাদের বিবাদ মিটিয়ে নেব এবং বর্ষাবসানে শাস্তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে এখানে পুনরায় নিয়ে আসবো।"

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা আরও গুরুতর। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য দেবদত্ত পূর্বসম্বন্ধে তাঁর শ্যালক।

তিনি ছিলেন উদ্ধত-স্বভাব, আত্মাভিমানী উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতাপ্রিয়। আহার-বিহারাদি বিষয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের নিয়মাদি তেমন কঠোর ছিল না বলে জৈনাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিন্দা ছিল। ঐ নিন্দার কারণ দূরীকরণমানসে হোক্ অথবা অপর যে কোন কারণে হোক্ দেবদত্ত বুদ্ধের কাছে এসে প্রস্তাব করলেন, "আপনার বয়স হয়েছে, এখন থেকে আমার হাতে ভিক্ষুসঙ্ঘের পরিচালনার ভার দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" দেবদত্ত প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক দল গঠন করলেন এবং সংঘে ভেদ ঘটাবার অজুহাত স্বরূপে এক প্রস্তাব আনলেন যাতে বুদ্ধ ভিক্ষুজীবনের কঠোরতা সাধনের অনুকূলে কতিপয় নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেন। বুদ্ধ তাতে অসম্মত হলেন। এই সুযোগ নিয়ে দেবদত্ত প্রমুখ পাঁচ'শ ভিক্ষু বুদ্ধশাসনের বাইরে গিয়ে এক নতুন সম্প্রদায় গঠন করলেন। চৈনিক পর্যটকগণের বিবরণ অনুসারে দেবদত্তপন্থী ভিক্ষুসম্প্রদায় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত উত্তরভারতে বিদ্যমান ছিল।

দেবদত্তের প্রথম প্রস্তাব-প্রত্যাখান বিষয়ে দুই পরস্পরবিপরীত বিবরণ বিনয়-পিটক ও সূত্র পিটকে আছে। বিনয়-পিটকের বর্ণনামতে (চুল্লবগ্‌গ, ৭ম পরিচ্ছেদ) বুদ্ধ দেবদত্তের প্রস্তাব শুনেই তাঁর অগ্রশিষ্য শারিপুত্রকে ডেকে আদেশ দিলেন, "শারিপুত্র, তুমি এখনই দেবদত্তের এই আস্পর্ধার সংবাদ জনসাধারণকে জানাও।" শারিপুত্র, "তথাস্তু ভান্ত", বলে প্রভুর আদেশ পূর্ণ করলেন। জনসাধারণের মনে দ্বিধা উপস্থিত হল, "ইনি অকারণ দেবদত্তের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অভিযোগ জানান কেন?" সূত্র-পিটকের বর্ণনামতে (মহাপরিনিব্বাণ সুত্তন্ত) বুদ্ধ দেবদত্তের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেন নি তার কারণ তিনি নিজে কদাচ ভাবেন নি যে তিনিই বৌদ্ধ ভিক্ষু-সংঘের প্রতিষ্ঠাতা অথবা এই সংঘ তাঁর নেতৃত্বের অপেক্ষা রাখে। তাঁর বলবার উদ্দেশ্য—দেবদত্তকে সংঘের পরিচালকরূপে মনোনীত ও নিযুক্ত করা তাঁর অধিকারের বাইরে।

আদর্শবাদী বুদ্ধের পক্ষে সূত্রপিটক-নিবদ্ধ উত্তরই উপযোগী ও সমীচীন। যখন তাঁর মহাপরিনির্বাণের প্রাক্কালে ভিক্ষুগণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "শাস্তা গতে আমাদের শাস্তা কে?" তখনও তাঁর সমীচীন উত্তর হয়েছিল, "কোন মনোনীত উত্তরাধিকারী নহে। উপদিষ্ট ধর্ম-বিনয় অর্থাৎ আদর্শই হবে তোমাদের পক্ষে শাস্তা ও পরিচালক।" তাঁর শিষ্যনামে পরিচিত শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের সহিত তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এক সময়ে জানুশ্রোণি নামক জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নিকট হতে জানতে চাইলেন তাঁর অনুগামীদের সহিত তাঁর সম্বন্ধ কি? বুদ্ধ তার উত্তরে ব্রাহ্মণকে জানালেন, (মজ্‌ঝিম-নিকায়, ভয়-ভেরব-সুত্ত) "আমরা সবাই সহযাত্রী, আমি শুধু তাদের পূর্বগামী, এই মাত্র আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ এবং আমার দায়িত্ব।" এই উত্তরও আদর্শবাদী বুদ্ধের পক্ষে উপযোগী ও সমীচীন। যদি বিনয়-বিধান তাঁর কাছে এতই না গুরুতর ব্যাপার হবে, তা হলে তাঁর প্রচার-জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি কোন ব্যক্তিকে ঐ বিধানমতে ভিক্ষুপদে বৃত করেন নি কেন? পক্ষান্তরে আমরা দেখি, তাঁর ছিল সেই একই বিধি—"এহি ভিক্‌খু!" "এস ভিক্ষু! Come Ye!" যথাপূর্বং তথাপরম্। এর মানে কি? যদি পথে যেতে যেতে কোন পথিকের সঙ্গে অপর পথিকের দেখা হয় এবং আলাপে-সালাপে জানা যায় দুজনাই একই পথের যাত্রী, অগ্রগামী পথিক অনুগামী সহযাত্রীকে বলেন—"তবে এস, Come along." কথাটী যেমন অতি সহজ তেমন সুন্দর। কিন্তু তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে কি একভাবে লোকচক্ষে দাঁড় করালেন?

অনাগতি-ভয়-শীর্ষক কতিপয় বুদ্ধ-উপদিষ্ট সূত্র অঙ্গুত্তরনিকায়ের পঞ্চক-নিপাতে সন্নিবিষ্ট আছে। সম্রাট্ অশোক তাঁর ভাব্রু অনুশাসনে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী এবং উপাসক-উপাসিকার পক্ষে যে সাতটী ধর্মপর্যায় নিত্যপাঠ্যরূপে প্রচলিত বুদ্ধবচন হতে নির্বাচন করেছিলেন অনাগত-ভয়-শীর্ষক সূত্রগুলি তাদের অন্যতম। এসকল সূত্রে ভবিষ্যতে বৌদ্ধধর্মের অধোগতির আশঙ্কার মূলে যে সমস্ত কারণ বিবৃত আছে তাদের মধ্যে প্রধান কটি হচ্ছে—বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে মতানৈক্য ও ভেদবুদ্ধি, সাম্প্রদায়িকতা, চরিত্রের গলতি, কর্তব্যে শিথিলতা, দলভারী করবার চেষ্টা, ভোজন-লোলুপতা, শয়ন-বিলাসিতা, ধ্যানাভ্যাসাদিতে ঔদাসীন্য, চিত্তা-কর্ষক কাব্যরচনার প্রতি অনুরাগ এবং গভীর জ্ঞানপূর্ণ সূত্রাদি অধ্যয়নে অবহেলা। পারাপর্য স্থবিরের গাথা হতে প্রমাণিত হয় বুদ্ধের মহা-পরিনির্বাণের দু-তিন শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের কি শোচনীয় পরিণতি ঘটেছিল। বর্ণিত আছে, পুষ্পিত মহাবনে একাগ্রচিত্তে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট শ্রমণের মনে এই চিন্তা উদিত হল :

"পুরুষোত্তম লোকনাথের জীবিতকালে ভিক্ষু-গণের চালচলন এক রকম ছিল, এখন অন্যরকম দেখা দিয়েছে। তখন শীতের হাত হতে রক্ষা পাবার এবং লজ্জানিবারণের জন্য কৌপীন ধারণের প্রয়োজন হত, শুধু জীবন-ধারণের উদ্দেশ্যে স্বাদু-অস্বাদু খাদ্য সন্তুষ্ট চিত্তে ভিক্ষুরা ভোজন করতেন। উৎকৃষ্ট কি অনুৎকৃষ্ট, অল্প কিম্বা অধিক যা পাওয়া যেত অপেটুক হয়ে তাঁরা দিন যাপনের জন্য তা আহার করতেন। আসবক্ষয় বা পাপক্ষয় বিষয়ে তাঁদের যেমন আগ্রহাতিশয্য ছিল তেমন চীবর-ভৈষজ্যাদি জীবনোপযোগী উপকরণ বিষয়ে তাঁদের আগ্রহের অল্পতা ছিল। অরণ্যে, বৃক্ষমূলে এবং পর্বত-গুহাকন্দরে তাঁরা আসবক্ষয়-পরায়ণ হয়ে বিবেক-বৈরাগ্য অনুবর্ধন করতেন।···সর্ব-আসব-পরিক্ষীণ মহাধ্যানী ও সমাধিমগ্ন যে সকল স্থবির ছিলেন তাঁরা সবাই গত হয়েছেন, এখন তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প। কুশল ধর্ম ও প্রজ্ঞার পরিক্ষয়ের দরুণ সর্বাঙ্গসুন্দর জিন-শাসন লোপ পাচ্ছে।··· ঔষধ বিষয়ে যেমন বৈদ্যেরা, কার্যাকার্যে যেমন গৃহীরা, বেশভূষায় যেমন গণিকারা, ঐশ্বর্যে যেমন ক্ষত্রিয়েরা, এদের দশাও আজ তা'ই।··· কর্মোদ্দেশ্যে পরিষৎ গঠন করে, ধর্মোদ্দেশ্যে নহে, লাভের কারণ অপরকে ধর্মোপদেশ দেয়, এর প্রকৃত অর্থবোধনের জন্য নহে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

বুদ্ধের শিষ্যগণের মতিগতি এবং কর্মপদ্ধতি সমস্তই সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতার অনুযায়ী ও অভিমুখী। সংঘশক্তির ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরা যে বৌদ্ধধর্মকে রূপায়িত করলেন তা অপরাপর ভাগবত ধর্মের ন্যায় এক বিশেষ রকমের শরণাগতি। এই শরণাগতির প্রথম আশ্রয়স্থল বুদ্ধ, দ্বিতীয় তদুপদিষ্ট ধর্ম এবং তৃতীয় তাঁরই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংঘ। প্রথম শরণ এক বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ, দ্বিতীয় গ্রন্থ-নিবদ্ধ উপদেশ ও বিনয়-বিধান, এবং তৃতীয় বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ের উপর স্থাপিত এক ভিক্ষু-সংঘ বা ভিক্ষু-সমাজ। ত্রিশরণাগত এবং উপাসক-উপাসিকা নামে খ্যাত গৃহিগণ এই সংঘের পক্ষে দায়ক ও দায়িকা। ত্রিশরণের সংজ্ঞা নির্দেশ করে তাঁরা এক সুন্দর ও মনোজ্ঞ ধর্মাদর্শ প্রস্তুত করলেন —এই এই গুণ-সমষ্টির জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপে বুদ্ধ, এই এই গুণ-সমষ্টির জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপে ধর্ম, এই এই গুণ-সমষ্টির জলন্ত আধাররূপে সংঘ। আপাতদৃষ্টিতে ত্রিশরণের সংজ্ঞা অতীব হৃদয়গ্রাহী হলেও, বিশেষ অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেক সংজ্ঞার অন্তরালে আছে এই

সাম্প্রদায়িক দাবীটা—একমাত্র বুদ্ধজাতীয় মহাপুরুষের মধ্যেই আছে প্রথম শরণের গুণাবলী, তাঁদের গৃহীত ধর্মের মধ্যেই আছে দ্বিতীয় শরণের গুণাবলী, এবং তাঁদের গড়া সংঘেই আছে তৃতীয় শরণের গুণাবলী। আদর্শ সংঘ-সংজ্ঞার লক্ষিত গুণাবলীর প্রত্যেকটীই এস্থলে মননযোগ্য :

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবক-সংঘো উজুপটিপন্নো ঞায়-পটিপন্নো আহুনেয্যো পাহুনেয্যো দক্খিণেয্যো অঞ্জলিকরণীয়ো অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি।

ভগবান্ বুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত শিষ্যসংঘ সুপথের পথিক, ঋজুপথের পথিক, ন্যায়পথের পথিক, আহ্বানযোগ্য, নিমন্ত্রণের যোগ্য, শ্রদ্ধেয় এবং লোকসমাজের পক্ষে অদ্বিতীয় পুণ্যক্ষেত্র (দানের উপযুক্ত পাত্র)।

আবার ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে আশীজন বাছা-বাছা বা অগ্রগণ্য শিষ্য নিয়ে গঠিত হল অশীতি-শ্রাবক-সংঘ। এঁরাই হলেন ধর্মরূপ বুদ্ধের অন্তরঙ্গ মন্ত্রি-পরিষৎ বা কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ। কথিত আছে বুদ্ধই স্বয়ং বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী দেখে এবং এক এক বিষয়ে তাঁদের বিশেষ পারদর্শিতা আছে জেনে "এতদগ্রে" স্থাপন করেছিলেন, যেমন বহুজ্ঞ বা শাস্ত্রজ্ঞদের মাঝে সারিপুত্র সকলের অগ্রণী, সংক্ষেপে উপদিষ্ট বুদ্ধবচনের বিশদব্যাখ্যাকারগণের মাঝে মহাকাত্যায়ন সকলের অগ্রণী, চিত্রকথীদের মাঝে কুমার কাশ্যপ সকলের অগ্রণী, ইত্যাদি। ভিক্ষু-সংঘ অধ্যাত্মবিষয়ে গৃহস্থগণের অন্ততঃ এক ডিগ্রী উপরে থাকলেন। গৃহীরা অধ্যাত্মপথ বহুদূর এগুতে পারে, অর্হত্বমার্গেও সমারূঢ় হতে পারে, কিন্তু অর্হত্বফলপ্রাপ্তির মুহূর্তে হয় তাদের মৃত্যু হবে কিম্বা গৃহিলিঙ্গ (গৃহিভাব) উড়ে যাবে, অন্তর্ধান করবে। শ্রাবক বা অগ্রশিষ্য নামধেয় পূর্ণ অর্হৎগণ বুদ্ধকার্য করতে পারেন, যেমন রাষ্ট্রীয় শাসনে রজ্জুকগণ রাজপ্রতিনিধির কাজ করতে পারেন। তাঁদের অধস্তন অগ্রগামী বুদ্ধশিষ্যগণ প্রাদেশিক নামধেয় উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্মচারীর ন্যায় দায়িত্বমূলক শাসনকার্য সম্পাদন করতে পারেন। পুগ্গল পঞ্ঞত্তি নামক অভিধম্ম-পিটকের এক গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ব্যক্তিগণের স্তর-বিন্যাস করা হল, সবার উপরে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, তার নীচে প্রত্যেকবুদ্ধ, তাঁর নীচে আটশ্রেণীর আর্যপুরুষ, তার নীচে কল্যাণ-পৃথগ্জন, তাঁদের নীচে শ্রেণীভেদে ইতরসাধারণ। লোকচক্ষে দেদীপ্যমান হল ভিক্ষুসংঘ। ত্রিশরণের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণীত হল এমন সুন্দর কবিত্ব ও চমৎকারিত্বের সাহায্যে যাতে ভ্রমেও গৃহিগণ ভিক্ষুসংঘের উচ্চমর্যাদা সম্বন্ধে সন্দিহান হতে না পারে। পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকপাঠ নামক ছোট বইখানির বিরাট অর্থকথার শরণাগতির ব্যাখ্যা-অংশে স্থিরীকৃত হল :—

"বুদ্ধ পূর্ণচন্দ্রতুল্য, ধর্ম স্নিগ্ধচন্দ্রকিরণতুল্য এবং সংঘ ঐ চন্দ্রকিরণতৃপ্ত লোকতুল্য। বুদ্ধ উদীয়মান সূর্য-সদৃশ, ধর্ম দীপ্ত সূর্যরশ্মিসদৃশ এবং সংঘ রবিকরসমুজ্জ্বল অন্ধকারদূরিত পৃথিবী-সদৃশ। বুদ্ধ বনদাহক-সদৃশ, ধর্ম বনদাহনকারী অগ্নি-সদৃশ, এবং সংঘ দগ্ধবনকর্ষণোপযোগী ক্ষেত্র-সদৃশ। বুদ্ধ বারিবর্ষী মহামেঘ-সদৃশ, ধর্ম বৃষ্টি-সদৃশ এবং সংঘ বারিবাঙ্কা-পূরিত বসুন্ধরা-সদৃশ। বুদ্ধ সুসারথি-সদৃশ, ধর্ম রথযুক্ত অশ্বগণের শিক্ষার উপায়-সদৃশ এবং সংঘ সুশিক্ষিত অশ্ব-সদৃশ। বুদ্ধ চক্ষুদাতা দক্ষ শল্যকর্তা, ধর্ম শলাকা-সদৃশ এবং সংঘ উন্মীলিত-নেত্র ব্যক্তি-সদৃশ। বুদ্ধ দক্ষ ভিষক্-সদৃশ, ধর্ম অব্যর্থ ভৈষজ্য-সদৃশ এবং সংঘ সম্পূর্ণ-আরোগ্য প্রাপ্ত সুস্থ-দেহ রোগি-সদৃশ। বুদ্ধ সুমার্গদেশিক-সদৃশ, ধর্ম সুমার্গ-সদৃশ, এবং সংঘ সুমার্গচালিত ও সুস্থানে-নীত পথিক-সদৃশ। বুদ্ধ

সুনাবিক-সদৃশ, ধর্ম নৌকা-সদৃশ এবং সংঘ কূলে-আনীত নৌকারোহি-সদৃশ, বুদ্ধ হিমালয়-সদৃশ, ধর্ম হিমালয়-সঞ্জাত ঔষধ-সদৃশ এবং সংঘ ক্ষত-দূরিত ব্যক্তি-সদৃশ। বুদ্ধ ধনদ-কুবের-সদৃশ, ধর্ম ধন-সদৃশ এবং সংঘ ঐ ধনে ধনাঢ্য-সদৃশ। বুদ্ধ গুপ্তধনের আবিষ্কারক-সদৃশ, ধর্ম গুপ্তধন-সদৃশ এবং সংঘ ঐ গুপ্তধনের গ্রহীতা-সদৃশ। বুদ্ধ অভয়দ, ধর্ম অভয়-বাণী এবং সংঘ অভয়প্রাপ্ত ব্যক্তি-সদৃশ। বুদ্ধ আশ্বাসক, ধর্ম আশ্বাস-বাণী এবং সংঘ আশ্বস্ত-ব্যক্তি-সদৃশ। বুদ্ধ রত্ন-সংগ্রাহী, ধর্ম রত্নস্বরূপ এবং সংঘ রত্ন-সংগ্রহীতা। বুদ্ধ রাজকুমারের স্নাপক-সদৃশ, ধর্ম সুগন্ধ-স্নানোদক-সদৃশ এবং সংঘ সুস্নাত-সদৃশ। বুদ্ধ জহরী-সদৃশ, ধর্ম রত্নালঙ্কারসদৃশ এবং সংঘ ঐ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত ব্যক্তি-সদৃশ। বুদ্ধ সুগন্ধ-চন্দনবৃক্ষ-সদৃশ, ধর্ম চন্দন-স্বরূপ এবং সংঘ চন্দনাবলিপ্ত স্নিগ্ধ-দেহ ব্যক্তি-সদৃশ। বুদ্ধ সম্পত্তির মূল-মালিক-সদৃশ, ধর্ম সম্পত্তি-স্বরূপ এবং সংঘ এর উত্তরাধিকারী দায়াদ-সদৃশ। বুদ্ধ পূর্ণ-বিকশিত পদ্ম-সদৃশ, ধর্ম পদ্মমধু-স্বরূপ এবং সংঘ ঐ পদ্মমধুর উপভোক্তা-সদৃশ।

সমসাময়িক শিষ্য-শিষ্যার কাছে বুদ্ধ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, শুদ্ধোদন ও মহামায়ার পুত্র এবং সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে তাঁর জন্ম। তিনি কপিলবস্তুর জনৈক শাক্য-রাজকুমার এবং শাক্য-কুলতিলক। পিতৃ-মাতৃ দুই কুলেই তিনি কুলীন এবং তাঁর জন্মে চৌদ্দপুরুষের মুখ উজ্জ্বল। বুদ্ধ দেব-নর, উচ্চ-নীচ সকলের শাস্তা, তিনি অপ্রতিম, অদ্বিতীয়, অনুপম, অতুলনীয় বিশ্ববরেণ্য মানব ও মহাপুরুষ। তিনি তাঁদের পক্ষ পরমদয়ালু পিতা, তাঁরা তাঁর পুত্র ও কন্যা এবং দায়াদ বা উত্তরাধিকারী; তিনি গুরু এবং তাঁরা তাঁর উপযুক্ত শিষ্য ও শিষ্যা। তিনি মহাকারুণিক মহর্ষি। তিনি যেন অমাত্য-পরিবৃত সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্তী, সংগ্রামজয়ী, অনুত্তর সার্থবাহ। বাগীশ স্থবির জোর গলায় বলেছেন :

চক্কবত্তী যথা রাজা অমচ্চ-পরিবারিতো
সমন্তা অনুপরিয়েতি সাগরন্তং মহীং ইমং,
এবং বিজিতসংগামং সত্থবাহং অনুত্তরং
সাবকা জয়িরুপাসন্তি তেবিজ্জা মচ্চু হায়িনো,
সব্বে ভগবতো পুত্তা, পলাপো এত্থ ন
বিজ্জতি।
তন্হাসল্লস্স হন্তারং বন্দে আদিচ্চবন্ধুনং"

(থেরগাথা, ১২৩৫-৩৭)

ভগবান মহানাগতুল্য, ঋষিগণের মধ্যে ঋষি-সত্তম যিনি মহামেঘ হয়ে শিষ্যগণের প্রতি জ্ঞানবারি ও কৃপাবারি বর্ষণ করেন :

নাগনামো' সি ভগবা, ইসীনং ইসি-সত্তমো
মহামেঘো ব হুত্বান সাবকে অভিবস্সসি।

আত্মপরিচয়-দানে বাগীশ স্থবির বললেন :

ন কামকারো হি পুথুজ্জনানং সংখেয়্যকারো
ব তথাগতানং।

(থেরগাথা, ১২৭১)

"আমি জনসাধারণের কামাকার নিশ্চয় নহি, সত্যিই যে আমি তথাগতগণের সাংখ্যকার, অর্থাৎ তত্ত্বকার, দর্শনের ব্যাখ্যাকার।"

দ্বাসীতিং বুদ্ধতো গণ্হিং, দ্বে সহস্সানি ভিক্খুতো,
চতুরাসীতি সহস্সানি যে মে ধম্মা পবত্তিনো।

(থেরগাথা, ১০২৪)

বুদ্ধের প্রশংসা, ধর্মের প্রশংসা এবং সংঘের প্রশংসায় স্থবির-স্থবিরার গাথাগুলি পরিপূর্ণ। এ সকল প্রশংসাবাদের তালিকা উপরে দেওয়া হয়েছে। গাথাগুলি বিশ্লেষণ করলেও প্রদত্ত তালিকায় প্রশংসাবাদের অতিরিক্ত কিছুই পাওয়া

৩ অবশ্য এ জাতীয় উক্তি বহু পরবর্তী কালের যোজনা মনে করবার কথা, যেহেতু বুদ্ধের সহচর ও সেবক শিষ্য স্থবির আনন্দের উক্তিও এমন এক সময়ের যখন পালি ত্রিপিটকের পরিণত অবস্থা।

যাবে না। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক শ্রমস্বীকার এবং সন্দর্ভের কলেবর-বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন দেখি না।

তাঁদের গাথাগুলি পড়লে এক বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হতে হয়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁদের সকলের মুখে আত্মপ্রসাদের উক্তি আছে। সকলেই আত্মমঙ্গল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কারও উক্তিতে অপরের চিন্তা নেই, জাতির হিত ও বিশ্বের হিতের কথা নেই। আত্মতুষ্টি, আত্মতৃপ্তি নিয়েই সবাই ব্যাপৃত। সকলেরই শেষকথা তাঁরা নির্বিকার চিত্তে আগের থেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন :

নাভিনন্দামি মরণং, নাভিনন্দামি জীবিতং
কালং বো পটিকঙ্খামি সম্পজানো পটিস্সতো।
মরণে উল্লাস নাই, জীবনে তেমন,
শুধু আছি কাল-প্রতীক্ষায় --
জানি তত্ত্ব স্মৃতিমান্ হয়ে।"

এই তত্ত্ব কি? সকল সংস্কার (গড়া জিনিষ, সৃষ্টবস্তু) অনিত্য, সকল সংস্কার দুঃখ (সুখ-দুঃখদায়ক) এবং সকল সংস্কার অনাত্মা (নিজস্ব নহে) :

সব্বে সংখারা অনিচ্চা, সব্বে সংখারা দুক্খা, সব্বে সংখারা অনত্তা। (থেরগাথা, ৬৭৬-৭৮)

এর মানে? অধিমুক্ত স্থবিরের ভাষায়—
উত্তমং ধম্মতং পত্তো সব্বলোকে অনত্থিকো
আদিত্তা বা ঘরা মুত্তো মরণস্মিং ন সোচতি।
যদত্থি সংগতং কিঞ্চি ভবো চ যথ লব্ভতি,
সব্বং অনিস্সরং এতং, ইতি বুত্তং মহেসিনা।
যো তং তথা পজানাতি যথা বুদ্ধেন দেসিতং,
ন গণ্হতি ভবং কিঞ্চি সুতত্তং ব অয়োগুলং।
ন মে হোতি অহোসিন্তি, ভবিস্সন্তি ন
হোতি মে,
সংখারা বিভবিস্সন্তি, তথ কা পরিদেবনা?
সুদ্ধং ধম্মসমুপ্পাদং, সুদ্ধং সংখার-সন্ততিং
পস্সন্তস্স যথাভূতং ন ভয়ং হোতি গামণি।
তিণকট্ঠসমং লোকং যদা পঞ্ঞায় পস্সতি
মমত্তং সো অসংবিন্দং 'নত্থি মে' তি ন সোচতি।
উক্কণ্ঠামি সরীরেণ, ভবেনম্হি অনত্থিকো,
সো'য়ং ভিজ্জিস্সতি কায়ো অঞ্ঞো চ ন
ভবিস্সতি। (থেরগাথা, ৭১২—১৮)

"আমি উত্তম জগত্তত্ত্ব পেয়ে সকল জাগতিক বস্তুতে অনর্থী (অপ্রার্থী)। প্রদীপ্ত তৃষ্ণাগৃহ হতে মুক্ত ব্যক্তিকে শোক করতে হয় না। যে স্কন্ধের সঙ্গতির ফলে ব্যক্তির উদ্ভব হয় এবং যাতে ভবের উৎপত্তি হয়, সে সমস্তই স্বকর্তৃত্বের বাহিরে, মহর্ষি বুদ্ধ একথাই বলেছেন। যিনি বুদ্ধোপদিষ্ট এই সত্য যথার্থ জানেন তিনি ভাব-বিশেষকে আসক্তির দ্বারা গ্রহণ করেন না যেমন কেহ সুতপ্ত লৌহগোলককে হাতে ধরেন না। এতে আমার বলতে কিছুই নেই, ছিলও না, ভবিষ্যতেও কিছু থাকবে না শুধু সংস্কারই (স্কন্ধগড়া বস্তুই) বিনষ্ট হবে, সেখানে পরিদেবনের কারণ কি আছে? বিশ্বে শুধু (কার্য-কারণ-বশে) ধর্মের উৎপত্তি ঘটছে, এতে শুধু সংস্কার-সন্ততি আছে, এই তত্ত্ব যথাযথ দেখলে কোন ভয়ের কারণ থাকে না। যিনি জগৎকে জ্ঞাননেত্রে তৃণকাষ্ঠসম দেখেন, নিজের বলে এতে কিছু না জেনে, তিনি 'আমার নিজস্ব এতে কিছু নেই' ভেবে শোক করেন না। দেহ নিয়ে আমার উৎকণ্ঠা, ভবে আমি অপ্রার্থী, এই দেহ ভেঙে গেলে আমার অপর কোন দেহ হবে না।"

এই হল বুদ্ধের সমসাময়িক শিষ্যগণের দার্শনিক চিন্তা বা মনোবৃত্তি। কিন্তু তা কি সত্যই যুক্তিসহ দার্শনিক তত্ত্ব? আমার অনাসক্ত হওয়ার পক্ষে এ জাতীয় চিন্তা অনুকূল। যদি 'আমি ভাবি, অনুক্ষণ চিন্তা করি—এই দেহ কিছু নয়, আমি কেহ নই, আমার বলতে কিছুই নেই, আমার দেহ নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর, তা হলে আমি

অনাসক্ত হতে পারি। ভাল কথা। কিন্তু আমার এরকমের ভাবাভাবিই কি দার্শনিক তত্ত্ব, না শুধু বৈরাগীর দেহতত্ত্ব ও ভাবুকতা? যদি ধর্মতা বা প্রাকৃতিক নিয়মবশে বিশ্বে ভাঙাগড়ার কাজ চলছে এবং তাতে আমার বা আমাদের কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব কিছু নেই, তা হলে অধিমুক্ত স্থবির কোন্ সাহসে বল্লেন, তাঁর বর্তমান দেহ ভেঙে গেলে আর অপর দেহ হবে না, তিনি পুনর্জন্মের কারণ নিঃশেষ করে ফেলেছেন? এই কি সত্যিই বুদ্ধের দার্শনিক মত যা তিনি তাঁতে আরোপ করেছেন?

ধ্যানাভ্যাসের ফলে তাঁরা যে ত্রিবিদ্যার অধিকারী হয়েছেন তাদের প্রথম ছটী তাঁদের উক্তির বিরুদ্ধে। ত্রিবিদ্যা অর্থে ত্রিবিধ যৌগিক জ্ঞান—প্রথম জাতিস্মর জ্ঞান, দ্বিতীয় কর্মবশে জীবগণের উত্থান-পতন-বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তৃতীয় আসবক্ষয় জ্ঞান। প্রথম জ্ঞান দ্বারা তাঁরা প্রত্যক্ষ দেখতে পান এবং অনুস্মরণ করতে পারেন তাঁরা তাঁদের পূর্ব পূর্ব জন্মে কোন্ কোন্ যোনিতে কি কি অবস্থায় কিরূপ সুখদুঃখের ভাগী হয়েছিলেন। কর্মফল স্বীকার করলে স্বকর্তৃত্ব ও নিজের দায়িত্ব মানতে হয়। শুধু প্রাকৃতিক নিয়মে ধর্মের উদ্ভব ও বিলোপ ঘটছে, যাবতীয় জগৎব্যাপার ঘটছে ও শেষ হচ্ছে এবং সংস্কার-সন্ততি চলছে, এরূপ এক দার্শনিক তত্ত্ব মানলে, কর্মবাদের স্থান কোথায় থাকে? যদি সংস্কার-সন্ততি বা ধর্ম-সন্ততির মধ্যে এক ব্যাপার ঘটবার পর আর এক ব্যাপার ঘটে এবং একের নিরোধে অন্যের উৎপত্তি হয়, তা হলে তাঁরা কোন্ দুঃসাহসে বলেন যে, এই সন্ততির ধারা রুদ্ধ করবেন? যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে উচ্ছেদবাদ তাঁরা পরিহার করেন কিরূপে? বুদ্ধত উচ্ছেদবাদী নন। তিনি শাশ্বতবাদীও নন। অস্তি ও নাস্তি, শাশ্বত ও উচ্ছেদ এই দুই অন্ত পরিহার করলে বুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

খন্ধ-সংযুত্তে বর্ণিত আছে যে, "দেহাবসানে, মৃত্যুর পর ক্ষীণাসব অর্হতের অস্তিত্ব থাকে না বা আর জন্ম-পুনর্জন্ম হয় না (ন হোতি পরম্মরণা), ইহাই বুদ্ধের মত একথা ভিক্ষু যমজ প্রকাশ করলে, বুদ্ধের প্রধান শিষ্য শারিপুত্র তাঁকে বেশ করে শাসালেন। বুদ্ধ সে কথা বলতেই পারেন না, কেন না তাতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উচ্ছেদবাদী হতে হয়। পূর্ণতা লাভ করলে আর আমাদের পুনর্জন্ম হবে না, সংসারে পুনরাবর্তন হবে না, পুনরায় গর্ভশায়ী হতে হবে না, ইত্যাদি এ দেশের পূর্বপ্রচলিত ধার্মিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভাষায় বুদ্ধ কোন উক্তি করে থাকলেও এর মানে সাধারণের উদ্ভট কল্পনা হতে স্বতন্ত্র। বুদ্ধ মাত্র বর্তমান জীবনের দিক্ হতে বলতে গেছেন কি ভাবে চরিত্র-বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, জ্ঞান-বিশুদ্ধি, ইত্যাদি সাধন করতে পারলে মানব চরিত্রের অধঃপতন হবে না এবং মানবচিত্ত পুনরায় অবিদ্যা ও ক্লেশের অধীন হয়ে চলবে না। তাঁর চিন্তার দার্শনিক অংশে জন্ম এবং মৃত্যুর, নিরোধ এবং উৎপত্তির বাস্তবতা স্বীকার না করলে সন্ততি (continuity) কল্পনা সম্ভব হয় না। এই সন্ততিতে যেমন জন্ম একটা ক্ষণ তেমন মৃত্যুও একটা ক্ষণ। যদি আমরা মৃত্যুক্ষণ চাইনা, তবে জন্মক্ষণ পাই কোথা? দুই ক্ষণের অন্যোন্য সম্বন্ধ এড়াতে গেলেই আমাদের বাধ্য হয়ে সাংখ্য বেদান্তাদি দর্শনের ভাবে বলতে হয় যে, আমাদের মধ্যে এমন এক বিজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানাত্মা আছে যাহা, চিন্মাত্র এবং শুদ্ধচৈতন্য এবং যার সত্তা জন্ম ও মৃত্যু দুয়েরই অতীত; তা অজ, নিত্য ও শাশ্বত। এরূপ এক দেহাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, মনাতীত, বুদ্ধির অতীত চিতির বা শুদ্ধচৈতন্যের অস্তিত্ব শুধু কল্পনারাজ্যেই

সম্ভব, বাস্তবে নয়।' সাময়িক নির্বিকল্প সমাধির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রমাণে এ হেন বিজ্ঞানাত্মার অস্তিত্বকে বাস্তবে পরিণত করার মূলে আছে বাস্তবের উপর কল্পিত সত্যের আরোপ। বাস্তবের মানবচিন্তা-নিরপেক্ষ ধর্মনিয়মতার সন্ততিতে থাকতে গেলেই নিরোধ ও উৎপত্তি ধারায় চলতে হবে। এ জীবনে আমাদের লব্ধ আত্মবিশুদ্ধিতে ঐ ধারা রহিত হল বলি কিরূপে? কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যগণ পূর্বপ্রচলিত সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অকুতোভয়ে বলে বসলেন—আমরা ঐ ধারাই রুদ্ধ করে ফেলেছি। ফলে দাঁড়াল যেমন বেদান্তের মধ্যে ব্যবহারিক দিক্ হতে যা সত্য, পারমার্থিক দিক্ হতে তা মায়া বা মিছে, তেমন স্থবিরবাদ বৌদ্ধধর্মে লোকসম্মতির দিক্ হতে যা ব্যক্তি বা বস্তু বলে স্বীকৃত, পরমার্থের দিক্ হতে তা শুধু সংস্কার বা পঞ্চস্কন্ধের সংগতিজনিত ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি।

বুদ্ধের পরিভাষায় মিথ্যাদর্শন অর্থে একাঙ্গ-দর্শন। একদেশদর্শিতা এবং বাহুশ্রুত্য অর্থে সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা। "শুধু আমি যা বলি এবং আমি যা করি তাই সত্য ও সার্থক এবং অপরং সব কিছু মিছে ও নিরর্থক", ইদমেব সচ্চং মোঘং অঞ্ঞং, এই হল একদেশদর্শীর মনোভাব এবং গর্বোক্তি। মজ্ঝিম নিকায়ের অলগদ্দূপম-সুত্তে বুদ্ধ বলেছেন—যদি কোন ভিক্ষু নিজ শাস্ত্র (ধর্ম-বিনয়) অধ্যয়ন করে স্বপক্ষ সমর্থন ও পরমত খণ্ডন উদ্দেশ্যে তাঁর দশা, আর যে লোক জাত সাপের দেহের মাঝখানে ধরে যাতে সাপ উল্টে ছোবল মারতে পারে তার দশা একই। মানবচরিত্রের উন্নয়নসাধনই আসল কাজ এবং সকল রকমের বিশুদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্য মানব-চরিত্রের উন্নয়ন। বুদ্ধের এই মতের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করেছিলেন সম্রাট অশোক। তাঁরও মতে বহুশ্রুত হওয়া শুধু এক সম্প্রদায়ের আগমে ব্যুৎপত্তি-লাভ করা নয়, সকল সম্প্রদায়ের আদর্শবাদকে সশ্রদ্ধ অধ্যয়ন এবং পরস্পর আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ের দ্বারা যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করে পরস্পর পরস্পরকে মানবসংস্কৃতি ও সভ্যতার সারবর্ধন-কার্যে সহায়তা করা। ব্রাহ্মণ সাম্প্রদায়িকগণের পরিভাষায় কেবল বেদবেদাঙ্গাদি নিজশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়ার নাম বহুশ্রুত হওয়া। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বুদ্ধের সমসাময়িক শিষ্যগণের স্বগতোক্তি অনুসারে কেবল বুদ্ধাগমে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার নামই বাহুশ্রুত্য। আনন্দ স্থবিরের উক্তি অনুসারে বুদ্ধ-শিষ্যদের মধ্যে যিনি বুদ্ধাগমে সুপণ্ডিত তিনিই বহুশ্রুত, তিনিই ধর্মরাজ বুদ্ধের কোষাধ্যক্ষ :

বহুস্সুতো ধম্মধরো কোসারক্‌খো মহেসিনো
চক্‌খু সব্বস্স লোকস্স পূজনেয়্যো বহুস্সুতো।
(থেরগাথা, ১০৩১)

শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধশিষ্যগণ অপরাপর শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করেছেন এরূপ উক্তি কোথাও পাই না। বুদ্ধের প্রত্যেক উক্তির পশ্চাতে যে ইন্দো-আর্য সংস্কৃতি ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বুদ্ধশিষ্যগণ বুদ্ধাগমের অর্থ করতে পারেন নি।

তাঁর সমসাময়িক শিষ্যগণের মধ্যে একমাত্র শারিপুত্রের এবং শিষ্যাগণের মধ্যে একমাত্র ধর্ম-দত্তার (ধম্মদিন্নার) নাম করা যেতে পারে যাঁরা বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তার স্বরূপ কিছু বুঝেছিলেন। বুদ্ধ দশাঙ্গমার্গ নির্দেশ করেছিলেন, যথা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ বিমুক্তি। স্থবিরগণ জনসমাজকে স্বধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রচলিত অষ্টাঙ্গযোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দশাঙ্গ-মার্গকে অষ্টাঙ্গমার্গে পরিণত করে বৌদ্ধ দার্শনিক চিন্তায় এক বিভ্রাট ঘটালেন এবং এর পূর্বে "আর্য" বিশেষণ যুক্ত করে নিজ ধর্মপন্থার গৌরব বাড়ালেন। তাঁরা আরও এক

বিষম ভুল করে বসলেন। চারি আর্য সত্যের মধ্যে দুঃখ-নিরোধের উপর জোর দিয়া বুদ্ধের সম্যক্‌বাদের সম্যকত্ব নষ্ট করলেন। দুঃখ-নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে যে সুখের পরিপূর্ণতা (পারিপূরি) জানাতে হবে সে কথা একেবারেই ভুলে গেলেন। বুদ্ধ যে দশাঙ্গমার্গ প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রমাণ বাগীশ স্থবির :

পজ্জোতকরো অতিবিজ্ঝ সব্বট্‌ঠিতীনং অতিক্কমং অদ্দা,

ঞত্বা সচ্ছিকত্বা চ অগ্গং সো দেসয়ি দসদ্ধানং।

(থেরগাথা, ১২৪৪)

তার প্রমাণ শারিপুত্র উদ্দিষ্ট দীঘনিকায়ের অন্তর্গত দসুত্তর ও সঙ্গীতি-পরিয়ায় সুত্তদ্বয়। অকুশল-নিরোধ এবং কুশলের পরিপূর্ণতার ভাবেই শারিপুত্র দশাঙ্গমার্গের ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্মদত্তা স্থবিরাও অধোগতি ও প্রগতি এই দু ধারায় বুদ্ধ চিন্তার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন।

বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ এতগুলি পরস্পর বিরোধী উক্তি ও কার্য বুদ্ধে আরোপ করলেন যাতে শেষে তাঁরা নিজেই তাঁদের সমস্যা-সমাধানে বিব্রত হলেন। এ বিপদে তাঁদের রক্ষাকর্তা হলেন মিলিন্দপ্রশ্ন নামক বৌদ্ধগ্রন্থের স্থবির-বক্তা নাগসেন। তাঁর ব্যাখ্যায় যথেষ্ট জ্ঞানপ্রতিভা এবং বাক্‌পটুতা থাকলেও তা কতটা যুক্তিসহ সন্দেহ।

বৌদ্ধ গোঁড়াদলের বিরুদ্ধে যে সকল প্রগতি-শীল সম্প্রদায় উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যেই আমরা যা কিছু বুদ্ধের আদর্শবাদের অনুকূলে যুক্তি পাই। শুধু আত্মমঙ্গল সাধনের প্রচেষ্টা এবং আত্মমঙ্গল-বিষয়ে আত্মগৌরব-প্রকাশ কদাচ বড় আদর্শ হতে পারে না; তা বস্তুতঃ হীনযান। মহাযানের মধ্যেই পাই আমরা বুদ্ধধর্মের মহান্‌ আদর্শের বিকাশ।

'অন্ধের নয়নে দাও আলো'

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল

অন্ধের নয়নে প্রভু দাও করুণায় মাখা
প্রভাতের আলো,
রজনীর অন্ধকারে উদয়-অচল ভরি
দীপ-শিখা জ্বাল।

তোমার আলোক-রাশি অকাতরে দাও ঢালি
বিশ্ব-চরাচরে,
কেন এত কৃপণতা অন্ধের কেবল ওই
আঁখি দুটি 'পরে?

কুঁড়ির মাঝারে যেই বন্ধ হয়ে গন্ধ থাকে
তাহারে ফুটাও,
মৃত্যুর আঁধার-ভেদে জ্যোতির ছটায় তুমি
অমৃতে লুটাও।

অন্ধ না পাইলে আঁখি তার কাছে সবি ফাঁকি
আলোক আঁধার;
অন্তরের দৃষ্টি মাঝে প্রেমের প্রদীপ জ্বালি
খোল রুদ্ধ দ্বার।

রামায়ণের যুগে গণতন্ত্র এবং স্বাধীন ভারতের শাসন-তান্ত্রিক আদর্শ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল, সাহিত্য-রত্ন

অনেকে মনে করেন প্রাচ্যদেশীয় নরপতিগণ প্রজারঞ্জক হইলেও স্বৈরাচার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না, গণতান্ত্রিক শাসনের ধার ধারিতেন না এবং তাঁহাদের আমলে রাষ্ট্রশাসনে জনসাধারণের কোনও হাত ছিল না। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে একথা কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। রামায়ণের যুগে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য যদিও রাজা প্রধানতঃ দায়ী থাকিতেন, তথাপি সে যুগে অমাত্য, সুধী ও সেনাধ্যক্ষগণ সমবেতভাবে আলাপ, আলোচনা ও মন্ত্রণা করিয়া রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও পরিচালন করিতেন। বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অথবা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে জনগণ সমবেত হইয়া পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ ও মন্ত্রণা করিতেন। সকলেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিতে পারিতেন; কাহারও নিজের মত প্রকাশ করিবার পূর্বে পারস্পরিক আলোচনা ও স্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—রামের রাজ্যাভিষেক-ব্যাপারে এক অভাবনীয় বৃহৎ গণ-সম্মেলন হইয়াছিল। সেই মহতী জনসভায় রাজা দশরথ বার্দ্ধক্যবশতঃ রাজ্যশাসনের গুরুভার হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তিনি উপসংহারে বলিলেন, "হে প্রজাগণ, আমি যে প্রস্তাব তোমাদের নিকট উপস্থিত করিলাম, ইহা যদি অসমীচীন ও তোমাদের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ না হয় তবে তোমরা ইহাতে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন কর এবং আর কি করিতে হইবে ও কি ভাবে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দাও। কিন্তু যদি আমি কেবল স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বশবর্ত্তী হইয়া এই সংকল্প করিয়া থাকি তবে তোমাদের মঙ্গলার্থ তোমরা অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন কর।" তৎপর রাজা স্বাধীন-ভাবে আলোচনা করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। স্বাধীন আলোচনাই নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ ও ন্যায়ানুগত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া সবকালে ও সর্বদেশে গৃহীত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও উহার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। জননায়ক, নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া সবসম্মতিক্রমে তাঁহাদের অনুমোদন জানাইলেও, রাজা তাঁহাদিগকে দ্বিতীয়বার গভীর চিন্তা করিয়া তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। এরূপভাবে অনুরোধ জানাইলেন যে, তিনি যেন তাঁহাদের মনোভাব আদৌ জানিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমার কথা শুনিবামাত্রই তোমরা রামের রাজ্যাভিষেকে তোমাদের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছ। ইহাতে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। তোমরা কি সত্য সত্যই স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় তোমাদের মত ব্যক্ত করিয়াছ? এক্ষণে আমি ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিতেছি। ইহা সত্ত্বেও তোমরা আমার পুত্র রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত

দেখিতে চাহিতেছ কেন?" রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য গণ-মত গ্রহণ করিবার ইহাপেক্ষা অধিকতর নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ ও ন্যায়ানুগ প্রচেষ্টা আর কি হইতে পারে? ইহাই গণতন্ত্রশাসনের সুস্পষ্ট নিদর্শন।

প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এরূপে জনগণের অভিমত, উপদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাভারতেও দেখা যায়, বৃদ্ধ ও অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রজাসাধারণের সহিত পরামর্শ ও মন্ত্রণা করিতেছেন এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার জন্য তাহাদের অনুমতি চাহিতেছেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রজাগণকে বলিতেছেন, "এই গান্ধারীও বৃদ্ধা এবং বিষণ্ণা। তিনি পুত্রহারা হইয়া নিতান্তই অসহায়া। পুত্রশোকে কাতরা হইয়া রাণী আমার সহিত তোমাদের নিকট অনুমতি চাহিতেছেন। ইহা জানিয়া তোমরা আমাদিগকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার অনুমতি দাও। তোমরা সুখী হও; আমরা তোমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি"। রাবণের ন্যায় উদ্ধত-প্রকৃতি ও স্বেচ্ছাচারী রাজাকেও তাঁহার রাজ-সভায় স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে দেখা গিয়াছে। রাক্ষসপতি রাবণ রামের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে রাক্ষসগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে মহাবল রাক্ষসগণ, হনুমান অপরাজেয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া জনকনন্দিনী সীতার সন্ধান পাইয়াছে। মনস্বিগণ বলেন, যুদ্ধে জয়লাভ মন্ত্রণার উপর নির্ভর করে। অতএব আমি যুদ্ধ বিষয়ে তোমাদের সহিত পরামর্শ ও মন্ত্রণা করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের আক্রমণকারী রাম লঙ্কার দিকে অগ্রর হইতেছে। রাঘব নিশ্চয়ই অনায়াসে সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।" মহাবল রাক্ষসগণ দম্ভভরে রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান ও সুগ্রীবের প্রাণসংহার করিবার আশ্বাস দিল। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ বিভীষণ শস্ত্র উত্তোলন করিয়া রাক্ষসগণকে বাধা দিলেন এবং নিজ নিজ আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ দিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "ভ্রাতঃ, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ উপায় ব্যর্থ হইলে পরিণামে বলপ্রয়োগ করিতে হয়—ইহাই জ্ঞানিগণের অভিমত। যশস্বী রাম পূর্বে আপনার এমন কি অপকার সাধন করিয়াছেন, যে জন্য আপনি তাঁহার স্বাধ্বী ভার্য্যা সীতাকে জনস্থান হইতে অপহরণ করিয়া আনিলেন? পরদারের প্রতি অসম্মান ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা নিতান্তই অযশস্য ও অনায়ুষ্য। এই নিমিত্ত বৈদেহী আমাদের মহা-বিপদের হেতুভূতা হইবেন। ধর্মানুবর্তী ও বীর্যবান রামের সহিত নিরর্থক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে শুভকর হইবে না। মৈথিলীকে ফিরাইয়া দিন। যাহা আমি শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি তাহা আপনাকে বলা অবশ্য কর্তব্য মনে করি। যথোচিত পরামর্শ, মন্ত্রণা ও গভীর চিন্তা করিয়া কায করিবেন।" কেবল বিভীষণ নহে, কুম্ভকর্ণও রাজসভায় সীতার প্রতি রাবণের দুর্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইয়া-ছিলেন। কুম্ভকর্ণ শেষ পর্য্যন্ত রাবণের পক্ষ সমর্থন করিলেও তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ নির্ভীক ও সুস্পষ্ট ভাষায় সর্বসমক্ষে ভ্রাতাকে নিজ স্বাধীন মত জানাইতে ও তিরস্কার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি রাবণকে বলিয়াছিলেন, "এই সমস্ত যাহা কিছু করিয়াছেন ইহা আপনার পক্ষে মোটেই সমীচীন হয় নাই। যদি আপনি প্রথমেই এই ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ, মন্ত্রণা ও উপদেশ গ্রহণ করিতেন, তবে আপনাকে এরূপ ঘোর বিপদসাগরের সম্মুখীন হইতে হইত না। এই বিপদের আভাস আমরা পূর্বেই পাইয়াছিলাম। স্বকৃত পাপের ফল আপনাকে

ঘিরিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এরূপ শোচনীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য রাম এখনও আপনাকে বিনাশ করেন নাই।" রাবণের মাতুল মাল্যবানও রাজসভায় প্রকাশ্যভাবে ও স্বাধীনচিত্তে অধর্ম, পাপাসক্তি ও দুর্নীতির জন্য রাবণকে কঠোর তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই সুদূর অতীতেও ভারতের রাষ্ট্রশাসনে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল—ইহা ভাবিবার ও প্রণিধান করিবার বিষয়।

অধুনা পৃথিবীর প্রগতিশীল রাষ্ট্রসমূহে গণতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় শাসন-ব্যবস্থাসকল গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপূর্ণতার দিকেই ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। বিগত বিশ্বব্যাপী মহাসমরের পর রাষ্ট্রশাসনে গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ও আগ্রহ স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারতবর্ষও ইহা হইতে বাদ যায় নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রের চিরন্তন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল শাসন-ব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক আদর্শের অবসান ঘটাইয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। পাঠান, মোগল এবং ব্রিটিশ আমলে ভারতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক সর্বপ্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস গণপরিষদ-মারফৎ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী ব্রিটিশ শাসকদের নিকট সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন। কংগ্রেসের এই দাবী ভারতবর্ষের প্রাচীন রাষ্ট্রশাসনের ঐতিহ্য ও আদর্শানুগত এবং আধুনিক সভ্যজাতিসকলের রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনুকূল। ভারতীয়গণের আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধিকার ও স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার এই সম্মিলিত দাবী ও দৃঢ়সংকল্প অবশেষে ফলপ্রসূ হইয়াছে। ভারতীয়গণের ত্যাগ, অশেষ দুঃখ-নির্যাতন-লাঞ্ছনা-ভোগ এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণের ফলে আজ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, জনগণ-পরিচালিত জনগণের মঙ্গলার্থ গণশাসন প্রতিষ্ঠার জয়যাত্রা পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৪৬ সনের ৯ই ডিসেম্বর ভারতীয় গণপরিষদের প্রথম কার্যারম্ভ হয়। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ব্রিটিশ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয়; ১৭ই নভেম্বর গণপরিষদের সম্মতিক্রমে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র ও আইন রচনার জন্য সার্বভৌম ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। এগুলি ভারতীয় ইতিহাসের ক্রান্তিপাতকারী স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সার্বভৌম ব্যবস্থা-পরিষদের প্রথম অধিবেশনে বলিয়াছেন, "আমাদের সম্মুখে যে সব সমস্যা উপস্থিত সেগুলি অতিশয় গুরুতর। নূতন শপথ গ্রহণ করিয়া আমরা এই নূতন জীবন আরম্ভ করিলাম, সে শপথ কোনো বাহিরের প্রতীকের নিকটে নয়, দেশের নিকটে এবং দেশের স্বার্থের নিকটে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে আমরা ভারতীয় জনগণকে সেবা করিতে থাকিব এবং তাহাতে কোন পক্ষপাতিত্ব বা অনুগ্রহ থাকিবে না।" সমগ্র ভারতবর্ষ আবহমান কালের ইতিহাসের মধ্য দিয়া এই গণতান্ত্রিক আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় কংগ্রেস এই আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়াই এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক, প্রবুদ্ধ ভারতের মূর্ত প্রতীক স্বদেশ-প্রেমিক ঋষি বিবেকানন্দেরও স্বপ্ন ও আদর্শ ছিল নিপীড়িত পদদলিত গণ-নারায়ণের জাগরণ, উদ্বোধন ও সেবা এবং তাহাদের ন্যায্য অধিকার, দাবী ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠা। যে বিরাট গণশক্তি এতদিন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল (Sleeping Leviathan) উহার নিদ্রাভঙ্গ, জাগরণ ও পুনরভ্যুত্থানের নিশ্চিত লক্ষণ ও সূচনা দেখিয়াই স্বামীজি বলিয়াছিলেন যে এবার শূদ্রশক্তির, জনগণের অভ্যুত্থান হইবে, গণরাজ প্রতিষ্ঠিত

হইবে, এ শক্তিকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না—যাহারা বাধা দিতে যাইবে তাহারা দুর্বার শক্তির বেগমুখে নির্মূল হইয়া যাইবে। স্বামীজি ভাবাবেগের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রতা হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিতা হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।······ নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে—তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা, সনাতন দুঃখ-ভোগ করেচে—তাতে পেয়েচে অটল জীবনীশক্তি। অতীতের কঙ্কালচয়—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ·········যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে, অথচ ইহাদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহা হইলে তাহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইবে।"

ভারতের আবহমান কালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শের ক্রমাভিব্যক্তির পূর্ণপরিণতিস্বরূপ, বিবেকানন্দের আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও গণপরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রশাসনে রূপ পরিগ্রহ করুক ইহাই আমরা ভারতের ভাগ্যবিধাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

'তবু গেয়ে যাব'

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

তবু গেয়ে যাব গান, দিয়ে যাব সুর
মানবের এ অনন্ত হৃদয়-ভাণ্ডারে
মনে যদি থাকে—ভাল। নাই যদি থাকে,
ভুলে যেও, 'মিথ্যা দিয়ে আমি আপনারে
রাখি নি আবৃত করে।'— জীবনের শাখে,
আমার সকল ফুলে, পাতায় পাতায়,
মর্মরিয়া ওঠে যেন এই বাণী মোর,
শারদ-হেমন্ত-প্রাতে বসন্তে বর্ষায়,
এ জনম-ভোর।

আমার যেটুকু সাধ্য আমি করে যাব,
মোর কাজ নিখিলের কর্মকোলাহলে
শুধু সুর দেয়া। নম্র শিরে নিশিদিন
সে কার্য সাধিয়া যাব। কোন মিথ্যা ছলে
অশোধিত রাখিব না আমার এ ঋণ।
ভালবেসে লও যদি আপনার করে
সে আমার পুরস্কার জানি শ্রেষ্ঠতম।
দূরে ফেলে দাও যদি রূঢ় অনাদরে
বাড়িবে হৃদয়-তন্ত্রে মহাবজ্রসম।
তবু শুধাব না কথা গেয়ে যাব গান,
দিব সুর, তারি সাথে দিব মোর প্রাণ।



কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪

শিল্পী
শ্রীনন্দলাল বসু

ব্লক ও মুদ্রণ বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

ভারতের মর্ম্মবাণী

স্বামী তেজসানন্দ (অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়)

বিভিন্নমুখী মানব-মন প্রত্যেক সমাজ ও জাতিকে কেন্দ্র করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে চিন্তা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। কালপ্রবাহে যুগে যুগে কত জাতির, কত সভ্যতার উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? বলাবাহুল্য, অতীত ইতিহাস মানবজাতির এই উত্থান-পতনের বার্ত্তা আমাদের দ্বারে উপহার দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শিক্ষা দিয়াছে যে, যে জাতি শাশ্বত সত্যবস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহার কৃষ্টিসৌধ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয়, সে জাতি সহস্র পরিবর্ত্তন-প্লাবনেও ধ্বংসের কুক্ষিগত হয় না। অতীত শতাব্দীর রক্তাক্ত ইতিহাস পুনঃ পুনঃ ইহার সাক্ষ্য দিলেও, বর্ত্তমান জড়সভ্যতার ধ্বংসলীলার মধ্যে ইহার সত্যতা আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানব-সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, সুদূর অতীতে প্রাচীন গ্রীক জাতি বা আধুনিক ইউরোপীয়গণ জগৎকারণীভূত বস্তুসম্বন্ধীয় পারমার্থিক তত্ত্বসমাধান-মানসে বহিঃপ্রকৃতির অনুশীলন-বিশ্লেষণেই নিমগ্ন রহিল; আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচ্য-মনীষা বহির্জগতে পরমতত্ত্বের সন্ধান না পাইয়া অন্তর্জগতে জ্যোতির্ম্ময় জীবাত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং ক্রমে অনন্ত শক্তির চিরপ্রস্রবণ শুদ্ধ মুক্ত আত্মার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া সেই অখণ্ড আত্ম-চৈতন্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর জাতির কৃষ্টি-সৌধ গড়িয়া তুলিল। তাই যুগে যুগে ভারত তাহার সাধনালব্ধ ত্যাগ ও শান্তির বাণী জগৎকে শুনাইয়া আসিতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঋষি বিবেকানন্দের কণ্ঠেও সেই বাণীই ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, -"কিম্বদন্তী যে অতীতের ঘনান্ধকার দূর করিতে অসমর্থ, সেই অতীত প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহিমাময় পুরুষগণ এই সমস্যা-পূরণে অগ্রসর হইয়াছেন;—তাহারা জগতের নিকট তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, যদি কাহারও সাধ্য থাকে, উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত এই,—ত্যাগ, প্রেম, অপ্রতিকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা ত্যাগ করিলেই সেই জাতি দীর্ঘজীবী হইতে পারে।... ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে,—শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব—কিছুদিনের জন্য পাপ খেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান জাতি অনেক দুরদৃষ্ট, বিপদ ও দুঃখের ভার সত্ত্বেও এখনও জীবিত রহিয়াছে; তাহার একমাত্র কারণ, এই জাতি ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।"

ভারত-সংস্কৃতির মূল উৎস বেদ, বেদান্ত, গীতাদি শাস্ত্র জগতের সম্মুখে ত্যাগের এই অমৃত-বাণীই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে। বেদান্তোক্ত* বালক নচিকেতার ত্যাগ-সমুজ্জ্বল চরিত্র-বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাইব, শ্রুতি কেমন করিয়া

* কঠোপনিষদুক্ত

মানব-চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া এই মূলতত্ত্বটিরই সন্ধান দিয়াছেন। প্রতি মানবের সামাজিক জীবনের অত্যুচ্চ আদর্শ, ঐহিক ও পারলৌকিক জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও ভোগ্যবস্তুনিচয়ের নশ্বরত্ব, ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল মহিমা ও আত্মজ্ঞানের চরম সার্থকতা—যে সম্পদরাজি ভারত চিরদিন বহুমূল্য বস্ত্র-পেটিকার মত সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে,—বেদমূর্ত্তি নচিকেতার উন্নত জীবন আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে।

অনন্ত স্বর্গসুখ-কামনায় ঋষি গৌতম বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্বদানের জন্য ব্রতী হইয়াছেন। হোম-গন্ধপরিপূরিত যজ্ঞভূমি ঋত্বিক্‌কণ্ঠোচ্চারিত সামগানে মুখরিত। পিতৃসন্নিধানে ঋষিপুত্র বালক নচিকেতা উপবিষ্ট। ঋত্বিক্‌গণের দক্ষিণাস্বরূপ জরাজীর্ণ কঙ্কালাবশিষ্ট, নিবিন্দ্রিয় গাভীসমূহ যজ্ঞস্থলে একে একে আনীত হইল। শাস্ত্রবাক্যে গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন বালক সর্ব্বস্বদান যজ্ঞে পিতার এইরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য-দর্শনে ব্যথিত হইয়া নিজকেও পিতার অন্যতম সম্পত্তিজ্ঞানে বিনয়-নম্রবচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! আমায় কাহাকে দান করিবেন?" পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া দ্বিতীয়বার, এমনকি তৃতীয়বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক পুত্রের এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া গৌতম বলিয়া উঠিলেন, "মৃত্যবে ত্বা দদামীতি।"—তোমায় মৃত্যুকে দিব। বাক্যবাণে বিদ্ধ বালকের আত্ম-শ্রদ্ধা আজ ক্ষুব্ধ অভিমানে জাগিয়া উঠিল। বালক ভাবিল, "আমি পিতার বহু পুত্রের বা শিষ্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট শিষ্যত্বাদিগুণে প্রথম; অনেকের মধ্যে মধ্যবিধ শিষ্যত্বাদিগুণে মধ্যম। কিন্তু কদাচ এমন তুচ্ছ বা অধম নহি যে জন্য আমি মরণযোগ্য হইতে পারি।" তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে আজ এক নূতন সুর বাজিয়া উঠিল। সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল,—

"সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে।
কালনৃত্য করে উপভোগ,—
মাতৃরূপা তা'রি কাছে আসে।

তাহার জীবনের অভিযান সুরু হইল,—বালক অকুতোভয়ে মৃত্যুর সন্ধানে চলিল। ভারত-প্রতিভা আজ যেন ত্যাগমূর্ত্তি নচিকেতার রূপ পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বশক্তির মূল-উৎস-সন্ধানে অনন্ত পথের পথিক হইল।

যম-ভবনে উপনীত বালক মৃত্যুরাজের প্রতীক্ষায় তিন দিবস তিন রাত্রি অভুক্ত অবস্থায় উপবিষ্ট রহিল। বালকের অন্তরে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা দেদীপ্যমান। তাহার নির্ম্মল মুখমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জিজ্ঞাসু নেত্রদ্বয়ে প্রতিভার ভাস্বর দ্যুতি। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বালকের কমনীয় কান্তিদর্শনে বিবস্বৎপুত্র যম আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং এই বরণীয় অতিথির তৃপ্তি ও শান্তিবিধানার্থ পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাহার যথোচিত সৎকার করিয়া তিন রাত্রি অনাহারে থাকার জন্য তিনটী বরপ্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি জানিতেন যাহার গৃহে অতিথি অভুক্ত থাকে, সেই অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার বিষয়, সাধুসহবাস ও প্রিয়বাক্যের ফল, যাগযজ্ঞ ও বাপীকূপাদিহিতকর-দ্রব্যপ্রদানজনিত পুণ্য, পুত্র ও পশুসমূহকে, অতিথির অনভ্যর্থনরূপ পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। তাই আজ ধর্ম্মরাজ স্বয়ং আদর্শগৃহীর কর্ত্তব্য হিসাবে দেবতাজ্ঞানে অতিথির উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনাদি করিলেন। নচিকেতা বালক হইলেও তাহার ধীশক্তির ন্যূনতা ছিল না। বিজ্ঞজনোচিত তিনটী বর যমরাজের নিকট বালক একে একে প্রার্থনা করিল এবং যে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশে মানব-মন যুগযুগান্তর ধরিয়া অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টায় ছুটিয়া চলিয়াছে তৃতীয় বরে তাহার চূড়ান্ত

মীমাংসা করিয়া লইল। প্রথমবরে পিতৃভক্ত বালক আদর্শপুত্রের উপযুক্ত বরই প্রার্থনা করিল,—

"শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্ বীতমন্যুর্গৌতমো মাভিমৃত্যো

ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥"

"—হে মৃত্যো, আমি তোমার অঙ্গীকৃত তিনটী বরের মধ্যে এই প্রথম বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পিতা গৌতম আমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠাশূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্নমনা ও বিগতক্রোধ হউন এবং তোমার নিকট হইতে বিমুক্ত হইয়া যখন আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিব, তখন যেন তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ করেন।" যমরাজও "তথাস্তু" বলিলেন। পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্যের এরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ক্রোধান্ধ পিতাকর্তৃক যমভবনে প্রেরিত হইয়াও পুত্র স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় নাই। সমাজ-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতিরক্ষার্থ শ্রুতি নচিকেতার চরিত্রে নিঃস্বার্থপরতা ও পিতৃভক্তির আদর্শ সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্বার্থসিদ্ধির এমন অপূর্ব্ব সুযোগ সত্ত্বেও তাহার নির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রতি-হিংসার বিন্দুমাত্র কলঙ্ককালিমা দেখিতে পাই না। অহিংসার পূতার্ঘ্য পিতৃচরণে উপহার দিয়া বালক দ্বিতীয় বর প্রার্থনায় অগ্রসর হইল।

মানব-মনের স্বাভাবিক গতি অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় মানুষ ইহলৌকিক সুখ-শান্তি, যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভেই সন্তুষ্ট হয় না; তাহারা ইহজগতের পরপারে এমন এক রাজ্যের সন্ধানের জন্য ব্যাকুল হয় যেখানে জরামরণ-ভীতি মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না,—যেখানে অমরত্বলাভ করিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া মানুষ সুখ-ভোগ করিতে সমর্থ হয়। সেই স্বর্গরাজ্যের সন্ধান দিবার জন্য মানব-হৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি তুলিয়া শ্রুতির বরপুত্র নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিল,—

"স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।

উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।

স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥"

"—হে মৃত্যো, শুনিয়াছি স্বর্গলোকে জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া সকলে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। যে অগ্নি-উপাসনা দ্বারা লোকে স্বর্গবাসী হইয়া অমৃতত্বলাভ করে সেই অগ্নিতত্ত্ব শ্রদ্ধালু আমার নিকট বর্ণন কর।" তপন-তনয় যমরাজ নচিকেতার প্রশ্নে প্রীত হইয়া অনন্তলোক-প্রাপ্তিসাধন ক্রিয়াতত্ত্বজ্ঞগণের বুদ্ধি-গুহায় নিহিত অগ্নিবিদ্যা জীবকল্যাণের জন্য নচিকেতার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন এবং বিচিত্রফলপ্রদায়ক কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত রহস্যও উদ্ঘাটন করিলেন। ভোগান্ধ মানব স্বর্গলোকে কল্লান্তস্থায়ী সুখপ্রাপ্তিই জীবনের পরমপুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে বিশাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যধামেই প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু এই গতাগতির মধ্যেই মানব-আত্মার গতি চিরতরে আবদ্ধ থাকিবে কি? বিশ্বসৃষ্টির পবিত্র রক্তিম ঊষায় যে জীবন জন্মলাভ করিয়া শৈশবের শুভ্রহাসিতে জগতে আগমন-বার্ত্তা জানাইয়াছিল, যাহা প্রমত্তযৌবনের প্রেমা-ভিসারে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রম-বিকাশের দিকে উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়াছে, সে জীবনস্রোত মধ্যপথে রুদ্ধ হইবে কি? ভাগীরথীর উচ্ছ্বসিত প্রবাহ মধ্যপথে স্তব্ধ হইবার নয়। অসীম জলধিজল হইতে যাহার জন্ম, তুহিনাবৃত

হিমাচলরূপে যাহার ক্ষণিক স্থিতি, বিগলিত করুণাধারার ন্যায় যাহার অফুরন্ত প্রবাহ, যার কূলে কূলে অগণিত নগরী, তীর্থ, জনপদ ও কৃষ্টি-সৌধ গড়িয়া জনগণের অপার কল্যাণ ও সম্পদ বিধান করিয়া নীলসিন্ধু-সলিলে বিলীন হইতে চলিয়াছে, সে পয়ঃ-প্রবাহের গতিবেগ কে রোধ করিতে পারে? প্রেমাভিসারের পরিসমাপ্তি প্রেমাস্পদের সঙ্গে চিরসম্মিলনে। মানব-আত্মার বিকাশের পথে তার সাধনার স্তরে স্তরে স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ঘটিলেও তাহার গতি ঐখানেই রুদ্ধ হইবার নয়। তাই শ্রুতি ঋষিবালকের মুখে শুধু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সম্পদলাভের প্রশ্ন তুলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যে তত্ত্বজ্ঞানলাভে মানবের সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার চিরনির্ব্বাণ ঘটে,—জীবনের এই মহাযাত্রারও পরিসমাপ্তি হয়,—যোগিজনদুর্লভ সেই আত্ম-জ্ঞানপ্রশ্ন মানবকল্যাণের জন্য করুণাময়ী শ্রুতি বালকের মুখে পুনঃ ধ্বনিয়া তুলিলেন,—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে
নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

—"মৃত মনুষ্যসম্বন্ধে এই যে এক চিরন্তন সন্দেহ বিদ্যমান,—কেহ বলেন, 'আত্মা মৃত্যুর পরও থাকে, কেহ বলেন, থাকেনা,—আমি তোমার নিকট হইতে এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আমার বরের মধ্যে এইটীই তৃতীয় বর।"

এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়াই মানবজীবনের একটী নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছে। দেবতারাও যে বিষয় সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিলেন, আজ বালক নচিকেতার মুখে সেই গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যমরাজের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ধীমান শিষ্যের আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগিতা পরীক্ষার জন্য, যে সকল ভোগৈশ্বর্য্যাদি অষ্টবিভূতি সাধকজীবনে স্বতঃই উপস্থিত হয়, তিনি একে একে সকলই তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্
হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো
যাবদিচ্ছসি॥
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং
চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাস্ত্বা
কামভাজং করোমি॥
যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্
কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া
মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো
মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥"

—"হে নচিকেতঃ, শতবর্ষায়ু, পুত্রপৌত্র, বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব এবং বৃহৎ রাজ্য প্রার্থনা কর এবং স্বয়ং যত বৎসর ইচ্ছা জীবন ধারণ কর। যদি অন্য কোন বর এতত্তুল্য মনে কর—যথা বিত্ত এবং চিরজীবিকা—তাহা প্রার্থনা কর। তুমি বিশাল ভূমিখণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হও; আমি তোমাকে সমুদয় কামনার কামভাগী করিব। মর্ত্ত্যলোকে যে যে কাম্যবস্তু দুর্লভ, সে সমুদয়ও ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। তোমার সম্মুখস্থিত রথযুক্তা ও বাদ্যযন্ত্রধারিণী অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী-গণ—যাহা মনুষ্যলোকে সুদুর্লভ—তাহারা তোমার পরিচর্য্যায় রত থাকিবে। হে নচিকেতঃ, মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন আমাকে করিও না।" প্রতি সাধকের জীবনেই এইভাবে প্রলোভন নানা রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধনরাজ্যের উচ্চভূমিতে উন্নীত হইয়াও অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মলালসার বশবর্ত্তী হইয়া কত সাধক প্রকৃতিদত্ত ভোগৈশ্বর্য্য-

লাভে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকে। আজ তত্ত্বজিজ্ঞাসু নচিকেতার সম্মুখেও প্রকৃতিরাজ্যের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার উন্মুক্ত। ইচ্ছামাত্রেই পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া অপরিমিত কাল পার্থিব আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ। কিন্তু ভোগবাসনার লেশমাত্র থাকিতে সেই অমৃতরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবার নয়। বোধিদ্রুমমূলে সমাসীন গৌতমবুদ্ধের সম্মুখে এমনি করিয়াই একদিন জগতের সমগ্র প্রলোভন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সংশিতব্রত গৌতম অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; সহস্র প্রলোভনেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না,—বুদ্ধত্বলাভে ধন্য হইলেন। ঋষিপুত্র নচিকেতাও আজ সেই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। ভারতপ্রতিভার জ্বলন্তবিগ্রহ অটল অচল বালকের তপঃপূত প্রাণ সে প্রলোভনে সাড়া দিল না। বালককণ্ঠে ভারতের মর্ম্মবাণী ধ্বনিয়া উঠিল —

"শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং
জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব
নৃত্যগীতে॥"

—"হে যম, তোমার বর্ণিত ভোগসমূহ কল্য থাকিবে কি থাকিবে না এরূপ সন্দিহ্যমান। অধিকন্তু, ইহারা মনুষ্যাদির সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তেজ ক্ষয় করিয়া থাকে। মানবজীবন পদ্মপত্রনীরের ন্যায় চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। অতএব তোমার অশ্ব, নৃত্যগীতাদি ভোগবস্তুনিচয় তোমারই থাকুক।"

"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে
বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে
বরণীয়ঃ স এব।"

—"পরন্তু মানবচিত্ত কেবল ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আমি যখন সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতি তোমার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন বিত্তাদি স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তুমি যতদিন প্রভু হইয়া রাজত্ব করিবে, ততদিন জীবিতও থাকিব সুতরাং এ ক্ষণস্থায়ী বস্তু আমার কাম্য নহে। পূর্ব্ববর্ণিত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বরই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।"

সাধনরাজ্যের এই সূক্ষ্মস্তরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ ও লক্ষ্যের বৈষম্য লক্ষিত হয়। সাধনরত পাশ্চাত্যমনীষা প্রকৃতিসমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত ঐশ্বর্য্যমদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতির মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া অন্তররাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। তাই আজও জড়বিজ্ঞানের মোহমদিরায় আত্মবিস্মৃত পাশ্চাত্য জাতিসংঘ সর্ব্বধ্বংসী হিংসাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত। অক্লান্ত সাধনার ফলে তাহাদের সম্মুখে যে ভোগ্যবস্তু-সমূহ নানা বৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাই আত্মসাৎ করিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় সকলে ছুটিয়াছে। প্রকৃত শান্তির দ্বার তাহাদের নিকট আজ তাই রুদ্ধ। ভারত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। সে জানিয়াছে "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" "যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।"—যাহা অনন্ত অসীম তাহাই অমৃত, শাশ্বত ও নিত্যানন্দপ্রদ; তদ্ব্যতীত জাগতিক সবই স্বল্প, ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে দুঃখপ্রদ। প্রকৃতিলব্ধ ভোগৈশ্বর্য্য যতই রমণীয় ও সুন্দর হউক না কেন উহা অন্তিমে দুঃখদায়ক—ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়া ভারত ভোগ্যবস্তুনিচয় বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্তররাজ্যে পরমানন্দাস্পদ আত্মার সন্ধানে ছুটিয়াছিল। তাই, অতুল বিভব পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত দেখিয়াও নচিকেতার কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল,—"তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।"

ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের অধিকারী হইতে হইলে যে সকল সদ্গুণদ্বারা সাধকজীবন ভূষিত হওয়া প্রয়োজন তাহা পূর্ণমাত্রায় নচিকেতার অন্তরে

বিরাজমান। বলা বাহুল্য, সাধন-চতুষ্টয়*-সম্পন্ন ব্যক্তিই একমাত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। কারণ, সর্ব্ববাসনানির্ম্মুক্ত নির্ম্মল চিত্তমুকুরেই আচার্য্যোপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নচিকেতা আজ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সন্নিধানে অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা লইয়া আত্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় সমাসীন। গুরু শিষ্যের দৃঢ়তা, ত্যাগ ও নিষ্ঠা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া শিষ্যকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে নচিকেতঃ, এই জগতে দুইটী বিভিন্ন পন্থা বর্ত্তমান,—একটী "শ্রেয়," অপরটী "প্রেয়"। এ দুয়ের মধ্যে যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়। বিচারশীল ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তম জানিয়া শ্রেয়কেই গ্রহণ করে, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণাভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে। হে নচিকেতঃ, তুমি আপাতরমণীয় কাম্যবস্তু-সমূহের অনিত্যত্ব ও অসারত্বাদি দোষ চিন্তা করিয়া তৎসমস্তকে পরিত্যাগ করিয়াছ এবং এই বিত্তময় প্রেয়-পথ যাহাতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হইতেছে, তাহা তুমি অবলম্বন কর নাই। এই সংসারে ভিন্নফলপ্রদা পরস্পরবিপরীত অবিদ্যা (অজ্ঞান) আর বিদ্যা (জ্ঞান) বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে আমি তোমাকে বিদ্যা-প্রার্থী বলিয়াই মনে করি; যেহেতু তোমাকে কাম্যবস্তু-সমূহ প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। কেবল ইহাই নহে—

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো
নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥

—"কামনার সমাপ্তি, জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্তফল হিরণ্যগর্ভপদ, অভয়প্রদস্থান, প্রশংসনীয় মহৎ বিস্তীর্ণ গতি—এই সমস্ত দেখিয়াও তুমি বুদ্ধিমান বলিয়া ধৈর্য্যের সহিত কর্ম্মকাণ্ডে অঙ্গীকৃত এই সকল পরিত্যাগ করিয়াছ।

নচিকেতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পবিত্র রক্তিম উষার প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জ্ঞানবৃদ্ধ গুরু ধ্যানগম্ভীর শ্রদ্ধান্বিত শিষ্যের কর্ণে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কোটিকল্পদুর্লভ আত্মতত্ত্ব প্রকটিত করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যে আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ তাহা শ্রবণ কর। আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, মহৎ হইতেও মহৎ। এই আত্মা সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান। এই চেতন আত্মার জন্ম নাই, বিনাশ নাই; ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হন নাই, ইহা হইতেও অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না। হন্তা যদি মনে করে আমি ইহাকে হনন করিব, হতব্যক্তি যদি আত্মাকে হত মনে করে, তবে উভয়েই আত্ম-লক্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞ; যেহেতু আত্মা হননও করেন না, হতও হন না। ইনি অনিত্য শরীরে অবস্থিত হইয়াও বস্তুতঃ অশরীরী। যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে তত্তদ্বস্তুরূপ হইয়াছেন, এবং সমুদয় পদার্থের বাহিরেও আছেন। সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষু-গ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জগৎ-সম্বন্ধ—দুঃখাদির সহিত লিপ্ত হন না, কারণ তিনি স্বতন্ত্রস্বভাব। সূর্য্য এই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র-তারকা সেখানে কিরণ দেয় না; বিদ্যুৎসমূহও সেখানে প্রকাশ পায় না। এই অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমান আত্মার প্রকাশে

* নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমোপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধারূপসাধন-সম্পৎ ও মুমুক্ষুত্ব।

অনুপ্রকাশিত; তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে। ইঁহার ভয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, এবং ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, এই চারি এবং পঞ্চম মৃত্যু আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, গন্ধহীন, এবং অনাদি, অনন্ত, বুদ্ধিনামক মহত্তত্ত্ব হইতেও পৃথক ও ধ্রুব,—সেই আত্মাকে জানিয়া সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন। সেই দুর্দর্শ, গূঢ়, প্রতিবিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়াতীত, সূক্ষ্ম, জ্ঞানমাত্রগ্রাহ্য স্থানে অবস্থিত, পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগঘটিত জ্ঞানদ্বারা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষশোকের অতীত হন। যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বয়ং একরূপকে বহুপ্রকার করেন তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন,—তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে। যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনবানদিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তু সকলের বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অন্যের নহে।"

তিনি আরও বলিলেন, "ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভতত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যাকৃত প্রকৃতি (মায়াতত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে ব্যাপক অশরীরী পুরুষ (আত্মা বা ব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। যিনি সমাহিতমনা ও সর্ব্বদা শুচি ও বিবেকী, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ কুশলী সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় বশবর্ত্তী হয়, কেবল তিনি এই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।"

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

—যে সকল কামনা মর্ত্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই সমুদয় যখন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তখনই মর্ত্ত্য অমর হয় এবং এইখানেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।

শ্রীগুরুপ্রমুখাৎ এই সুদুর্লভ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া শিষ্য নচিকেতা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইল। যমরাজ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব
সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্ নো
ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥

—তুমি আজ যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্কদ্বারা প্রাপ্য নহে; হে প্রিয়তম, অভিজ্ঞ আচার্য্যকর্তৃক উক্ত হইলে তাহা সুবিজ্ঞেয় হয়; তুমি নিশ্চয়ই স্থিরসংকল্প ব্যক্তি। হে নচিকেতঃ, আমি যেন সর্ব্বদা তোমার মত জিজ্ঞাসু পাই।

বলা বাহুল্য, কঠোপনিষদুক্ত নচিকেতার তত্ত্ব-জ্ঞানোদ্দেশ্যে যে নির্ভীক অভিযান ও ভোগবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা তাহা ভারত-মনীষারই নিগূঢ় আত্মকাহিনী এবং প্রতি মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের দিগ্‌দর্শন। মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য তথা ভারতকৃষ্টির মূলমন্ত্র ও ক্রমবিকাশের ধারা এই অনাড়ম্বর আদর্শ চরিত্রের ভিতর দিয়া কি সহজ সরলভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। এই সেই ভারতবর্ষ যেখানে জীবন-মৃত্যুর সমস্যা, সর্ব্বদুঃখের মূল বাসনার তীব্র দহন হইতে মানবের মুক্তির সমস্যা সর্ব্বপ্রথম মীমাংসিত হইয়াছিল। এই ভারতভূমিই একমাত্র দেশ যেখানে ধর্ম্ম জীবন্ত সত্য বলিয়া গৃহীত, যেখানে নরনারী জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দুর্জ্জয় সাহসে ভোগ্যবস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া গভীর সমাধি-

সাগরে মগ্ন হইয়াছে। কেবল এই দেশেই মানবহৃদয় বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত পশুপক্ষী, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিজ্জগৎকেও প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছে এবং সমগ্র বিশ্বের একত্ব ও অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশ্বচরাচরের হৃৎস্পন্দন আপন হৃদয়ের স্পন্দন বলিয়া অনুভব করিয়াছে। সত্য-জ্ঞান-আনন্দ ত্রিবেণীতে অবগাহন করিবার জন্য বিশ্ববাসীকে যুগে যুগে ভারতই আহ্বান করিয়া আসিতেছে। বেদান্তের বরপুত্র, বিংশশতাব্দীর ঋষি, প্রাচ্যমনীষার মূর্ত্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ গভীর দূরদৃষ্টিবলে ভাবী শতাব্দীর ভয়াবহ ধ্বংসের করালদৃশ্য দর্শন করিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, "সাবধান! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি সমগ্র পাশ্চাত্যজগৎ একটা ধূমায়মান আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহা যে কোন মুহূর্ত্তে অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া ভোগৈকসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জগৎকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। এখনও যদি সাবধান না হও, যদি বেদান্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ত্যাগধর্ম্মের বিশাল ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দ্রুত উন্নতিশীল, আপাতরমণীয় পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত না কর, তবে আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।" নচিকেতা-সদৃশ তেজস্বী ঋষি বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইবার নয়। ইতিহাস রক্তাক্ষরে যুগাচার্য্যের সেই বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট অহিংসা ও ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত ভারত বিনা অস্ত্রযুদ্ধে,—বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা আর কি হইতে পারে। ধর্ম্মচক্রলাঞ্ছিত স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী আজ ভারতের প্রতিগৃহে শোভা পাইতেছে। কনককিরণোদ্ভাসিত পূর্ব্বদিক্‌চক্রবালে আজ মহিমার অপূর্ব্ব ছটা। দিকে দিকে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। আশৈলবনকান্তার ভারতের প্রতি অঙ্গ বিপুল পুলকে স্পন্দিত। ত্রিংশকোটিকণ্ঠে অহিংসা, ত্যাগ ও সেবার জয়গান চলিয়াছে। বৃক্ষের প্রতি মর্ম্মরে, কলকণ্ঠ বিহগের সুমধুর কাকলীরবে, উচ্ছ্বাসময়ী স্রোতস্বিনীর কলনাদে,—আকাশ ভুবনে,—সর্ব্বত্র ভারতের মর্ম্মবাণী ধ্বনিয়া উঠিতেছে,—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"; "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। অহিংসার মূর্ত্তবিগ্রহ ভারতপ্রাণ মহাত্মা গান্ধী কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হইয়া ত্যাগ-সত্য-পবিত্রতার পতাকাহস্তে বিশ্ববাসীকে ভারতের তথা প্রাচ্যের সনাতন শান্তির পথই নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভারতের স্বাধীনতা আজ প্রমাণ করিয়াছে,—"জীবন-সংগ্রামে প্রেমেরই জয় হইবে, ঘৃণার নহে; ত্যাগের জয় হইবে, ভোগের নহে; চৈতন্য জয়ী হইবে, জড় নহে।" বিশ্বজগৎ এই সাম্য-মৈত্রীর বাণী শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই ঘোষণা করিয়াছেন, "আমি ভয়বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছি, অপূর্ব্ব-জ্যোতির্ম্মণ্ডিত যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী অবিশ্রান্ত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, এই দীর্ঘায়তন কালশৃঙ্খলের কোথাও একটু মলিনতা দৃষ্ট হইলে আবার দেখিতে পাইতেছি, পরবর্ত্তী কালে তাহাই অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর দেখিতেছি ভারতভূমি, আমার এই জন্মভূমি বর্ত্তমান কালেও মহীয়সী রাজ্ঞীর ন্যায় অপূর্ব্ব মহিমায় মন্থর পদক্ষেপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন আপনার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য। সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করাই ভারতবর্ষের একমাত্র জীবন-ব্রত, তাহার চিরন্তন সঙ্গীতের সুর, তাহার জীবনের মেরুদণ্ড ও ভিত্তি, তাহার অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য ও সার্থকতা। এই মহান্ ব্রত পালনের পথ হইতে ভারত কখনও একচুল পরিমাণও বিচ্যুত হয় নাই।...আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছি, প্রত্যেক সভ্যদেশের কোটি কোটি নরনারী ভারতবর্ষ হইতে অমৃতবাণী লাভ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে যাহা ধনদেবতার অর্চ্চনার অনিবার্য্য পরিণামস্বরূপ জড়বাদের ভীষণ নরককুণ্ড হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। ঐ সকল দেশের নূতন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেকেই ইতোমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন,—একমাত্র অদ্বৈত-বেদান্তের আদর্শই তাহাদের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইবে।"

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"
ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

পুনর্ণব

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস

ভারতের ভাগ্যাকাশে নব সূর্য্যোদয়ে,
হে বিধাতা, মনে পড়ে অতীতের কথা,
পুরাকালে পুণ্যভূমি এই ভারতের
সুনিবিড় তরুচ্ছায়ে, এরি তপোবনে
সামগান মুখরিত, ঋষি তপোধন
বসি যোগাসনে কিম্বা, ওই জ্যোতির্ম্ময়
আদিত্যের পানে চেয়ে, বিশ্বের বিস্ময়
সেই 'সোঽহং' ধ্বনি তুলিয়া মধুর,
শুনাইল মরবাসী জনে অমরার
বাণী মহত্তম, হেরি সেই মহীয়ান্
পরম পুরুষে, স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি নাই
সে রহস্য লোকাতীত রাজে বিশ্বলোকে,
অণুমাঝে অনুস্যূত সত্তা বিশ্বাতীত,
এক আছে বহুরূপে, রূপের জগতে
রূপাতীত লোকে আর ; ভাগবত লীলা
অভিরাম চিরন্তন অভিনয় নব,
স্থিতিমূলে অভিনব গতির বিভূতি,
আনন্দের আবর্ত্তনে ব্যক্ত অহরহ,
বিসর্পিত, ধাতার অব্যক্ত লোক হ'তে ;
সেত শুধু ধ্বনি নহে, অনারত এই
কালের প্রবাহে যায় মিলাইয়া যাহা,
জগতের বক্ষপুটে রাখিয়া স্পন্দন
অমূর্ত্ত সত্যের তথ্য বাঙ্ময়ীরূপিণী
ঘনীভূত আলোকের মূর্ত্তি বাণীময়ী ;
আভাসে ইঙ্গিতে আর জননীকৃপায়
শুনিয়াছি সেই কথা, যেকথা অব্যক্ত
রহে এই সংখ্যাহীন ধূলিকণা-বুকে
পরিপূর্ণ প্রণতির লীলায়িত সুখে ;
যে কথা ফুটিতে চায় প্রাণের স্পন্দনে
যে কথা উছসি উঠে কোটী মানবের
মনন-আকাশে, জলে, অনলে, অনিলে,
ব্যথাদীর্ণ প্রকাশের সুখ-শিহরণ,
লক্ষ লক্ষ কুসুমের ক্ষুদ্র বীজ সম
উদ্ভিন্ন হইতে চায় ; পঙ্ক-হৃদি হ'তে
পাষাণের বক্ষ চিরে' কি ফুল ফুটিছে,
বিলাইতে অন্ধকার কোন্ বহ্নিসুধা
মার্ত্তণ্ড উত্তপ্ত ভাণ্ড হতে যুগ যুগ
গলিত সোনালী ধারা করে বিকিরণ,
ধরিত্রীর বুকে কোন্ অমিয়ার ফোঁটা
অভিসিঞ্চি নিরবধি, সুধাকর প্রেমে,
জড় প্রাণ ধরণীরে করিল পাগল ?
কোন্ সে প্রেমের কথা শুনিবার তরে
তটিনীর দুর্নিবার প্রবাহ চঞ্চল ?
নর নারী পশু পাখী সর্ব্ব প্রাণী আর
প্রাণহীন অচেতন, কি যেন বলিতে
চায় তবু সেই কথা পারে না কহিতে,
সৃষ্টি চায় বলিবারে কথা স্বপ্নে নয়,
সত্য জাগরণে, স্রষ্টার আনন্দ ব্যথা
বিকশিত চেতনায় ; অচেতন হ'তে
প্রাকৃতিক বিকাশের ক্রমিক পর্য্যায়ে
চেতনা স্ফুরিত হয় দেহে, প্রাণে, মনে,
লীলানন্দে তাঁরি, ডুবে যায় তাঁরি মাঝে,
তাঁরি নৃত্য মহিমায়, রস পারাবারে,
তাঁরি কথা উচ্চারণ তাঁরি ; ভারতের
প্রাণ তারে প্রাথমিক নবীন উষায়,
সৃষ্টি করে স্রষ্টা পায়ে আত্মনিবেদন
কর্ম্মের আহুতি সম মর্ম্ম-বেদীমূলে
বিশ্বকর্ত্তা ক্রিয়া-যজ্ঞে যেথা অধিষ্ঠিত ;
তারপর উঠা পড়া সুদীর্ঘ কাহিনী,
ভারতের ভাগ্যাকাশে আলো-অন্ধকারে,

চলিয়াছে তারি খেলা, কভু ভেসে উঠে
জীবনের উচ্চকিত হাসি রূপে, রসে,
ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ সিংহাসন, ইহলোকে
পরলোকে, নাটমঞ্চে বিজলী আলোক
সম উদ্ভাসিয়া হেথা উঠে বার বার,
নৃত্যগীত সমারোহ চলে অহর্নিশ;
অপরূপ বিধাতার বিচিত্র খেলায়
ভারত ভুলিয়া যায় ব্রাহ্মীশ্রী-মণ্ডিত
তার সেই দীক্ষাগুরু ঋষি তপোধনে
পদপ্রান্তে শিখিয়াছে যার, ধর্ম্মে শিক্ষা
কর্ম্মে দীক্ষা, জীবনের নিরাময় বাণী
মহত্তম, অকুণ্ঠিত আত্মদানে লভি
আত্মপরিচয় নব, ত্যাগে তপস্যায়
ধ্যানস্নিগ্ধ জীবনের নিভৃত নিলয়ে
সাধিয়াছে পরাৎপর পুরুষ প্রধানে,
আপনা সফল করি, নিজের সুধার
ভাণ্ড সব বিশ্বজনে দিয়াছে বিলায়ে;
দীর্ঘকাল অতিক্রমি', নটরাজ পুনঃ
নবরঙ্গ অভিলাষে যবনিকা কালো
টেনে দিয়েছিল যেন ভারতের ভালে;
নিশিতে শিশুর মত স্বীয় পূর্ব্ব কথা
বিস্মরিয়া দৈনন্দিন কর্ম্মক্লান্তি বশে
এভারত সুপ্তিক্রোড়ে লভেছে বিরাম;
কালের সরণি বাহি স্বপ্ন সম ভাসে
মানসনয়নে মোর, তারি প্রতিভাস;
উত্তরিয়া বিস্মৃতির এই অমানিশা
আরণ্যক সেই দৃশ্যে হই উপনীত
সম্বুদ্ধ ঋষির পায়ে আনে পুষ্পাঞ্জলি
ভারতের প্রান্ত হ'তে অভীপ্সু মানব,
মস্তকে সমিধভার হাতে বনফুল;
সানন্দে গ্রহণ করি নবারুণ যেন
সুশ্যামলা ধরণীর প্রেমাভিনন্দন,
সীমাহৃদে যুক্ত করি পরমের সেই
প্রজ্ঞান চেতনা, ঋষি কয় বেদকথা
শান্তভাষে জাতবেদা অগ্নিরে স্মরিয়া:
মর্ম্মগুরু, হে শাশ্বত, ওগো পুনর্ণব,
ব্যাকুলিত ধরণীর হৃদয় প্রাঙ্গণে,
ভারত সাগর তীরে, মহামানবের,
আসিয়াছ পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোক হ'তে,
জাগাইতে অন্তর্লীন সুপ্ত ভগবানে,
সমুত্তরি অপ্রবুদ্ধ অশান্ত মানস
অতিমানসের জ্যোতি, শান্তি সুধা লভি
দ্বিধা দ্বন্দ্ব ক্ষুদ্রতার করি অবসান
মানবের অভীপ্সিত দিব্য জীবনের
ঋতময় সুপ্রতিষ্ঠা সাধি এইবার,
অমরার বৈজয়ন্তী মর্ত্ত্যের সম্বিতে
ভাগবত মহিমায় স্থাপিয়ে ধরায়;
এ বিক্ষুব্ধ ধরণীর মানসপ্রতিভূ
আমরাও আসিয়াছি পদপ্রান্তে তব,
এই নরজীবনের দীন অর্ঘ্য লহ,
জড় দেহে, প্রাণে, মনে, মাতৃ-উদ্বোধনে
কুসুমিয়া রূপান্তর, দৈবী চেতনায়।

জীবন্মুক্তি ও জীবন্মুক্ত

অধ্যাপক শ্রীদিনেশ চন্দ্র গুহ, এম-এ, কাব্য-ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, রাষ্ট্রভাষাকোবিদ

অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি নামক দুই প্রকার মুক্তির কথা বলা আছে। এই দুই প্রকার মুক্তির মধ্যে বিদেহমুক্তিই হইতেছে প্রকৃত মুক্তি, জীবন্মুক্তিকে গৌণভাবে মুক্তি বলা হয়। এই জন্যই জীবন্মুক্ত পুরুষকেও গৌণরূপেই[১] মুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়। সদ্‌গুরূপদেশ ও বেদান্তবাক্যের শ্রবণ, তৎপ্রতিপাদ্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে সুকৃতিবশতঃ তপস্যাপরায়ণ পুরুষের মন পবিত্র হইতে থাকে এবং কোন কোন সময় অখণ্ডব্রহ্মাকারক চিত্তবৃত্তিও জীবদ্দশাতেই তাঁহার উৎপন্ন হয়। অবশ্য জীবিত কালে এইরূপ চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা থাকে না। সময় সময় এইরূপ অখণ্ডব্রহ্মাকারক চিত্তবৃত্তি হয়, আবার অন্য সময় তাহা থাকে না। এই জন্য শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মাকে "জ্ঞাতত্ব" অর্থাৎ অখণ্ডব্রহ্মাকারক বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়ত্বদ্বারা কদাচিৎ উপলক্ষিত মাত্র বলা হয়, কিন্তু সর্ব্বদা উপলক্ষিত বলা হয় না। 'জ্ঞাতত্ব' অর্থাৎ অখণ্ডব্রহ্মাকারক বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়ত্বের দ্বারা কদাচিৎ উপলক্ষিতমাত্র কথার তাৎপর্য্য এই যে জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মার তাদৃশজ্ঞানবিষয়ত্বের পূর্ব্বকালীন উক্তজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ প্রতিযোগীর সহিত সমানাধিকরণ তাদৃশজ্ঞানবিষয়ত্বের অভাব থাকিবে, অথবা তাদৃশজ্ঞানবিষয়ত্বসম্বন্ধের পরবর্ত্তী কালে উক্ত জ্ঞানবিষয়ত্ব-সম্বন্ধের সহিত সমানাধিকরণ তাদৃশজ্ঞানবিষয়ত্বসম্বন্ধের অভাব থাকিবে।[২] কথাটা একটু জটিল হইয়া গেল, সোজা কথায় বলিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মায় অখণ্ডব্রহ্মাকারক বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়ত্ব সব সময় থাকে না। জ্ঞানের বিষয়ত্ব জিনিষটা জ্ঞানের সমানকালীন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেইজ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুতে উক্ত জ্ঞানবিষয়ত্বও বর্ত্তমান থাকে। জীবন্মুক্ত পুরুষের সর্ব্বদা অখণ্ডব্রহ্মাকারক বৃত্তিজ্ঞান থাকে না, অতএব তাঁহার আত্মায় তাদৃশবৃত্তিজ্ঞানবিষয়ত্ব এবং তাহার অভাব দুইই সময়বিশেষে থাকিতে পারে। কারণ, ব্রহ্মাকারক বৃত্তিজ্ঞান না-থাকা-দশায় অন্যপ্রকার বৃত্তিজ্ঞান থাকিতে কোন বাধা নাই।

আচার্য্য শঙ্কর মণিরত্নমালা নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে বিষয়ের প্রতি বিরক্তিই হইতেছে বিমুক্তি।[৩] সেখানে তিনি "বিমুক্তি" শব্দের দ্বারা বিদেহমুক্তিকেই সম্ভবতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। অন্যথা "বিমুক্তি" কথার ভিতর যে "বি" উপসর্গটী আছে তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। আচার্য্যগণ বিনাপ্রয়োজনে একটী অক্ষরও প্রয়োগ করেন না। তাহা হইলে অখণ্ডব্রহ্মজ্ঞান-

১ জীবন্মুক্ত ইতি ব্যবহারস্তু গৌণঃ। বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী, অদ্বৈতসিদ্ধি, নির্ণয়সাগরসংস্করণ, ৩ পৃষ্ঠা।

২ "জ্ঞাতত্বম্ অখণ্ডধীবিষয়ত্বং তদুপলক্ষিতত্বং চ স্বপূর্ব্বকালীনপ্রতিযোগিসমানাধিকরণতদভাববত্বং, তৎসম্বন্ধোত্তরকালীনতৎসমানাধিকরণতদভাববত্বং বা। তচ্চ জীবন্মুক্তস্যাত্মেব। বৃত্ত্যন্তরকালে তস্য তথাত্বাৎ।" বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী—অদ্বৈতসিদ্ধি, নির্ণয়সাগর সংস্করণ ৩ পৃষ্ঠা।

৩ "কা বা বিমুক্তি র্বিষয়ে বিরক্তিঃ।" মণিরত্নমালা, ২ শ্লোক।

বিনয়ত্বের দ্বারা "সর্ব্বদা" উপক্ষিত আত্মাই অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বিদেহমুক্তি শব্দবোধ্য হওয়ায় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি তাদৃশ মুক্তির পক্ষে পরম্পরাক্রমে প্রয়োজক হয়, ইহাই সম্ভবতঃ আচার্য্যের কথার তাৎপর্য্য। অতএব জীবন্মুক্তির প্রতি বিষয়বৈরাগ্য অপেক্ষাকৃত অল্প পরম্পরাক্রমে প্রয়োজক হইতে পারে। ইহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সে যাহা হউক, অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর, অর্থাৎ জীবের নিজের স্বরূপের জ্ঞান হইবার পর, জীবের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। সে সময় জীব সর্ব্বদা অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। প্রারব্ধকর্ম্ম ভিন্ন অপর সকলপ্রকার কর্ম্মের নাশও ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের হইয়া যায়। এই অবস্থা হইলে সেই পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। তখন জীবের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহও দূর হইয়া যায় এবং হৃদয়ের গ্রন্থিও ছিন্ন হয়।[৪] হৃদয়ের গ্রন্থি শব্দের অর্থ হইতেছে অহঙ্কার।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলিতে যাইয়া বেদান্তসার নামক প্রকরণ-গ্রন্থে আচার্য্য সদানন্দ লিখিয়াছেন যে, জীবের স্বরূপের জ্ঞান হইলে ঐ জ্ঞানের দ্বারা জীবের স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানের বাধ হওয়ায় স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান এবং তাহার কার্য্য সংশয়-বিপর্য্যয়াদিরও বাধ হয়, তাহার ফলে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন।[৫] এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়।

অদ্বৈতবেদান্তের অতিশয় প্রামাণিক অদ্বৈত-সিদ্ধি নামক গ্রন্থে আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জীবের অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও যে পুরুষের দেহাদিবিষয়ক জ্ঞান অনুবর্ত্তমান থাকে, সেই পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা হয়।

জীবন্মুক্তসম্বন্ধে তত্ত্ববোধ নামক একটি প্রকরণ গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বেদান্ত-বাক্যের দ্বারা এবং সদ্‌গুরূপদেশের দ্বারা সর্ব্বভূতে যাঁহাদের ব্রহ্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাঁহারাই জীবন্মুক্ত।[৬] এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ মনুষ্যের যেমন এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি থাকে যে এই দেহই আমি, আমি পুরুষ, আমি শূদ্র, আমি ব্রাহ্মণ, সেই রকম যখন কোন ব্যক্তির এইরূপ নিশ্চয়াত্মক অপরোক্ষ যথার্থ জ্ঞান জন্মে যে আমি ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র নই, অথবা পুরুষও নই, কিন্তু অসঙ্গ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বান্তর্য্যামী চিদাকাশ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ, তখন তাহাকে জীবন্মুক্ত বলা হয়।[৭]

জীবন্মুক্ত পুরুষ স্বকীয় অবিদ্যার নাশ হইলে পরও পূর্ব্বসংস্কারের বশে জ্ঞানের অবিরোধী সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করেন এবং প্রারব্ধকর্ম্মের ফলও ভোগ করেন। তবে তাঁহার সহিত সাধারণ সংসারাবদ্ধ জীবের পার্থক্য এই যে, মুক্তপুরুষের কর্ম্মফল ভোগ করিবার সময় "এ সমস্তই মিথ্যা" এই প্রকারের নিশ্চয়াত্মক যথার্থ জ্ঞান হয় যাহা

৪ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"
মুণ্ডকোপনিষৎ

৫ জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে অজ্ঞানতৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম-সংশয়বিপর্য্যয়াদীনামপি বাধিতত্বাৎ অখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।
বেদান্তসার

৬ এবঞ্চ বেদান্তবাক্যৈঃ সদ্‌গুরূপদেশেন চ সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু যেষাং ব্রহ্মবুদ্ধিরুৎপন্না তে জীবন্মুক্তা ইত্যর্থঃ।
তত্ত্ববোধ।

৭ "যথা দেহোঽহং পুরুষোঽহং ব্রাহ্মণোঽহং শূদ্রোঽহম্ ইতি দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, তথা নাহং ব্রাহ্মণঃ ন শূদ্রঃ ন পুরুষঃ কিন্তু অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ প্রকাশরূপঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী চিদাকাশরূপোঽস্মীতি দৃঢ়নিশ্চয়রূপাপরোক্ষজ্ঞানবান্ জীবন্মুক্তঃ।
তত্ত্ববোধ

সংসারাবদ্ধ জীবের কখনও হইতে পারে না। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক পুরুষ অপরকে ইন্দ্রজাল দেখাইবার সময় নিজের মনে ভালরূপেই জানে যে, "ইহা ইন্দ্রজাল, সত্য নহে" সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষও সংসারে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে সেগুলিকে মিথ্যা বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় করেন। ঐ অবস্থায় জীবন্মুক্ত পুরুষ সমস্ত কিছু দেখিয়াও বাস্তবদৃষ্টিতে দেখেন না, শুনিয়াও শোনেন না।[৮] এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষকে পাপ অথবা পুণ্য কিছুতেই স্পর্শ করে না।

এখন এক প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই জীবন্মুক্ত পুরুষকে যদি পাপ ও পুণ্য কিছুই স্পর্শ না করে, এবং বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তাহাই, তবে কি তিনি কখনও কখনও নিজের ইচ্ছা অনুসারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে ইহা সম্ভবই নয় যে জীবন্মুক্ত পুরুষ সামান্য কুকার্য্যও করিবেন। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সমুদয় দূষিত সংস্কার নাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব দূষিত সংস্কারের অভাব হওয়ায় সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের দ্বারা কুকার্য্য অনুষ্ঠান সম্ভব হইতেই পারে না। সে অবস্থায় উক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের শুধু শুভ সংস্কারেরই অনুবৃত্তি হয়। কোন কোন আচার্য্য বলেন যে জীবন্মুক্ত পুরুষের শুভ ও অশুভ দুই প্রকার সংস্কার সম্বন্ধেই উদাসীনতা বর্ত্তমান থাকে।[৯] সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইবার পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত শুভকার্য্য করিয়াছিলেন সেই সমস্ত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানের বলেই তিনি কেবল শুভকার্য্যই করিয়া থাকেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিলে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ও কুকুরের মধ্য কোনই ভেদ থাকে না।[১০]

যদিও কোন কোন উপনিষদে এই রকম কথাও পাওয়া যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের মাতৃবধ আদি কুকার্য্য হইতেও অল্পমাত্রও ক্ষতি হয় না, তথাপি সে সমস্ত গ্রন্থের ইহা অভিপ্রায় নহে যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দ্বারা কোন কুকার্য্য অনুষ্ঠান সম্ভব। পরন্তু উক্ত উপনিষদ্-বাক্য গুলি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রশংসার জন্যই উক্ত হইয়াছে[১১]।

জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের এমন এক অবস্থা হয় যে, তিনি স্বয়ং জ্ঞানী হইয়াও নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করেন না[১২]। অভিপ্রায় এই যে, জীবন্মুক্ত পুরুষে জ্ঞানের অভিমান সামান্য মাত্রও থাকে না। সেই অবস্থায় অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞান সাধন এবং অহিংসাদি সদ্গুণাবলী তাঁহার মধ্যে আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। তার জন্য কোন বিশেষ সাধনের আবশ্যকতা থাকে না[১৩]।

এই জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যে কোন ভাবে প্রারব্ধকর্ম ভোগ করিতে থাকিলেও দেহত্যাগের

৮ "অয়ং তু……পূর্ব্ববাসনয়া ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি ভুজ্যমানানি জ্ঞানাবিরুদ্ধারব্ধফলানি চ পশ্যন্নপি বাধিতত্বাৎ পরমার্থমিদমিতি ন পশ্যতি সচক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণোঽকর্ণ ইব" ইতি শ্রুতেঃ। বেদান্তসার

৯ "শুভবাসনানামনুবৃত্তির্ভবতি শুভাশুভয়োরৌদাসীন্যং বা।" বেদান্তসার

১০ "বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
শুনাং তত্ত্বদৃশাং চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে॥"
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, ৪।৬২

১১ "তেষাং বচনানাং বিদ্বৎস্তুতিপরত্বেন তৎ কর্ত্তব্যমিত্যত্র তাৎপর্য্যাভাবাৎ।"
সুবোধিনী (বেদান্তসারটীকা)

১২ "ব্রহ্মবিত্ত্বং তথা মুক্ত্বা স আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ।"
উপদেশসাহস্রী

১৩ "উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ। ১১৫
অযত্নতো ভবন্ত্যেতে নৈতে সাধনরূপিণঃ॥"
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, ৪।৬৩

পর অখণ্ডব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। ঐ অবস্থায় তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলা হয়।

জীবন্মুক্তিসম্বন্ধে লৌকিক কোন প্রমাণ না থাকিলেও "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" (বিমুক্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিমুক্ত হন), "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" (দেহান্তে পুনর্ব্বার সমস্ত মায়ার নিবৃত্তি হয়) ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ অনুসারে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার হয়। বিমুক্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিমুক্ত হন একথার দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে দুই প্রকারের মুক্তি আছে। এইরূপ পুনর্ব্বার সমস্ত অবিদ্যার নাশ হয় একথার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে জীবন্মুক্তি আছে। জীবন্মুক্তি অবস্থায় একবার অবিদ্যানিবৃত্তি হয় এবং বিদেহমুক্তি অবস্থায় আর একবার নিবৃত্তি হয়। কারণ অবিদ্যা দুই প্রকার, এক প্রকার হইতেছে স্থূল অবিদ্যা, অপর হইতেছে সংস্কারাদিরূপ সূক্ষ্ম অবিদ্যা,[১৪] জীবন্মুক্তিদশায় অবিদ্যার স্থূলরূপ নষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম সংস্কারাদিরূপে তাহা থাকিয়া যায়। উহাকেই অবিদ্যার লেশ বলা হইয়া থাকে। বিদেহমুক্তিদশায় অবিদ্যার স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ রূপই নষ্ট হয়।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অনুভবও জীবন্মুক্তি-বিষয়ে প্রমাণ। অধিকন্তু যদি জীবন্মুক্ত পুরুষ না থাকেন তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়ই লুপ্ত হইয়া যায়। কারণ, যদি জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কেহই না থাকেন, অথবা ব্রহ্মজ্ঞ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞানী দেহত্যাগ হইয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞান উপদেশ করাই অসম্ভব হয়। আর যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নাই তিনি যদি জ্ঞান-উপদেশ করেন তাহা হইলে একজন অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইবার মত অন্ধপরম্পরা হইয়া যায়। তাহার ফলে সংসারে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কাহারও হইতে পারে না এবং ঐ বিষয়ে অজ্ঞান ক্রমাগত বিস্তার লাভ করে।

জীবন্মুক্ত পুরুষের ব্যাপারে অপর একটী বিচার প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়ে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে।[১৫] তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পর প্রারব্ধ কর্ম্মও যদি নষ্ট হইয়া যায় তবে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ কিরূপে জীবিত থাকিবেন এবং জ্ঞান উপদেশই বা কিরূপে করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মকে নষ্ট করে সত্য, তবে প্রারব্ধকর্ম্মভিন্ন অপরাপর কর্ম্মকেই নষ্ট করে। কারণ, "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।" ভোগ না করিলে কোটি কোটি কল্পেও কর্ম্ম ক্ষয় হয় না, এই প্রামাণিক বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া পূর্ব্বোক্ত গীতাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে। বাধা থাকিলে পদের অর্থের সংকোচ করা ন্যায়-বিরুদ্ধ নহে, যেমন "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী" বলিলে সরস্বতী দেবীর করতল, চরণতল, কেশ, চক্ষুর তারা আদি শরীরাবয়ব ভিন্ন অপরাপর সমস্ত সঙ্গেই শুক্লতা আছে বুঝিতে হয়, সেইরূপ প্রয়োজন অনুসারে ও অপর প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্যের সহিত একবাক্যতার অনুরোধে প্রকৃত স্থলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন অপরাপর সমস্ত কর্ম্ম নাশ প্রাপ্ত হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

এই জীবন্মুক্তি ও জীবন্মুক্তের বিষয়ে শাস্ত্রে বহু বিস্তৃত আলোচনা আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অদ্বৈতসিদ্ধি, জীবন্মুক্তিবিবেক, বেদান্তসার, তত্ত্ববোধ, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রভৃতি মূল গ্রন্থ আলোচনা করিলে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন।

১৪ "সা স্থূলরূপা সংস্কারাদিরূপা চ"—গৌড়ব্রহ্মানন্দী, অদ্বৈতসিদ্ধি, নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ৩ পৃষ্ঠা।

১৫ "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।" গীতা

ভারত-ব্যবচ্ছেদ ও মাইনরিটি সমস্যা

রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল

ভারতবর্ষের মাইনরিটি সমস্যার সমাধানের জন্যই পাকিস্তান পরিকল্পনা। মুসলীম লীগের নেতা কায়েদ আজম জিন্না পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত-ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত মাইনরিটি সমস্যার কোনও সমাধান হইবে না। সেই উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "তোমরা লও ২, আর আমাদের দাও ২, দেখিবে নিমেষের মধ্যে সমস্ত গণ্ডগোল জলের মত তরল হইয়া যাইবে।" জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর শত আপত্তি সত্ত্বেও অবশেষে ভারত-ব্যবচ্ছেদ করা হইল; তাঁহারই আব্দার শেষ পর্য্যন্ত টিকিল। অপরের আপত্তি, প্রতিবাদ কোথায় ভাসিয়া গেল? ভারত-ব্যবচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। কিন্তু মাইনরিটি সমস্যার ত কোনও সমাধান হইল না। বরং তাহা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক অনুপাতে চাকরী-বাকরী, আইন-সভার আসনবণ্টন, বাদ্যভাণ্ড, গোবধ প্রভৃতি বিষয় লইয়া যে সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছিল আজ তদপেক্ষা ভীষণ ও মারাত্মক সমস্যাসমূহ এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে তদ্দৃষ্টে আপাততঃ মনে হইতেছে যে দেশ বুঝি উৎসন্নে যাইবে! আজ দেশময় একটা ওলট-পালট ও ভাঙ্গা-গড়ার তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ কোথাও ভূমিকম্প অথবা সাইক্লোন হইলে চতুর্দ্দিকে যেমন ভাঙ্গাচুরার পালা পড়িয়া যায়, নানাস্থানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, আজ সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের ফলে দেশের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। জনসাধারণের সহজ জীবন-যাত্রার পথে বিঘ্ন-সৃষ্টি হইয়াছে। জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় এই সব কঠিন সমস্যার সমাধানের কোন সহজ পন্থা নাই। নিত্যনূতন সমস্যা উদ্ভূত হইয়া দেশের নেতাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে। এত সব অসুবিধা ও দুঃখ কষ্টের পরও কি আশা করা যাইতে পারে যে দেশ-ব্যবচ্ছেদের পর মাইনরিটি সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে? যাহারা বলিতেছিলেন যে পাকিস্তান হইলেই মাইনরিটি সমস্যার সমাধান হইবে তাঁহাদের মোহ আশা করি এতদিনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আজ একথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে পাকিস্তান কোন সমস্যারই চরম সমাধান নহে। ইহা সমাধান অপেক্ষা জটিলতাই সৃষ্টি করিতে সহায়তা করিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত-ব্যবচ্ছেদ হইলেও বিচ্ছিন্ন উভয় অংশেই কয়েক কোটি মাইনরিটি থাকিয়া যাইবে। পাকিস্তানে থাকিবে প্রায় দুই কোটি অমুসলমান। আর ভারতীয় ইউনিয়নে কিঞ্চিদধিক চারি কোটি মুসলমান বসবাস করিবে। এই দুই রাষ্ট্রে মাইনরিটিদের মর্য্যাদা যাযাবর জাতির মত নিশ্চয় নহে। সেখানে তাহাদের ঘর-বাড়ী আছে, বিষয়-সম্পত্তি আছে। শত সহস্র বন্ধনদ্বারা দেশের মাটির সহিত তাহাদের নিবিড় সংযোগ আছে। এমনকি হিন্দুর সহিত মুসলমানের এবং মুসলমানের সহিত হিন্দুর একটা মধুর সম্পর্ক আছে। সেটা আত্মীয়তার সম্পর্ক

না হইলেও আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার দিক হইতে তাহা নিকট সম্পর্কিত আত্মজনের মতই মধুর, সহজ ও স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমানকে আগামী যুগে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া একই দেশে থাকিতে হইবে। ভারত-ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ তাহাদিগকে ভিটামাটি হইতে উৎখাত করিতে পারিবে না। অখণ্ড ভারতবর্ষে মাইনরিটি সমস্যা ছিল, খণ্ডিত ভারতেও সেই সমস্যাই রহিয়া গেল। পাকিস্তান দ্বারা ত তাহার সমাধান হইল না। পূর্ব্বের মত এখনও দুই রাষ্ট্রে মাইনরিটিদের জন্য রক্ষা-কবচ, বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ স্বার্থ প্রভৃতি বিষয়ক প্রতিশ্রুতি থাকিবে। এমনকি ম্যাজরিটি কর্তৃক মাইনরিটি পীড়নের ভয়ও থাকিবে। পাকিস্তানপন্থী নেতাদের সিদ্ধান্ত যে মারাত্মক ভুল ও আত্মঘাতী তাহা অনেকেই ইতোমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেকে সাহসে ভর করিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না যে ভারত-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা মূলতঃ ত্রুটিপূর্ণ ; আবার অনেকে এরূপ আশাও পোষণ করিতেছেন যে কিছুদিন পরে আবার ভারতবর্ষ এক হইবে, একই পতাকার তলে সকলে সমবেত হইবে। তাঁহাদের ধারণা যে পাকিস্তান-অঞ্চলের লোক ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া নিজেরাই প্রস্তাব করিয়া পাকিস্তান গুটাইয়া ফেলিবে এবং বিনা দ্বিধায় ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত হইবে।

কিন্তু আর একদল লোক আছেন, তাঁহাদের মোহ এখনও ভাঙ্গে নাই। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হইয়া গেল, তখন আর উহাকে এক করিবার দরকার নাই। তাঁহাদের মতে দেশ-ব্যবচ্ছেদ হওয়া সত্ত্বেও যখন মাইনরিটি সমস্যার সমাধান হইল না, তখন আবার একত্র মিলিত হওয়ার পরিবর্ত্তে অধিবাসি-বিনিময় দ্বারা দুইটি রাষ্ট্রকে এমন ভাবে ঢালিয়া গড়িতে হইবে যে, সেখানে কোনও মাইনরিটি নাগরিকের দাবী থাকিবে না। এই প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে হইবে এবং পাকিস্তান হইতে সমস্ত অমুসলমান বিশেষতঃ হিন্দুকে সরাইয়া ভারতে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইভাবে উভয় রাষ্ট্রের মাইনরিটি সমস্যার চির অবসান হইবে। সুস্থবুদ্ধি মানুষ কেমন করিয়া এই অবাস্তব, অসম্ভব ও ক্ষতিকর প্রস্তাব করিতে পারেন তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। অধিবাসি-বিনিময় কি সোজা কথা? একবার সুলতান মহম্মদ তুগলক কেবল রাজধানী দিল্লী হইতে অধিবাসী স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত খেয়ালের জন্য হাজার হাজার নিরীহ লোককে কিরূপ অসুবিধার মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। পাকিস্তানপন্থীদের আদর্শানুযায়ী অধিবাসি-বিনিময় প্রস্তাব আরও মারাত্মক, আরও সর্ব্বনাশকর। ইহা দু এক লক্ষ লোকের সমস্যা নহে। ইহার ফলে ভারতের কোটি কোটি লোক নিরন্ন, নিরবলম্ব হইয়া পড়িবে। লক্ষ লক্ষ লোক অকালে প্রাণ হারাইবে এবং দীর্ঘযুগ ব্যাপী কয়েক কোটি লোক যাযাবর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে, এবং অবশেষে জাতির আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিবে। বহু যুগ হইতে এদেশে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে এরূপ ভাবে আবদ্ধ যে তাহা দু-চারজন নেতার উস্কানিতে ছিন্ন হইবে না। হিন্দু-মুসলমানের এই আন্তরিকতার সম্পর্কের কথা বাদ দিয়া অধিবাসি-বিনিময়ের বাস্তব অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইবেন। প্রসঙ্গক্রমে এক্ষেত্রে কয়েকটি

অসুবিধার কথা উল্লেখ করিব। সর্ব্বপ্রথম অসুবিধা হইতেছে যে পাকিস্তানে স্থানের অভাব। ভারতীয় ইউনিয়নে কিঞ্চিদধিক চারি কোটি মুসলমান আছে। কিন্তু পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা দুই কোটি। ভারতীয় ইউনিয়ন অনায়াসে দুই কোটি হিন্দুকে আশ্রয়-স্থান ও সংস্থান দিতে পারিবে। কিন্তু পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান এক-সঙ্গেও চারি কোটি মুসলমানের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিবে না। বঙ্গ ও পাঞ্জাব ভঙ্গের পর পাকিস্তানের পরিধি এত ক্ষুদ্র হইয়াছে যে সেখানে আর নূতন লোকের সঙ্কুলান হইবে না। পায়রার খোপের মত ছোট ছোট কামরায় মানুষকে দু-চার দিন কোনও ক্রমে রাখা যায়, কিন্তু সেখানে স্বাধীনভাবে বসবাস করা অসম্ভব। এই চারিকোটি লোককে জমি জায়গা ও জীবিকার সংস্থান ইত্যাদি দিতে হইবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র তাহা কোথা হইতে দিবে? কেবল নোট ছাপাইয়া মুদ্রাস্ফীতি করিলে দেশবাসীর মুখে অন্ন জোটান সম্ভব নহে।

ইহার উপর আরও অসুবিধা আছে। এত অধিকসংখ্যক লোক স্থান ত্যাগ করিলে, এবং অন্য দেশে আশ্রয় লইতে গেলে উভয় রাষ্ট্রে নানা অসুবিধা দেখা দিবে। সাধারণ ভাবে দেশের জনসাধারণ একই দেশে বহুযুগ ধরিয়া বসবাস করিয়া দেশের অবস্থার সহিত কোনও রকমে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, হঠাৎ স্থান ও দেশ ত্যাগের হিড়িক পড়িলে তাহাদের স্বচ্ছন্দ জীবন-ধারার পথে বিঘ্ন-সৃষ্টি হইবে। বেকারসমস্যা আরও মারাত্মক হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। সরকারী ভাণ্ডার হইতে দৈনিক মুঠি মুঠি অন্ন বিতরণ করিয়া কোন জাতিকে বাঁচান যায় না। অকর্ম্মণ্য ও বেকার লোক দেশকে উৎসন্নে দিবে, শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হইবে, দেশের মূল অধিবাসিগণের জীবনও বিপন্ন হইয়া উঠিবে। পাকিস্তানের মুসলমানগণ দীর্ঘ দিন ধরিয়া হিন্দুর সহিত পাশাপাশি বাস করিয়া আপনাদের নিয়মে সংসার পাতিয়া কোনও ক্রমে দিন গুজরান করিয়া আসিতেছে। ইতোমধ্যে হঠাৎ চারিকোটি লোক আসিয়া তাহাদের সহজ চলার পথে এক মস্ত বড় বিপর্য্যয় ঘটাইবে। তাহারা তাহাদের সামলাইতে পারিবে না। বিভিন্ন আব-হাওয়ায় লালিত-পালিত লোক, অন্য প্রকার আবহাওয়ার মধ্যে পতিত হইলে তাহাদের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইবে। কোটি কোটি নরনারীর একত্র সমাবেশ হইলে দেশ দুর্নীতিতে ভরিয়া যাইবে। উভয় রাষ্ট্রের ভাব, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে এত প্রকাণ্ড পার্থক্য বিদ্যমান যে স্থানান্তরিত অধিবাসিগণ কিছুতেই নূতন দেশে নূতন পরিবেশের মধ্যে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবে না। হয়ত তাহারা কালক্রমে নিজস্ব কালচার ভুলিয়া যাইবে। অথবা ভিন্ন দেশের কালচারের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু এই অন্তর্বর্ত্তী কালে তাহাদের নিজস্ব প্রতিভা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ইহা সমগ্রভাবে জাতির সর্ব্বনাশ সাধন না করিয়া ছাড়িবে না। অধিবাসি-বিনিময়ের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর দিক হইতেছে আর্থিক অসুবিধা। উভয় রাষ্ট্রের উভয় সম্প্রদায়ের অধিবাসিগণ নিজ নিজ দেশে নানা উপায়ে রোজগার করিয়া খাইত। হঠাৎ ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করার পর তাহারা ভিন্ন দেশে গিয়া বেকার হইয়া পড়িবে। সেখানে হঠাৎ কর্ম্ম পাইবে না। বিশেষতঃ পাকিস্তান এলাকা শিল্প ও বাণিজ্যে অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। তথায় চারিকোটি লোক বহু দিন পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মই পাইবে না। পাকিস্থান রাষ্ট্র আরও দরিদ্র হইয়া পড়িবে। সমাজের একটা প্রয়োজনীয় অংশ ভিখারীর জাতিতে পরিণত হইবে। এই

চারিকোটি অধিবাসী পাকিস্তানের পক্ষে লাভের কারণ না হইয়া নিতান্ত গলগ্রহস্বরূপ হইবে। পাকিস্তান এলাকার আর যে একটা অসুবিধা হইবে সেকথা হয়ত অনেকে এখনও চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে পাকিস্তানের মুসলমানগণ বহু বিষয়ে হিন্দুদের দ্বারা উপকৃত, ডাক্তার শিক্ষক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বৃত্তিমূলক কার্য্যে হিন্দুর সহায়তা না পাইলে পাকিস্তানের মুসলমানের অশেষ প্রকার অসুবিধা হইবে। অধিবাসি-বিনিময়ের ভিত্তিক পড়িলে এই সমুদয় উপকারী হিন্দুগণ পাকিস্তান হইতে চলিয়া আসিলে, বহু সমস্যার দ্বারা বিব্রত মুসলমান দাঁড়াইবে কোথায়? যেদিক দিয়াই দেখা যাক না কেন অধিবাসি-বিনিময়ের মত সাংঘাতিক প্রস্তাবকে কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না। এই সাংঘাতিক প্রস্তাব যতই বর্জ্জন করা যাইবে ততই দেশের মঙ্গল। সামান্য কতকগুলি অসুবিধা দূর করিতে গিয়া অধিবাসি-বিনিময়রূপ পরিকল্পনার দ্বারা পাকিস্তানপন্থিগণ নিজেদের রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন।

প্রশ্ন হইতেছে যে, তাহা হইলে প্রতিকার কি? আমার বিবেচনায় মাইনরিটিদের জন্য সর্ব্বপ্রকার রক্ষা-কবচসহ স্বাধীন সার্ব্বভৌম অখণ্ড ভারতই বর্ত্তমান অসুবিধা ও অস্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার একমাত্র প্রতিকার। এরূপ হইলে অধিবাসি-বিনিময়রূপ অসম্ভব পরিকল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে না। মাইনরিটিগণ সর্ব্বপ্রকার রক্ষা-কবচ পাইবে। সুতরাং তাহাদের ভয়-ভীতির কারণ দূর হইবে। এক অখণ্ড ভারতের যে কোন স্থানে যে কোনও মাইনরিটি পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের রুচি প্রয়োজন ও সুবিধামত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকিবে। সমস্বার্থ-বোধ ও নিরাপত্তা-বোধ হইতে সমজাতীয়তার ভাব জাগিবে। তখন দেখা যাইবে ভারতের প্রত্যেক নাগরিক সমবেত ভাবে সমগ্র দেশের কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। এই ভাবে দেশ হইতে সাম্প্রদায়িকতারূপ পাপ চিরতরে দূর হইয়া যাইবে। পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষ যদি আশা করেন যে তাঁহাদের প্রদত্ত রক্ষা-কবচের প্রতিশ্রুতি তথাকার মাইনরিটিদিগকে রক্ষা করিবে, তবে অখণ্ড ভারতের সমর্থকদের সেই প্রকার প্রতিশ্রুতিতে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। বরং আমার বিশ্বাস—অখণ্ড ভারতের মাইনরিটিগণ বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও অধিক কার্য্যকরী ও স্থায়ী রক্ষাকবচ পাইবে। ভারত-ব্যবচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বে যেরূপ প্রতিশ্রুতি ভারতের নেতারা দিয়াছিলেন। সে সব প্রতি-শ্রুতি আজও অপরিবর্ত্তিত আছে। ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি অনায়াসে সে সব প্রতিশ্রুতির সুবিধা গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে সুখী, উন্নত ও একত্র করিবার সাধনা করিতে পারেন। পাকিস্তান মুসলমানের জন্য স্বর্গরাজ্য আনিয়া দিবে না। কোনও রূপ চেষ্টা দ্বারা পাকিস্তানকে নিছক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব হইবে না। ভৌগোলিক ভারতে দুইটি ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন নাই। অখণ্ড দেশ, অখণ্ড ভারত ও অখণ্ড জাতি—মিলন, ঐক্য ও সাম্যের এই আদর্শই মাইনরিটি সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়—অন্য পথ নাই।

স্বামীজীর অদ্বৈতবাদ

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার

'উদ্বোধনে'র সুবর্ণ জয়ন্তীতে লিখবার আহ্বান এসেছে। আহ্বান পাওয়া মাত্রই স্বামীজী-প্রচারিত অদ্বৈতবাদের উপর লিখতে আমার ইচ্ছা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয় ছিল বিরাট, কর্ম্মশক্তি ছিল অপ্রতিহত। এজন্য তাঁকে প্রেমিকরূপে—ভারতের সমাজ ও মানব-সমাজের সেবকরূপে দেখাই স্বাভাবিক এবং সাধারণতঃ দেশ ও বিদেশ তাঁকে সেই ভাবেই দেখে থাকে। তাঁর সমস্ত শক্তির পেছনে এবং বিরাট প্রেমের পেছনে ছিল তাঁর অদ্বৈতানুভূতি।

সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ দার্শনিক বিচারের বাকবিতণ্ডায় পর্য্যবসিত। অদ্বৈতবাদের ভেতরে যে জীবনের উৎস তার দিকে নব্য বেদান্তি-সম্প্রদায় ততটা অবহিত নন, যতটা অদ্বৈতবাদের সহিত অন্যান্য দর্শনের সম্বন্ধ-বিচারে এবং মিথ্যাত্ব ইত্যাদি লক্ষণ-নির্ণয়ে অবহিত। ফলতঃ এখন পণ্ডিত-সমাজে অদ্বৈতবাদ মননেই পর্য্যবসিত —অবশ্য এরও একটা দার্শনিক মূল্য আছে। এতে অদ্বৈতবাদের বিজ্ঞানের স্বরূপ স্ফূর্ত্ত হচ্ছে। কিন্তু যে বিজ্ঞান মূর্ত্ত হয়ে জীবনের ভিতরে কার্য্যকর হয় এবং জীবনকে সত্য-উপলব্ধির জন্য উদ্বেল করে তোলে, তা হচ্ছে না। স্বামীজীর দান এখানে। অদ্বৈতবাদকে অবলম্বন করে মানুষ কিরূপে সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে জীবনকে অনুভূতির শিখরে প্রতিষ্ঠা করতে পারে স্বামীজী তাই দেখিয়ে গেছেন। অদ্বৈতবাদকে তিনি মননের ভিতরে বদ্ধ করে রাখেন নি – তাঁর সত্য শক্তিকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমাজ-জীবনেও তাঁর অসীম কল্যাণকরী শক্তিকে উদ্বোধিত করেছিলেন। তাঁর কাছে অদ্বৈতবাদ শুধু একটা বিজ্ঞান বা দর্শন-রূপে প্রতিভাত হয়নি। অদ্বৈতবাদ ছিল তাঁর কাছে জীবনের কর্ম্মভিত্তি, দৃঢ় শক্তি এবং অভী মন্ত্রের পরম বিকাশ। স্বামীজীর সমস্ত শক্তির মূল এখানে। সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ জীবনে নিষেধ-ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত, নেতির ভিতর দিয়ে সমস্ত বিশেষকে অতিক্রম করে সত্যের ধারণা অদ্বৈতবাদের সাধনামার্গ। একে যোগবাশিষ্ঠে বলা হয়েছে দৃশ্য-মার্জ্জনা—যা দেখছি তার নামরূপ ক্রিয়া বাদ দিয়ে যে জিনিসটা থাকে তাই ব্রহ্ম। স্বামীজীর পথ ছিল ইতিমূলক সাধনা –কিছু বাদ না দিয়ে সবটা গ্রহণ করেই ব্রহ্মসাধনা—জীবনের যত স্পন্দন তাতেই ব্রহ্মানুসন্ধান। এই ইতিমূলক সাধনার ভিতর কিছুই বাদ যায় না, সবটাই ব্যাপকদৃষ্টির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। চিৎশক্তিকে ক্রমশঃ প্রসারীভূত করে তার সমস্ত পরিস্পন্দনের ভেতরে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করে ক্রমশঃ আরোহ মার্গে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। একবার প্রসারীভূত সত্তার পরিচয় পেলে এই প্রসারণ-মার্গে ভাব ও কর্ম্ম ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়, তার মূলে আছে যে অখণ্ড বিজ্ঞান তারই পরিচয় দেয়। কিন্তু এতে অনুভূতির কোন লাঘব হয় না, বরং এ বিরাট অনুভূতি জীবনকে রসে পূর্ণ করে ক্রমশঃ প্রস্মৃতির দিকে আকৃষ্ট করে তাকে বিরাটের রসাস্বাদন করায়। অবশ্য অদ্বৈতশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে যে অদ্বৈত-অনুভূতি কোন রসের অনুভূতি নয়। কিন্তু সকলকে এই পথে আকর্ষণ করা সম্ভব হয় না যদি জীবনের মূলে আছে যে আনন্দ বা রস তার সাথে ব্রহ্মসত্তার কোন সম্বন্ধ না থাকে। উপনিষদেও দেখতে পাই ব্রহ্মকে রস বলা

হয়েছে। অদ্বৈতোপাসনায় জীবনের এই আনন্দ-রসকে অনুভব করবার কথা আছে। বিজ্ঞানের উপাসনার সহিত আনন্দের উপাসনাও শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে। আনন্দময় বিশ্বের দৃষ্টি মানুষকে অদ্বৈতানন্দের দিকে আকৃষ্ট করে। নিরুপাধিক আনন্দ অবশ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিশ্বের প্রতিস্তরে যে আনন্দ অনুস্যূত আছে তাকে ধরে ধরে উপাধি ত্যাগ করে এই নিরুপাধিকতার দিকে অগ্রসর হতে হয়।

স্বামীজী এই বিশ্বের আনন্দমূর্ত্তির দিকে মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন। দুঃখ জরা ব্যাধি দারিদ্র্যকে আনন্দে বরণ করে নিতে উদ্বোধিত করেছেন। এই সব স্থানেই মানুষের ভয়। এই ভয় হতে উত্তীর্ণ হতে তিনি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন মৃত্যুকে বরণ করতে। কারণ মৃত্যুর মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, জরাজীর্ণের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন এক শাশ্বত সত্তা, যা অজর, অভয় ও অমৃত।

এই জন্যই তিনি সংসারকে ত্যাগ করে আবৃত-চক্ষু হয়ে ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হতে উদ্বোধিত করেন নি। তিনি কঠিন হতে কঠিনতমকে বরণ করে নিতে আদেশ দিয়েছেন। ভয় যেখানে বর্ত্তমান সেখানে ব্রহ্মানুভূতি হতে পারে না।

এই কথাটা মনে রাখলে স্বামীজীর সমস্ত কর্ম্মের মূলের প্রতি দৃষ্টি পড়বে। তাঁর মানব-সেবার মূলে ছিল এই দৃষ্টি। মানুষের অন্তর সমাজের সমস্ত ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে ঠিক ভাবে জাগ্রত হয় না। অথচ মানুষকে ব্রহ্মরূপে দেখে সেবা করতে পারলে তার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয়—হৃদয়ের প্রকাশ ব্যাপক হয়। স্বামীজীর লোকসেবা—মানুষকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা। শুধু সেবাজ্ঞানে দেখলে ছোট করে দেখা হয়। এটা ঠিক সেবা নয়, এ এক প্রকার উপাসনাবিশেষ। এই জ্ঞানে সেবা করতে করতে চিত্তে একটি বৃত্তি উপস্থিত হয় এবং সেই বৃত্তির আশ্রয়ে হৃদয় ব্যাপকজীবনে ব্রহ্মানুভূতির স্পর্শ পায়। মানুষ যদি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে একটি ব্যক্তিকেও ব্রহ্মদৃষ্টিতে সেবা করতে পারে তা হলে কর্ম্মের ভেতর দিয়ে তার ব্রহ্মস্পর্শ হয়ে থাকে। ব্রহ্মানুভূতির প্রধান ভিত্তি সুখ-দুঃখের বিস্মৃতি। এইরূপে বেদান্ত-ভিত্তিতে স্বামীজী কর্ম্মজীবনে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই কর্ম্ম শুধু নিষ্কাম কর্ম্ম নয়, দৃষ্টি এখানে ভিন্ন। এরূপ দৃষ্টি সমস্ত সঙ্কোচ দূরীভূত করে এবং সেবার অনুভূতিকে গরীয়ান করে তোলে। সাধারণতঃ বেদান্তে বলা হয়—কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মস্পর্শ করা যায় না। কথা সত্য, কর্ম্ম যেখানে কোন প্রাপ্তিমূলক সেখানে তার পরিধি ক্ষুদ্র। এখানে কিন্তু তা নয়। আত্মবিস্মৃতিতে কর্ম্ম হয় সম্পূর্ণ রূপান্তরিত, একে অবলম্বন করে প্রেমের স্পন্দনে বিশ্বসত্তার অনুভূতির দ্বার খুলে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের Order of Service এইজন্যই অন্যান্য Order of Service হতে পৃথক। তাঁর উপদেশ সম্পূর্ণ অনুসরণ করলে সেবার ভিতর দিয়ে অন্তরের গভীর দ্বার খুলে যাবে এবং সেবক সেব্যের সহিত একতা অনুভব করবে। অদ্বৈত তত্ত্বকে জীবনে গ্রহণ করবার এমন পথ আর নেই। বিজ্ঞানের চর্চ্চায় বুদ্ধির শুদ্ধি আসতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির শুদ্ধি অনেক সময় দেখা যায় খুব গভীর না হলে প্রাণে ব্রাহ্ম ছন্দ জাগায় না। অদ্বৈতবাদ সেখানে শুধু কথায় পর্য্যবসিত। প্রাণের সঙ্কোচ নষ্ট করতে হলে এবং মহাপ্রাণ আকর্ষণ করতে হলে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত মার্গ শ্রেষ্ঠ মার্গ। বিশেষতঃ যে জাড্য ও সঙ্কীর্ণতা ভারতবর্ষের প্রাণকে করেছে আক্রমণ, তার থেকে মুক্ত হতে হলে আনন্দের সহিত সেবা একটি পরম কৌশল।

প্রাণগ্রন্থি সরল ও সবল না হওয়ার জন্য আমাদের জীবন হয়েছে পঙ্গু। প্রাণে ব্রহ্ম-দৃষ্টির কথা শ্রুতিতে আছে। স্বামীজীর সেবাধর্ম্ম

প্রকারান্তরে প্রাণেই ব্রহ্মদৃষ্টি করায়। প্রাণকে ব্রহ্মরূপে বরণ করলে মহাপ্রাণ জাগ্রত হয়—মানুষকে অসীম শক্তিসম্পন্ন করে। সেবা যেমন অদ্বৈত-ভিত্তিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁর প্রেমধর্মের ভিত্তিও তেমনি অদ্বৈত। বৈষ্ণবীয় প্রেমের ভিতর আছে যে রসানুভূতি, যা' সাধারণ মানুষকেই একরূপ সূক্ষ্ম ভোগে আকৃষ্ট করে—স্বামীজী তা বরণ করেন নি, বরং দুর্বলতার কারণ বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য বিশুদ্ধ প্রেমকে কখনও তিনি আঘাত করেন নি। তাঁর প্রেম ছিল আত্মজ্ঞানমূলক। অদ্বৈতানুভূতি গভীর স্তরে উপনীত হলে যে কোন আনন্দের সহিত বিশ্বের উপর যে প্রেম প্রতিফলিত হয়, স্বামীজীর প্রেম ছিল তাই। প্রেমের উপজীব্য আনন্দ—আত্মাই আনন্দস্বরূপ এই আনন্দস্বরূপ আত্মা যার নিত্যস্মরণের বস্তু তার কাছে প্রেম শান্ত স্নিগ্ধ—ভাবাবেশ-বর্জিত অথচ অনন্ত কর্মের উৎস। স্বামীজীর ভিতরে এইরূপ প্রেম আমরা দেখতে পাই। তাঁর মঠের শিক্ষা এই রূপ প্রেমেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রেম ভীষণকে ভয় পেত না, সুন্দরেও আত্ম-বিস্মৃত হয়ে মগ্ন হত না। তাঁর প্রেম ছিল শাশ্বত জ্ঞানোপলব্ধির শান্ত মহিমময় বিকাশ—হৃদয়-বৃত্তির ভিতর দিয়ে অদ্বৈতের ভাববিনিময়। স্বামীজী বাঙালী জাতির মনীষা ও মেধা নিয়ে বেদান্তকে এক নূতন মূর্তি দিয়ে গেছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। জীবনের সবটা তিনি স্পর্শ করেছেন বেদান্তের তত্ত্ব দ্বারা এবং জীবনের প্রতি ধারাকে ক্ষিপ্রতর করে ব্রহ্মানুভূতির দিকে অগ্রসর করেছেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময়ে বেদান্তকে সমগ্র জীবনের উপযোগী করে গ্রহণ করা কঠিন ছিল, কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও অমানুষী শক্তি বেদান্ত কিরূপে মানুষের সব অধিকারকে বজায় রেখে মুক্তি-মার্গ প্রদর্শন করতে পারে তা দেখিয়েছে। বেদান্তের মূল বৃত্তি দুটি—সঙ্কোচহীনতা ও নির্ভীকতা। এই দুইটি বৃত্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ব্রহ্মোপলব্ধি নিশ্চিত। সমাজের যে অবস্থা সে অবস্থায় স্বামীজীর বেদান্তদৃষ্টি যে সকল নরনারীকে কল্যাণের পথে চালিত করবে এতে আর সন্দেহ নেই।

রাত্রি ও দিবা

শ্রীসাহাজী

দিনের সে শুভ্র আলো মর্ত্যেরে সে করে সুপ্রকাশ,
কিন্তু হায়! রাখে সে যে রুদ্ধ করি স্বর্গের দুয়ার।
হের পুনঃ লুপ্ত করি দিনের সে নির্মম প্রকাশ,
দেখায় স্বর্গের দৃশ্য পরিপূর্ণ নিশার আঁধার!
দিবা জন্ম, মৃত্যু নিশা দিবার বহিন,
নর-চিত্তে এ তত্ত্ব যে পরম গহিন।

সাধনা ও প্রেম

শ্রীঅরবিন্দ

প্রেমের সত্য-প্রতিষ্ঠা

দিব্য প্রেম, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ পৃথিবীর মধ্যে আগাইয়া আনা, বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে আমাদের যোগের চূড়ান্ত ও মূল কথা। কিন্তু ইহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন ইহার ভিত্তি ও রক্ষকস্বরূপই আসে ভাগবত সত্য (ইহাকেই আমি Supramental বা অতিমানস নামে অভিহিত করিয়াছি) এবং তাহার ভাগবত শক্তি। নতুবা প্রেম বর্ত্তমান চৈতন্যের বিভ্রান্তির দ্বারা নিজেই অন্ধ হইয়া মানবীয় আধারে কোন রকমে প্রকট হইতে পারে। আর এমনও হইতে পারে যে তাহার মর্য্যাদা করা হইবে না, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইবে অথবা তাহা দ্রুত বিকৃত হইয়া মানুষের নিম্নতম প্রকৃতির দুর্ব্বলতার মধ্যে অপচয়প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দিব্য প্রেম যখন ভাগবত সত্য ও ভাগবত শক্তিতে আসে তখনও তাহা প্রথমে এক লোকোত্তর ও বিশ্বময় সত্তারূপে অবতীর্ণ হয় এবং সেই লোকোত্তরতা ও বিশ্বময়তা হইতে ভাগবত সত্য ও সঙ্কল্প অনুযায়ী ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হয় এবং মানুষের মন ও হৃদয় এখন যাহা কল্যাণ করিতে পারে তাহা অপেক্ষা প্রশস্ততর, মহত্তর শুদ্ধতর ব্যক্তিগত প্রেমের সৃষ্টি করে। যখন কেহ এইরূপ অবতরণ উপলব্ধি করে তখনই সে পৃথিবীতে দিব্যপ্রেমের জন্ম ও ক্রিয়ার প্রকৃত যন্ত্র হইতে পারে।

ভাবের অতীত

শ্রীমা তোমাকে এমন কথা বলেন নাই যে প্রেম একটি ভাব (emotion) নহে, তিনি বলিয়াছেন, দিব্য প্রেম একটি ভাব নহে—ইহা একই কথা নহে। মানুষের প্রেম হইতেছে ভাব, আবেগ ও কামনা দিয়া গড়া, এ-সবই প্রাণের ক্রিয়া এবং সেই জন্যই মানবীয় প্রাণ-প্রকৃতির ত্রুটি-সকলের অধীন। মানবীয় প্রকৃতিতে ভাব খুবই ভাল জিনিস এবং অপরিহার্য্য, উহার যত ত্রুটি এবং বিপদই থাকুক না কেন,—ঠিক যেমন মানসিক চিন্তা নিজের ক্ষেত্রে এবং মানবীয় স্তরে খুবই ভাল জিনিস এবং অপরিহার্য্য। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হইতেছে মনের চিন্তার ঊর্দ্ধে অতিমানস সত্যের আলোকের মধ্যে যাওয়া—তাহা লৌকিক চিন্তা দ্বারা কাজ করে না, সাক্ষাৎ দৃষ্টি ও তাদাত্ম্যের দ্বারা কাজ করে। সেইরূপই আমাদের লক্ষ্য হইতেছে ভাবের ঊর্দ্ধে দিব্য প্রেমের উচ্চতা, গভীরতা ও নিবিড়তার মধ্যে যাওয়া এবং সেখানে আন্তর হৃৎপুরুষের ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত অনিঃশেষণীয় একত্ব অনুভব করা—প্রাণিক ভাবের আক্ষেপময় উচ্ছ্বাস কখনও সেখানে পৌঁছিতে বা তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।

অতিমানস সত্য যেমন আমাদের মানসিক ধ্যানধারণারই একটা উন্নত রূপ নহে, তেমনই দিব্য প্রেমও মানবীয় ভাবাবেগের একটা ঊর্দ্ধ রূপ নহে,—উহা এক বিভিন্ন চৈতন্য, তাহার গুণ বিভিন্ন, গতি বিভিন্ন, সারসত্তা বিভিন্ন।

সাধনায় প্রেমের স্থান

(১)

সাধনাতে মানবীয় প্রেমের স্থান কি প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। যে প্রেমের ভিতর দিয়া

অন্তরাত্মা ভগবানের অভিমুখী হইবে তাহা মূলতঃ হওয়া চাই দিব্য প্রেম, কিন্তু যেহেতু প্রথমে উহার অভিব্যক্তি মানবীয় প্রকৃতির মধ্য দিয়াই হয়, উহার প্রাথমিকরূপে হয় মানবীয় প্রেম ও ভক্তি। কিন্তু মানবীয় প্রেমের মধ্যেই আবার প্রেরণার কতকগুলি প্রকারভেদ রহিয়াছে। যাহাকে হৃদাত্মক (psychic) মানবীয় প্রেম বলা যায় তাহা খুব গভীর হইতে আইসে, যে আমাদের অন্তঃপুরুষকে দিব্য আনন্দ ও মিলনের জন্য আহ্বান করে তাহার সাক্ষাৎ লাভ হইতেই এই প্রেমের উদ্ভব হয়। একবার যখন ইহা নিজের স্বরূপ অবগত হয়, তখন ইহা হয় স্থায়ী, স্ব-প্রতিষ্ঠ, বাহিরের তৃপ্তির উপর তাহা নির্ভর করে না। বাহিরের কোন কিছু দ্বারাই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাহা স্বার্থপর নহে, তাহা দাবী করে না, বিনিময় চাহে না, শুধু নিজেকে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দান করে, ভুল বুঝা দ্বারা, আশাভঙ্গের দ্বারা, দ্বন্দ্ব বা অভিমানের দ্বারা তাহা বিচলিত বা নষ্ট হয় না, পরন্তু আভ্যন্তরীণ মিলনের জন্য সর্ব্বদা সোজা অগ্রসর হইয়া চলে। এই হৃদাত্মক প্রেমই হইতেছে দিব্য প্রেমের নিকটতম এবং সেই জন্যই ইহা হইতেছে প্রেম ও ভক্তি মার্গের যথার্থ ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ। তথাপি ইহার অর্থ নহে যে, আমাদের সত্তার যে অন্যান্য অংশ আছে,—দেহ, প্রাণ ইত্যাদি, ইহাদের ভিতর দিয়াও প্রেমকে প্রকট করিতে হইবে না। ইহারাও প্রেমের খেলা এমন কি দিব্য প্রেমের খেলা ও সার্থকতার অংশ গ্রহণ করিবে না, তাহা নহে। দিব্য প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তিতে তাহারাও যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারে এবং বিশেষ স্থান লাভ করিতে পারে, অবশ্য যদি তাহারা বিকৃত ক্রিয়াসকল হইতে মুক্ত হয়, এবং যথার্থ ক্রিয়ার বিকাশ করিতে পারে। প্রাণের স্তরেও দুই প্রকার প্রেম আছে—একটি হইতেছে উল্লাস, প্রত্যয় ও স্বচ্ছন্দলীলায় পূর্ণ উদার, অপ্রত্যাশী, অকুণ্ঠ, ইহাতে আত্মনিবেদন খুবই পূর্ণ হইতে পারে—ইহা হৃদাত্মক প্রেমের সমতুল। এবং ইহা অনুপূরক হইবার এবং দিব্য প্রেমের অভিব্যক্তির যন্ত্র হইবার বেশ উপযোগী। আর হৃদাত্মক প্রেমই হউক অথবা দিব্য প্রেমই হউক, কোনটিই দৈহিক অভিব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য করে না, যদি তাহা হয় শুদ্ধ যথার্থ ও সম্ভব; ইহারই উপর সে-প্রেম নির্ভর করে না, এই প্রকার অভিব্যক্তি হইতে বঞ্চিত হইলে তাহা হৃদয়প্রাপ্ত বা বিদ্রোহী হয় না অথবা সলিতাহীন দীপশিখার ন্যায় নিবিয়া যায় না; কিন্তু যখন তাহা ইহাতে ব্যবহার করিবার সুযোগ পায়, তখন আনন্দের সহিত এবং কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা করিয়া থাকে। দিব্য প্রেম ও ভক্তির দিকে অগ্রসর হইবার সহায়রূপে স্থূল দৈহিক উপায় অবলম্বন করা যায় এবং করা হইয়া থাকে; কেবল মানুষের দুর্ব্বলতার জন্যই সে সবে অনুমতি দেওয়া হয়—ইহা সত্য নহে, আর ইহাও সত্য নহে যে হৃদাত্মক সাধনায় ঐ সব জিনিষের কোন স্থানই নাই। পরন্তু ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার এবং ভাগবত জ্যোতি গ্রহণ করিবার এবং হৃদাত্মক মিলনকে কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে তাহারা হইতেছে এক প্রকার সহায়; আর যতক্ষণ যথাযথ ভাব লইয়া ইহা করা যায় এবং সত্য প্রয়োজনে তাহাদিগকে ব্যবহার করা যায় ততক্ষণ তাহাদেরও একটা স্থান আছে। কেবল যদি তাহাদের অপব্যবহার করা হয় অথবা ঔদাসীন্য বা বিদ্রোহ বা বৈরিতা কিম্বা কোন স্থলে কামনা দ্বারা কলঙ্কিত হওয়ায় উপগমটি যথাযথ না হয় তাহা হইলেই তাহাদের কোন উপযোগিতা থাকে না এবং তাহাদের দ্বারা বিপরীত ফলই হইতে পারে।

কিন্তু প্রাণাত্মক প্রেমের অপর একটি ধারা

আছে সেইটিই সাধারণতঃ মানব-প্রকৃতির ধারা এবং তাহা হইতেছে অহং ও কামনার ধারা। ইহা প্রাণাত্মক (vital) লালসা, কামনা ও দাবীতে পূর্ণ; ইহার দাবীগুলি যতক্ষণ পূর্ণ হয় ততক্ষণই ইহা স্থায়ী হয়; ইহা যাহা চায় তাহা যদি না পায়, অথবা কল্পনা করে যে সে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার পাইতেছে না (বস্তুতঃ ইহা কল্পনা, ভুলবুঝা, ঈর্ষা, বিকৃতদৃষ্টি প্রভৃতিতে পূর্ণ), তখনই তাহার মধ্যে উদয় হয় দুঃখ, অভিমান, ক্রোধ, নানাপ্রকার বিক্ষোভ, এবং শেষ পর্যন্ত বিরতি ও বিদায়। এই প্রকারের প্রেম স্বভাবতঃই ক্ষণভঙ্গুর ও অনির্ভরযোগ্য, ইহাকে দিব্য প্রেমের ভিত্তি করা চলে না ··· ·এই জন্যই আমরা এই নিম্নতর প্রাণাত্মক মানবীয় প্রেমকে প্রশ্রয় দিই না এবং লোককে বলি তাহারা যথনই সম্ভব যেন তাহাদের প্রকৃতি হইতে এই সব জিনিষ বর্জ্জন ও নির্ম্মূল করে। প্রেম হওয়া চাই সুখ, মিলন, নির্ভর, আত্মদান ও আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ,—কিন্তু এই যে নিকৃষ্টতর প্রেমের কথা বলিলাম, ·ইহা আনে যত শুধু দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, ভুলভাঙ্গা ও বিচ্ছেদ। ইহার একটু জেরও যদি থাকে তবে তাহা শান্তির ভিত্তি নড়াইয়া দিতে পারে, এবং আনন্দের দিকে গতিকে রুদ্ধ করিয়া লইয়া আসে দুঃখ অসন্তোষ ও নিরানন্দের মধ্যে পতন।

(২)

ভগবানের দিকে যে প্রেমের গতি তাহা যেন মানুষ সাধারণতঃ যাহাকে প্রেম নাম দেয় সেই প্রাণাত্মক ভাব না হয়; কারণ তাহা বস্তুতঃ প্রেম নহে, তাহা হইতেছে প্রাণাত্মক কামনা, পরিত্রাণের অভিলাষ, অধিকার ও এক-চেটিয়া ভোগ করিবার প্রবৃত্তি। ইহা যে দিব্য প্রেম নহে শুধু তাহাই নহে, সাধনার সহিত ইহাকে আদৌ মিশ্রিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। ভগবানের প্রতি সত্যকারের প্রেম হইতেছে আত্ম-দান, তাহার মধ্যে কোনরূপ দাবী নাই, তাহাতে আছে শুধু নতি ও সমর্পণ; তাহা কিছু দাবী দাওয়া করে না, কোন সর্ত্ত করে না, দরদস্তুর করে না, তাহাতে ঈর্ষা, গর্ব্ব, ক্রোধের উগ্রতা নাই—কারণ তাহা এই সব জিনিষ দিয়া গঠিত নহে। বিনিময়ে জগন্মাতাও নিজেকে দান করেন, কিন্তু স্বচ্ছন্দে—এবং ইহা হয় আভ্যন্তরীণ দান—তোমার মনে, তোমার প্রাণে, তোমার শারীর চৈতন্যেও তাঁহার সান্নিধ্য, তার শক্তি তোমার দিব্য প্রকৃতিতে নবজন্ম দিবে, তোমার সত্তার সকল ক্রিয়াকে লইয়া পূর্ণতা ও স্বয়ংসিদ্ধির দিকে পরিচালিত করিবে, তার প্রেম তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্রোড়ে করিয়া তোমাকে ভগবানের দিকে লইয়া যাইবে। তোমার সত্তার সকল অংশে, স্থূল দেহে পর্যন্ত এই অনুভূতি যাহাতে পাও সেই অভীপ্সা জাগাইয়া রাখ; আর এখানে সমনের বা পূর্ণতার কোন গণ্ডী নাই। অভীপ্সা যথাযথ হওয়ায় যদি কেহ ইহা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে আর অন্য কোন দাবীর স্থান থাকে না, কোন অপূর্ণ কামনা থাকে না। আর যদি কাহারও অভীপ্সা যথাযথ হয়, সে নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর ইহা লাভ করে যেমন প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া উঠে এবং প্রয়োজনমত রূপান্তরিত হয়।

তোমার প্রেমকে সকল প্রকার স্বার্থপর দাবী ও কামনা হইতে মুক্ত রাখ, তাহা হইলে দেখিবে যে, তোমার গ্রহণ করিবার, বহন করিবার যত সামর্থ্য আছে তত প্রেমই তুমি লাভ করিবে।

আর এটাও জানিয়া রাখ যে, প্রথমেই চাই সিদ্ধি; কাজটি আগে পূর্ণ করিতে হইবে, তাহার পরই দাবী ও বাসনার তৃপ্তির কথা উঠিতে পারে, তাহার পূর্ব্বে নহে। যখন ভাগবত চৈতন্য তাঁহার অতিমানস জ্যোতি ও শক্তিতে অবতীর্ণ

হইয়া স্থূল আধারকে রূপান্তরিত করিবে, কেবল তখনই অন্যান্য জিনিষগুলিকে সম্মুখে আসিতে দেওয়া যাইতে পারিবে—আর সেটাও হইবে বাসনা-কামনার তৃপ্তি নহে, পরন্তু প্রত্যেকের ও সকলের মধ্যে ভাগবত সত্যের সিদ্ধ প্রকাশ, এবং সেই প্রকাশের উপযোগী নূতন জীবন। ভাগবত জীবনে সব কিছুই হইতেছে ভগবানের জন্য, অহং-এর জন্য নহে।

আরও দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন, নতুবা সংশয় থাকিয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ আমি ভগবানের প্রতি যে প্রেমের কথা বলিতেছি এইটি শুধুই হৃদাত্মক প্রেম নহে। ইহা হইতেছে সমস্ত সত্তার প্রেম, প্রাণময় সত্তা এবং প্রাণময় দৈহিক সত্তার প্রেমও ইহার অন্তর্গত—এই সব সত্তাই অনুরূপ আত্মদানে সমর্থ। এটা মনে করা ভুল যে, যদি প্রাণসত্তা ভালবাসে, তাহা হইলে তাহাতে দাবী থাকিবেই, কামনা থাকিবেই; এটা মনে করা ভুল যে, প্রাণকে যদি ঐ সব ছাড়িতে হয়, আসক্তিবর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রেমের বস্তু হইতে সম্পূর্ণভাবেই সরিয়া আসিতে হইবে। প্রকৃতির অন্য যে কোন অংশের ন্যায়ই প্রাণসত্তাও অকুণ্ঠ ও পূর্ণভাবে আত্মদান করিতে পারে; যখন সে প্রিয়ের জন্য নিজেকে ভুলিয়া যায়, তাহার সেই আত্মহারা ভাব অপেক্ষা উদার আর কিছুই হইতে পারে না। প্রাণ ও দেহ যেন যথাযথভাবে নিজদিগকে সমর্পণ করে—যথার্থ প্রেমের ধারায়, অহংভাবাত্মক কামনার ধারায় নহে।

প্রাণাত্মক প্রেম (Vital Love)

প্রাণাত্মক প্রেমের সাধারণ লক্ষণ হইতেছে এই যে, উহা স্থায়ী হয় না, আর যদিই বা উহা স্থায়ী হইতে চেষ্টা করে, উহা তৃপ্তি দিতে পারে না, কারণ এই রাগাবেশ প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছে একটি সাময়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য; অতএব ঐ সাময়িক প্রয়োজনের জন্য উহা ভালই, আর প্রকৃতির ঐ প্রয়োজনটি যখন সিদ্ধ হইয়া যায় তখন স্বভাবতঃই উহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তবে পশু-জগতে যাহাই হউক মানুষ আরও বহুলাত্মক জীব হওয়ায় প্রকৃতি কল্পনা ও ভাবুকতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া প্রবৃত্তিটিকে প্রবল করিয়া তোলে, উৎসাহ, সৌন্দর্য্যবোধ, গৌরব-বোধ প্রভৃতি উৎপন্ন করে; কিন্তু কিছুকাল পরে এ-সবই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহা স্থায়ী হয় না, কারণ ইহার সব জ্যোতি ও শক্তি হইতেছে ধার করা। ধার করা এই অর্থে যে, ইহা হইতেছে একটা ঊর্দ্ধের কোন বস্তুর প্রতিচ্ছায়া মাত্র, ইহা প্রাণিক ভাবাবেগের নিজস্ব নহে। আরও কথা এই যে, মনে ও প্রাণে কিছুই স্থায়ী হয় না, সেখানে সবই হইতেছে স্রোতের ন্যায় চির-পরিবর্ত্তনশীল। একমাত্র যে বস্তু স্থায়ী হয়, তাহা হইতেছে আত্মা, অধ্যাত্মসত্তা, the soul, the spirit. অতএব প্রেম স্থায়ী হইতে পারে, তৃপ্তি দিতে পারে—কেবল যদি তাহার ভিত্তি হয় আত্মা ও অধ্যাত্মসত্তার উপর, যদি তাহার শিকড়গুলি ঐখানেই থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ হইতেছে আর প্রাণসত্তার মধ্যে বাস না করিয়া আত্মা ও অধ্যাত্মসত্তার মধ্যেই বাস করা।

প্রাণসত্তার আত্মসমর্পণের পথে বাধা হইতেছে এই যে, উহা বুদ্ধি বা জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, পরন্তু সুখভোগের সহজাত প্রবৃত্তি ও কামনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সে পশ্চাৎপদ হয় যখন সে নিরাশ হয়, যখন সে উপলব্ধি করে যে বারবার তাহাকে নিরাশই হইতে হইবে, কিন্তু সব জিনিষটাই যে একটা মিথ্যা জলুস মাত্র তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে না, আর করিলেও, কেন এমন হল এই বলিয়া সে দুঃখ করে। যেখানে বৈরাগ্যটি হয় সাত্ত্বিক, আশাভঙ্গ হইতে উদ্ভূত

না হইয়া, মহত্তর ও সত্যতর জিনিষ লাভ করিবার আগে এই উপলব্ধি হইতে উহা উদ্ভূত হয় তখন এই বাধাটি আসিতে পারে না। যাহাই হউক প্রাণসত্তাও অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে, আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান হওয়ার দুঃখ হইতে বিরত হইতে পারে। ইহার বৈরাগ্য সাত্ত্বিক ও সুনিশ্চিত হইতে পারে।

মানবীয় সম্বন্ধে প্রেম—হৃদাত্মক ও অধ্যাত্ম প্রেম

"প্রেম" শুভ ইচ্ছা হইতে গভীরতর জিনিষ, ভাললাগা বা স্নেহ অপেক্ষা গভীরতর জিনিষ। কিন্তু প্রেমই হউক বা শুভ ইচ্ছাই হউক, মানবীয় অনুভব (feeling) সকল সময়েই অহংএর উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্ততঃ উহার সহিত প্রবলভাবে মিশ্রিত—সেই জন্যই উহা শুদ্ধ হইতে পারে না। উপনিষদে বলা হইয়াছে,

> ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ
> প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ
> প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ
> কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু
> কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ইত্যাদি
> —বৃহদারণ্যক ২।৪।৫

পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না; স্ত্রী বা পুত্র বা বন্ধুর জন্য স্ত্রী, পুত্র বা বন্ধু প্রিয় হয় না—আত্মার জন্যই লোক পতি জায়া প্রভৃতিকে ভালবাসে। সাধারণতঃ একটা প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকে, কোন রকমের উপকার বা সুবিধা অথবা প্রেমাস্পদের নিকট হইতে কোনরূপ মানসিক প্রাণিক বা দৈহিক সুখভোগ পরিতৃপ্তির প্রত্যাশা থাকে। এইগুলির অভাব হইলে প্রেম শুকাইয়া যাইবে, ক্ষীণ বা অদৃশ্য হইবে, অথবা রোষ, তিরস্কার বা অবহেলায় পরিণত হইবে, এমন কি ঘৃণাতেও পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটা জিনিষ আছে—অভ্যাস, বহুকাল কারও সঙ্গে থাকার ফলে এমন একটা অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায় যে তাহা না হইলে আর চলে না,—এবং ইহা অনেক সময়ে এমন প্রবল হয় যে, দুই জনের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অমিল, ভীষণ বিরোধ, ঘৃণারই মত একটা কিছু সত্ত্বেও, উহা স্থায়ী হয়, এই সব ভেদ থাকিলেও দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয় না, অন্যান্য ক্ষেত্রে এই অনুভবটা অপেক্ষাকৃত অনুষ্ণ হয়, এবং কিছুকাল পরে বিচ্ছেদ সহনীয় হইয়া উঠে, অথবা অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার আকর্ষণ থাকে—মানসিক, প্রাণিক বা দৈহিক আকর্ষণ—এবং ইহা প্রেমকে অধিকতর দৃঢ় সংসক্তি দেয়। আর শেষতঃ, উচ্চতম ও গভীরতম প্রেমে থাকে হৃদাত্মকতার স্পর্শ, তাহা আইসে অন্তরতম হৃদয় বা আত্মা হইতে, ইহা হইতেছে এক প্রকার আভ্যন্তরীণ মিলন বা আত্মদান, অন্ততঃ উহারই প্রয়াস—একটা সম্বন্ধ বা প্রেরণা যাহা অন্য কোন অবস্থা বা প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে না। তাহার অস্তিত্ব শুধু নিজের জন্যই, কোনরূপ মানসিক, প্রাণিক বা দৈহিক সুখভোগের জন্য নহে, কোনরূপ তৃপ্তি, স্বার্থসিদ্ধি বা অভ্যাসের জন্য নহে। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের প্রেমে যখন হৃদাত্মক স্পর্শ থাকে তাহা এত মিশ্রিত হয় এবং অন্যান্য জিনিষের ভারে এমন চাপা পড়িয়া যায়, ঢাকা পড়িয়া যায়—যে তাহা আর নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় না, নিজের স্বাভাবিক শুদ্ধস্বরূপ ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। অতএব যাহাকে প্রেম নামে অভিহিত করা হয়, তাহা কখনও হয় একরকমের, কখনও আর এক রকমের, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা হয় একটা বিভ্রান্ত মিশ্রণ, অতএব কোন

ক্ষেত্রে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ কি সাধারণ ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। সব নির্ভর করে—ব্যক্তির উপরে এবং পরিস্থিতির উপরে।

প্রেম যখন ভগবানের দিকে যায় তখনও এই সাধারণ মানবীয় ভাব থাকে, প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকে। আর যদি প্রতিদানের সম্ভাবনা দেখিতে না পাওয়া যায় তখন ঐ প্রেমও শুকাইয়া যায়; স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা থাকে, মানুষ যাহা চায় ভগবান সেই সব প্রদান করিবেন এইরূপ সব দাবী থাকে; আর যদি ঐ সব দাবীর পূরণ না হয়, ভগবানের উপর অভিমান হয়[১], বিশ্বাস নষ্ট হয়, অনুরাগের শক্তি হ্রাস পায় ইত্যাদি। কিন্তু ভগবানের প্রতি যে সত্য প্রেম তাহা মূলতঃ এই প্রকার নহে পরন্তু তাহা হইতেছে হৃদাত্মক (Psychic) এবং আধ্যাত্মিক (Spiritual), হৃদাত্মক উপাদান হইতেছে, আমাদের অন্তরাত্মার আত্মদানের, প্রেমের, পূজার,[২] মিলনের জন্য যে গভীর আকাঙ্ক্ষা—ইহা কেবল মাত্র ভগবানের দ্বারাই পরিতৃপ্ত হইতে পারে। আধ্যাত্মিক উপাদান হইতেছে, আমাদের সত্তার যে নিজ উচ্চতম ও পূর্ণতম আত্মা, যাহা আমাদের জীবন, চৈতন্য ও আনন্দের মূল উৎস সেই ভগবানের সহিত স্পর্শের মিলনের, তাঁহারই মধ্যে নিমজ্জিত হইবার গভীর আকাঙ্ক্ষা[৩]। এই দুইটি হইতেছে একই জিনিষের দুইটি দিক। মন, প্রাণ, দেহ এই প্রেমের আধার ও গ্রহীতা হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণভাবে ইহা হইতে হইলে তাহাদিগকে সত্তার হৃদাত্মক ও আধ্যাত্মিক অংশের সহিত সামঞ্জস্যে পুনর্গঠিত হইতে হইবে, অতএব নিম্নতর দাবী-গুলিকে আর ডাকিয়া আনা চলিবে না।

বন্ধুত্ব ও হৃদাত্মক প্রেম

পুরুষে পুরুষে এবং স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বন্ধুত্ব হওয়া যে অধিকতর সহজ তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সেখানে যৌনলিপ্সা সাধারণতঃ স্থান পায় না। পুরুষ ও নারীর মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে যে কোন মুহূর্তে যৌনপ্রবৃত্তিটি সূক্ষ্মভাবেই হউক বা সাক্ষাৎভাবেই হউক আসিয়া পড়িতে এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব যে একেবারেই অসম্ভব তাহা নহে; এরূপ বন্ধুত্ব হইতে পারে এবং চিরকালই হইয়াছে। একমাত্র প্রয়োজন হইতেছে নিম্নতর প্রাণিক প্রেরণা যেন পিছন দিক হইতে আসিতে না পায় অথবা তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়। পুরুষ ও স্ত্রী-প্রভৃতির মধ্যে অনেক সময়ে একটা সুসমঞ্জস মিল দেখা যায়, একটা আকর্ষণ বা অন্তরঙ্গতা—তাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে নিম্নতর প্রাণিক (যৌন) প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—ইহা কখনও কখনও

১ এইরূপ অভিমানব্যঞ্জক গান বাংলায় অনেকই শোনা যায়, যথা—

> বড় আশা করেছিলাম শ্যামা আমার করবি ভাল
> যে ভাল করিলি শ্যামা একে একে দেখা গেল।
>
> অথবা
>
> যে ভাল করেছিস্ শ্যামা, আর ভালোর কাজ নাই।
> এখন ভালয় ভালয় বিদায় দে মা
> আলোয় আলোয় চলে যাই।

২ রবীন্দ্রনাথ একটি গানে এই হৃদাত্মক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,

> যদি রূপ না দিলে বিধি হে,
> পূজারই লাগি হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
> পূজিব তারে আমি কি দিয়ে?

৩ চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলী.—

> জীবনে মরণে জনমে জনমে
> প্রাণনাথ হয়ো তুমি।

প্রধানতঃ মন বা হৃৎপুরুষ (the psychic) বা ঊর্দ্ধতন প্রাণসত্তার উপর নির্ভর করে, কখনও বা ইহাদের মিশ্রণের উপরে নির্ভর করে—এই সবের দ্বারাই পুষ্ট হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব হয় স্বাভাবিক, অন্য জিনিষ আসিয়া ইহাকে নীচের দিকে টানিবে বা ভাঙ্গিয়া দিবে সে-সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

আর এটা মনে করাও ভুল যে কেবল প্রাণসত্তাতেই উষ্ণতা আছে, হৃৎপুরুষ হইতেছে একেবারে উদাস ও শীতল তাহাতে কোন বহ্নি-শিখা নাই। স্বচ্ছ বিমল সদিচ্ছা খুব ভাল বাঞ্ছনীয় জিনিষ। কিন্তু হৃদাত্মক প্রেম বলিলে ঐ সদিচ্ছা বুঝায় না। প্রেম হইতেছে প্রেম, উহা কেবল শুভ ইচ্ছা (good-will) নহে। হৃদাত্মক প্রেমেও প্রাণাত্মক প্রেমের ন্যায় প্রগাঢ় উষ্ণতা ও বহ্নিশিখা থাকিতে পারে, কেবল তাহা হয় বিশুদ্ধ শিখা, তাহা অহং-মাত্মক বাসনাতৃপ্তির উপর নির্ভর করে না, অথবা ইন্ধনকে ক্ষয় করিয়া বর্দ্ধিত হয় না। ইহা হইতেছে শুভ্র শিখা, লাল শিখা নহে, কিন্তু প্রখরতার শুভ্র উষ্ণতা লাল উষ্ণতা অপেক্ষা হীন নহে। ইহা সত্য যে, মানবীয় সম্বন্ধে এবং মানবীয় প্রকৃতিতে হৃদাত্মক প্রেম সাধারণতঃ পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে না। যখন ইহা ভগবানের দিকে উত্তোলিত হয় তখনই ইহা অপেক্ষাকৃত সহজে ইহার নিজস্ব বহ্নি ও আনন্দলাভ করিতে পারে। মানবীয় সম্বন্ধে হৃদাত্মক প্রেম অন্যান্য জিনিষের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, সেই সব জিনিষ ইহাকে নিজেদের কাজে লাগাইতে চায় আবার সেই সঙ্গেই ইহার উচ্ছেদও করিতে চেষ্টা করে। কচিৎ কখনও নিজের প্রগাঢ়তা-সকলের বিকাশ করিবার সুযোগ পায়। অন্যথা ইহা আসে শুধুই একটা সূক্ষ্মরূপে, কিন্তু তাহা হইলেও মূলতঃ প্রাণাত্মক প্রেমের মধ্যে যে-সব উচ্চতর জিনিষের বিকাশ হইতে পারে—সূক্ষ্ম মধুরতা, কোমলতা, বিশ্বস্ততা, আত্মদান, আত্মত্যাগ, আত্মার সহিত আত্মার স্পর্শ, নিম্নতর প্রবৃত্তিসকলের উদ্গতি (sublimation)—এ সব ঐ হৃদাত্মক প্রেমের স্পর্শ হইতেই আইসে। মানবীয় প্রেমের মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক জিনিষগুলিকে যদি ইহা নিয়ন্ত্রিত ও রূপান্তরিত করিতে পারে, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে প্রেম সত্য জিনিষটির কতকটা প্রতিচ্ছায়া বা প্রস্তুতি হইতে পারে, দ্বৈত জীবনে আত্মা ও তাহার সকল অঙ্গের পূর্ণতম মিলনই হইতেছে সেই সত্য প্রেম।[৪] কিন্তু উহার অসম্পূর্ণ প্রকাশও খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের মত হইতেছে এই যে, যোগ-সাধনায় সাধারণতঃ প্রকৃতির মধ্যে সমগ্র প্রেম-শিখাকে ভগবন্মুখী করিতে হইবে। বাকী সব কিছুকেই অপেক্ষা করিতে হইবে যতক্ষণ না সত্য ভিত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়; সাধারণ চৈতন্যের বালি ও কাদার উপরে উচ্চতর জিনিষ গড়িতে যাওয়া নিরাপদ নহে। ইহার অর্থ নহে যে বন্ধুত্ব বা সঙ্গ একেবারেই বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু এ-সবকেই মূল শিখার সম্পূর্ণ অধীনে রাখিতে হইবে। ইতোমধ্যে যদি কেহ ভগবানের সহিত সম্বন্ধকেই তাহার অনন্যলক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে তাহা খুবই স্বাভাবিক হইবে এবং সাধনাকে পূর্ণভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। আমরা যে দিব্যতর চৈতন্যের সন্ধান করিতেছি, হৃদাত্মক প্রেম যখন তাহা হইতে বিস্ফুরিত হয় তখনই তাহা

৪ বৈষ্ণব কবি এই পূর্ণ প্রেমের কিছু আভাস দিয়াছেন,

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

তাহার পূর্ণ স্বরূপটি লাভ করে, যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ সে-প্রেম তাহার অম্লান সত্তা ও রূপ প্রকট করিতে পারে না।

পুনশ্চ মন, প্রাণ দেহ হইতেছে প্রকৃতপক্ষে আত্মা ও অধ্যাত্মসত্তার উপকরণ বা যন্ত্র; যখন তাহারা নিজেদের জন্যই কর্ম্ম করে তখন তাহারা অজ্ঞান ও অসম্পূর্ণ জিনিষসকল সৃষ্টি করে—যদি তাহাদিগকে হৃৎপুরুষ ও আত্মার সজ্ঞান যন্ত্রে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা নিজেদেরই দিব্যতর সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। আমরা এই যোগে রূপান্তর (transformation) বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই হইতেছে ইহার মর্ম্মকথা।

দিব্য প্রেমের স্বরূপ

প্রেম কখনও শীতল হইতে পারে না—কারণ শীতল প্রেম বলিয়া কোন জিনিষ নাই, কিন্তু শ্রীমা যে প্রেমের কথা বলিয়াছেন তাহা হইতেছে অতি শুদ্ধ, সুদৃঢ় ও নিত্য বস্তু; তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে না, ইন্ধন না পাইলে নিবিয়া যায় না, তাহা সূর্য্যের আলোকেরই মত স্থির, সর্ব্বগ্রাহী, স্বপ্রতিষ্ঠ। এমনও দিব্য প্রেম আছে যাহা ব্যক্তিগত, কিন্তু তাহা সাধারণ মানবীয় ব্যক্তিগত প্রেমের মত নহে, তাহা ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিদান পাওয়ার উপর নির্ভর করে না—ইহা ব্যক্তিগত কিন্তু অহমাত্মক (egoistic) নহে; উহা একজনের সত্য সত্তা হইতে আর এক জনের সত্য সত্তার নিকট যায়। কিন্তু সেই প্রেম লাভ করিতে হইলে, সাধারণ মানবীয় ধারা হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

সাধনার নিগূঢ় রহস্য

দিব্য প্রেম মানবীয় প্রেমের মত নহে, উহা হইতেছে গভীর ও বিশাল ও মৌন; মানুষকে শান্ত এবং উদার হইতে হইবে, তবেই সে দিব্য প্রেম কি তাহা জানিতে পারিবে, এবং তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে। আত্মসমর্পণকেই তাহার সমগ্র লক্ষ্য করিতে হইবে যেন সে একটি আধার ও যন্ত্র হইয়া উঠে—তাহা হইলে ভাগবত প্রজ্ঞা ও প্রেমই যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাতে তাহাকে পূর্ণ করিয়া দিবে। আর ইহাও তাহাকে নিশ্চিত ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাহাকে উন্নত করিতে হইবে, সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে এরূপ কোন জিদ বা দাবী করা ঠিক নহে, তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকিতে হইবে, এবং সমস্ত জীবনকে করিতে হইবে কেবল-মাত্র ভগবানের জন্য উপাসনা, কেবলমাত্র ভগবানের দিকে নিজেকে উন্মুক্ত করা। নিজকে দেওয়াই হইতেছে ঠিক যথাযথ সাধনা, দাবী করা বা অর্জ্জন করা নহে। নিজকে যতই দিবে, ততই গ্রহণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সকল অধৈর্য্য ও বিদ্রোহ দূর হওয়া চাই; কিছুই পাইলাম না, সাহায্য মিলিল না, ভালবাসা পাইলাম না, চলিয়া যাওয়া ভাল, মরণ ভাল, সাধনা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল—এই সব ইঙ্গিত ও প্রেরণা বর্জ্জন করিতেই হইবে।*

* Letters of Sri Aurobindo হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

বৌদ্ধধর্মের ভারত-ত্যাগ

স্বামী গম্ভীরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের মতে ইহা বলা ঠিক নহে যে, বৌদ্ধ-ধর্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে; বরং ইহাই অধিকতর সত্য যে, বৌদ্ধ-ধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত এইরূপে মিলিত হইয়া গিয়াছে যে, এখন আর উহার পৃথক অস্তিত্ব নাই। তথাপি অপরাপর সাম্প্রদায়িক নামে পরিচিত বহু ব্যক্তি আজ ভারতে থাকা সত্ত্বেও বৌদ্ধ নামে পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা এতই অল্প যে, সাধারণ ভাবে ধরিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, বৌদ্ধ-ধর্ম ভারত ত্যাগ করিয়াছে।

বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার এবং সঙ্কোচনের পশ্চাতে এক দিকে যেমন ছিল কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব, অপর দিকে তেমনি ছিল উহার নিজস্ব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও অভিনবত্ব। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তারের একটি প্রধান কারণ ছিল রাজ-শক্তির সহায়তা। মহারাজ অশোক ও হর্ষবর্ধন প্রমুখ প্রতাপশালী সম্রাটগণের সাহায্য না পাইলে বৌদ্ধ-ধর্ম তেমন প্রভাবশালী হইত কিনা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু এই কৃত্রিম শক্তিই আবার তাহার অবনতিরও কারণ হইয়াছিল। রাজশক্তি যখন যে দিকে ঝোঁকে তখন সে কিছুদিন অব্যাহত গতিতে এবং নির্বিচারে আপন কার্য সাধন করিতে থাকে। এই অস্বাভাবিক ও অদম্য অন্ধশক্তির প্রেরণায় ধর্মসম্প্রদায় ক্রমে আপনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলের উপর নির্ভর না করিয়া বহিঃশক্তির উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করে এবং উহার ফলে নিজ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকে। পরে যখন কোন কারণে রাষ্ট্রবিপর্যয় হয় এবং নূতন পরিবেশের মধ্যে ধর্মসম্প্রদায় তাহার চিরাভ্যস্ত সহায়তা হইতে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার দাঁড়াইবার স্থান থাকে না; সে পথভ্রষ্ট হইয়া দ্রুত অবনত হইতে থাকে। বৌদ্ধ-ধর্মের ভাগ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

অনেকের ধারণা শঙ্করাচার্য প্রভৃতি হিন্দু-সংস্কারকগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বৌদ্ধ-ধর্ম ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। এইরূপও কথিত হয় যে, শঙ্করাচার্য বহু বৌদ্ধকে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন! এই সকল কিংবদন্তীর মূলে সত্য কতটা আছে জানি না। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্যের পরেও ভারতে অসংখ্য বৌদ্ধ ছিল, এমন কি বহু শতাব্দী পরে রামানুজাচার্যের সময়েও ভারতে বৌদ্ধের অভাব ছিল না। কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সংস্কারকের অভ্যুদয়ের পরেও বৌদ্ধদের সমপর্যায়ের জৈনাদি সম্প্রদায় আজও ভারতে বাঁচিয়া আছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম প্রথমে বড় আঘাত পায় হূনদিগের নিকট এবং সর্বশেষ ও কঠিনতম আঘাত পায় মুসলমানদিগের নিকট। ভারত হইতে বৌদ্ধ-দিগের মুছিয়া যাইবার একটি প্রধান কারণ মুসলমান আক্রমণকালের ধ্বংসলীলা। সেই সর্ববিধ্বংসী বন্যার সম্মুখে যাহাই পড়িয়াছিল তাহাই ভাসিয়া গিয়াছিল—মন্দির, মঠ, আরাম, পুস্তকালয়, বিদ্যাপীঠ কিছুই রক্ষা পায় নাই। বিশ্ববিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সময়েই ভস্মে পরিণত হয়। স্বভাবতঃই মনে হয়

যে, মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি অধিকতর কোমলতা না দেখাইলেও হিন্দুধর্ম বাঁচিল অথচ বৌদ্ধ-ধর্ম মরিল কেন? ইহার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধদের সঙ্ঘারামগুলি এক দিকে যেমন অর্থশালী ছিল অন্য দিকে ছিল তেমনি অতি প্রতিপত্তিশালী; উহারা দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্গের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া চারিদিকে আপন প্রভাব বিস্তার করিত। হিন্দুধর্ম কিন্তু ঠিক ঐভাবে মন্দিরে, মঠে বা সঙ্ঘারামে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে নাই। সুতরাং মঠের ধ্বংসে বৌদ্ধধর্ম বিধ্বস্ত হইলেও হিন্দুধর্ম আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অবসানকালে উহা জনগণকে শাসন করিত মাত্র, কিন্তু জন-মনে বলসঞ্চার করিতে পারিত না এবং জনগণের ভয়ের কারণ হইলেও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত না।

ধর্ম ও নীতির দৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বিদায় লইয়াছিল প্রধানতঃ দুইটি কারণে। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যাহা কিছু ভাল বা অভিনব ছিল হিন্দুধর্ম তাহা আত্মসাৎ করিয়া লওয়ায় বৌদ্ধধর্মের আলাদা ভাবে বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন ছিল না। আবার হিন্দুধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে এতটা পরিবর্তিত ও হিন্দুধর্মের অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছিল যে উভয়ের পার্থক্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধধর্মের অস্থিমজ্জায় এমন কতকগুলি দুর্বলতা ছিল যাহা পরে তাহার সমস্ত অঙ্গে প্রসারিত হইয়া ক্রমে তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।

প্রথমে বৌদ্ধধর্মের দানের কথা ধরা হউক। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব জাতিবিচার সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছিলেন। সমাজক্ষেত্রেও ইহার অনেকটা প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। ধর্মকে সাধারণের নিকট সুলভ করার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত ছাড়িয়া প্রচলিত ভাষাগুলির সাহায্য লইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে ধর্ম সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার না করিয়া সমষ্টি-জীবনকেও একটা বিশেষ রূপ দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ঐ কালে সেবার ভাব খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধের প্রাণ তুচ্ছ ছাগলের জন্যও কাতর হইয়াছিল; সুতরাং বৌদ্ধসংঘের দ্বারা হাসপাতালাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রেও বৌদ্ধদের দান অতুলনীয় ছিল। বস্তুতঃ দর্শনশাস্ত্রে তাঁহাদের দান অমূল্য। বৌদ্ধযুগে শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের অপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। বুদ্ধের অভ্যুদয়কালে বৈদিক ধর্ম পশু-হিংসাযুক্ত যাগযজ্ঞে এবং কতকগুলি প্রাণহীন আচারে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছিল। বুদ্ধদেব উহার সংস্কার করিয়া ধর্মের মধ্যে একটা সজীবতা আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সন্ন্যাসিসংঘকে কেন্দ্র করিয়া অতি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বে সন্ন্যাসী ছিল; কিন্তু সংঘ ছিল কি না সন্দেহ। বুদ্ধদেবই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথমে ধর্মের পরিচালনা সংঘশক্তির হস্তে অর্পণ করেন। তিনি সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড অভিযান-স্বরূপ ছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সংঘে স্থান পাইয়া এবং নিজেদের হস্তে ধর্মপ্রচার ও ধর্মরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমাজে এক অপূর্ব বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে পৌরোহিত্য পর্যুদস্ত হইয়াছিল এবং জনসাধারণ সমাজ ও ধর্মক্ষেত্রে অপূর্ব স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ বুদ্ধ ছিলেন গণজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত।

হিন্দুধর্ম কালক্রমে এই সমস্তই স্বীকার করিয়া লইল। বৈষ্ণবধর্মে অহিংসা আশ্রয়প্রাপ্ত হইল। বৌদ্ধদের দর্শনবাদ ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া পড়িল। সাধারণের ধর্মপিপাসা মিটাইবার জন্য হিন্দুগণ বৌদ্ধদের অনুকরণে গণ-মনের উপযোগী তন্ত্র ও পুরাণ রচনা করিলেন। ত্যাগিসম্প্রদায়ে জাতিভেদ সম্পূর্ণ উঠিয়া গেল কিংবা অনেকাংশে শিথিল হইয়া পড়িল। বৌদ্ধদের পথ অনুসরণ করিয়া ভারতের গ্রাম ও নগর সমূহ বিশাল মঠ ও মন্দিরাদিতে সুশোভিত হইয়া উঠিল। বৌদ্ধদের আবিষ্কৃত নূতন দেবদেবী হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে বৌদ্ধধর্মের প্রায় সমস্ত অবদান একে একে হিন্দুর নিজস্ব হইয়া গেল। বৌদ্ধ আচারাদি রূপ পরিবর্তন না করিয়া শুধু নাম পরিবর্তন করিয়াই হিন্দুসমাজে উচ্চাসন লাভ করিল। অতএব বৌদ্ধধর্মের পৃথক অস্তিত্বের আর প্রয়োজন কি? আধুনিক কালে আমাদের চক্ষের সম্মুখেই অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম একদিন মহাপ্রতাপে মস্তক তুলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই দেখা গেল যে হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মদের সমস্ত অবদান আত্মসাৎ করিয়া ব্রাহ্মধর্মকে বিদায় দিয়াছে। এই প্রণালীই অতীত কালেও অনুসৃত হইয়াছিল। অতএব ইহা মনে করার কোনও কারণ নাই যে, শঙ্করাচার্যাদি নিষ্ঠুর হিন্দুদের পীড়নে বৌদ্ধধর্ম ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল!

অবশ্য এই আদান-প্রদান একপক্ষপাতী ছিল না। হিন্দুসংস্কার লইয়া যে সকল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বৌদ্ধসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহারকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করিয়া উহা কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের নামে চালাইতে লাগিলেন। এই রূপে ভিতরের লুক্কায়িত প্রেরণায় বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুধর্মের অনুরূপ হইতে বাধ্য হইয়া পড়িল। ফলতঃ এই দিক হইতে বৌদ্ধরাই বৌদ্ধধর্মের শত্রুতা করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রধান শত্রু ছিল বৌদ্ধধর্ম নিজে। বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের উদ্দেশ্য মূলতঃ এক হইলেও এবং উভয়েই উপনিষদ্ হইতেই আপনার মূল তত্ত্বগুলি গ্রহণ করিলেও উভয়ের কার্যধারা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। হিন্দুধর্মের নিজস্ব রীতি অবলম্বনে বেদান্ত কখনও পূর্বের জাতীয় ধারাকে অস্বীকার করে নাই; সে চাহিয়াছিল অতীতের ভিত্তিতে নবীনকে গড়িয়া তুলিতে। বৌদ্ধধর্মের ভিতর কিন্তু প্রাচীনকে অস্বীকার করার ভাব খুব প্রবল ছিল যাহার ফলে বৌদ্ধগণ বেদকে এবং বৈদিক মার্গকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বুদ্ধ উপনিষদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন; কিন্তু বৌদ্ধগণ উপনিষদ্‌কে স্বীকার করেন নাই। বুদ্ধ প্রাচীন ধর্মের সংস্কার করিতে যাইয়া এতটা নেতিমার্গের অনুসরণ করিয়াছিলেন যে, প্রাচীনের সংগে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার দার্শনিক মতও নেতিমূলক ছিল। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার ইতিমূলক কোনও নির্দেশ ছিল না। বরং কালক্রমে বৌদ্ধগণ আত্মা ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেই শিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুক্তিও একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা। এতটা নেতির মধ্য দিয়াও কিন্তু বৌদ্ধদের নীতিবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ ছিল বুদ্ধের অপূর্ব অনুকম্পা। জীবের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। সুতরাং তাঁহার অনুচরবর্গও বিশেষ নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বিবিধ সেবাকার্যে তাঁহারা তাঁহাদের অনুকম্পার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতিতে শূন্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই। প্রকৃতি সমস্ত শূন্যকে অচিরে পূর্ণ করিয়া তোলে। সুতরাং ঈশ্বরাদির শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া তুলিলেন বুদ্ধ এবং বহু দেবদেবী। আর যে বুদ্ধ কার্যে পরিণত নীতি ও অনুষ্ঠানহীন আধ্যাত্মিক সাধনাকেই মাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহার ধর্ম পূর্ণ হইয়া উঠিল দেবদেবীর মন্দির ও তান্ত্রিক আচারে!

বৌদ্ধধর্ম নির্বিচারে সকলকে কোল দিতে গিয়া আর এক বিপদে পড়িল। দ্রুত প্রসার ও অপেক্ষাকৃত অসভ্যতর জাতিগণের মধ্যে বিস্তারের ফলে ধর্মের গভীরতা কমিয়া যাইতে লাগিল এবং সংগে সংগে বর্বরতা পর্যন্ত ধর্মের নামে সভ্য সমাজে বিচরণ করিতে অগ্রসর হইল। অনার্যদিগকে আর্য সমাজে আনার ফলে তাহাদের ভূত, বেতাল, পুতুল পর্যন্ত আর্যের দেবমন্দিরে প্রবেশ করিল। যজ্ঞ ও যজ্ঞশালা গেল, পশুবলি ও সোমপান রহিত হইল, কিন্তু ভূতের নৃত্য ও মধুপানে দেশ মত্ত হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম এক দিকে যেমন অত্যন্ত দার্শনিক ও জনসাধারণের নিকট অবোধ্য হইয়া পড়িল, অন্য দিকে তেমনি এই অবোধ্য হওয়ার ফলেই একটা নীচ সহজবোধ্য রূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইল। তাহা হইতে সৃষ্ট হইল জঘন্য বামাচার, সহজিয়া প্রভৃতি ধর্ম।

উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে জনপ্রিয় করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম আরও বহু অনিষ্ট সাধন করিল। সন্ন্যাসকে সকলের পক্ষে সুলভ করিতে গিয়া এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের অবাধ মিলনের সুযোগ দিয়া বৌদ্ধধর্ম মহা অনাচারের সৃষ্টি করিল। আবার সন্ন্যাসীর ধর্ম অহিংসাকে উচ্চ স্থান দিতে গিয়া অনধিকারী অসন্ন্যাসীদিগকে দুর্বল, কাপুরুষ ও ভণ্ড করিয়া তুলিল। ধর্মাশোকের শাসনে দেশ নীতিপরায়ণ হইল বটে; কিন্তু সংগে সংগে পরাধীনতার বীজও প্রোথিত হইল। হিন্দুর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের স্থলে একমাত্র মোক্ষধর্ম প্রচারের ফলে দেশে দারিদ্র্যের করাল ছায়া চিরতরে বিস্তার লাভ করিল। সংস্কৃতের স্বীয় উচ্চ পদবী হইতে নামাইয়া দিয়া বুদ্ধদেব গণজাগরণের পথ উন্মুক্ত করিলেন বটে; কিন্তু সংগে সংগে সংস্কৃতির ও প্রাচীনের সহিত যোগাযোগের মূলোচ্ছেদ হইল। ধর্মের প্রসার হইল, কিন্তু আর্যধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হইল।

এই সকল আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু তাঁহার চিরাভ্যস্ত পরধর্মসহিষ্ণুতাকে বিসর্জন দিয়া বৌদ্ধধর্মকে দেশচ্যুত করিয়াছিল বলিয়া যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। প্রত্যুত ইহাই অধিকতর সত্য যে বৌদ্ধগণ নিজেরাই আপন ধর্মের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। সত্য বটে যে, বুদ্ধদেবকে কোন কোন পুরাণে জনগণকে ভ্রান্ত করার জন্য দায়ী করা হইয়াছে; কিন্তু উহা হইতে মধ্যযুগীয় ইউরোপ বা বর্তমান কালীন ভারতের ন্যায় কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং অন্যরূপ প্রমাণই প্রবলতর। রাজা শশাঙ্ক অকস্মাৎ ভারত-গগনে উদিত হইয়া অকস্মাৎই বিলীন হইয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইহা নিয়মের একটি ব্যতিক্রম মাত্র। নিয়ম বরং ইহাই ছিল যে, হিন্দু রাজারা বৌদ্ধদিগকে অকাতরে সাহায্য করিতেন। হিন্দুগণও বুদ্ধদেবকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রদর্শিত ধর্মমত অনেকাংশে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

আধুনিক কালে বর্ণবিদ্বেষ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে অনেকের মন বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দও বুদ্ধদেবকে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার শ্রদ্ধার ভিত্তি ছিল অন্যত্র। তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বুদ্ধের চারিত্রিক মহত্ত্ব, হৃদয়বত্তা ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা। সমাজক্ষেত্রেও বুদ্ধের বহু দান তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্মের দেশত্যাগের পশ্চাতে কার্য-কারণের যে পরম্পরা রহিয়াছে তাহা বৌদ্ধগণেরই সৃষ্ট এবং উহাদের দেশত্যাগ প্রকৃতির সুবিচারের একটি নিদর্শন মাত্র। সুতরাং বৌদ্ধধর্মকে ফিরাইয়া আনার বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করিয়া আমাদের উচিত বুদ্ধের অনুসরণ করা। আমরা বুদ্ধকেই চাই, বৌদ্ধকে নহে।

উদ্বোধন

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী

ত্রিসিন্ধু-সঙ্গম-পীঠে ভারতের শেষ শিলা-তল
ধ্যানমৌন সন্ন্যাসীর তপঃশান্ত চিত্ত-পটে আসি'
গ্লানিগ্রস্ত তবালেখ্য হে ভারত, উঠিল উদ্ভাসি',
সমগ্র হৃদয় হ'ল বেদনায় বিক্ষুব্ধ বিচল।
ঋষিবুকে দীর্ঘশ্বাস : আর্দ্রকণ্ঠে অস্ফুট উচ্চার :
"যে মোর শৈশব-শয্যা, যৌবনের স্বপ্ন-উপবন,
বার্ধক্যের বারাণসী, মাটি যা'র স্বর্গ নিকেতন,
গরীয়সী জন্মভূমি—এই কী রে ভারত আমার !"
ক্ষমা-স্নিগ্ধ বশিষ্ঠের বরভূমি এ মহাভারত .....
উদ্ভাসিত মানবতা, মহত্ত্বের হিরণ্য প্রভায়,
আত্মা যা'র মহিমন্বী আধ্যাত্মিক ঋদ্ধি-গরিমায়,
ধ্যানস্তব্ধ চিত্তে যা'র পরমার্থ-সুষমা-সম্পৎ ;
ধনৈশ্বর্য, দম্ভ যা'র সত্য রূপ নহে কদাচিৎ,
অনশ্বর প্রাণধর্ম প্রেম, শান্তি, করুণা, কল্যাণ,
বিশ্বের বোধন আনে যা'র ভাব, প্রতিভা, প্রজ্ঞান,
মেদিনীর মোক্ষভূমি, সভ্যতার প্রাক্‌সিদ্ধ পীঠ ;
বিপুলা পৃথ্বীর সেই আদর্শের জীবন্ত প্রতীক
হেমশ্রী ভারতবর্ষ সর্বস্বান্ত গৌরব-বিহীনা,
নিরন্তর দাসত্বের দুর্বিষহ ঘৃণ্য গ্লানিলীনা,
স্ফীতোদর দৈন্যভারে বিষায়িত তা'র সর্বদিক।
দুঃশাসনী দুরাশায় শোষে তা'র দানব রুধির :
বেপথু বিহ্বলতায় পাশ্চাত্যের ইন্দ্রজাল-তলে,
হিরণ্যাক্ষ-সভ্যতার উচ্ছৃঙ্খল উগ্র কোলাহলে,
ছিন্নমস্ত স্বাতন্ত্র্যের অবসাদে নিরুত্তেজ স্থির।
অনুদিন মুহ্যমান ক্লীবতার মৌন হতাশায়,
উচ্ছৃধর্মী সঞ্চয়ের সুবিপুল অন্ধ অপচয়ে,
বীর্যের দারিদ্র্যে উপেক্ষিত, ক্লান্ত জীবনের জয়ে,
পরকীয় তত্ত্বানুগ সুবিকৃত ধিকৃত নিষ্ঠায়।

দিকে দিকে আত্মদ্রোহ, লজ্জাহীন স্বৈর ব্যভিচার,
আত্মার অবমাননা, জড়বাদী নারকী প্লাবন,
অভ্যুত্থিত ধর্ম-সাঙ্কর্যের দৃঢ় দৃপ্ত আস্ফালন,
দিগন্ত-বিতত শুধু নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার।
ভারতের ভাগ্যাকাশে মধ্যযাম ঘোরা অমানিশা :
মরণের বিচরণ—কালো ছায়া জীবনে-জীবনে,
পণ্য ভারতের প্রাণ বণিকের প্রতি প্রয়োজনে
বিলাসের ক্রীড়নক বিদূরিতে ক্ষণিকের তৃষা।
প্রতীকার-পরিশূন্য, ঊর্ধ্ব শীর্ষ, ঔদার্য-বিহীন
প্রভুত্ব-ঔদ্ধত্য-দম্ভে বাণী তার কাঁদিছে বিরলে ;
সুন্দর ভুবন তা'র কীর্তিনাশা কৃতঘ্নতা-তলে
বিজৃম্ভিছে বিকলাঙ্গে ত্রস্ত-ত্রস্ত আঁখি-সম্মুখীন।
সর্বাপেক্ষা সঙ্কটের ত্রিযামা নিশায়
তোমার প্রথম ছোঁয়া বুভুক্ষিতা বন্দিনী ভারত
লাগিল তাপস-দেহে। উদ্বেলিল বিপুল বৃহৎ
দুর্মর রক্তের ঢেউ মরমীর মর্মমোহানায়।
উপেক্ষার লাভা-স্রাবে, বঞ্চনার বালু-বেলা-পার,
লজ্জা-গ্লানি-শোচনার বন্ধ্যারাতে তা'র স্বপ্নে, তব
প্রথম লভিল সে যে প্রশ্বাসের পূর্ণ অনুভব,
চিত্তে তা'র এঁকে গেল ঐতিহ্যিক প্রতিষ্ঠা তোমার।
বিভূতির বহ্নি জ্বালি অন্তিমের প্লবমান ক্ষণে
হে ভারত, উদ্ভেদিয়া অনির্বাণ আঁধারের স্তূপে
বেদনার কেন্দ্রে তব দাঁড়াইয়া ধূর্জটির রূপে
অভ্যগ্র ভার্গব উচ্চে উদ্‌ঘোষিল আগ্নেয় ঘোষণে......
"মানবতা নিপীড়িত, মহত্ত্ব সে ম্লান, মসীময়,
তোমার এ অসাড়তা হে ভারত, এ রূঢ় জীবন
সত্য নয়, আপদ্ধর্মে অক্ষমের আত্ম-সমর্পণ,
বিভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত—তব দৈন্য স্বেচ্ছাকৃত নয়।

জ্বেলেছে শ্মশান-চিতা যে তোমার স্নুকুমার চিতে,
ভেঙেছে মৌলিক স্বপ্ন, জীবনের থামা'য়েছে বাঁশী,
বিষা'য়েছে বায়ু যেই, নিভা'য়েছে ছন্দ, আলো, হাসি,
তা'রে তুমি পারোনিকো, পারনাকো কখনো ক্ষমিতে।"
সৌর জগতের সর্ব অধ্যাত্মের প্রমূর্ত প্রকাশ,
শ্রেষ্ঠ সমন্বয়ী সর্ব সাধনার বিগ্রহ প্রধানে,
মহাগুরু রামকৃষ্ণ-জীবনের জ্যোতিস্তম্ভ-পানে
তপোজ্জ্বল তাপসের ঘনঘন অঙ্গুলি-আশ্বাস······
"উঠ, জাগ, উপবাসী পটভূমে ভারত আমার!
আদর্শ বীর্যেরে সাধো ঐকান্তিক সাধনায় আনি'
ভূমানন্দে যা'ক্ ভরি' জীবনের রিক্ত পাত্রখানি,
বক্ষে-বক্ষে বেজে যা'ক্ গায়ত্রীর মন্ত্রের ঝঙ্কার।
বাঙ্ময়ী মঙ্গলোচ্চারে আত্মা তব উর্দ্ধক্ নাচিয়া
লক্ষ ফণা আন্দোলিয়া লক্ষ শীর্ষ বাসুকির প্রায়,
তির্যক শ্বাসের তা'র অব্যর্থ-সে হিন্দোলের ঘায়
প্রগল্‌ভা স্বৈরতার শিলা-সৌধ পড়ুক্ ভাঙিয়া।
ব্যাপ্ত হো'ক্ সিদ্ধি তব উল্লঙ্ঘিয়া বদ্ধ সীমারেখা,
অপ্রমেয় প্রাণধর্ম পুনরায় জাগিয়া শাশ্বতে
মানবতা-উদ্বোধন, সার্বভৌম কল্যাণের পথে
চালিত করুক বিশ্বে নিয়া সুষ্ঠু সারথ্যেরে একা।
আত্মা তব অনাহত, অনপেক্ষ অনন্ত, অমর:
তোমার অতীত যত গৌরবিত, মহিমামণ্ডিত,
ভবিষ্যেরে তুমি তব তা'র চেয়ে গৌরবঅন্বিত,
তা'রো চেয়ে মহীয়ান্, জ্যোতিষ্মান্ কর ঋতম্ভর।
কভু বা পতিত তুমি হে মাতৃকা, নহ অবনত,
হেরিতেছি সত্য তুমি মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর প্রায়
মন্থর অথচ মঞ্জু পদপাতে নিজ মহিমায়
চলেছ সম্মুখ-পানে উদ্‌যাপিতে মহত্তর ব্রত।"
উদাত্ত বীর্যের সুরা মহাতপা ভার্গব-ভৃঙ্গারে:
হিমান্বিত বক্ষ তব স্পর্শিল সে স্নেহে মাতৃবৎ,
বলিষ্ঠ ভারতরূপে জন্ম নিলে নিঃসাড় ভারত!
জীবনের জন্ম হ'ল, জন্ম হ'ল মায়ের এবারে।
শতাব্দীর মূর্চ্ছাহতা হে ভারত, তোমার শ্রবণে
আঘাতিল বিজয়ীর জীবনীয় মন্ত্র-প্রতিধ্বনি,
উঠি এল হরিতালিকার শুভ্র জ্যোতির সরণি
বিস্মৃত সমাধি হ'তে নিরঙ্কুশ আঁধার গগনে।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে হ'ল সিদ্ধ প্রেরণার বিদ্যুৎ স্ফুরণ,
অরণ্য লাবণ্য হ'ল বিখচিত মরু-কুট্টিমেতে,
আচার্যের শক্তি-সুরা নিলে তুমি করাঞ্জলি পেতে,
চৈতন্যের প্রেমানন্দে চিত্তদলে লাগিল বোধন।
সূর্য-সাযুজ্যের স্বপ্ন সন্ন্যাসীর যুগ্ম আঁখিময়:
নির্জিত সে মানবতা, পৌরুষেরে প্রকটি' প্রথম
অনন্ত প্রেমের দীক্ষা দিল বীর সাধক-সত্তম,
আত্মার অস্তিত্বে তব পদ্মরাগ-শুচিতা-উদয়।
মাধুর্যে মুখর হ'ল অব্যক্ত সে আশার দীপক
অশ্রুলিপ্ত অনুজ্জ্বল তোমার সে অন্তর-আকাশে,
স্বরূপের স্বর্ণরূপ রূপায়িত হ'ল যে সহাসে,
বিচ্ছুরিল দিক্‌বালে প্রাচুর্যের আলোর ঝলক।
জ্বলিল সে জয়শ্রীর জ্যোতির্ময় শুদ্ধ হোমানল,
জ্বলিল সে জাতি-বুকে সাম্রাজ্যের ভাস্বর বর্তিকা,
জাগিল সে স্নিগ্ধতার হাস্যোচ্ছল আনন্দের শিখা,
অনাগত সাফল্যের সমীরিত ধূপ-পরিমল।
উদয়-দিগন্ত-তলে সন্ন্যাসীর উদার বিজয়:
বসুতন্ত্রী বসুন্ধরা মুগ্ধ মূক বিস্ময়-বিভল;
ভারতের "উদ্বোধন" অব্যাহত রাখিতে উছল
ভবিষ্য-ভাণ্ডারতরে সন্ন্যাসীর বীর্যের সঞ্চয়।
ঋষির সে বীর্যে তুমি হে ভারত, গড়িবে তোমারি'
আগামীর অভিপ্রেত গরিমার নব ইতিহাস,
বলিষ্ঠ বাহুতে ল'য়ে অনিবার্য সিদ্ধির আভাস
নিশ্চিত দেখা'বে বিশ্বে তোমার যে স্বরূপ উঘারি!
রাজসি-তিমির-ব্যূহ ভেদি' পৃথ্বী সত্ত্বের উন্মেষে
সম্মানের শ্রেষ্ঠোষ্ণীষ পরাইবে তোমার ললাটে;
তোমার অনন্তোচ্ছল যৌবনের বর ব্যঞ্জনাতে
জরামুক্ত যৌবনের দিবে-দিবে অভিষেক হেসে।
করিবে ফিরোজা সূর্যে প্রাচী তব মঙ্গল-আরতি,
প্রণতির অর্ঘ্য দিবে সপ্তসিন্ধু সুচির যাবৎ,
তোমারে অঞ্জলি দিবে হিমাচল-নীলাদ্রি-সংহতি,
বন্দিবে নিখিল পৃথ্বী গাহি' নিত্য······ জয়তু ভারত!

ভ্রম

অধ্যাপক শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী, এম-এ, পি-আর-এস, বেদান্ততীর্থ

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"
(৺শ্রীশ্রীসপ্তশতী মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৫ম অঃ)

ইংরাজী প্রবচন—'ভ্রম মানবের স্বভাবসিদ্ধ'। চণ্ডী বলিলেন—'কেবল মানবের কেন, সর্ব্বভূতের পক্ষেই ভ্রান্তি স্বাভাবিক—স্বয়ং মহাদেবী চিন্ময়ী মহামায়া ভ্রান্তিরূপে সর্ব্বভূতে সংস্থিত।'

ভ্রমের ছড়াছড়ি চতুর্দ্দিকে। রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রায়ই হয়। শ্রীবিল্বমঙ্গলের আবার সর্পেও রজ্জু-ভ্রম হইয়াছিল। শুক্তিতে রজতভ্রম, মরু-মরীচিকাতে জলাশয়-ভ্রম—এ সকলই ভ্রমের স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত। কিন্তু ভ্রম যে হয়, ভ্রান্ত পদার্থের প্রতীতি যে হয়—তাহার বিশ্লেষণ করিয়া দেখার প্রয়োজন ত আছে—ভ্রমের মূলে কি তত্ত্ব বর্ত্তমান। ভারতের আস্তিক-নাস্তিক-দর্শন-সম্প্রদায়গুলি এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহারই একটু বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

(১) একশ্রেণীর মীমাংসক ভ্রমের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া 'সৎখ্যাতিবাদ' প্রচার করিয়াছেন। এই মতে ভ্রমস্থলে অধিষ্ঠান, আরোপ্য ও অধিষ্ঠান-আরোপ্য-সম্বন্ধ—এই তিনই যথার্থ সত্য—কোনটিই মিথ্যা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রসিদ্ধ শুক্তি-রূপ্য-ভ্রমই ধরা যাউক। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে—শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এই মতে এক্ষেত্রে শুক্তি, রজত ও শুক্তি-রজতের সংসর্গ—এই তিনই সত্য। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রত্যেক পদার্থই অপর প্রত্যেক পদার্থে বর্ত্তমান—অবশ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আণবিক-মাত্রায়। অতএব রজতের অণুমাত্রা শুক্তিকাতে বর্ত্তমান থাকায় শুক্তিকা রজত বলিয়া কখন কখন প্রতিভাত হইবার যোগ্যতা রাখে। তবে শুক্তিকাতে রজতের পরিমাণ এতই অল্প যে, উহার ব্যাবহারিক উপযোগ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই।

(২) অপর একশ্রেণীর মীমাংসক 'অখ্যাতি-বাদে'র প্রচারক। এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে—শুক্তিকাকে যখন 'ইহা রজত' বলিয়া ভ্রম হয়, তখন ঐ ভ্রমের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে—'ইহা রজত' এই প্রতীতিটি একটি অখণ্ড প্রতীতি নহে। 'ইহা রজত'—এই প্রতীতি দুইটি পৃথক্ প্রকার প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র—(ক) 'ইহা'—এইরূপে শুক্তিকার (অর্থাৎ অধিষ্ঠানের) অনু-ভবাত্মক জ্ঞান, ও (খ) 'রজত'—এই প্রকারে রজতের স্মৃতিরূপ জ্ঞান। (ক) ও (খ) প্রত্যয়দ্বয় কেবল দুইটি পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান নহে - উহারা পৃথগ্বিধ প্রত্যয়—উভয়ে একশ্রেণীর প্রত্যয়ও নহে—(ক) অনুভবাত্মক জ্ঞান ও (খ) স্মৃতিরূপ জ্ঞান। ভ্রমস্থলে এই দুই শ্রেণীর জ্ঞান শুক্তিকার 'ইহা'-রূপে অনুভব, আর রজতের 'রজত'-রূপে—স্মৃতি—পৃথগাকারে প্রতীত হয় না। উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা তৎকালে অনুভূত হয় না। ফলে শুক্তিকাকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সৎখ্যাতি ও অখ্যাতি—উভয় মতেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই। পাঞ্চরাত্রাগমানুসারী রামানুজ-সিদ্ধান্তে এই উভয়বিধ খ্যাতিবাদই স্বীকৃত হইয়াছে।

(৩) বৌদ্ধগণের একটি সম্প্রদায় 'অসৎ-

খ্যাতি'-বাদের সমর্থক। এই মতে আরোপ্য একান্তভাবেই অসৎ। শুক্তিরূপ্য-ভ্রমে প্রতীয়মান রজত সর্ব্বতোভাবে অসৎ বা অসত্য। মাধ্ব-সম্প্রদায় এই অসৎখ্যাতিবাদের অনুগামী।

(৪) সাঙ্খ্য-যোগ-সম্প্রদায়দ্বয় মনে করেন যে—'নিয়ত-সদসৎখ্যাতিবাদ'ই 'ইহা রজত' ইত্যাকার ভ্রমের বিশ্লেষণে পর্য্যাপ্ত। এই সিদ্ধান্তে অধিষ্ঠান আরোপ্যাকারে অসৎ, কিন্তু স্বাকারে সৎ। শুক্তিকা রজতরূপে অসৎ—কিন্তু নিজাকারে অর্থাৎ শুক্তিরূপে সৎ।

(৫) সৌগতগণের আর এক সম্প্রদায় (যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী) 'আত্মখ্যাতি'-বাদের প্রচার করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানবাদে বাহ্য বস্তুর কোনই সত্তা নাই—আন্তর বিজ্ঞানই বাহ্য বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হয় মাত্র। এ মতে বিজ্ঞান বস্তুতঃ এক হইলেও দ্বিধা প্রতীত হয়। (১) গ্রাহকাকার বিজ্ঞান - যাহা 'আমি আমি' এইরূপে প্রতীত হয়—ইহার নাম 'আলয়-বিজ্ঞান'; (২) গ্রাহ্যাকার বিজ্ঞান—যাহা 'এই এই' রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে—ইহার নাম 'প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান'। মোটের উপর বাহ্য বস্তু বলিয়া কিছুই নাই—সবই বিজ্ঞানের রূপমাত্র—"যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্বহির্বদবভাসতে"। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে—শুক্তিকা বলিয়া কোন বাহ্য বস্তু নাই, রজত বলিয়াও কোন বাহ্য বস্তু নাই - শুক্তিকাতে প্রতিভাসমান রজতেরও বাহ্য সত্তা নাই। শুক্তিকাতে প্রতীয়মান রজত আত্মভূত আন্তর বিজ্ঞানেরই বহির্নিক্ষিপ্ত রূপান্তর মাত্র।

(৬) পক্ষান্তরে, নৈয়ায়িকগণ তর্ক করেন যে, একমাত্র 'অন্যথাখ্যাতি'-বাদই ভ্রমব্যাখ্যার পক্ষে অনুকূল। অন্যথাখ্যাতিবাদে—পূর্ব্বে (কালান্তরে) অন্যত্র (দেশান্তরে) দৃষ্ট রজত 'জ্ঞান-লক্ষণা-প্রত্যাসত্তি' নামক এক প্রকার অলৌকিক সংসর্গের বলে শুক্তিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই 'জ্ঞানলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি'-রূপ অলৌকিক সংসর্গের বলে বহুদূরে দৃশ্যমান চন্দনকাষ্ঠকে (যতদূর হইতে তাহার গন্ধ বায়ুতে ভাসিয়া আসা সম্ভবপর নহে ততদূরে দৃশ্যমান চন্দনকাষ্ঠকে) 'সুরভি চন্দন' বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহা স্মৃতি নহে—পরন্তু প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান—ইহাই নৈয়ায়িকসিদ্ধান্ত।

(৭) জৈনগণ অনিয়তখ্যাতি'বাদের প্রবর্ত্তক। সাংখ্যযোগ-মতে নিয়তসদসৎখ্যাতি—ইহা পূর্ব্বেই চতুর্থ প্রকরণে বলা হইয়াছে। অনিয়তখ্যাতি ইহারই রূপান্তর। জৈনগণের মতে নিয়তসদসৎ-খ্যাতি-দ্বারা ভ্রমের সকল দৃষ্টান্তের পর্য্যাপ্ত বিশ্লেষণ হয় না। জৈনগণ সর্ব্বত্রই অনিয়তবাদানুসারী। ঘট যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ঘটই—একথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। সপ্তভঙ্গীনয়ানুযায়ী ঘট কখন কখন কোথাও কোথাও ঘট—আবার কখন কখন কোথাও কোথাও ঘট নহে—ইত্যাকার সপ্তপ্রকার বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অবতারণা তাঁহারা করিয়া থাকেন। মোটের উপর তাঁহা-দিগের সিদ্ধান্তে কোন বস্তুরই নিয়ত একরূপতা থাকার সম্ভাবনা নাই—এ কারণে যে কোন একটি খ্যাতিবাদের দ্বারা ভ্রমের যাবতীয় ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা অসম্ভব। জৈনগণ অংশতঃ প্রত্যেক খ্যাতিবাদই স্বীকার করিয়াছেন, অথচ পূর্ণভাবে কোন একটি খ্যাতিবাদ গ্রহণ করেন নাই; কারণ, তাঁহাদিগের মতে কোন খ্যাতি-বাদই নির্ব্বিশেষে সকল ভ্রমের বিশ্লেষণে সমর্থ নহে।

(৮) অবশেষে মনে পড়ে—অদ্বৈতবাদিগণের 'অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতি'-বাদের কথা। এই মতে—শুক্তি-রজত অনির্ব্বচনীয় - শুক্তিতে প্রতীয়মান রজতের স্বরূপ-নির্ব্বচন অসম্ভব। যতক্ষণ ইহা প্রতীত হয়, ততক্ষণ ইহার সত্তা স্বীকার্য্য; কিন্তু আরোপ্য রজতের অধিষ্ঠান শুক্তিকা একবার

নির্দ্ধারিত হইলে আর আরোপ্যের কোন সত্তাই থাকে না—উহা নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। এই অনির্ব্বচনীয়তা ও মিথ্যাত্ব—একই—ইহাই অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—"মিথ্যাশব্দোঽনির্বচনীয়বচনঃ"। মিথ্যা ও অসৎ এক নহে। যাহা দৃশ্যমান তাহাই মিথ্যা, কিন্তু তাহা অসৎ নহে। পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা—অসৎ নহে।

শ্রীভগবান্ বাদরায়ণ অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে এই সকল সম্প্রদায় ও তাঁহাদিগের দ্বারা পরিগৃহীত খ্যাতিবাদগুলির মধ্যে কোন্‌টি তাঁহার অভিমত নহে, তাহার সূচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনই বেদান্তের তর্ক-প্রস্থান। যুক্তির সাহায্যে বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের সিদ্ধান্ত ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের তর্ক-পাদে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে) পরপক্ষ-নিরাকরণের অবতারণা বিশেষরূপে করা হইয়াছে। সংক্ষেপে ঐ পাদের কতিপয় সূত্রের আলোচনা করিলেই বাদরায়ণের স্বীয় মত পরিস্ফুট হইবে।

(১) তর্কপাদের প্রথম অধিকরণে (১-১০ সূত্রে) দৃষ্ট হয় সাঙ্খ্য-যোগ-মতের খণ্ডন। দশম সূত্রটি—"বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্" (২।২।১০) 'অসমঞ্জস'-পদ-প্রয়োগ-দ্বারা ভগবান্ বাদরায়ণের এই অভিমত সূচিত হইয়াছে যে, সাঙ্খ্য-যোগ-সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে বাদরায়ণের সমর্থন লাভ করে নাই। অতএব, তত্তৎ-সম্প্রদায়-কর্তৃক গৃহীত সদসৎ-খ্যাতির সমর্থকও বাদরায়ণ নহেন।

(২) পরবর্ত্তী দুইটি অধিকরণে (২।২।১১ ও ২।২।১২-১৭) ন্যায়-বৈশেষিক-সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে। সপ্তদশ সূত্রটির রূপ—'অপরিগ্রহা-চ্চাত্যন্তমনপেক্ষা" (২।২।১৭)। ইহাতে বোধ হয় না কি যে—ন্যায়-বৈশেষিক মত সর্ব্বাংশেই বাদরায়ণের অনভিমত? ইহার ফলে অন্যথা-খ্যাতিবাদও যে বাদরায়ণের অপরিগৃহীত—ইহাই সূচিত হইতেছে।

(৩) পরবর্ত্তী দুইটি অধিকরণ (২।২।১৮-২৬ ও ২।২।২৮-৩২) বাহ্যার্থবাদী ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-সমূহের মতবাদ নিঃশেষে খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বাত্রিংশ সূত্রের রূপ "সর্ব্বথানুপ-পত্তেশ্চ" (২।২।৩২)। বৌদ্ধমত সর্ব্বথা ত্যাজ্য—ইহাই বাদরায়ণের অভিপ্রায়—এই সূত্রে অভিব্যক্ত। একারণে—অসৎখ্যাতি ও আত্ম-খ্যাতি যে বাদরায়ণের সমর্থন লাভ করে নাই, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

(৪) পরবর্ত্তী অধিকরণে (২।২।৩৩-৩৬) জৈনমত খণ্ডিত হইয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশ সূত্রটির আকার (২।২।৩৩)—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ"। 'অসম্ভব'-পদপ্রয়োগহেতু ইহাই সূচিত হইয়াছে যে জৈনমত বাদরায়ণের নিকট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। এতএব, অনিয়তখ্যাতি-বাদও বাদরায়ণমতের প্রতিকূল।

(৫) সপ্তম অধিকরণ (২।২।৩৭-৪১) পাশু-পত-মতের খণ্ডন। সপ্তত্রিংশ সূত্রটির রূপ—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (২।২।৩৭)। 'অসামঞ্জস্য' পদ-প্রয়োগ দ্বারা সূচিত হইয়াছে পাশুপতমত সর্বাংশে বাদরায়ণ-মতের বিরোধী নহে বাদরায়ণ-সিদ্ধান্তের সহিত অংশতঃ সামঞ্জস্যহীন-মাত্র। এই মত সাঙ্খ্য-যোগ-মতের সহিত বহু অংশে সাদৃশ্যযুক্ত। অতএব সাঙ্খ্য-যোগমতের অনুকূল নিয়তসদসৎখ্যাতি এই মতেরও অনুকূল—আর উহা বাদরায়ণ-সিদ্ধান্তে বর্জ্জিত।

(৬) অন্তিম অধিকরণে (২।২।৪২-৪৫) পাঞ্চরাত্র-মত অংশতঃ খণ্ডিত হইয়াছে। পঞ্চ-চত্বারিংশ সূত্রের আকার—"বিপ্রতিষেধাচ্চ" (২।২।৪৫)—উহার সহিত দশমসূত্রের তুলনা সম্ভবপর—"বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্" (২।২।১০)। সাঙ্খ্য-যোগ-মত যেমন অংশতঃ বাদরায়ণ-মত বিরোধী, পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তও সেইরূপ অংশতঃ বাদরায়ণ সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। পাঞ্চরাত্র-মতে সমর্থিত সংখ্যাতি ও অখ্যাতি-বাদ বাদরায়ণ-মতে অগৃহীত।

অতএব, পারিশেষ্য-ন্যায়ে একমাত্র অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিবাদই বাদরায়ণ-মতের অনুকূল ইহা বলা চলে।

তর্কপাদের আটটি অধিকরণে—(১) সাংখ্য ও যোগ (২) ও ন্যায়-বৈশেষিক, (৪) ও (৫) বাহ্যার্থ-বাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়-দ্বয়, (৬) জৈন, (৭) পাশুপত ও (৮) পাঞ্চরাত্র মত খণ্ডিত হইয়াছে। উহা-দিগের মধ্যে সাংখ্য-যোগ-পাশুপত-পাঞ্চরাত্র মত অংশতঃ খণ্ডিত ও আংশিক সমর্থিত হইয়াছে কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক-সৌগত-আর্হত মত সর্ব্বাংশেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই কারণে বুঝা যায় যে—সাংখ্য-যোগ-পাশুপত-পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়-চতুষ্টয় প্রাচীনতর। ঔপনিষদ বা শ্রৌত বা বেদান্ত মতের সহিত আংশিক অসামঞ্জস্য-সত্ত্বেও ইহারা সর্ব্বাংশে উপেক্ষণীয় ছিল না। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ন্যায়-বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈন-মত অত্যন্ত উপেক্ষিত হইত। মহাভারতেও বেদান্তদর্শনের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্বে বলা হইয়াছে—(১) সাংখ্য, (২) যোগ, (৩) পাঞ্চরাত্র, (৪) বেদ ও (৫) পাশুপত—এই পাঁচটি বিভিন্ন মত—

"সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে! বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব,
৩৪৯ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সং)

'শিবমহিম্নঃস্তোত্রে'ও এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে.................।" (৭)

অতএব, প্রাচীন মত পাঁচটি—(১) বৈদিক বা ঔপনিষদ বা বেদান্ত-মত, (২) সাংখ্যমত, (৩) যোগমত, (৪) পাঞ্চরাত্রমত, (৫) পাশুপত মত। তন্মধ্যে বাদরায়ণ বৈদিক মতের অনুবর্ত্তী—অপর চারিটি মতের অংশবিশেষ তিনি গ্রহণ ও অংশবিশেষ বর্জ্জন করিয়াছেন।

আচার্য শ্রীশঙ্কর-ভগবৎপাদও এই শ্রেষ্ঠ মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-রচনা করিয়া গিয়াছেন। একারণে তিনিও অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতির সমর্থক। অধ্যাসভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি ইহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। বিরোধী খ্যাতিবাদগুলির নিরসন করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—"তথা চ লোকেঽনুভবঃ শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে"। ভ্রমস্থলে লৌকিক অনুভব এইরূপ—শুক্তিকা রজতের ন্যায় প্রতীত হয়। 'লোকে' পদ হইতে সূচিত হয়—শুক্তিতে রজত-প্রতীতি লৌকিক—অলৌকিক নহে—এ কারণে 'অন্যথাখ্যাতি' ভাষ্যকারের অনভিপ্রেত। (কারণ, অন্যথাখ্যাতিতে স্বীকৃত জ্ঞানলক্ষণা-প্রত্যাসত্তি অলৌকিক সংসর্গরূপ)। 'অনুভব'-পদপ্রয়োগে সূচিত হইয়াছে—শুক্তিতে রজত-প্রতীতি অনুভবাত্মক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান—অনুমানাত্মক জ্ঞান নহে—অতএব 'অখ্যাতিবাদ' ভাষ্যকার কর্ত্তৃক সমর্থিত হয় নাই। (কারণ, অখ্যাতিবাদে শুক্তিতে রজত স্মৃতিমাত্র হইয়া থাকে)। 'শুক্তিকা'-পদটি হইতে সূচিত হয়—অধিষ্ঠান শুক্তির বাহ্য সত্তা আছে; অতএব 'আত্মখ্যাতি' ভাষ্যকারের অনভিমত। (আত্ম-খ্যাতিতে বাহ্যরূপে প্রতীয়মান বস্তু বস্তুতঃ আন্তর বিজ্ঞানের বহিঃক্ষেপমাত্র)। 'রজতবৎ' পদটি দ্বারা বুঝা যায়—শুক্তিতে প্রতীয়মান রজত যথার্থ রজত নহে কিন্তু রজতের ন্যায় আর কিছু যাহা বস্তুতঃ ব্যাখ্যাযোগ্য নহে। অতএব, সৎখ্যাতিও ভাষ্যকার-সম্মত নহে। (কারণ, সৎখ্যাতিবাদে সত্য রজতের অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ শুক্তিতে বর্ত্তমান বলিয়া শুক্তিতে রজত-প্রতীতি হয়; অর্থাৎ—শুক্তি-রূপা একেবারে অসৎ নহে—উহাতে সত্য রজত সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান।)

ভাষ্যের 'অবভাসতে' পদ হইতে বুঝা যায় যে—শুক্তিতে রজতের প্রতীতি সম্পূর্ণ অসৎ নহে—যাবৎকাল রজতের প্রতিভাস হয়, তাবৎ উহা সত্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব, অসৎখ্যাতিবাদও ভাষ্যকারের মতবিরুদ্ধ।

অতএব, পারিশেষ্য-ন্যায়ে একমাত্র 'অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতি'ই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত—ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইতে পারে না।

মার্গসঙ্গীত বৈদিক কি-না?

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

মার্গসংগীত বল্‌তে কোন শ্রেণীর সংগীতকে বোঝায় এ নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদের ভেতর মতভেদের অন্ত নেই, আর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এখনো গতানুগতিক ধারাকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন—নতুনের কোন সন্ধান তাঁরা দিতে পারেন নি। 'মার্গ' বল্‌তে 'ক্ল্যাসিকাল' (classical) সংগীত বোঝায় এ ধরণের সৌখিন মন্তব্যও অনেক কলাবিদ্‌ আবার পোষণ করেন। কিন্তু ক্যাসিকাল সংগীত ও মার্গসংগীত যে সমপর্যায়-ভুক্ত নয় একথা ঐতিহাসিক গবেষক মাত্রই একবাক্যে স্বীকার করবেন। প্রাচীন সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রগুলিও আমাদের এ পার্থক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ল্যাসিকাল যে সংস্কৃত (refined) উন্নত রুচিসম্মত ও বৈচিত্র্যময় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ল্যাসিকালের বয়স মুসলমান রাজত্বের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে ঠিক ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিকের কোঠায় কিছুতে পৌঁছুতে পারেনি। স্বরবিস্তার, শ্রুতি-মাধুর্য, রাগ-রাগিণীর প্রকাশ ও পরিবেশন, বাদী সংবাদী ও বিবাদীর মর্যাদা দান, আলাপ তান গমক অলংকার মূর্ছনা প্রভৃতির কৌলীন্য রক্ষা এ সমস্তই ক্ল্যাসিকাল তথা বর্তমান অভিজাত সংগীতের অবদান, ঐশ্বর্য ও রূপ হ'তে পারে, কিন্তু মার্গসংগীত ঠিক এধরণের নয়। মার্গ-সংগীত যদিও 'আলাপাদিনিবদ্ধো', রাগবিবেকসম্পন্ন ও নিয়মযুক্ত ('নিয়মে তু সতি') তবুও তাকে ক্ল্যাসিকালের গোষ্ঠীভুক্ত করা কখনই সমীচীন হবে না। মার্গসংগীতে নিছক ভারতীয় ভাবধারা ও পরিবেশের মাধুর্য আছে, ক্ল্যাসিকাল সংগীতে ভারতীয় আদর্শের সংগে মোগল-দরবার ও পারস্য-পরিবেশের ছোঁয়াচই বরং বেশী।

মার্গসংগীত প্রাগ্বৈদিক যুগে রূপায়িত না থাক্‌লেও বৈদিক যুগে যে পূর্ণবিকশিত ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মার্গসংগীত বল্‌তে আমরা সত্যি সত্যি কি বুঝি সেটাই যথার্থ আলোচনার বিষয়। অবশ্য এ আলোচনাও প্রাচীন নথি-পত্রের নজিরের ওপর নির্ভর ক'রেই করতে হবে। ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাগুলির ভেতর গাথা, গান, সাম, উদ্‌গীথ, উদ্‌গান, স্তোম, স্তোভ, উহ, উহ্য প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে ও প্রাতিশাখ্য-গুলিতে সামগানের অজুহাতে গ্রামেগেয়গান ও অরণ্যেগেয়গানের ইংগিত পাই। সামগান বৈদিক যুগেরই নিজস্ব সম্পদ। বৈদিকযুগও দু'চার বছরের সমষ্টিকে নিয়ে গড়ে উঠে নি, কয়েক হাজার বছরের ক্রমোন্নতির ধারা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনকে নিয়ে এই বৈদিক যুগ গড়ে উঠেছিল। উত্থান-পতনই যুগের ধর্ম। বৈদিক যুগে ক্রমবিকাশের সংগে সকল জিনিসেরই ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছিল। ঋক্‌ছন্দে সুর যোজনা ক'রে সামগানের সৃষ্টি হয়েছিল। সামগান সামিক যুগেরই পরিণতি। সামিক যুগে তিনস্বরযুক্ত গানের প্রচলন ছিল। সে তিন স্বর কারো মতে নিষাদ ষড়্‌জ ঋষভ, কারো মতে পঞ্চম মধ্যম ষড়্‌জ অথবা কারো মতে আবার পঞ্চম গান্ধার ষড়্‌জ। তবে সোমনাথ (১৬০৯ খৃঃ) তাঁর রাগবিবোধগ্রন্থে পঞ্চম গান্ধার

ষড় জকেই (সমপা) স্বয়ম্ভু (eternal and self revealing) স্বর বলেছেন : 'কিং চ স্বভুবঃ সমপা' অথবা 'সমপাঃ ষড় জ-পঞ্চম-মধ্যমাঃ স্বস্মাদেব ভবন্তীতি স্বভুবঃ স্বপ্রকাশাঃ' বলেছেন।' বেঙ্কটমুখীর অভিমতও তাই। সুতরাং অবরোহ গতিতে পঞ্চম-মধ্যম-ষড় জ (পমসা অর্থাৎ সমপা) স্বর তিনটিই সামিক যুগের স্বর হওয়া সমীচীন।

সামিক যুগের আগে আর্চিক ও গাথিক যুগ। আর্চিক যুগে একটিমাত্র স্বরেই ঋক্‌ছন্দ গান করা হত, আর গাথিক যুগে দুটিমাত্র স্বরে গাথা-গানের প্রচলন ছিল। সামিকের পরে স্বরান্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও সংপূর্ণ-যুগের রাজত্ব। ক্রম-বর্ধমান স্বরগুলির বা যুগের ভেতর ক্রমবিকাশের ধারা বা স্তর লুকানো রয়েছে। ক্রমবিকাশ সমস্ত জিনিসেরই স্বীকার করতে হবে। স্বরের বিকাশকে নিয়েই গান বা গীতির বিকাশের সার্থকতা। সামগানে তিন থেকে আরম্ভ ক'রে সাত স্বরের প্রচলন ছিল—তার প্রমাণ ঋক্ সাম যজু অথর্ব তৈত্তিরীয় ঐতরেয় প্রভৃতি প্রাতিশাখ্যগুলি, তাদের ভাষ্য টীকা টিপ্পনি আর শিক্ষাগুলি। সামগান চার পাঁচ ছয় অথবা সাত তথা সম্পূর্ণ স্বরে লীলায়িত হ'লেও তা সুসঙ্গত ও নিয়মানুগই হয়েছিল। দেশ ও কালের মর্যাদাকেও তারা অবমাননা করেনি। সামগানের পর সামের অনুকরণে মার্গ-সংগীতের উৎপত্তি হয়েছিল। শ্রুতি জাতি গ্রাম আলাপ মূর্ছনার সংমিশ্রণে মার্গসংগীত ছিল বৈচিত্র্যময় ও নিয়মাধীন। এই বৈচিত্র্য ও নিয়মকে অতিক্রম করলেই তা দেশী সংগীতের পর্যায়ভুক্ত হত। দেশী সঙ্গীতে শ্রুতি জাতি ও গ্রামের কোন বালাই থাকত না—'যেষাং শ্রুতি-স্বরগ্রামজাত্যাদিনিয়মো ন হি'। অবশ্য বর্তমান ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতও শাস্ত্রীয় দেশী সংগীতের শ্রেণী-ভুক্ত যদিও ক্ল্যাসিকাল-সংগীতে শ্রুতি জাতি মূর্ছনা অলঙ্কার সবই রয়েছে। কল্লিনাথ দেশী সংগীতকে 'কামচারপ্রবর্তিত্বম্' বলেছেন। নিয়মে বিধিবদ্ধ হ'লেই ('নিয়মে তু সতি') তা মার্গ-সংগীতের কৌলীন্য পেত—'তেষাং গীতাদীনাং মার্গত্বমেব'। 'কামচার' বলতে যার যেমন রুচি সে রকমই গান করত। এটাই দেশী সংগীত। কল্লিনাথ তাই বলেছেন : 'দেশিত্বং চ তত্তদ্দেশ-মনুজমনোরঞ্জনৈকফলত্বেন কামচারপ্রবর্তিত্বম্'। রুচির অনুযায়ী যা ভাল লাগত অর্থাৎ শ্রুতিমধুর ছিল ও লোকের মনোরঞ্জন করত তাই গান করত, কাজেই দেশ বা স্থানভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন হত, নিয়মের তথা বিধি-নিষেধেরও কিছু বালাই থাকত না।

রাগবিবোধকার সোমনাথ 'গীতং দেধা মার্গো দেশী' ব'লে মার্গ ও দেশী হিসাবে ভারতীয় সংগীতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। মার্গ-সংগীত সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

'* * মার্গঃ স যো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ।
অন্বিষ্টো ভরতাদ্যৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তোঽর্চ্যঃ॥'

আরো পরিষ্কার করার জন্য তিনি টীকাতেও উল্লেখ করেছেন : 'মার্গ্যতে অন্বিষ্যতে ইতি মার্গঃ যো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ অন্বিষ্টঃ গবেষিতঃ সামবেদাদুৎকৃষ্য প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতি-স্বার্যাখ্যান্ সপ্তস্বরান্ সংগৃহ্য প্রবর্তিত ইত্যর্থঃ' মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে মার্গ-সংগীতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,—

'আলাপাদিনিবন্ধো যঃ স চ মার্গঃ প্রকীর্তিতঃ।
আলাপাদিবিহীনস্তু স চ দেশী প্রকীর্তিতঃ॥'

যে গানে আলাপ মূর্ছনা তাল লয় অলংকার প্রভৃতির সমাবেশ থাকে তাকে 'মার্গ' আর আলাপাদি বৈশিষ্ট্য যে গানে থাকে না তাকে 'দেশী'-সংগীত বলে।

প্রাচীন সংস্কৃত বইগুলির ভেতর শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকরই (১২১০-১২৪৭খৃঃ) বিস্তৃত ও এক-দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, নচেৎ প্রামাণিক সমস্ত গ্রন্থকেই

১ 'রাগবিবোধ (Adyar ed. 1945), পৃঃ ৬৭

বলা যায়। রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেবের আগেও অনেক সংগীতগ্রন্থকারের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। শার্ঙ্গদেব নিজেই রত্নাকরে তাঁদের নাম করেছেন (১।১৫—২০)—যেমন, সদাশিব, ব্রহ্মা, ভরত, কশ্যপ, মতঙ্গ, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, শার্দূল, কোহল, বিশ্বাখিল, দত্তিল প্রভৃতি। এঁদের সকলের সংগীতগ্রন্থ কিন্তু ছাপার আকারে আবার পাওয়া যায় না; পাণ্ডুলিপি (manuscripts) তাও সকলের সংপূর্ণরূপে পাওয়া সুকঠিন। ভরতের নাট্যশাস্ত্র (৪-৫ শতাব্দী), দত্তিল বা দত্তিলের দত্তিলম্ (৪-৫ শতাব্দী), মতঙ্গের বৃহদ্দেশী (৯ম শতাব্দী) নারদের মকরন্দ (৭ম শতাব্দী) প্রভৃতি বইগুলি ছাপার অক্ষরে এখন পাওয়া যায়। তবে এগুলির চেয়ে রত্নাকরের আলোচনা আরো সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত। শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরে মার্গসংগীত সম্বন্ধে বলেছেন: ব্রহ্মা[২] প্রভৃতি আচার্যেরা চারবেদ থেকে অন্বেষণ ক'রে যে সংগীত রচনা করলেন, ভরত প্রভৃতি কলাবিদেরা তাকেই রূপায়িত ক'রে সাধারণের সমাজে পরিবেশন করেছেন। রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ (১৪৪৬-১৪৬৫খৃঃ) একথা আরো পরিষ্কার করে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন: "মার্গিতত্বান্মার্গঃ। মার্গিতত্বং চ বিরিঞ্চ্যাদ্যৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ নাট্যসংজ্ঞমিমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্' ইতি প্রতিজ্ঞায় চতুর্ষু বেদেম্বন্বিষ্য কৃতত্বাৎ। মার্গিত ইতি 'মার্গ অন্বেষণে' ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ কর্মণি নিষ্ঠায়াং রূপম্।" সুতরাং দেখা যায়, ব্রহ্মা প্রভৃতি কলাবিদেরা ঋক্ সাম যজু ও অথর্ববেদ থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে ভরতাদি শিষ্যদের শেখালেন, ভরত প্রভৃতি সংগীত-নায়কেরা তাকে আবার নাট্য ও সঙ্গীতের ভেতর যোজনা ক'রে সাধারণের জন্য লোকসমাজে প্রচার করলেন।

রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল (১২২০ খৃষ্টাব্দ) মার্গ' তথা 'মার্গিত' শব্দে 'অন্বেষিত' বা 'দৃষ্ট'-ই ('মার্গিতোঽন্বেষিতো দৃষ্টঃ) বলেছেন। অন্বেষণ অথবা দেখা (দৃষ্টঃ) কোন-কিছু একটা চল্‌তি ও সত্যিকার জিনিসের, অর্থাৎ যার অস্তিত্ব ও প্রচলন সমাজে আছে তার সম্বন্ধেই চলে, যা আগে বা কোনদিন সমাজে প্রচলনের আকারে থাকে না সে জিনিষের অন্বেষণ বা দর্শনের প্রশ্ন কিছুতেই জাগে না। কাজেই একথা ঠিক যে, ব্রহ্মা প্রভৃতি গুণীরা একটি প্রচলিত বৈদিক সংগীতের ধারাকে অনুসরণ করেই মার্গ তথা মার্জিত (refined) সঙ্গীতের প্রবর্তন সমাজে করেছিলেন। কল্লিনাথও তাই বলেছেন: 'সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ'। এই 'গীতং' বা গান বল্‌তে কল্লিনাথ বৈদিক তথা মার্গসংগীতকেই সংপূর্ণ লক্ষ্য করেছেন। তারপর মার্গসংগীতও যে বৈদিক তার নজির দিতে গিয়ে তিনি আবার বলেছেন: 'গীতস্য সামবেদসংগ্রহরূপত্বেন বৈদিকত্বাদুপাদেয়ত্বং' তবে গীত তথা মার্গসংগীত নিছক সামগান নয়, কারণ সামগানের স্বরসৌন্দর্য, গতি ও ধারাকে অনুসরণ করেই মার্গসংগীতের সৃষ্টি হয়েছিল, আর তাই মার্গসঙ্গীত ও সামগান ঠিক এক জিনিস নয়। তবে সামবেদ তথা সামগানকে অনুসরণ ক'রেই সৃষ্টি হয়েছিল ব'লে মার্গসঙ্গীতও বৈদিক কৌলীন্য পাবার অধিকারী।

সামগানের মতো মার্গসংগীতেও সাত স্বরের প্রচলন হয়েছিল ('গীতস্যাপি সপ্তস্বরাত্মকত্বাৎ')। অনেকে এই সাত স্বর সম্বন্ধে আপত্তি ক'রে বলেন যে, সামগানে তিন অথবা চার স্বরেরই মাত্র প্রচলন ছিল। কিন্তু এ ধরণের মন্তব্যের পেছনে কোন ঐতিহাসিকতা নেই, কারণ

২ এই ব্রহ্মা অবশ্য সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা নন, কারণ ব্রহ্মার বহু রূপ ও মূর্তিভেদের উল্লেখ ব্রাহ্মণসাহিত্য থেকে আরম্ভ ক'রে পুরাণগুলিতে পর্যন্ত পাওয়া যায়।

ক্রুষ্টাদি সাত স্বর যে সামগানে ব্যবহৃত হত একথা প্রাচীন আচার্যেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। পুষ্পর্ষি প্রণীত সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে আবার উল্লেখ করা হয়েছে : সম্প্রদায়ভেদে সামগান চার, পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরেও গান করা হত। যেমন,

'এতৈর্ভাবৈস্তু গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চস্বের তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু ॥
সামানি ষট্সু চান্যানি সপ্তসু দ্বে তু কৌথুমাঃ।'[৩]

মিঃ এম এস রামস্বামী আয়ারও রামামত্যের স্বরমেলকলানিধির মুখবন্ধে (Introduction) এই প্রসংগের অবতারণা ক'রে স্বীকার করেছেন, চার কেন, পাঁচ থেকে সাত স্বরের ব্যবহার সাম তথা বৈদিক গানে ছিল।[৪] তিনি বলেছেন : 'The scale of the Marga-music ordinarily ranged from one to four notes but, during the later *Sâman*-period, rose to seven notes; * *'[৫] প্রকৃতপক্ষে সামগানে সাত স্বরের প্রচলন ছিল আর সে সাত স্বরের নাম ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার। শিক্ষাকার নারদ এবং বেদভাষ্যকার সায়ণ আবার এদের নাম প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তমও দিয়েছেন। মার্গসংগীত যখন সৃষ্টি হল মার্জিতরুচিসম্পন্ন সমাজের জন্য তখন সামগানের অনুকরণে সাত স্বরকেই আবার তাতে ব্যবহার করা হল, কিন্তু তাদের নামকরণ করা হল দেশী সংগীতের মতো ষড়্জ, ঋষভ গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ বোলে। অবশ্য বৈদিক সামগানের অনুকরণে মার্গসংগীতের সৃষ্টি হলেও কেন যে স্বরগুলির নামের পরিবর্তন করা তার কোন সুস্পষ্ট নজির এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। তবে সামগানের পাশাপাশি দেশী সংগীতের প্রচলন থাকায় এবং সামগানের রীতি তখনকার সমাজ থেকে লোপ পেতে বসলে বর্তমানের রুচি অনুযায়ী দেশী সংগীতের স্বরনামই গুণীরা গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মনে হয়। চলতি জিনিসেরই সমাজে আদর থাকে। সমাজে সামগানের প্রচলন তখন কমে এসেছে, সমাজের রুচিও দেশী সংগীতের দিকে ঢলে পড়েছে, কাজেই ভরত প্রভৃতি কলাবিদেরা সামগানকে আরো মার্জিত ও তখনকার সমাজের অনুযায়ী ক'রে মার্গসংগীতের সৃষ্টি করলেন, দেশের উন্নতিকামী গুণীরাও তা গ্রহণ করলেন। দেশী সংগীতও সমাজে তখন আদৃত ও সুপরিচিত ছিল ব'লে দেশী সংগীতের মতোই মার্গসংগীতের স্বরগুলির নামকরণ করলেন ষড়্জাদি। কল্লিনাথও তাই সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন : 'সামানি হি ক্রুষ্ট-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্যাখ্যাঃ সপ্ত স্বরাঃ; ইহ তু ত এব যথাযোগং ষড়্জাদিব্যপদেশভাজ ইতি।'

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, কল্লিনাথের 'ইহ তু ত এব যথাযোগং ষড়্জাদিব্যপদেশভাজঃ' স্বীকৃতিগুলি কিন্তু বেশ সুস্পষ্ট নয়, তবে এ স্বীকৃতির জন্য তিনি শিক্ষাকার নারদের[৬] কাছেই বিশেষভাবে ঋণী। আমাদের

৩ Vide পুষ্পসূত্র (কাশী সং), পৃঃ ১১৮-১১৯; অজাতশত্রুর ভাষ্যও দ্রষ্টব্য। Cf. Fox Strangways : *The Music of Hindoostan* (1914), পৃঃ ২৬১। নারদীশিক্ষা, পৃঃ ৩৯৭-৩৯৮।

৪ 'মার্গসংগীত' বলতে তিনি সামগানকেও লক্ষ্য করেছেন; কারণ তাঁর মতে সামগান ও মার্গসঙ্গীতের ভেতর কোন পার্থক্য নেই।

৫ *Cf. Introduction* to *Svaramelakalânidhi*, p lxxi.

৬ মকরন্দকার নারদ ও শিক্ষাকার নারদ এঁরা যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সম্পূর্ণ আলাদা লোক একথা আগে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। রামায়ণ, মহাভারত,

অনুমান—শিক্ষাকার নারদ নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ও দত্তিলেরও আগেকার লোক; সুতরাং রত্না-করকার শার্ঙ্গদেবেরও অনেক আগে তিনি তাঁর সংগীতগ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। শিক্ষাকার নারদের সময়েই সাম গানের ধারা ক্ষীণপ্রায় হয়েছিল, অথচ দেশী সংগীতের প্রচলন তখন অব্যাহতই ছিল। মার্গ-সংগীতের রূপও দেশীর পাশে তখন বরং বেড়েই চলেছে। নারদের কাছে মার্গের কৌলীন্য বৈদিকের কোঠাতেই সুরক্ষিত ছিল, অথচ সামগানের সাত স্বরের সংগে মার্গ-সংগীতের সাত স্বরের পারস্পরিক পরিচয়গত কোন ঐক্য ছিল না, অথচ ঐক্যের অথবা বিশেষ সম্পর্কের একটা প্রয়োজনও ছিল; কারণ সমাজ তখন সামগানের স্বর ক্রুষ্টাদির নাম একরকম ভুলে যাওয়াতে নারদ তাঁর শিক্ষায় সংগীতে সাত স্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে দেশী স্বরের কথাই বলেছেন। যেমন,

'ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ॥'

কাজেই একথা ঠিক যে, নারদ মার্গ-সংগীত ও দেশী সংগীত এ দুটির স্বরনামেরই মাত্র উল্লেখ করেছেন, সামগানের কথা কিছু বলেন নি; কারণ সামগান তখন সাধারণের ভেতর এক রকম অপ্রচলিত হয়েছে বল্লেই চলে। অথচ সামবেদ বা সামগানের মোটামুটি উপাদানকে অনুসরণ ক'রেই ('মার্গিতঃ', 'দৃষ্টঃ') অন্ততঃ মার্গ-সংগীতের উৎপত্তি। তাই নারদ সামগান ও মার্গ-সংগীতের ভেতর একটি যোগসূত্র রচনা ক'রে দেখালেন,

'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ।
যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্ত্বৃষভঃ স্মৃতঃ॥
চতুর্থঃ ষড়্জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ।
ষষ্ঠো নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ॥' ৭

নারদ প্রথম স্বরের সংগে মধ্যমের, দ্বিতীয়ের সংগে গান্ধারের, তৃতীয়ের সংগে ঋষভের, চতুর্থের সংগে ষড়্জের, পঞ্চমের সংগে ধৈবতের, ষষ্ঠের সংগে নিষাদের এবং সপ্তমের সংগে পঞ্চম স্বরের তুলনা ক'রে পরস্পরের ঐক্য দেখিয়েছেন। অবশ্য আচার্য সায়ণও এ ধরণের প্রচেষ্টা করেছিলেন, যদিও শিক্ষাকার নারদের সংগে ঠিক মিল নেই। শিক্ষাকার নারদের 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ' প্রভৃতি স্বীকৃতির জন্য কল্লিনাথের 'ইহ তু ত এব যথাযোগং ষড়্জাদিব্যপদেশভাজ ইতি' কথাগুলির সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। ব্রহ্মা চার বেদ থেকে উদ্ধার ক'রে মার্গ-সংগীতের রূপ দিয়েছিলেন সর্বসাধারণের উপকারের জন্য ('ব্রহ্মণোঽপি বেদাদুদ্ধৃত্য সংগ্রহেণ সার্ববর্ণিকত্বং প্রয়োজনমিতি')। তদানীন্তন গুণী সমাজও তাই মার্গ-সংগীতকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

মোটকথা, একথা মেনে নিতে আমাদের আপত্তি নেই যে, মার্গ-সংগীতও সামগানের মতো বৈদিক, যদিও তা সামগানের হুবহু নকল অথবা ঠিক সামগানই নয়। চার বেদ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করলেও প্রধানতঃ সামবেদ থেকেই 'গীত' অর্থাৎ মার্গসংগীতের উপাদান নেওয়া হয়েছিল। ব্রহ্মা নিজে সামগানে পারদর্শী ছিলেন—'সামগীতিরতো ব্রহ্মা', আর সংগ্রহকর্তা ব্রহ্মার সময়েও সমাজে সামগানের প্রচলন ছিল—যদিও খুব বেশী নয়। রত্নাকরের অন্য টীকাকার

হরিবংশ ও পুরাণগুলিতে অনেকগুলি নারদের আবির্ভাব দেখা যায়। কাজেই ব্যাস, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতির মতো নারদও একটি উপাধি হওয়া অসম্ভব নয়। অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই নামে অনেক নারদ থাকাও সম্ভব।

৭ শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পৃঃ ৪১০

৮ সামগানের প্রচলন অবশ্য এখনো ভারতের নানান জায়গায় রয়েছে যদিও সর্বসাধারণের ভেতর তার আদর অত্যন্ত কম। পাঞ্জাবপ্রদেশে, দাক্ষিণাত্যে ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে

সিংহভূপালও স্বীকার করেছেন: 'গীতস্য সমুৎ-ত্তমাহ—সামবেদাদিতি'। তা ছাড়া কল্লিনাথের 'এতচ্চ ন কেবলং বৈদিকম্' কথাগুলি থেকেও মার্গ-সংগীত যে বৈদিক একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

অনেকের মতে গান্ধর্বগানই মার্গসংগীত। টীকাকার চতুর কল্লিনাথও তাই স্বীকার করেছেন: 'গান্ধর্বং মার্গঃ। গানং তু দেশীতাবগন্তব্যম্। অনাদিসংপ্রদায়মিত্যনেন গান্ধর্বস্য বেদবদপৌরুষেয়ত্ব-মিতি সূচিতং ভবতি। গানং তু বাগ্গেয়কারাদিপরতন্ত্র-ত্বাৎ পৌরুষেয়মেব।'[৯] 'বাগ্গেয়কার' বলতে শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরের প্রথম অধ্যায়ে পদার্থসংগ্রহে গানের কথায় (বাক্) যিনি সুর (গেয়) যোজনা করেন তাকে বলেছেন। আর 'গান্ধর্ব' বলতে যিনি মার্গ ও দেশী এই উভয় সংগীতে পারদর্শী তাঁকে বোঝায়। মোটকথা কল্লিনাথ গান্ধর্বকে মার্গ-সংগীতের আভিজাত্য দিয়ে 'গান'-এর সংগে সম্পূর্ণ পৃথক দেখিয়েছেন। গান্ধর্বকে তিনি বলেছেন অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ বা মরণশীল মানুষের দ্বারা রচিত নয়। বেদও তাই; বেদকেও শাস্ত্রে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে। গান্ধর্বকে অপৌরুষেয় ব'লে তিনি সুতরাং বেদের তথা বৈদিক কৌলীন্যই গান্ধর্বকে দিয়েছেন, আর গানকে তিনি বলেছেন পৌরুষেয় সুতরাং লৌকিক ও অবৈদিক। কল্লিনাথের এ বিভাগ কিন্তু ঠিক প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত নয়, কারণ গান বা গীতি বলতে সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রই সামগান তথা বৈদিক সংগীতকেই লক্ষ্য করেছে। তবে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে এবং ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকারেরা প্রায় সকলেই তাঁদের সংগীতের বইয়ে গানকে নাট্য ও বাদ্যের সমপর্যায়ভুক্ত ক'রে লৌকিকই বলেছেন। লৌকিক গানই প্রকৃতপক্ষে দেশী সংগীত। তবে ভরত 'গান' শব্দের পরিবর্তে 'গীত' শব্দই বেশী উল্লেখ ক'রে বলেছেন: গীত সাম তথা সামবেদ বা সামগান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যেমন,

> 'নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্।
> জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ॥
> যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি।' ১০

এখানে 'সামভ্যো গীতমেব চ' বলতে মার্গ-সংগীতই বোঝানো উচিত। নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'গানং পঞ্চবিধং জ্ঞেয়ং' (৬।৩০) কথাগুলিতে 'গান'-ও মার্গ-সংগীতেরই পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। কিন্তু ২৭শ অধ্যায়ে 'গানং বাদ্যং' (২৭।৮০), 'গীত-বাদিত্রভূয়িষ্ঠং' (২৭।৯১), 'গানং নাট্যকৃতং তথা' (২৭।৯৮) অথবা 'এবং গানং চ নাট্যং চ বাদ্যং চ বিবিধাশ্রয়ম্।' (২৮।১) কথাগুলির ভেতর গীত, গীতি বা গান দেশিশ্রেণীভুক্ত করেছেন বলেই মনে হয়।[১১] ভরত অথবা দত্তিলের পর মতঙ্গ সম্পূর্ণ দেশী সংগীতেরই প্রচারক ছিলেন; কারণ তাঁর বইয়ের নামই 'বৃহদ্দেশী'। তাছাড়া সংগীতের উৎপত্তি প্রকরণ বলতে গিয়ে একমাত্র দেশী সংগীতের সম্বন্ধেই তিনি বলছেন; যেমন 'বর্ণোপলম্ভনাদ্ ব্যক্তো দেশিমুখমুপাগতঃ'।[১২] শার্ঙ্গদেব ও তাঁর সংগীত-রত্নাকরে মার্গসংগীতের কথা উল্লেখ করছেন যদিও দেশী সংগীতের আলোচনাই প্রধানতঃ তিনি করছেন। পার্শ্বদেব, সোমনাথ, অহোবল, দামোদর এঁরাও তাঁদের সংগীতসময়সার, রাগবিবোধ, পারিজাত ও দর্পণে দেশীসংগীতের বিবরণই দিয়েছেন। কাজেই কল্লিনাথ যে গান্ধর্বের সংগে পৃথক

এখনো সামগ বা সামগানকারীদের সংখ্যা বড় কম নয়। তবে প্রাদেশিক গায়কী ও উচ্চারণ-পদ্ধতির অনেক পার্থক্য আছে।

৯ সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar ed.) Pt. II, পৃঃ ১৮৮.

১০ নাট্যশাস্ত্র (কাশীসং), ১।১৬-১৭

১১ শার্ঙ্গদেবও তাঁর রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে (৪র্থ অঃ) গানকে দেশী পর্য্যায়ভুক্ত ক'রে বৈদিক গান্ধর্বসংগীতের সংগে আলোচনা করেছেন (৪।১-৩)।

১২ বৃহদ্দেশী, ১২

ক'রে গানকে লৌকিক বলেছেন তা একেবারে অসংগত নয়, কেননা 'গান' বল্‌তে তিনি দেশী গানের কথাই বলেছেন।

মোটকথা কল্লিনাথের মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গান্ধর্বসংগীত বৈদিকত্বের সম্মান পাবার যোগ্য। মার্গ-সংগীতও তাই। কাজেই সাদৃশ্যের দিক থেকে গান্ধর্ব ও মার্গ সমপর্যায়-ভুক্ত অথবা এক ও অভিন্নই। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত এই গান্ধর্ব-গানকে আবার গন্ধর্বদেরই একমাত্র প্রিয় সংগীত বলেছেন: 'গন্ধর্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে'।[১৩] এই গন্ধর্বদের বাড়ী ছিল নাকি গান্ধার তথা বর্তমান কান্দাহারে —ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বা কাবুলে। ঐতিহাসিক গবেষণায় এখনো পর্যন্ত এর কোন সঠিক নির্ধারণ হয়নি। গন্ধর্ব-সংগীতের রূপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন: গান্ধর্ব স্বর তাল ও পদের সংমিশ্রণের রূপ—'গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্'।[১৪] এদিক থেকে ভরত গান্ধর্বকে স্বর তাল ও পদ হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।[১৫] তাছাড়া আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, গান্ধর্বগানের উৎপত্তি হয়েছে বীণা ও বংশ থেকে—'অস্য যোনির্ভবেদ্ গানং বীণাবংশস্তথৈব চ'।[১৬] ভরত বীণা ও বংশ তথা বেণুকে (?) সমগোষ্ঠীভুক্ত করেছেন, আর 'গান' বল্‌তে সামগানকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন ব'লে আমাদের অনুমান। কিন্তু নারদীশিক্ষায় 'বেণু' শব্দে মার্গ এবং দেশী-সংগীতকে বুঝিয়েছে; যেমন 'যং সামগানং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ'।[১৭]

কাজেই মার্গসংগীত যদি গান্ধর্বগানের সংগে অভিন্ন হয় তবে নিজেই নিজের কারণ বা উৎপত্তি-স্থান কি ক'রে হতে পারে? সুতরাং গান্ধর্ব-সংগীতের যোনি বা উৎস্থান-স্থান গান কি-না সামগান এবং সামগানের সহকারী বীণা ও বংশ অর্থে বাঁশী। শিক্ষাকার নারদ 'বেণু' শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন মার্গ ও দেশী-সংগীতকে বোঝাবার জন্যে। কাজেই কল্লিনাথের 'গান্ধর্বস্য বেদবদপৌরুষেয়ত্বমিতি' কথা-গুলির সংগে 'গীতস্য[১৮] সামবেদসংগ্রহরূপত্বেন বৈদিকত্বাদুপাদেয়ত্বং' উক্তির সংপূর্ণ সামঞ্জস্য ও মিল আছে, আর সে জন্য গান্ধর্বকে মার্গ-শ্রেণীভুক্ত অথবা মার্গ-সংগীতের সংগে এক ও অভিন্ন ক'রে উভয়কে বৈদিক সংগীত বলারও কোন বাধা নেই। রামামত্য তাঁর স্বরমেলকলানিধিতেও 'তত্র লক্ষ্যানুরোধেন গান্ধর্বঃ সংপ্রযুজ্যতে' ব'লে গান্ধর্ব তথা মার্গসংগীতকে বৈদিক আখ্যাই দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে মার্গ-সংগীতকেও বৈদিক সংগীত ব'লে স্বীকার করা উচিত। মিঃ এম এস রামস্বামী আয়ারও রামামত্যের স্বরমেলকলানিধির মুখবন্ধে (Introduction) এই অভিমত স্বীকার করেছেন।[১৯] তিনি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন: 'Hence, I venture to call 'Marga' *Vedic Music.*' মার্গসংগীতকে তিনি গন্ধর্বসংগীতও বলেছেন: 'Now, Marga or Gandharva or Vedic Music—call it what you may.'

কিন্তু মিঃ এন এস রামচন্দ্রন তাঁর *The Rāgas of Karnatic Music* (1938) বইয়ে

১৩ নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং); ২৮।৯

১৪ ঐ ২৮।৮

১৫ ঐ ২৮।১২

১৬ ঐ ২৮।১০

১৭ শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পৃঃ ৪১০

১৮ 'গীতস্য' বল্‌তে এখানে মার্গ সংগীতকেই বুঝতে হবে।

১৯ Cf. *Introduction to Svaramelakalānidhi*, p. lxix.

মার্গ-সংগীতকে ঠিক বৈদিক হিসাবে মানতে রাজী হন নি। তিনি শার্ঙ্গদেব এবং কল্লিনাথের প্রমাণ-বাক্যের নজির দেখিয়ে বলেছেন: 'শার্ঙ্গদেব ও কল্লিনাথ দুজনেই মার্গকে বৈদিক সঙ্গীত ব'লে স্বীকার করেন নি।' কিন্তু তা ঠিক নয়, কারণ শার্ঙ্গদেব ও কল্লিনাথের স্বীকারকে তিনি বরং একটু বিকৃত ক'রে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন: 'There is a view that Mârga means Vedic music and Desi, modern music. This does not seem to be quite acceptable.'[২০] 'There is a view' বলতে পাদটীকায় তিনি মিঃ এম্ এস্ রামস্বামী আয়ারের মতকেই লক্ষ্য করেছেন যদিও তাঁর লেখায় 'seems to be quite' কথাগুলি থাকার জন্য মার্গ-সংগীতকে বৈদিক ব'লে না-মানার ভেতর তত জোর বা আঁট নেই।[২১]

সুতরাং মিঃ রামচন্দ্রনের মন্তব্য ঠিক হ'লেও সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হয় নি। কারণ কল্লিনাথের টীকার মর্ম হল: '* * স্বরগতরাগবিবেকয়োর্জাত্যান্তরভাষান্তরং যদুক্তং তদ্ গান্ধর্বমিত্যর্থঃ।' ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা প্রভৃতিকে নিয়ে গান্ধর্ব বা মার্গ-সংগীতের সার্থকতা। এখানেও কল্লিনাথ গানকে গান্ধর্ব-সংগীত থেকে আলাদা করেছেন। শার্ঙ্গদেবও তাঁর রত্নাকরে বলেছেন:

> 'গান্ধর্বং গানমিত্যস্য ভবেদ্দ্বয়মুদীরিতম্।
> অনাদিসংপ্রদায়ং যদ্গান্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে ॥
> *   *   *
> দেশিরাগাদিষু প্রোক্তং তদ্গানং জনরঞ্জনম্ ॥
> তত্র গান্ধর্বমুক্তং প্রাগধুনা গানমুচ্যতে।'[২২]

'গান' বলতে দেশী সংগীতেরই শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ব'লেও গান্ধর্বকে বৈদিক কৌলীন্যের সম্মান দিতে তিনি মোটেই কার্পণ্য করেন নি; কেননা 'অনাদিসংপ্রদায়ং যদ্গান্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে' কথাগুলিই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তারপর গান্ধর্ব-গানে যে গ্রহ অংশ মূর্ছনা প্রভৃতি এবং জাতি গ্রাম রাগাদিও থাকবে তা রত্নাকরের অন্যতম টীকাকার সিংহভূপালের 'তস্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশমূর্ছনাদিনিয়মযুক্তম্' এবং 'গান্ধর্বং জাতিগ্রামরাগাদিপূর্বমুক্তম্' স্বীকৃতিতেও প্রমাণিত হয়েছে। এই গান্ধর্বই মার্গ-সংগীত যা সামবেদ অথবা চতুর্বেদের উপাদান ও ধারাকে অনুসরণ ক'রে উৎপন্ন হয়েছে। মার্গ-সংগীত যে বৈদিক তা শার্ঙ্গদেব ও তাঁর টীকাকার সিংহভূপাল, কল্লিনাথ ও কুম্ভকর্ণও একবাক্যে স্বীকার করেছেন 'গান্ধর্বং মার্গঃ' শব্দগুলির দ্বারাও গান্ধর্ব-সংগীত যে বৈদিক একথা বুঝতে কষ্ট-কল্পনা করতে হয় না। কাজেই মিঃ রামচন্দ্রনের সিদ্ধান্তকে আমরা ঠিক মেনে নিতে পারি না। তবে একথা ঠিক যে, মিঃ রামস্বামী আয়ার যে মার্গ-সংগীতকে সামগানের স্বগোত্রভুক্ত কেন, সামগানের সংগে অভিন্ন ব'লে প্রমাণ করেছেন সে সিদ্ধান্তকেও স্বীকার ক'রে নিতে আমরা রাজী নই। সামগানকে ঠিক মার্গ-সংগীত বলা যায় না। কাজেই মিঃ রামস্বামী আয়ারের (১) 'Hence, the Vedic chant[২৩] * *. That kind (of music) is called Mârga'. (২) '* * clearly shows that Vedic chant, or for that matter, the *Mârga* music'[২৪] মন্তব্য দুটি যুক্তিসঙ্গত হয় নি। সামগান এবং জাতি, শ্রুতি, অংশ, ভাষা ও অন্তরভাষাদি-সমন্বিত মার্গ-সংগীত শ্রেণী হিসাবে আলাদাই, যদিও 'বেদবদ্-পৌরুষেয়ত্বম্'-এর দিক থেকে উভয়েই সমান বৈদিক কৌলীন্য লাভ করবার যোগ্য অধিকারী।

২০ Cf. *The Ragas of Karnatic Music* (1938), পৃঃ ৯

২১ Ibid. পৃঃ ৯১০

২২ সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar ed.), Pt. II, পৃঃ ১৮৮

২৩ এখানে Vedic Chant বলতে নিছক সামগানের কথাই উল্লেখ করেছেন।

২৪ Cf. *Introduction* to *Svaramelakalânidhi*, পৃঃ LXVIII, LXIX.

ব্রহ্মানন্দ-স্মরণে

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম-এ, পি-আর-এস

বহুদিন পূর্বে দেখা। বলরাম বাবুর বাড়ীতে 'রাখাল মহারাজ'কে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার আশীর্বাদও পাইয়াছিলাম। গম্ভীর মূর্তি, অথচ মুখে মৃদু হাসি; সংযতবাক্; যেন অন্য কিছু ভাবিতেছেন, অন্য কি দেখিতেছেন। কত লোকে কত কথা বলিতেছে, কিন্তু ঘরে শান্ত একটা ভাব। সাধুকৃপার অর্থ তখনও বুঝি নাই, এখনও বুঝি কি? তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিও বদলায়। তখন যত লোককে 'রাখাল মহারাজ' বলিতে শুনিতাম, এখন তো শুনি না—এখন তো স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তখন তিনি আমাদের যত কাছে ছিলেন, এখন কি ততটা কাছে নাই, আমরাই কি দূরে সরিয়া গিয়াছি?

* * *

লোকে বলিত, রাখাল মহারাজ সকলের সঙ্গেই আলাপ করেন, কত ভালো-মন্দ বৈষয়িক পরামর্শও দেন। আমরা ছেলেবেলায় ছেলেমী ভাবেই আলোচনা করিতাম, বা রে! সন্ন্যাসী মানুষ, ধর্মোপদেশ দেন না কেন? সঙ্গীদের একজন আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া দিল। যারা ধর্মের ডাকে সাড়া না দেয়, তাদের তো তিনি ধর্মকথা বলেন না; পিপাসা যাহার নাই, তাহার জল যোগাইবেন কেন? আমাদের ছেলেমী আলোচনার মধ্যেও একটা গম্ভীর সুর আসিল। আমরা বুঝিতে শিখিলাম, অন্ততঃ তাহাই মনে হইল।

* * *

কথামৃতে পড়িলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন, "নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ।" মাষ্টার মশায়কে বলিলেন, "রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি—সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছে।" কখনও তাঁহাকে অসুস্থ দেখিয়া বলিতেছেন, "এই দেখ, রাখালের অসুখ হইয়াছে। সোডা খেলে কি ভালো হয় গা? কি হবে বাপু! রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।" কথামৃতে আছে, "পরমহংসদেব এই বলিয়া বালক রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই নাম করিতে করিতে সমাধি হইল।" কী গভীর ভালবাসা! 'মানসপুত্র', সেকথা মনে পড়িল।

* * *

শুনিয়াছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ একবার বেলুড়ে উৎসবাদিতে নানাবিধ বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, নিয়ম-কানুন বাঁধিয়া দিতেছিলেন। তিনি যখন রাখাল মহারাজকে সেই সব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা, তুই কি বলিস?' (স্বামী বিবেকানন্দ রাখাল মহারাজকে এই নামেই ডাকিতেন) রাখাল মহারাজ অনুমোদন করেন নাই। বলিলেন, 'আমার তো এত বাঁধাবাঁধি ভাল লাগে না। সন্ন্যাসীর আবার এত বিধি-নিষেধ কেন? যখন তোমরা বিধি বেঁধে দিলে তখনই তো নানা-প্রকার প্রভেদের সৃষ্টি করলে!' স্বামীজী তাঁহার



স্বামী ব্রহ্মানন্দ

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪

যুক্তি স্বীকার করিলেন, কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

*　　　*　　　*

স্বভাবতঃ শান্ত, স্বল্পবাক্, অথচ কি বিরাট কর্ম করিয়া গিয়াছেন! ভুবনেশ্বরের মঠ-প্রতিষ্ঠা, দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ এবং কেন্দ্র ও মঠাদি স্থাপন—নীরবে কত কর্ম করিয়াছেন। তাঁহার অধিনায়কত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য কত বিস্তৃত হইয়াছে, অথচ কেমন একটা নির্লিপ্তভাব! ভুবনেশ্বরের মঠে এক ফটো দেখিয়াছিলাম, ফরশির নল মুখে, অথচ চক্ষু স্তিমিত, উর্ধ্বদৃষ্টি, মৃদু মৃদু হাসিতেছেন ইহাই কি তাঁহার স্বরূপ! এই কি ব্রহ্মানন্দ? 'উদ্বোধনে'র সুবর্ণ জয়ন্তীর দিনে তাঁহার কথা স্মরণ না করিয়া পারি না।

*　　　*　　　*

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

'উদ্বোধনে'র পঞ্চাশ বৎসর

'উদ্বোধন'-প্রতিষ্ঠা

১৩০৫ সনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ আলমবাজার (২৪ পরগনা) হইতে বেলুড় (হাওড়া) নীলাম্বর মুখার্জির বাগান বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। ইহার কিছু কাল পরই আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মঠের মুখপত্ররূপে একটি বাংলা দৈনিক পত্র প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া প্রথমতঃ একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করা স্থির হয়। স্বামীজী এই পত্রের নাম রাখেন—'উদ্বোধন'। ইহার প্রচ্ছদ-পটে উদ্‌গীত উপনিষদের ওজঃপ্রদায়িনী "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—'উঠ, জাগ এবং শ্রেষ্ঠ আচার্য সমীপে যাইয়া সম্যক জ্ঞান লাভ কর' বাণীও তাঁহারই নির্বাচিত। 'উদ্বোধন' নাম এবং ঐ বাণী—উভয়টিতে মোহনিদ্রাভিভূত নর-নারীকে জাগ্রত করিবার ভাব বিশেষরূপে পরিস্ফুট। স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতকে এই পাক্ষিক পত্রের প্রথম-সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর ইহার পরিচালনের সকল দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে স্বামীজীর প্রদত্ত এক হাজার টাকা এবং গৃহস্থ ভক্ত হরমোহন মিত্রের নিকট হইতে ধারপ্রাপ্ত এক হাজার টাকা লইয়া কার্যে নিযুক্ত হন। স্বামী ত্রিগুণাতীত জাতির সেবার উদ্দেশ্যে 'উদ্বোধন'-পরিচালনে যে মনীষা ও কর্ম-শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা যথার্থই অতুলনীয়।

পাক্ষিক 'উদ্বোধন' ও 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী'

১৩০৫ সনের ১লা মাঘ স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক পাক্ষিক 'উদ্বোধন' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার আয়তন ছিল—ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে এক মাস (দুই সংখ্যা) পাক্ষিক 'উদ্বোধন'-প্রকাশ বন্ধ থাকিত।

'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত যে সকল প্রবন্ধ হইতে নবযুগ-প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বার্তাবাহী 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী'র সূচনা হয়, উহাদের মধ্যে প্রথম বর্ষের (১৩০৫ মাঘ—১৩০৬ পৌষ) প্রথম-সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ স্বামী বিবেকানন্দের "প্রস্তাবনা", শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম-অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের "পরমহংসদেবের উপদেশ" (ক্রমশঃ), শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম-সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক তৎকালীন 'রামকৃষ্ণ মিশন সভা'য় প্রদত্ত বক্তৃতা-বলীর সারাংশ (ক্রমশঃ) এবং ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক স্বামীজীর ইংরেজী "রাজযোগ" গ্রন্থের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

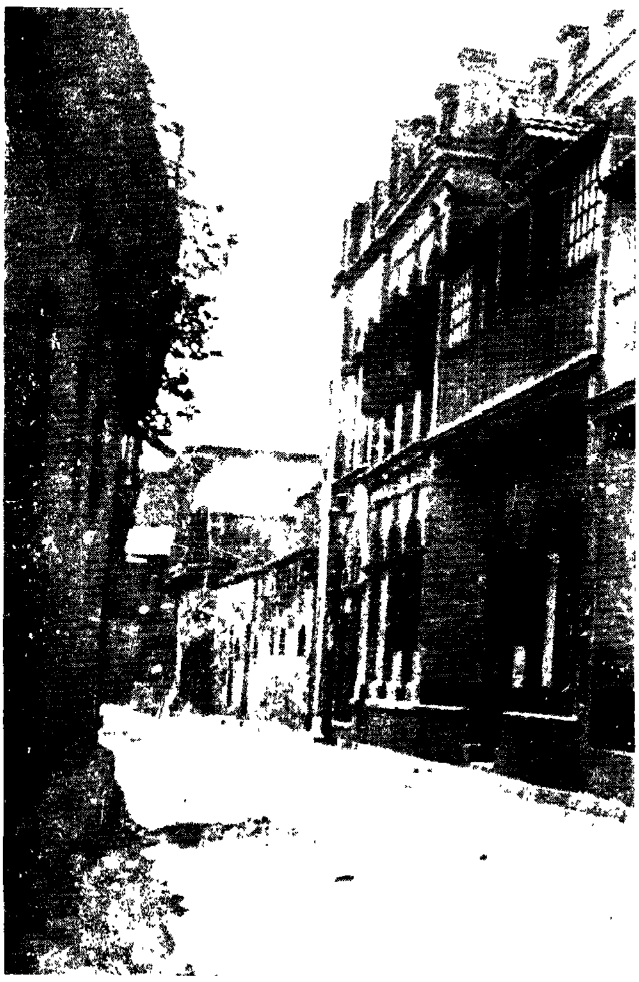
ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন। পরে তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয়-সম্পাদক এবং পরে পঞ্চম-অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রথম হইতেই 'উদ্বোধন' পত্রের সহিত বিশেষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনিই স্বামীজীর ইংরেজী "ভক্তিযোগ", "কর্ম্মযোগ", "জ্ঞানযোগ" "ভক্তিরহস্য", কথোপকথন ও বক্তৃতা প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী' প্রবর্তন করেন। এই অনুবাদসমূহের কিছু কিছু প্রথম কয়েক বৎসর 'উদ্বোধনে'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রথম বর্ষ হইতে তাঁহার মহাসমাধি লাভের পূর্ব পর্যন্ত বহু মৌলিক প্রবন্ধও 'উদ্বোধনে' প্রকাশ করেন। 'উদ্বোধন' পত্রের উন্নতি-সাধনে এবং 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী' সৃজনে তাঁহার অবদান অপরিসীম।

পাক্ষিক 'উদ্বোধনে'র অন্যান্য যে সকল প্রবন্ধ 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী'র শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে উহাদের মধ্যে প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় স্বামীজীর বিখ্যাত কবিতা "সখার প্রতি" এবং তৃতীয় সংখ্যায় তাঁহার লিখিত "জ্ঞানার্জ্জন" ভাবসম্পদে অতুলনীয়। এই শেষোক্ত সংখ্যার সংবাদে লিখিত আছে, "বরাহনগরের ভগ্নগৃহে যে ১৭।১৮টি যুবক দৈববলে বিশ্বাসী হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে।" চতুর্থ সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধনে'র অন্যতম প্রধান গ্রন্থ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের "শ্রীরামানুজ-চরিত" প্রকাশিত হইতে থাকে। পঞ্চম সংখ্যায় স্বামীজীর "ম্যাকসমূলার কৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি" বাহির হয়। ষষ্ঠ সংখ্যা হইতে স্বামীজীর "বর্ত্তমান ভারত", নবম সংখ্যা হইতে শ্রীম-কথিত "শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ-কথামৃতের" অংশবিশেষ এবং দশম সংখ্যা হইতে স্বামীজীর "ভাববার কথা" প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রাগুক্ত "প্রস্তাবনা" প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। এই শেষোক্ত সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক কলিকাতায় যে প্লেগরিলিফ কার্য পরিচালিত হইয়াছিল উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই দুরূহ কার্যে ভগিনী নিবেদিতা সম্পাদিকা, স্বামী সদানন্দ প্রধান কার্যাধ্যক্ষ এবং স্বামী শিবানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ সহকারী ছিলেন। শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে বর্তমান 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে বলিয়াছেন যে, এই কার্যের জন্য অর্থসংগ্রহে ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা প্লেগাক্রান্তা হইলে নিবেদিতা তাঁহাকে সেবা-শুশ্রূষা করিতে চাহিয়া-ছিলেন। কিন্তু ইহার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভগিনী নিবেদিতার অক্লান্ত চেষ্টায় কলিকাতা ঠনঠনিয়ায় প্লেগের রোগীদের জন্য একটি সাময়িক হাসপাতাল স্থাপন করা হইয়াছিল। পঞ্চদশ সংখ্যা হইতে স্বামীজীর "বিলাত-যাত্রীর পত্র" প্রকাশিত হইতে থাকে। এই গুলি পরে "পরিব্রাজক" পুস্তকাকারে বাহির হয়।



স্বামী সারদানন্দ

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪



উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪

'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষের (১৩০৬ মাঘ—১৩০৭ পৌষ) প্রথম সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত কবিতা "নাচুক তাহাতে শ্যামা," ষষ্ঠ সংখ্যায় তাঁহার লিখিত "বাঙ্গালা ভাষা," দশম সংখ্যা হইতে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" (ক্রমশঃ) প্রকাশিত হইতে থাকে। তৃতীয় বর্ষের (১৩০৭ মাঘ—১৩০৮ পৌষ) একাদশ সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধনে'র প্রচ্ছদ-পটে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সিল-মোহর মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। চতুর্থ বর্ষের (১৩০৮ মাঘ—১৩০৯ পৌষ) ষষ্ঠ সংখ্যায় (১৩০৯, আষাঢ়) স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি লাভের সংবাদ অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। নবম সংখ্যা হইতে স্বামীজীর "হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" এবং একাদশ সংখ্যা হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীতের "ব্রহ্মচর্য্য" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ১৩০৯ সনের কার্তিক মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীত স্যান্‌ফ্র্যানসিস্‌কো বেদান্ত সোসাইটীর কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া কলম্বো হইতে আমেরিকা গমন করেন।

পঞ্চম বর্ষের (১৩০৯ মাঘ—১৩১০ পৌষ) প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ স্বামী সারদানন্দের "ভারতে শক্তিপূজা," পঞ্চম সংখ্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দের "গুরু" এবং ষষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের "সাধন—প্রাণায়াম" প্রকাশিত হয়। নবম সংখ্যা হইতে স্বামী সারদানন্দের "গীতাতত্ত্ব" এবং ষষ্ঠ বর্ষের (১৩১০ মাঘ—১৩১১ পৌষ) পঞ্চদশ সংখ্যা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দের "তিব্বতে তিন বৎসর" বাহির হইতে থাকে। বিংশ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আছেঃ "সমগ্র প্রজাশক্তির ভিতর কি কোন মহাশক্তি নিদ্রিত নাই, যাহা জাগরিত হইলে রাজশক্তির সহায়তা-নিরপেক্ষ হইয়া প্রজাকুল নিজেদের হিত নিজেরা সাধন করিতে পারে? * * রাজনৈতিক আন্দোলনও একেবারে ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু বুঝিতে হইবে ইহাই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উপায় নহে। সমাজরূপ বিরাট দৈত্য জাগিয়া উঠিলে নানারূপে নানাভাবে চেষ্টা করিবে।" এই মন্তব্যে 'উদ্বোধনে'র আদর্শ পরিব্যক্ত। একবিংশতি সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছেন, "জাতীয় ভাব-উদ্বোধনের প্রতিবন্ধক এ দেশে দুইটি। যাঁহারা বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত, তাঁহারা সময়ে সময়ে জাতীয়তা লইয়া গলাবাজি করেন কিন্তু কার্য্যকালে পদোন্নতি ও আত্মীয়-স্বজনের উন্নতি ভিন্ন অন্য বিষয়ে মন দিবার সুযোগ পান না। আর এক প্রকৃতির লোক—যাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন, তাঁহারা দেশের জন্য প্রাণ দেওয়াকে মায়ার অন্তর্গত বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া হরিনামের মালা জপ করেন!" প্রথমোক্ত দোষগুলি এখনও দূর হয় নাই; এই জন্য দলাদলি, হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ এবং তপসিলভুক্ত জাতিসমূহের সমস্যা প্রভৃতি বিদ্যমান। শেষোক্ত ত্রুটির জন্য দেশে এখনও ব্যাপক ভাবে জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হয় নাই।

সপ্তম বর্ষের (১৩১১ মাঘ—১৩১২ পৌষ) অষ্টাদশ সংখ্যা হইতে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" বাহির হইতে থাকে। এই সকল প্রবন্ধ পরে 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলী'রূপে প্রকাশিত হয়।

পাক্ষিক 'উদ্বোধনে'র লেখকগণ

পাক্ষিক 'উদ্বোধনে'র লেখকগণের মধ্যে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা ব্যতীত প্রথিতনামা গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মোক্ষদাচরণ

সামাধ্যায়ী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী পরমানন্দ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাসিক 'উদ্বোধন'

দশম বর্ষ (১৩১৪ মাঘ—১৩১৫ পৌষ) হইতে 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রে পরিণত হয়। ইহার আয়তন ছিল—ডিমাই ৬৪ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য পূর্ববৎ।

এই বর্ষের একাদশ সংখ্যা হইতে স্বামী সারদানন্দের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ" এবং চতুর্দশ বর্ষের (১৩১৮ মাঘ—১৩১৯ পৌষ) প্রথম সংখ্যা হইতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের "ভারতের সাধনা" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'উদ্বোধন গ্রন্থাবলীর' মধ্যে এই দুই খানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'উদ্বোধনে'র শারদীয়া ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংখ্যা

৩৮শ বর্ষ (১৩৪৩ সন) হইতে গত মহা-যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বৎসর দেশ-প্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া 'উদ্বোধনে'র সচিত্র শারদীয়া সংখ্যা বর্দিত কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ-শত-বার্ষিকী সংখ্যারূপে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ বহু মনীষীর প্রবন্ধ কবিতা ও চিত্রে সুশোভিত হইয়া বৃহদাকারে বাহির হয়। পাঠকগণের চাহিদার জন্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

'উদ্বোধনে'র কার্যালয় ও কার্যাধ্যক্ষ এবং প্রেস ও প্রকাশক

'উদ্বোধনে'র প্রথম কার্যালয় স্থাপিত হয়—কলিকাতা, কম্বুলেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, গিরীন্দ্র মোহন বসাকের বাটীতে। প্রথম বর্ষ হইতে 'উদ্বোধনে'র চতুর্থ বর্ষের ১৮শ সংখ্যা (১৩০৯, কার্তিক) পর্যন্ত স্বামী ত্রিগুণাতীত কার্যাধ্যক্ষ ও সম্পাদক এবং পূর্বোক্ত গিরীন্দ্র বাবু প্রথম বর্ষ হইতে অষ্টম বর্ষের ১৮শ সংখ্যা (১৩১৩, কার্তিক) পর্যন্ত প্রকাশক ছিলেন। প্রথম হইতেই 'উদ্বোধন প্রেস' নামে 'উদ্বোধনে'র একটি নিজস্ব প্রেস ছিল। এই প্রেসটিও গিরীন্দ্র বাবুর বাটীতেই স্থাপন করা হইয়াছিল। পরে ইহা নানা কারণে স্বামী বিবেকানন্দের জীবদ্দশায়ই বিক্রয় করা হয়। প্রথম বর্ষ হইতে এই প্রেসেই 'উদ্বোধন' মুদ্রিত হইতে থাকে।

১৩১৩ সনের প্রায় মধ্যভাগে কলিকাতা, বাগবাজার, ৩০নং বোসপাড়া লেনে 'উদ্বোধন কার্যালয়' স্থানান্তরিত হয়। অষ্টম বর্ষের ঊনবিংশ সংখ্যা হইতে (১৩১৩ অগ্রহায়ণ) ব্রহ্মচারী অমূল্যচরণ (বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ স্বামী শংকরানন্দ) কর্তৃক ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন 'সারদা প্রেস' হইতে এবং নবম বর্ষ ১৩১৩, মাঘ) হইতে কিশোরী মোহন রায় কর্তৃক ৯৩নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট 'সারদা প্রেস' হইতে পাক্ষিক 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হইতে থাকে। দশম বর্ষ (১৩১৪, মাঘ) হইতে মাসিক 'উদ্বোধন' কার্যাধ্যক্ষ স্বামী সত্যকাম 'হাওড়া বি আই প্রিন্টিং ওয়ার্কস' হইতে প্রকাশ করেন।

এই বৎসর হইতে 'উদ্বোধন কার্যালয়' বাগবাজার ১২, ১৩নং গোপাল চন্দ্র নিয়োগী

উদ্বোধনের সম্পাদক-মণ্ডলী
১৩১৮—১৩২৬



স্বামী প্রজ্ঞানন্দ



স্বামী মাধবানন্দ



স্বামী গঙ্গেশানন্দ



স্বামী ধীরানন্দ

উদ্বোধনের সম্পাদক-মণ্ডলী

১৩২৬—১৩৫৪



স্বামী বাসুদেবানন্দ



স্বামী সুন্দরানন্দ, উদ্বোধনের বর্ত্তমান সম্পাদক

লেন—পরে ১নং মুখার্জি লেন—বর্তমানে ১নং উদ্বোধন লেন 'উদ্বোধনে'র নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এই বাড়ীটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অবস্থানের জন্য নির্মিত। ইহার দ্বিতলে শ্রীশ্রীমা বাস করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গিনী গোলাপ-মা যোগীন-মা প্রভৃতিও এই বাটীতে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবাদি করিতেন। এজন্য ইহা 'মায়ের বাড়ী' নামে ভক্তসংঘে পরিচিত। 'উদ্বোধনে'র প্রধান অধ্যক্ষ-রূপে স্বামী সারদানন্দও এই বাড়ীতেই থাকিতেন। ইহার একতলায় 'উদ্বোধন কার্যালয়' অবস্থিত।

একাদশ বর্ষ (১৩১৫, মাঘ) হইতে 'উদ্বোধন' ৬৪-১, ৬৪-২, সুকিয়া ষ্ট্রীট 'লক্ষ্মী প্রেস' হইতে স্বামী সত্যকাম কর্তৃক এবং চতুর্দশ বর্ষ (১৩১৮, মাঘ) হইতে ব্রহ্মচারী কপিল (স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ) কর্তৃক উক্ত প্রেস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ২২শ বর্ষ (১৩২৬, মাঘ) হইতে 'উদ্বোধন' ৬৭।৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট 'ইউনিয়ন প্রেস' হইতে এবং এই বর্ষের সপ্তম সংখ্যা হইতে ৭১।১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস' হইতে মুদ্রিত হয়। ২৩শ বর্ষ (১৩২৭, মাঘ) হইতে 'উদ্বোধনে'র বার্ষিক মূল্য ধার্য হয় সডাক ২॥০ টাকা। ২৪শ বর্ষ (১৩২৮ সন) হইতে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্র নাথ 'উদ্বোধনে'র কার্যাধ্যক্ষের কার্য করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মচারী কপিল পূর্ববৎ প্রকাশক থাকেন।

৩১শ বর্ষের অষ্টম সংখ্যা (১৩৩৬, ভাদ্র) হইতে স্বামী আত্মবোধানন্দ 'উদ্বোধনে'র কার্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী নবম সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধন' ৩১নং সেণ্ট্রাল এভেনিউ 'আর্ট প্রেস' হইতে উক্ত স্বামীজী কর্তৃক প্রকাশিত হইতে থাকে। ৩৫শ বর্ষ হইতে এই মাসিক পত্র ২৫৯নং আপার চিৎপুর রোড —বর্তমানে ২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট 'শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং' হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

কাগজ ও মুদ্রণ-ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় জন্য ৪৯শ বর্ষ (১৩৫৩, মাঘ) হইতে 'উদ্বোধনে'র বার্ষিক মূল্য ৩৲ নির্ধারিত হয়। বর্তমানে প্রতি সংখ্যা রয়াল ৫৬ পৃষ্ঠায় বাহির হইতেছে। কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিক্রমে এই সচিত্র সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হইল। এই বৎসর হইতে মুদ্রণব্যয়াধিক্যের জন্য বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা ধার্য করা হইয়াছে।

'উদ্বোধনে'র সম্পাদক-মণ্ডলী

স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (১৩০৫, মাঘ) হইতে চতুর্থ বর্ষের কার্তিক সংখ্যা (১৩০৯) পর্যন্ত 'উদ্বোধনে'র সম্পাদক ছিলেন। ইহার পর ২৪শ বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যা (১৩২৯) পর্যন্ত 'উদ্বোধনে'র সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হয় নাই। এই সময়ে সম্পাদকের নাম-মুদ্রণ আইনতঃ বাধ্যতামূলক ছিল না। ১৩০৯ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধনে'র বর্ষ অনুসারে (মাঘ—পৌষ) ১৩১৪ সন পর্যন্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ, ১৩১৪ সন হইতে ১৩১৮ সন পর্যন্ত স্বামী সারদানন্দ, ১৩১৮ সন হইতে ১৩২০ সন পর্যন্ত স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, ১৩২০ সন হইতে ১৩২২ সন পর্যন্ত ব্রহ্মচারী নির্মল (স্বামী মাধবানন্দ), ১৩২২ সন হইতে ১৩২৬ সন পর্যন্ত ব্রহ্মচারী বিমল চৈতন্য (স্বামী দয়ানন্দ) ও ব্রহ্মচারী শান্তি চৈতন্য (স্বামী গঙ্গেশানন্দ), ১৩২৬ সন হইতে ১৩২৯ সনের শ্রাবণ সংখ্যা পর্যন্ত স্বামী বাসুদেবানন্দ 'উদ্বোধনে'র সম্পাদকের কার্য পরিচালন করেন। ২৪শ বর্ষের অষ্টম সংখ্যা (১৩২৯, ভাদ্র) হইতে স্বামী সারদানন্দ

ও স্বামী বাসুদেবানন্দের নাম যুগ্ম-সম্পাদক-রূপে মুদ্রিত হইতে থাকে। এই সময় হইতে সম্পাদকের নাম-মুদ্রণ আইনতঃ বাধ্যতামূলক হয়। ১৩৩৪ সনের ১লা ভাদ্র স্বামী সারদানন্দ মহাসমাধি লাভ করিলে তাঁহার স্থলে স্বামী শুদ্ধানন্দ যুগ্ম-সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। ৩৭শ বর্ষের দশম সংখ্যা (১৩৪২, কার্তিক) হইতে স্বামী বাসুদেবানন্দের স্থলে স্বামী সুন্দরানন্দ যুগ্ম-সম্পাদকের কার্য করিতে আরম্ভ করেন। ৩৮শ বর্ষের নবম সংখ্যা (১৩৪৩, আশ্বিন) হইতে স্বামী সুন্দরানন্দ একক সম্পাদকের কার্য করিতেছেন।

জগৎ কি স্বপ্নবৎ ?

(শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ অবলম্বনে)

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রামু চাষা বড় আশায় ক্ষেতের কাজে ছিল রত,
ভীষণ রোগে শিশু হারু হলো হঠাৎ শয্যাগত,
খবর গেল রামুর কাছে অমনি সে ঘরে গেল
শত যতন সত্ত্বে হারু শেষ শয়নে শায়ী হলো।

সবারই দুখ হলো রামুর চোখে এলো না জল,
নিঠুর তারে পত্নী বল্লে কেঁদে কেঁদে হয়ে পাগল।
রামু হেসে বল্লে "আমি কাঁদিনি কেন বলছি প্রিয়ে,
রাতে দেখেছি স্বপ্ন এক শোন তবে মনটি দিয়ে,—

হেরি আমি হয়েছি রাজা, বসেছি স্বর্ণ-সিংহাসনে
আট ছেলের হয়েছি পিতা, আনন্দ ধরে না প্রাণে!
নিদ্রা ভঙ্গে মহা ভাবনায় আকুলিত হলো হিয়া
সেই ছেলে কটি কিবা হারুর জন্য কাঁদবো প্রিয়া ?"

"মণিপুর-পুরাণ"

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের ভারতীয় হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা, এদেশে আগত আর্য এবং নানা অনার্য জাতির ধর্ম ও সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল। বৈদিক সংস্কৃত ভাষা এবং হোমাদি অনুষ্ঠান লইয়া, ইন্দ্র-অগ্নি-মিত্র-বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজক আর্যগণ কবে ভারতে আসিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না—বিভিন্ন পণ্ডিত এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন ও করেন, কিন্তু যে মতটী আমার নিকট যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয় তাহা হইতেছে এই যে আর্যেরা মেসোপোতামিয়া বা আধুনিক ইরাক দেশ হইয়া পারস্য বা ঈরান ও আফগানিস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-এর পরে কোনও সময়ে ভারতে প্রবেশ করিতে থাকেন। ভারতে যে সমুদয় অন্-আর্য জাতির মানুষের সঙ্গে এই নবাগত আর্য্যদের সংঘর্ষ বা সঙ্ঘাত ও পরে মিলন ও মিশ্রণ ঘটিল, তাহারা ছিল তিনটী বিভিন্ন শ্রেণীর অথবা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ—[১] দ্রাবিড় (দাস বা দস্যু নামে আর্যদের দ্বারা অভিহিত), [২] নিষাদ (নিষাদদের উত্তর পুরুষ পরে কোল্ল ভিল্ল অর্থাৎ কোল ও ভীল নামে পরিচিত হয়—ইহাদের বংশধর হইতেছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোররা, হো, বীর-হড়, খাড়িয়া, ভূমিজ, কোরকু, গদব, শবর এবং ভীল প্রভৃতি মধ্য ও পূর্ব ভারতের "আদিবাসী" জাতি), এবং [৩] কিরাত (ইহারা মোঙ্গোল জাতীয়, ইহাদের নানা ভাষা হইতেছে ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—নেপালের ও হিমালয়ের সানুদেশের আদিম অধিবাসী নেবার, মগর, গুরুঙ্, কনাবরী, টীমাল, কিরান্তী, তামাঙ্, লেপ্চা, আবর, আকা, মিগুর ডিফ্লা প্রভৃতি, এবং উত্তর বঙ্গ ও আসামের তথা ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসিগণ—বোডো, মিকির, মিশ্‌মি, নাগা, কুকি, মেইতেই বা মণিপুরী প্রভৃতি ও আসামে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে আগত অহমগণ হইতেছে কিরাত-জাতীয় মানুষ। নিষাদগণ বোধ হয় ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী—ইতিহাস-পূর্ব যুগ হইতে ইহারা এদেশে বাস করিতেছে, ইহাদেরই সত্যকার "আদিবাসী" বলা যায়। নিষাদগণের পরে পশ্চিম এশিয়া হইতে দ্রাবিড়দের আগমন হয়—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০০ এর পূর্বেই পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বিরাট নাগরিক সভ্যতা যাহার ধ্বংসাবশেষ এখন আমাদের বিস্মিত করিতেছে তাহা হইতেছে খুব সম্ভব এই দ্রাবিড়-ভাষী জাতির মানুষের সৃষ্টি। নিষাদগণ ও দ্রাবিড়গণ প্রায় সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে কিরাতদের উপস্থিতির কথা আমরা যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ হইতে পাই; অন্ততঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০০০ বৎসরের পূর্ব হইতে কিরাতগণ আসাম ও হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া নেপালে, উত্তর বিহার ও উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গে ও আসামে উপনিবিষ্ট হইতে থাকে।

প্রভুশক্তিযুক্ত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুধীর এবং কল্পনা-শীল আর্যগণ উত্তর ভারতে দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিরাতগণের সংস্পর্শে আসিল, তাহাদের বিজেতা রূপে। প্রথমটায় বিভিন্ন জাতির মানুষ বলিয়া ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, যাহার আভাস আমরা ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে পাই। পরে আর্যগণ এদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে,

দেশের আদিম অধিবাসীরা আর্য্যদের ভাষা গ্রহণ করিতে থাকে,—দ্রাবিড় ও নিষাদ এবং কিরাত গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা বা উপভাষার মধ্যে ঈপ্সিত ও আবশ্যক যোগসূত্র রূপে আর্যভাষার বিশেষ উপযোগিতা বা কার্য্যকারিতা ছিল বলিয়া, আর্যভাষা সহজেই প্রসার লাভ করিতে থাকে। একই আর্য-ভাষা লইয়া যখন আর্য, দ্রাবিড় ও নিষাদ এবং উত্তরে হিমালয় অঞ্চলে ও পূর্বে উত্তর বিহার ও উত্তর বঙ্গে এবং পূর্ব বঙ্গ ও আসামে একটী সমভাষিক জনগণ বা রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছিল, তখন হইতে জন-সমাজের অলক্ষ্যে ইহাদের ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত মিলন ঘটিতে থাকে। এই সকল জাতির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন লোক কিছু-কিছু ছিল, যাহারা অন্য জাতির ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত মিশ্রণ চাহিত না। কিন্তু আর্যজাতির ব্রাহ্মণাদি চিন্তানেতাদের মনীষা, তাঁহাদের উদারতা ও দূরদৃষ্টি, এই সাংস্কৃতিক মিলনকে একটী পরিপূর্ণ নবীন সংস্কৃতির গঠনের পথে চালিত করিতে সমর্থ হয়। অনার্য দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিরাতের প্রাচীন দেববাদ ও পুরাণকথা, আর্য দেববাদ ও পুরাণ-কথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া, ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত হইয়া, হিন্দু পুরাণকথায় পরিণত হয়।

প্রাচীন ভারতে হিন্দু ধর্মে এই দুই ধারার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সচেতন ছিলেন। তাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্র ও অনুষ্ঠানকে দুইটী মুখ্য ভাগে বিভাগ করেন—বৈদিক শাস্ত্র বা "নিগম", এবং বেদেতর বা অবৈদিক শাস্ত্র বা "আগম"; বেদান্ত-শাস্ত্রও "নিগমান্ত বিদ্যা" নামে পরিচিত। হিন্দুমহাজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অনার্য জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহাদের নিজস্ব দেবতাদের ও প্রাচীন রাজাদের কাহিনী—এক কথায়, তাহাদের পুরাণ-কথা—নূতন মিলিত আর্যানার্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া, কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া, সংস্কৃত ভাষায় নবকলেবর প্রাপ্ত হয়, ও তদনন্তর নিখিল ভারতের গ্রহণযোগ্য হয়। এই ভাবে বিশাল অরণ্যানীবৎ হিন্দুজগতের পুরাণ-কথা, সংস্কৃত রামায়ণে, মহাভারতে ও অষ্টাদশ মহাপুরাণে ও উপপুরাণে, দ্রাবিড় দেশের নানা স্থল-পুরাণে, "স্বয়ম্ভুপুরাণ" প্রভৃতি নেপালের বৌদ্ধ-পুরাণে, এবং প্রাকৃতে ও আধুনিক আর্য ভাষায় নিবদ্ধ এবং বিভিন্ন অনার্য ভাষায় মৌখিক কাহিনীরূপে প্রচারিত, সমগ্র ভারতের পুরাণ-কথা গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহার একটা বড় অংশ প্রাচীন কালেই (অর্থাৎ এদেশে তুর্কীদের আগমনের পূর্বে) এবং কিছু পরেও সংস্কৃত পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, বহু স্থলে একটী সমগ্র অনার্য-ভাষী জাতি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া দুই তিন পুরুষের মধ্যে হিন্দুসমাজ-ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে আমাদের চোখের সামনে বহু দ্রাবিড়-গোষ্ঠ জাতির লোক, কোল-জাতির লোক, এবং নেপাল ও অন্যত্র কিরাত-জাতির লোক হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মানুভূতি এবং পুরাণ-কথা যথারীতি সংস্কৃতে নীত হইয়া, বৃহত্তর হিন্দু পুরাণের অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বহুশঃ সংস্কৃত ভাষায় নীত হওয়ার ফলে, এই প্রকার অনুভূতি, অনুষ্ঠান ও পুরাণ নিখিল ভারতের দ্বারাও গৃহীত হইয়াছে।

বহু স্থলে আবার এইরূপ অনার্য পুরাণ আর্যানার্য বা হিন্দু পুরাণের প্রভাবে আসিয়া গেলেও, নিজের একটী সংস্কৃতেতর আদিম-গন্ধী রূপ রক্ষা করিয়া বিদ্যমান আছে, তাহা দেখা যায়। মধ্য ভারতের বিভিন্ন দ্রাবিড় ও কোল-ভাষী জাতির মধ্যে, এবং এখন আর্য-

ভাষী হইলেও মূলতঃ দ্রাবিড় ও কোল-ভাষা যাহারা বলিত এমন হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে লব্ধ-প্রবেশ নানা জাতির মধ্যে, যে-সকল পুরাণ-কথা প্রচলিত আছে, সেগুলির সংগ্রহ ও বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ Verrier Elwin ভেরিয়ার্ এল্‌উইন্ এবিষয়ে লক্ষণীয় কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

গত নভেম্বর মাসে (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে) আমি মণিপুরে যাই—কেবল দুই দিনের "ঝাঁকী দর্শন" এবার ঘটিয়াছে। কিন্তু কিছু বই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, মণিপুরের ইতিহাস ও folk-lore অর্থাৎ "লোকযান" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যয়নও করিয়াছি, এবং স্থানীয় দুই-চারিজন সুধী ও পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপও করিয়াছি। মণিপুরীরা এখন হিন্দু, ইহারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যতদূর জানা যায়, খ্রীষ্টীয় ১৫০০-র পূর্বেই ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রসার লাভ করে। মণিপুরের রাজারা ও অভিজাতশ্রেণীর ব্যক্তিরা, পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর ধর্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ করেন; আবার নিজেদের আদি কালের ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং নানা অনুষ্ঠানও বজায় রাখেন; এই উভয়ের সংমিশ্রণে মণিপুরী হিন্দুধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট হইতে আগত বাঙ্গালী হিন্দুরাও এই ধর্ম প্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন; ইঁহাদের অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর নগর, মণিপুরে হিন্দু সংস্কৃতির একটী প্রাচীন কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। মণিপুরী (বা মেইতেই) জাতি, বিরাট কিরাত জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত কুকি (বা চিন, অথবা কুকিচিন) প্রশাখার একটী বিশিষ্ট উপজাতি। সৌন্দর্য-বোধে এবং কর্মকুশলতায়, তথা চিন্তাশীলতায়, মানসিক শক্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাত-জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য। নিজেদের প্রাচীন দেবকথা ইহারা পরিত্যাগ করে নাই; ইহা ইহাদের মধ্যে একাধারে রক্ষণশীলতার ও জাতীয়তাবোধের এবং তদানুষঙ্গিক আত্মসম্মান-জ্ঞানের ও নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচায়ক; আবার ওদিকে সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নিজেদের পুরাণ-কথাকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টাতেও, অজ্ঞাতসারে আর্যানার্য-সম্মেলনের মহৎ কাজে ইহাদের অংশগ্রহণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। মণিপুরের প্রচলিত হিন্দু ধর্মে এক দিকে যেন রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতির সম্মাননীয় স্থান আছে, অন্য দিকে তেমনি বিশিষ্ট মণিপুরী দেবকাহিনী ও নানা হিন্দু-পূর্ব যুগের রীতি-নীতি অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ইহাদের ধার্মিক ও সামাজিক জীবনের অনেকটা জুড়িয়া আছে; এবং মণিপুরের চিন্তাশীল নেতৃবর্গের আকাঙ্ক্ষা, এই উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য-সাধন, এবং মণিপুরের জীবনে হিন্দু দর্শন ও উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ কথাগুলিকে সুপরিস্ফুট করিয়া তোলা; মণিপুরকে নিখিল ভারতের অংশরূপেই ইহারা দেখেন।

মণিপুরের দেব-কথা ও মণিপুরের ইতিহাস, কি ভাবে হিন্দু ভারতীয় দেব-কথা ও ইতিহাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়াছে, কি ভাবে মণিপুরের দেব-কথা ও ঐতিহ্যের টানার উপরে ভারতীয় মিশ্র আর্যানার্য হিন্দুদের দেব-কথা ও ঐতিহ্যের পড়িয়ান আসিয়া, মণিপুরী হিন্দুত্বের অভিনব ধূপছায়া বস্ত্র বয়ন করা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই ভাবে, মিশ্র মণিপুরী (মেইতেই বা কুকি-চিন্) ও হিন্দু-শাস্ত্রীয় পুরাণ-কাহিনীকে আমরা "মণিপুর-পুরাণ" আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি। বলা বাহুল্য, এই পুরাণ-কথা সংস্কৃত ভাষায় অথবা বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ হয় নাই—আংশিক ভাবে নৃতত্ত্ববিদ্যার পুস্তকে ইংরেজীতে

ইহা আঁসিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা এখনও মণিপুরীতেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় আছে—ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আসামের শানগোষ্ঠীর অহম বা অসম জাতির পুরা-কথা লইয়া তেমনি একখানি অলিখিত "অসম-পুরাণ"ও আছে। বাঙ্গালার ভগিনী, আর্য অসমীয়া ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্ত-সার পাওয়া যায়। অনুরূপ অলিখিত "ত্রিপুর-পুরাণ" সম্ভবতঃ ত্রিপুরা বা টিপ্‌রা জাতির প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে মিলিবে; এবং কাছাড়ীদের "হিড়িম্বা বা হেরম্ব-পুরাণ" এবং খাসিয়া ও জৈন্তিয়াদিগের "জয়ন্তী-পুরাণ"-ও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া আছে।

নিম্নে এই "মণিপুর-পুরাণ"-এর কতকগুলি লক্ষণীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

মণিপুরীদের প্রাচীন দেবতারা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দেবতাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হন। "মৈ" হইতেছেন ব্রহ্মা, "ইশিঙ্" বিষ্ণু, ও "নুঙ্‌শিং" শিব; তেমনি "শোরারেল" বা "শোরারেন্" হইতেছেন ইন্দ্র, "মারজিঙ" কুবের, "খোরিফাবা" বরুণ, "রাঙব্রেল" যম, "ইরুম্" অগ্নি, এবং "তাও-রোইনাই" হইতেছেন নাগরাজ অনন্ত।

শিব ও পার্বতী বিশেষ করিয়া মণিপুরে অবস্থানের জন্য অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মণিপুরে "নোঙমাইজিঙ" বা নীলকণ্ঠ-গিরিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কতকগুলি পর্বত বাসের জন্য তাঁহাদের মনঃপূত হইল। এই পর্বত-গুলি এখন মণিপুরের বিভিন্ন তীর্থ-রূপে পরিচিত, সহস্র সহস্র যাত্রী এই-সব স্থানে এখন গিয়া থাকে। মণিপুরে শিব নূতন করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার একটি নূতন নাম হইল—"পোইরেইতোন্", অর্থাৎ 'যিনি নূতন স্থানে আসিয়াছেন'।

শিব মণিপুরে আসিয়া সপ্তবীর্য "সানাজিঙ" বা স্বর্গভূমি হইতে সাত জন দেবতার আবির্ভাব ঘটাইলেন। ইঁহারা সাতটী গ্রহ-রূপে বিদ্যমান আছেন—(১) "নোঙমাইজিঙ" বা সূর্য, (২) "নিংথোউকাবা" অর্থাৎ চন্দ্র, (৩) "লেইপাক্-পোকু" অর্থাৎ মঙ্গল, (৪) "য়ুম্-সাইকে-সা" অর্থাৎ বুধ, (৫) "সাগোলসেল্" অর্থাৎ বৃহস্পতি, (৬) "ইরাই" অর্থাৎ শুক্র ও (৭) "থাঙজা" অর্থাৎ শনি। ইহাদের মধ্যে মঙ্গল ছিলেন মহিষমুণ্ডযুক্ত, বুধ গজমুণ্ড, বৃহস্পতি হরিণমুণ্ড ও শুক্র ব্যাঘ্রমুণ্ড।

শিব ও পার্বতী তৎপরে মণিপুর রাজ্যের ঈশান-কোণে (উত্তর-পশ্চিমে) অবস্থিত "কোউব্রু" বা কুমার-পর্বতে গিয়া অবস্থান করিলেন। মণিপুরে ইঁহাদের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, ইঁহারা এখানে আসিয়া রাস-নৃত্য করিবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসনৃত্য করিতেছেন, তখন গোপেশ্বর শিব ও দেবী রাসমণ্ডলের বাহিরে দ্বারে দ্বারপালের কার্যে নিযুক্ত। ভিতরে রাসনৃত্যের বাদ্য ও ধ্বনি শুনিয়া দেবীর আকাঙ্ক্ষা হইল যে, তিনিও রাস দর্শন করিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু তিনি শিব ও উমাকে অন্য কোনও উপযুক্ত স্থানে গিয়া নিজেরা যাহাতে রাসনৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নির্দেশ করিলেন। মহারাসের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে ইঁহারা মণিপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং "কোউব্রু"-পাহাড় রাসের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া শিব ও উমা বিশেষ প্রীত হইলেন। কিন্তু দেশটী নানা নদীর জন্য জলময় ছিল। যাহাতে দেশটী শুষ্ক হইয়া যায়, তজ্জন্য শিব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন আগমন করিলেন; একটী বিশেষ অঞ্চল জলশূন্য হওয়ায় উহা "বিষ্ণুপুর" নামে পরিচিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর সঙ্গে দশ জন দেবতা আসিলেন, "হাওবা শোরারেল" বা ইন্দ্র, "মারজিঙ" বা কুবের, "রাঙব্রেল্" বা যম, "খোরিফাবা" বা বরুণ, "ইরুম্-নিংথৌ" বা অগ্নি, "থাঙজিঙ" বা অশ্বিনীকুমার অথবা নিঋ‌র্তি,

"চিঙথেই-নিঙথোউ" বা ঈশান, "লোইয়া-নাকৃপা" বা বায়ু, এবং "নোঙসাবা" ও "কোঙবা-মেইরোম্বা"। ইঁহাদের চেষ্টায় সমস্ত দেশটী আর্দ্রতা হইতে মুক্ত হইল, এবং এই দশ-জন দেবতার প্রথম আটজন অষ্টদিক্‌পাল হইলেন, কেবল "নোঙসাবা" ও "কোঙবা-মেইরোম্বা" ইন্দ্রের সহিত পূর্বেরই অধিষ্ঠাতা হইয়া রহিলেন। মণিপুরে শিব ও পার্বতী আসিয়া পর্বতের অধিবাসী রূপে কেবল কিরাত-জাতীয় লোকেদের দেখা পান।

দেশটী পরিষ্কৃত ও সুসংস্কৃত হইলে পরে, শিব ও উমার রাসনৃত্যের আয়োজন হইল। জগৎ-পিতা ও জগন্মাতার মহারাস উপলক্ষ্যে দেবতারা নানা বাদ্য-যন্ত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্ত-নাগ নিজ মাথার মণিদ্বারা সাত দিন সাত রাত ধরিয়া, মহারাসের অবসান পর্যন্ত, সমগ্র দেশ আলোকিত করিয়া রাখিলেন ; সেইজন্য দেশটীর নাম হইল "মণিপুর"। মণিপুর এই ভাবে সৃষ্টির উষঃকালে হরপার্বতীর রাসনৃত্য দ্বারা পবিত্র হইল ; দেবতারা ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং মণিপুরের ভূমিকে আশীর্বাদ করিলেন—চিরকাল এই দেশ হরিদ্বর্ণ থাকিবে, এবং পরমেশ্বরের প্রতি দেশবাসীর অচলা ভক্তি থাকিবে। পূর্বে শিবের নাম অনুসারে দেশের নাম হইয়াছিল "শিব-নগর", মহারাসের পর হইতে ইহা "মণিপুর" নামেই প্রসিদ্ধ হইল।

দেবতারা শিবকেই দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু শিব অনন্ত-নাগকে দেশের রাজা করিলেন। বরাহ-রূপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে মণিপুরের ভূমিতে এক স্থানে একটী সুরঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহারই পার্শ্বে একটী পাহাড়ের উপরে অনন্তনাগের রাজপাট ও সিংহাসন স্থাপিত হইল। কার্তিকেয় ও গণেশের মূর্তি রাজবাটীর সিংহদ্বারের দুই পাশে স্থাপিত হইল। রাজবাটীর স্থাপনের পরে, সময় নির্দেশের জন্য একটী তালমান যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল। অনন্ত-নাগ দেবতাদের প্রীতির জন্য নৌকা লইয়া বাইচ-খেলার প্রবর্তন করিলেন। এই বাইচ-খেলায় দেবতা ও অপ্সরোগণ যোগ দিয়া আমোদ পাইলেন। দড়ি টানিয়া শক্তি-পরীক্ষা খেলার পরিবর্তে, লম্বা দণ্ড লইয়া টানাটানি খেলারও প্রবর্তন হইল। "মারজিঙ" বা কুবের-দেব, "কাঙ-জেই" অর্থাৎ পোলো খেলা আবিষ্কার করিলেন ; দেবতারা সাত জন, সাত জন করিয়া দুইটী প্রতিযোগী দলে বিভক্ত হইয়া এই ক্রীড়া প্রথম করিলেন। এই পোলো-খেলার দ্বারা দেবতারা প্রীত হন ; সেইজন্য দেশে কোনও মহামারী দেখা দিলে মণিপুরীরা দেবতাদের নামে পোলো-খেলার লাঠি ও গোলা উৎসর্গ করিয়া থাকে।

এই ভাবে মণিপুরের প্রথম রাজা হইলেন অনন্ত-নাগ। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া মণিপুর হইতে তিনি তাঁহার নিজ রাজ্য পাতালে ফিরিয়া গেলেন। অনন্ত-নাগ মণিপুরের প্রথম রাজা ছিলেন বলিয়া, মণিপুরের রাজাদের বিশেষ লাঞ্ছন হইতেছে, মুকুট মাথায় জটিল গ্রন্থির আকারে বিন্যস্ত নাগমূর্তি ; এই মূর্তির চিত্র তাঁহাদের রাজকীয় পতাকায় অঙ্কিত থাকে।

অনন্ত-নাগের পরে মণিপুরের রাজা হন চিত্রভানু নামে গন্ধর্ব। কি ভাবে তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সম্বন্ধে মণিপুরের প্রাচীন পুরাণ-কথায় কিছুই উল্লিখিত নাই।

মণিপুরে প্রথম মানুষের সৃষ্টি কি করিয়া হয়, তৎ-সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানটীকে হিন্দু-পূর্ব বা আর্য-পূর্ব যুগের মেইতেই বা মণিপুরী সৃষ্টি-কথা বলিতে পারা যায়। মণিপুরী ভাষার পুরাণ ("লৈথাক্‌-লৈখারোল্‌") অনুসারে, শিব এই সৃষ্টি-কথা গণেশকে প্রথমে শোনান। এই সৃষ্টি-কথা হইতেছে এই প্রকার :—

পরমেশ্বর "আতিয়া-গুরু-শি-দবা", স্বর্গে যাঁহার বাস ("আতিয়া" অর্থে আকাশ বা স্বর্গ, "গুরু" সংস্কৃত শব্দ, "শি-দবা" অর্থে অমর), মানব সৃজন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ দেহ হইতে "কোদিন্" নামে এক দেবতার আবির্ভাব করিলেন। কোদিন্‌কে আজ্ঞা দেওয়া হইল, এমন একটী প্রাণী সৃজন করিতে, যে জন্ম হওয়ার কারণেই মৃত্যুর অধীন হইবে। কোদিন্ তখন সাতটী ভেক ও সাতটী বানর সৃজন করিলেন, এবং শি-দবা গুরুর সমক্ষে এগুলি স্থাপিত করিলেন। শি-দবা গুরু কিন্তু ইহাতে খুশী হইলেন না; এই জীবগুলির জ্ঞান-বিচার এবং অনুভব-শক্তি ছিল না, ভাল-মন্দের ধারণা ছিল না, এইজন্য তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি কোদিন্‌কে বলিলেন—"দেখ, আমি এই দাঁড়াইয়া আছি; আমার রূপ বা ছায়া ধরিয়া কোনও প্রাণী সৃজন কর।" কোদিন্ তখন তদনুসারে নূতন একটী রূপ বা আকার গঠন করিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রাণ-শক্তি দেওয়া কোদিন্-এর সাধ্যের বাহিরে ছিল। তখন শি-দবা গুরু নিজ হইতে তাহাতে প্রাণ-বায়ু সঞ্চারিত করিলেন, এবং এইভাবে মানুষের উদ্ভব হইল। ভেক সাতটীকে তিনি জলে ছাড়িয়া দিলেন, ও বানর সাতটীকে পাহাড়ে পাঠাইলেন; মানুষ আসিয়া উপত্যকায় বাস করিতে লাগিল।

ইহার পরে আতিয়া-গুরু-শি-দবা সূর্য ("নুমিৎ") ও চন্দ্র ("থা") প্রস্তুত করিলেন, মানবের রূপে; এবং সূর্যের নাম হইল "কোঙ্গিন্-তু থোক্‌পা" ও চন্দ্রের "আশিবা"। ইহার পরে গুরু শি-দবা পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইলেন।

আতিয়া-গুরু-শি-দবা প্রথম প্রকট হন পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে একটী সুরঙ্গ-পথ দিয়া, এই সুরঙ্গ-পথ বা গহ্বর বরাহ-রূপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে হইয়াছিল। শি-দবা গুরুর সঙ্গে সাতজন অপ্সরা বা দেবীও পৃথিবীতে আসেন। এই সাতজন দেবী—মণিপুরী ভাষায় ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম আছে—সাত গ্রহ-দেবতার সঙ্গে বিবাহিত হন: এবং এই সাত দেব-দম্পতীর প্রত্যেকের একটী করিয়া পুত্র হয়। সেই পুত্রেরা মণিপুরী জাতির সাতটী "শালৈ" অর্থাৎ উপজাতির অথবা গোত্রের পূর্বপুরুষ। এই সাতটী গোত্রের, আর্য বা হিন্দু গোত্রের সঙ্গে মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে: যথা—(১) "অঙোম্" = ভরদ্বাজ, মতান্তরে কৌশিক; (২) "নিঙ্‌থৌজা" = শাণ্ডিল্য; (৩) "লুয়াঙ্" = কাশ্যপ; (৪) "খুমোন" বা "খুমোল্" = মৌদ্‌গল্য (এই গোত্র-নাম ক্বচিৎ "মধুকুল্য" রূপেও বিকৃত হইয়াছে): (৫) "খাবা-ঙাঙ্‌বা" = নৈমিষ্য, মতান্তরে ভরদ্বাজ; (৬) "মোইরাঙ্" = আত্রেয়; এবং (৭) "চেঙ্‌লোই" = ভরদ্বাজ। গুরু শি-দবা পরমেশ্বরের দ্বারা সাতটী গোত্রের আদি-পুরুষ নির্ধারণের কথা, হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র সপ্তর্ষি হইতে নানা ঋষি বা আর্য গোত্রের উদ্ভবের কথার অনুরূপ। মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আবার এই সপ্ত "শালেই" বা গোত্রের আদিপুরুষগণের উদ্ভবে হয়, সপ্ত গ্রহ দেবের সহিত সপ্ত দেবী ও অপ্সরোগণের বিবাহের ফলে নহে,—গুরু শি-দবার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে। আমাদের প্রাচীন বিশ্বাস-মত, যেমন ব্রহ্মার বা ঋগ্বেদোক্ত "পুরুষ"-এর মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উদ্ভব হয়, তেমনি গুরু শি-দবার দক্ষিণ চক্ষু ও বাম চক্ষু, দক্ষিণ কর্ণ ও বাম কর্ণ, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র ও বাম নাসারন্ধ্র, এবং দন্ত হইতে, এই সাত "শালেই"-এর আদি পুরুষগণ আবির্ভূত হন।

মণিপুরী পুরাণ "লেইথাক্-লেইথারোল" গ্রন্থে অন্যত্র মণিপুরের আদিম দেবতাদের সম্বন্ধে আরও কতকগুলি উপাখ্যান পাওয়া যায়। একটী হইতেছে "পাখাম্বা" (বা "সেনক্রেঙ্") ও

"শেনামাহি" (বা "কুপ্ত্রেঙ্") দেবতাদ্বয়ের উপাখ্যান। ইঁহারা পরমেশ্বর গুরু শি-দবার পুত্র। ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার জন্য ইঁহারা পিতার অনুমতি লইয়া মণিপুরে আসিলেন। পিতার প্রতি ইঁহাদের ভক্তি পরীক্ষা করিবার মানসে, গুরু শি-দবা মৃত গাভীর আকার ধারণ করিয়া বিজয়া-নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। সেন্‌ত্রেঙ্ দেব অনুমানে বুঝিলেন যে এই মৃত গাভী আর কেহই নহে, গুরু শি-দবা। দুই ভাইয়ে তখন মৃত গাভীর দেহ টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিলেন। গুরু শি-দবা গাভীর দেহ হইতে বাহির হইয়া স্বরূপে দেখা দিলেন ও বলিলেন যে, তিনি তাহাদের পিতার প্রতি শ্রদ্ধা দর্শনে তুষ্ট হইয়াছেন — সেন্‌ত্রেঙ্-কে নূতন নাম দিলেন "পাখাঙ্‌বা" অর্থাৎ 'যে পিতাকে চিনে' ("পা"='পিতা' "খাঙ্‌বা"='চেনা, জানা')। দুই ভাই মৃত গাভীর শরীর কাটিয়া, সাত "শালেই" বা গোত্র-পতির মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। একজন পাইলেন চোখ দুইটী ও অধোদেহের কিছু অংশ, একজন মাথার খুলি, একজন হৃৎপিণ্ড, একজন চারিটী পা, ইত্যাদি। গোরুর চামড়া একস্থানে শুখানো হইল, সেই স্থানের নাম "কাঙ্‌লা" ("কাঙ্‌বা"='শুখানো' হইতে)। সাত গোত্রপতি তখন মৃত গাভীর দেহের অংশ লইয়া অগ্নিতে যজ্ঞ করিলেন। এই প্রাচীন কুকি-উপাখ্যানে এই যজ্ঞের কথা জুড়িয়া দিয়া, উহাতে হিন্দু বৈদিক ধর্মের হাওয়া একটু বহানো হইয়াছে।

গুরু শি-দবা প্রকাশ করিলেন, দুই ভাইয়ের মধ্যে যে প্রথম সারা জগৎ ঘুরিয়া আসিতে পারিবে তাহাকেই তিনি রাজা করিয়া দিবেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে কুপ্ত্রেঙ্ (বা শেনামাহি) জগৎপরিক্রমা করিবার জন্য কাঙ্‌লা হইতে বিনির্গত হইলেন, কিন্তু "লেইমারেন্-শিদাবি" নামে দেবতার পরামর্শে সেন্‌ত্রেঙ (বা পাখাঙ্‌বা) পিতার সিংহাসনের চারিদিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিলেন। গুরু-শি-দবা প্রীত হইলেন, এবং এই প্রদক্ষিণকেই তিনি জগৎ-পরিক্রমার অনুরূপ স্থির করিয়া, পাখাঙবা-কে রাজা করিয়া দিলেন। এদিকে বিশ্বজগৎ ঘুরিয়া আসিয়া কুপ্ত্রেঙ্ দেখিলেন, ভাই রাজা হইয়া বসিয়াছেন। মাতা পার্বতীকে পরিক্রমণ করাই জগৎ-পরিক্রমার তুল্য, এইরূপ একটী উপাখ্যান আমাদের মধ্যেও আছে— গণেশ এইভাবে কার্তিককে বোকা বানান। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কুপ্ত্রেঙ পাখাঙ্‌বার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। পাখাঙ্‌বা ভয় পাইয়া অপ্সরা বা দেবকন্যাদের আশ্রয় লইলেন, দেব-কন্যারা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, ও "আউগ্রি-হাঙেল্" নৃত্যানুষ্ঠানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। কুপ্ত্রেঙ বা শেনামাহি তখন পাখাঙ্‌বার বিনাশের জন্য ভূমির উপরে নিজের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলেন। ইহাতে পাতাল হইতে গুরু শি-দবা বাহির হইয়া আসিলেন। পাতালের অনন্ত নাগ ("তাওরোই-নাই") ছিল তাঁহার বাহন। তিনি দুই ভাইয়ের বিরোধ শান্ত করিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, পর পর এক এক বছর করিয়া দুইজনে রাজত্ব করিবেন। যিনি রাজত্ব হইতে বিরত থাকিবেন, তিনি মণিপুরের প্রত্যেক ঘর হইতে লেইমারেন্-শিদাবি দেবতার সঙ্গে মিলিত ভাবে রাজার যোগ্য পূজা পাইবেন। ইহার পরে গুরু শি-দবা অন্তর্হিত হইলেন, লেইমারেন-শিদাবি দুই ভাইকে বুঝাইয়া দিলেন যে গুরু-শি-দবা হইতেছেন পরমাত্মা পরমেশ্বর। তখন ভগবান্ শিবও পঞ্চাননরূপে দেখা দিলেন; এবং সূর্য্যদেব জলমান অগ্নিরূপে অতি উজ্জ্বল মূর্তিতে প্রকট হইলেন।

পূর্বে বর্ণিত অনন্ত-নাগ ও দুই ভাই দেবতা পাখাঙ্‌বা ও শেনামাহির রাজত্বের পরে, গন্ধর্ব চিত্রভানু মণিপুরের রাজা হন। মণিপুরের আদি পুরাণের সঙ্গে হিন্দু পুরাণের ও মহাভারতের

সামঞ্জস্য করিয়া, অভিনব মণিপুর-পুরাণ গ্রথিত হয়। নারায়ণের নাভিকমলজাত ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন মরীচি মুনি, তৎপুত্র কশ্যপ মুনি, কশ্যপের পুত্র সূর্যদেব. সূর্যের পুত্র সাবর্ণ মুনি, তৎপুত্র চিত্রকেতু, তৎপুত্র চিত্রধ্বজ, তৎপুত্র চিত্রবীজ, তৎপুত্র চিত্রসর্ব, তৎপুত্র চিত্ররাজ, তৎপুত্র চিত্রভানু। চিত্রকেতু হইতে চিত্রভানু পর্যন্ত গন্ধর্ব ছিলেন। অপুত্রক চিত্রভানুর একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদা তৃতীয় পাণ্ডব মহাভারতের নায়ক অর্জুনের পত্নী হন; চিত্রাঙ্গদার ও অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন, বভ্রুবাহনের পুত্র সুপ্রবাহু, তৎপুত্র যবিষ্ঠ।

অর্জুনের আগমন সম্পর্কে মণিপুরের কতকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণ-কথার সহিত এখানে মণিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের মিলন ঘটানো হইয়াছে। মণিপুরের ইতিকথায় ব্রাহ্মণ্য ও মণিপুরী পুরাণ মিলাইয়া প্রাচীন রাজাদের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিন্তু ঐতিহাসিক স্থিরতা নাই। একটী মত অনুসারে, বভ্রুবাহনের পৌত্র যবিষ্ঠ, অন্য মত অনুসারে বভ্রুবাহনের পরে ১৩ তের জন রাজা তৎপরে যবিষ্ঠ। এই তেরজনের মধ্যে প্রথম দুইজনের মাত্র সংস্কৃত নাম, তাহার মধ্যে একটী অতি আধুনিক ছাঁদের "কলাপচন্দ্র", অন্যটী "শক্তি"; বাকী ১১টী মণিপুরী ভাষার। যবিষ্ঠের মণিপুরী নাম হইতেছে "পাখাঙ্‌বা"; উপরে বর্ণিত গুরু-শি-দবার পুত্র দেবতা ও রাজা পাখাম্বার নাম অনুসারে ইঁহার এই মণিপুরী নাম হয়। সম্ভবতঃ মণিপুরী ঐতিহ্যের নামী রাজা পাখাঙ্‌বার সহিত, গন্ধর্ব রাজকুমারী ও পাণ্ডব অর্জুনের উত্তর পুরুষ রাজা যবিষ্ঠকে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাখাঙ্‌বার সম্বন্ধে কতকগুলি লোকপ্রিয় উপাখ্যান আছে। মণিপুরী তারিখ-গণনার মতে, পাখাঙ্‌বা হইতেছেন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মানুষ—৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নাকি তিনি মারা যান। রাজা "ইঙোউ-পান্‌বা" ইঁহার পিতা। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। জন্মকালে ইঁহার নাম দেওয়া হয় "মেইদিঙ্গু" পরে তাঁহার নাম দেওয়া হয় "পাখাঙ্‌বা"। পাখাঙ্‌বার রাজ্য নানা কারণে মণিপুরীদের মধ্যে লক্ষণীয়। ইঁহার সময়ে মণিপুরী গোত্র এবং গোত্রজাত বিভিন্ন বংশ বা পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়, সামাজিক নানা নিয়ম বিধি নিষেধ প্রবর্তিত করা হয়। যেগুলি মণিপুরীদের সমাজে এখনও কার্যকর হইয়া আছে। পাতলা কাঁসার খণ্ডের এক প্রকার মুদ্রা ইঁহার সময়ে প্রচলিত হয়; এই মুদ্রার নাম "শেল্"। "চৈইথারোল্ কুম্বাবা" নামে বর্ষপঞ্জী লিখিবার রীতি ইঁহারই রাজ্যকালে প্রবর্তিত হয় বলিয়া কথিত। মাকেঙ্"-গোত্রের জনৈক সরদারের কন্যা "লাই-স্রা"-র প্রেমে পড়িয়া তাঁহাকে ইনি বিবাহ করেন—পাখাঙ্‌বা ও লাইস্রাকে লইয়া মণিপুরের পুরাণে একটী মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে।

পাখাঙ্‌বার পর হইতে মণিপুরের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রথম কতকগুলি রাজার সুদীর্ঘ রাজত্বের কথা পাওয়া যায়, ইহা হইতে অনুমিত হয় যে এই ইতিহাস পুনর্গঠিত হইবার কালে কতকগুলি নাম পাওয়া যায় নাই। এই রাজাদের রাজত্বকালে প্রধান প্রধান ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহাদের সকলেরই দুইটী করিয়া নাম মিলে—একটী সংস্কৃত, অন্যটী মণিপুরী। যেমন "কোইবা-তোম্বা" বা ক্ষেমচন্দ্র, "কোম্বোউবা" বা কবিচন্দ্র সিংহ, "অয়াংবা" বা অখণ্ড-প্রতাপ সিংহ। খ্রীষ্টীয় ১১২৭ থেকে ১১৫৪ পর্যন্ত রাজত্ব করেন "লোয়াম্বা" বা লবঙ্গ সিংহ; ইঁহারই রাজ্যকালে মণিপুরের বিখ্যাত প্রেমমূলক উপাখ্যানের নায়ক "খম্বা" ও নায়িকা রাজকুমারী

"থোইবি" জীবিত ছিলেন—ইহাদের উপাখ্যানকে মণিপুরীদের 'জাতীয় উপাখ্যান' বলা যাইতে পারে; এই প্রেমিক-প্রেমিকার কথা—বীর যুবক খম্বার নানা বীরকার্য দেখাইয়া, শত্রুর নানা ষড়যন্ত্র ও বিরোধকে ব্যর্থ করিয়া, রাজকুমারী থোইবি-কে বিবাহ করা, ও শেষে খম্বার নির্বুদ্ধিতায় উভয়ের মৃত্যু, প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত গাথা মণিপুরীরা এখনও গান করিয়া থাকে, এবং এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক মণিপুরী কবি নাটক লিখিয়াছেন, ও আধুনিক মণিপুরের প্রধানতম কবি ৺হিজম্ আঙাঙহল্ সিংহ ৩৯,০০০ ছত্রের এক বৃহৎ মহাকাব্য লিখিয়াছেন। খম্বা থোইবির উপাখ্যান মণিপুরীদের সম্বন্ধে প্রামাণিক ইংরেজী গ্রন্থ T. C. Hodson হড্‌সন্ রচিত The Meitheis (London, 1908)-তে পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র মহাশয় তাঁহার "বিচিত্র মণিপুর" পুস্তকে (২য় সংস্করণ ১৩৫৩) ইহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন।

পুরাণ ছাড়িয়া আমরা মণিপুরের ঐতিহাসিক যুগে আসিয়া পৌঁছাই রাজা কিয়াম্বা বা ক্যাম্বার সময় হইতে (রাজ্যকাল, খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকে; ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন)। ইঁহার সময়ে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় প্রকারের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মণিপুর রাজবংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যায়। মণিপুরে ব্রাহ্মণের বাসও হইতে থাকে। "পাম্‌হেইবা" বা গরীব-নিবাজ অথবা গোপাল সিংহ (১৭০৯-১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে) অষ্টাদশ শতকে বিশেষ প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। ইনি রামানন্দী গোসাঁই সন্তদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মণিপুরে রামচন্দ্রের উপাসনা প্রবর্তিত করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে "মোরাম্বা" বা গৌরশ্যাম সিংহ মণিপুরের রাজা হন। ইঁহার নাম হইতেই বুঝা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গৌরশ্যামের পরে, মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ (বা "চিঙথাঙ-খোম্বা"), ১৭৫৯ হইতে ১৭৯৮ পর্যন্ত যিনি রাজত্ব করেন, তাঁহার আমলে মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম রাজার, রাজবংশের ও জন-সাধারণের ধর্ম রূপে গৃহীত হয়। নবদ্বীপ হইতে গোস্বামী ও ব্রাহ্মণগণ আসিয়া মণিপুরের বৈষ্ণবধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন।

মণিপুরের প্রাচীন দেবতা-বিষয়ক উপাখ্যান-গুলি পূর্ণভাবে আলোচিত হয় নাই। আদিম মণিপুরী পুরাণ সমস্তই প্রাচীন মণিপুরী ভাষায় লিখিত। "নুমিৎকাপ্পা" বলিয়া একটী প্রাচীন পুরাণ-কথা হড্‌সন্ সাহেব তাঁহার বইয়ে প্রাচীন মণিপুরী, আধুনিক মণিপুরী ও ইংরেজী অনুবাদের সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত নলিনী ভদ্র ইহার বাঙ্গালা করিয়া দিয়াছেন। মণিপুরী ভাষা কবে প্রথম লিখিত হয় তাহা জানা যায় না। প্রাচীন মণিপুরী বর্ণমালায় এই সমস্ত পুরাণ-কথার পুথি পাওয়া যায়, সেগুলির আলোচনার সূত্রপাতও ভাল করিয়া হয় নাই। এই বর্ণমালা বাঙ্গালা ও দেবনাগরীর আধারের উপরে গঠিত হইয়া, কয়েক শত বৎসর পূর্বে হিন্দুধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে মণিপুরী ভাষার জন্য গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পরে মণিপুরীরা বাঙ্গালা লিপি গ্রহণ করিয়াছে, এখন মণিপুরী ভাষা বাঙ্গালা লিপিতেই লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া থাকে—কিন্তু কয়েকজন মণিপুরী লেখক ও স্বজাতীয়-সংস্কৃতি-প্রিয় অন্য ব্যক্তি, এই বর্ণমালাকে আবার ফিরাইয়া আনিবার আকাঙ্ক্ষা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছেন।*

*এই প্রবন্ধ মুখ্যতঃ শ্রীযুক্ত মৃতুম বুলন সিংহ রচিত মণিপুরী ও ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

ভারতীয় চিন্তাধারা

স্বামী বোধাত্মানন্দ

অনাদি কাল হইতে মানব-মনে চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছে। বাহিরের প্রকৃতি তাহার সেই চিন্তার ইন্ধনস্বরূপ। নদ-নদী, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র চিন্তাশীলের নিকট সবই বিচিত্র। তাহাদের কেহ বা চলিয়াছে স্বকীয় সাবলীল গতিতে, কেহ বা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মুগ্ধ মানবও ইচ্ছা করে ঐরূপ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে, নিজেকে পূর্ণভাবে বিকাশ করিতে; কিন্তু সে পায় পদে পদে বাধা। প্রকৃতির রুদ্রলীলা তার নিজ ক্ষুদ্রতাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। ঝঞ্ঝা, অশনিসম্পাত, প্রবল বারিবর্ষণ, অকস্মাৎ ভূমি-কম্পন—কোন্ শক্তি এই সব সৃষ্টি করে? বহুশ্রমে নির্ম্মিত গৃহ নিমেষে ভূমিসাৎ হয়। স্নেহের নীড় ছাড়িয়া আদরের সন্তান কোথায় চলিয়া যায়? কে এই বিচ্ছেদ ঘটায়? মন ব্যাকুল হইয়া উঠে তত্ত্ব জানিবার জন্য! ঐ সকল কার্য্যের পশ্চাতে বুঝি বা এক এক দেবতা আছেন। তাঁদেরই এই সব খেলা। তাঁদের কৃপাদৃষ্টি এই সব বিঘ্ন নাশ করিবে। হে দেবগণ! প্রসন্ন হও, আমাদের বিঘ্ন দূর কর। তোমাদের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই প্রিয় বস্তু প্রদান করিতেছি। কিন্তু কোন্ দেবতা কোন্ দ্রব্যে প্রসন্ন হইবেন, কি ভাবেই বা দেওয়া যাইবে? ঐ যে উজ্জ্বলবর্ণ অগ্নি, উহাতে আহুতি দিলেই কি জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ পাইবেন? কে এই সব সংশয় দূর করিবে? বেদনাকাতর জিজ্ঞাসুগণ নিভৃতে চিন্তারত হইলেন। তাঁহাদের ব্যাকুল একাগ্রমনে কে যেন প্রকাশ করিয়া দিল কত অভিনব মন্ত্র, উপাসনার অনন্ত রূপ, আরও কত অদ্ভুত তত্ত্ব। বিস্মিত ঋষিগণ শ্রদ্ধাপূতচিত্তে সেই নবাবিষ্কৃত জ্ঞানরাশির নাম দিলেন বেদ। ক্রমে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্—এইভাবে তার ভাগ হইল। সে সব স্মরণাতীত কালের কথা। কেহ বলেন. পঞ্চাশ হাজার, কেহ বলেন পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। ঐসব চিন্তাকে সব চেয়ে আধুনিক যাঁরা বলিতে চান তাঁরা বলেন ও সব আড়াই হাজার হইতে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

কালের কথা দূরে থাক। এখন সাধারণ মানুষের মনে একটা দ্বন্দ্ব লাগিয়া গেল। কোন্ দেবতা সব চেয়ে বড়? কাহাকে সে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইবে? শক্তির দেবতা ইন্দ্রকে? না, না—ধর্ম্মের দেবতা বরুণই ভাল। প্রজাপতি, যম, মাতরিশ্বা এঁরাই বা কম কিসে? আবার সেই সংশয় সেই নিভৃত চিন্তা আরম্ভ হইল। শোন, শোন; বিবাদে কাজ নাই। এক, এক; একেরই ও সব বিভিন্ন মূর্ত্তি। সেই একত্বে গেলেই সব দুঃখ, সব অসম্পূর্ণতার চির অবসান—বৈদিক ঋষি গাহিয়া উঠিলেন। নিস্তব্ধ গিরিগুহা, শান্ত তপোবন সেই একের ধ্যানে মগ্ন হইল। কখন বা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির ব্রহ্মবিচার তত্ত্বোচ্ছ্বাসে রাজসভা মুখরিত করিল। কোথাও বা জগৎকারণের সহিত একত্ব অনুভবে কোন আত্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনীর মুখ হইতে স্বতঃই বৈদিক সূক্ত স্ফুরিত

হইল। কিছু কাল কাটিয়া গেল। ক্রমে মানুষের মন তত্ত্ব হইতে সরিয়া যাগযজ্ঞে নিবদ্ধ হইল। যজ্ঞধূমে আকাশ আচ্ছন্ন, পশুর রক্তে ধরণী সিক্ত হইতে লাগিল। স্বাধিকার-রক্ষার্থে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আচণ্ডাল সকলকে ত যজ্ঞের অধিকার দেওয়া যায় না। বেদ, উপনিষদ্ আলোচনা করাও তাহাদের কর্ম্ম নয়। যজ্ঞের জন্যই পশুর সৃষ্টি; এইগুলির বধের জন্য দুঃখিত না হইয়া আমাদের অনুগত থাকাই ধর্ম্মাচরণকারীর ধর্ম্ম।" এই নির্দেশ জনসাধারণের হৃদয়ে আঘাত দিল। মরমের ব্যথা লইয়া তাহারা সরিয়া দাঁড়াইল। দেবতুষ্টির দরকার নাই; বেদ, বেদান্ত দূরেই থাক। এস আচণ্ডাল সকলে এস, জীবকে তুষ্ট কর। ব্যথীর ব্যথা ঘুচাইয়া দাও। তোমাদের কর্ম্ম, তোমাদের বাসনা তোমাদিগকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যাইতেছে। কর্ম্ম শুদ্ধ কর, বাসনা ক্ষয় কর, অচিরে নির্ব্বাণসুখ লাভ করিবে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইয়া এই বাণী ঘোষণা করিলেন। ও দিকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক জৈন ধর্ম্মের সংস্কারক বর্দ্ধমান মহাবীর হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অতটা অভিমান, অতটা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ না করিলেও অহিংসার উপর আরও জোর দিয়া জীবের নির্ব্বাণমুক্তির আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, তবে অধিকতর সাবধানতার সহিত। শ্রৌতসূত্র লিখিত হইল বৈদিক যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠানের জন্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানকে আরও সরল করিয়া ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র লিখিত হইল। প্রতিমা-পূজা, মন্দির-স্থাপন ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে লাগিল। জ্ঞান-বৃদ্ধ মনু, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈদিক সত্যগুলি স্মরণ করিয়া ধর্ম্মপথে সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য স্মৃতি-শাস্ত্র রচনা করিলেন। শ্রীভগবানের অবতারচরিত অবলম্বনে মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বিরচিত হইল। এ সবও প্রায় দুই হাজার বছর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু সেই সময়ে উপনিষদের সত্যকে ভিত্তি করিয়া সর্ব্ব বর্ণ, সর্ব্ব আশ্রম, নারী-পুরুষ সকলের জন্য রচিত হইল মহাভারতের অংশ-বিশেষ যাহা গীতা নামে খ্যাত। "দেবতার প্রীতির জন্য যজ্ঞ করিতে চাও কর—ফল অবশ্য পাইবে। তবে উৎকৃষ্টতর যজ্ঞও আছে। শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য যাহা কিছু স্বার্থ-ত্যাগ, তাঁর পবিত্র নাম জপ, তপস্যা, সংযম এগুলিও যজ্ঞ। কর্ম্মবিমুখ হওয়া ধর্ম্ম নয়; কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাও তোমার কল্যাণ হইবে। অনাসক্ত হইবার চেষ্টা কর; ক্রমশঃ শুদ্ধচিত্তে তত্ত্ব আপনিই প্রকাশ পাইবে। জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া আত্মাতিরিক্ত অন্যবস্তুর অদর্শনে যদি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত হইতে পার—ভাল কথা, নতুবা সাকার ঈশ্বরকেই আশ্রয় কর, তিনিই তোমাকে জন্মমৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত করিয়া চরম সত্যে লইয়া যইবেন।" বলিতে গেলে গীতাকার কাহাকেও বিমুখ করেন নাই। বিভিন্নরুচি, বিভিন্ন স্তরের মানব মনকে অপূর্ব্ব শান্তিপ্রদ আশ্রয় দান করিয়াছেন।

এই সব চিন্তাধারায় কিছুকাল কাটিয়া গেল। বৈদিক চিন্তাধারার সহিত দ্রাবিড় দেশীয় চিন্তা-ধারা সংযুক্ত হইল। মানবের মন ভক্তির স্নিগ্ধধারায় স্নাত হইতে আকুল হইল। বিবিধ পুরাণ রচিত হইল। অবতার মহিমা উজ্জ্বলতর হইয়া মানবচিত্ত মুগ্ধ করিল। ওদিকে জগৎ-কারণকে মাতৃভাবে আরাধনার ক্ষীণধারাও এই সময়ে বেগবতী হইল। ফলে বহু তন্ত্র প্রকাশ পাইল। সময়ে সময়ে ভক্তির ভাবাবেগ জ্ঞানকে প্রেমের অতলগর্ভে নিমজ্জিত করিল পুরাণে।

কিন্তু জ্ঞানের সহিত ভক্তির স্বচ্ছ স্বাভাবিক মিলন দেখা দিল তন্ত্রে। ক্রমে প্রাচীন চিন্তারাশি বহুভাগে বিভক্ত হইল। দুঃখের চরম নিবৃত্তি, আত্মার সর্ব্ববন্ধন-মুক্তির উপায় দেখাইতে উপস্থিত হইল ষড়্দর্শন।

এই বিভিন্ন মত মতান্তরের যুগে আসিলেন আচার্য্য শঙ্কর ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। উপনিষদের বাক্যগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া বেদব্যাস যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াছিলেন তিনি তাহার ও অন্যান্য উপনিষদাদির ভাষ্য রচনা করিলেন। উপনিষদ্-বাক্য স্বীয় প্রতিভা এবং যুক্তিসহায়ে প্রমাণ করিলেন অদ্বৈত ব্রহ্মই বেদের চরম প্রতিপাদ্য বিষয়। জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। প্রত্যেক মানবাত্মা মেঘে ঢাকা সূর্য্য। অজ্ঞান-মেঘনাশে নিত্যমুক্তস্বভাব আত্মা স্বমহিমায় প্রকাশিত হন। উপনিষদের মহাবাক্যগুলি গুরুমুখে শ্রবণ, অসম্ভব ও বিপরীত ভাবনা দূর করিবার জন্য অনুকূল যুক্তিসহায়ে সেই বাক্যের মনন, তারপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ সেই বাক্যার্থের নিরত ধ্যান —ইহাই হইল আত্মানুভূতির সহজ উপায়। সন্ন্যাসের মহিমাও কীর্ত্তিত হইল। ঐহিক পারত্রিক অতি সূক্ষ্মতম ভোগেও চঞ্চলচিত্ত না হইয়া সত্যকে সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করিতে চলিলেন দৃঢ়চিত্ত বৈরাগ্যবান শঙ্করানুগ সন্ন্যাসী দল কিন্তু বাস্তব জগতে চিরকালই অতি মুষ্টিমেয় লোকই থাকেন, সত্যের বিমল জ্যোতিতে যাঁহাদের চক্ষু ঝলসিত হয় না। তাই আমরা দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখিতে পাই অদ্বৈত ভাব রঞ্জিত হইতে চলিল। জীব জগৎকে একেবারে ত্যাগ না করিয়া উহাই ব্রহ্মের শরীর, তিনি সকলের অন্তর্য্যামী, জীব-জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম—এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন আচার্য্য রামানুজ। তাঁরই প্রায় সমসাময়িক মধ্বাচার্য্য আরও একটু এদিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন জীব জগৎ ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শরণাগত জীব ঈশ্বরকৃপায় মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠে গমন করতঃ চিরকাল তাঁর সেবার অধিকার পাইয়া কৃতার্থ হয় ইহাই মুক্তি। অদ্যাপি বহুভক্ত এইভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। ভাগবত পুরাণোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাও অনেকের চিত্ত আকৃষ্ট করিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব মধুর ভাবের মাধুর্য্যে বঙ্গ ও উৎকল দেশকে মুগ্ধ করিলেন। রামানন্দ, তুলসীদাস উত্তর ভারতে ভগবান রামচন্দ্রের গুণগানরত হইলেন।

এই সকল ভারতীয় চিন্তা প্রাচীনকাল হইতে মানুষকে তার উচ্চ ভাববিকাশে অনুপ্রেরিত করিয়াছে। এই ভাবপ্রবাহ চণ্ডাশোককে ধর্ম্মাশোক, রাজা হর্ষবর্দ্ধনকে সর্ব্বস্বদানে নিযুক্ত এবং বীরকে ধর্ম্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ইহারই প্রেরণায় পতিব্রতা ধর্ম্মরক্ষার্থ চিতানলে শয়ন করিয়াছেন। পুরুষ সত্যান্বেষী হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন। নারী গার্হস্থ্যসুখ তুচ্ছ করিয়া কোথাও নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষিণী কোথাও বা ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়াছেন। গৃহী সন্ন্যাসী সকলের মধ্যে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ।

ভারতীয় ধনরত্ন বিভিন্নজাতিকে বিভিন্নসময়ে আকৃষ্ট করিয়াছে সত্য। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত তাহাদের চিন্তাধারা অনেকক্ষেত্রে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইলেও বিরুদ্ধ ভাব সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানবলে উন্নত পৃথিবীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুচতুর ইংরাজ আসিয়া যখন নিজেদের সভ্যতা ও ও সংস্কৃতি এ দেশবাসীর সম্মুখে ধরিল, মুগ্ধ ভারত নিজ সুপ্রাচীন আদর্শে সন্দিগ্ধ হইয়া

সম্বিৎ হারাইল। কিন্তু সেই মোহনিদ্রা ভঙ্গ করত ভারতীয় চিন্তাধারাকে সুকঠোর সাধনার দ্বারা উজ্জীবিত করিয়া মুগ্ধ ভারত-ভারতীকে নিজ মহান ধর্ম্মে আস্থাবান করিলেন এবং প্রচলিত স্বদেশীয় ধর্ম্মে শিথিলবিশ্বাস পাশ্চাত্যবাসীরও ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ এবং বেদান্তালোকে সুদৃঢ় করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। বেদান্তের একাত্মজ্ঞান, পুরাণের অবতারলীলা, তন্ত্রের মাতৃভাব—সকলেরই মিলন হইল। আধ্যাত্মিক রাজ্যের সমস্ত চিন্তাধারা অলক্ষ্য ইঙ্গিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। বিবিধশাস্ত্রোক্ত আপাতবিরুদ্ধ মতবাদগুলি বিভিন্নরুচি মানব-মনের বিভিন্নস্তরের অনুভূত সত্যরূপে যথাযোগ্য স্থানলাভ করিল। মস্তিষ্ক এবং হৃদয়—জ্ঞান ও ভক্তি দুইএরই বিকাশ আবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হইল। অলস জড় অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে, তাই কর্ম্মের দ্বারা অলসতার নাশও একান্ত দরকার। বিক্ষিপ্ত মন লক্ষ্যহারা হয়, তা চায় চিত্তের একাগ্রতা। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ—এগুলির যার মধ্যে যতটা প্রকাশ তিনি তত উচ্চ-দরের মানুষ। চারিটীর পূর্ণ প্রকাশে পূর্ণ মানব—এই নব আদর্শ গঠিত হইল।

এবার ভারতীয় চিন্তাধারা সজীব ও সমধিক বলশালিনী হইয়া পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়াছে। বুঝিবা সে আপন সবল তরঙ্গে সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিবে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণামফল চিন্তাশীলের মনে সন্দেহ জাগাইতেছে। ব্যষ্টির সুখশান্তি সমষ্টির উপর নির্ভর করে—এই বোধ সমগ্র জগৎকে একত্র করিতে চাহিতেছে। ধর্ম্মের ভেদবুদ্ধি, বিরুদ্ধস্বার্থ তাহাদের মিলনসূত্র বার বার ছিন্ন করিয়া দিতেছে। ভারতের বেদান্ত মানব-কল্পিত সর্ব্ববিধ বৈষম্য নাশ করিয়া সর্ব্বভূতে এক আত্মা রহিয়াছেন—ইহাই শিক্ষা দেন। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার নিজ নিজ জন্মভূমির প্রচলিত ধর্ম্মমতে আঘাত করিলেও ইহারই সুদৃঢ় ভিত্তিতে বিস্মিত হইয়া বৈরভাব ত্যাগ করত আজ মিলনের পথে চলিয়াছে। যথার্থ সাম্যের ভিত্তি এই বেদান্তই কি সকলের মিলনসূত্র? হায় ভারত, তোমার এই একাত্ম-বাদই কি বিশ্ববাসীকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া ত্যাগ ও সেবার পথে চলিতে সকলকে অনুপ্রেরিত করিবে? এইরূপে তুমি জগৎ-সভায় সত্যই কি ধর্ম্মগুরুর শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া বৈদান্তিক বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় গমন সার্থক করিয়া তুলিবে? ভবিষ্যৎ ইহার উত্তর দিবে।

মধ্যগ

ব্রহ্মচারী ব্যোমকেশ

গন্ধ নিজেরে বিলাইয়া দেয়
ধূপের ধারে,
সুরে মহাকাশে পরিণয় ঘটে
বীণার তারে।

আলোক আঁধারে দূর করে দেয়
প্রদীপে বেড়ি',
অসীমে সসীমে কোলাকুলি হয়
মনেরে ঘেরি'।

দিবস নিশিতে দেখাদেখি হয়
কালের তটে,
মিলনের সাথে বিরহের যোগ
স্মৃতির পটে।

'আমি'র মাঝেতে 'তুমি' এসে গেছে
ভ্রমের ফলে,
সুখ সাথে দুখ মিল করিয়াছে
ঘটনা ছলে।

রকমারি স্বাধীনতা ও রকমারি সাম্রাজ্য

ডক্টর বিনয়কুমার সরকার

স্বাধীনতা রকমারি। ১৯৪৭ আগষ্ট পনর'র স্বাধীনতাটাও হাজার রকমের একরকম মাত্র। ইহার ভিতর হাতী-ঘোড়া পাকড়াও করিতে বলা আহাম্মুকি। ভারতবাসীর এই সকল নয়া লম্ফে-ঝম্ফে ইংরেজের লোকসান নাই,—লাভ আছে।

১৭৫৭ সালের পলাশীতে ভারতের নরনারী, হিন্দু-মুসলমান,—এক রকমের স্বাধীনতা পাইয়াছিল। সে হইতেছে বৃটিশ স্বাধীনতার এক ছটাক বা এক কাঁচ্চা। মারাঠা-শিখ-মোগল যুগের স্বাধীনতা হইতে এই পলাশীর দেওয়া বৃটিশ স্বাধীনতা বেশ-কিছু আলাদা। কিন্তু ভারতের এই বৃটিশ স্বাধীনতাও স্বাধীনতাই বটে।

হিন্দুর বাচ্চারা, মুসলমানের বাচ্চারা সেই মারাঠা-শিখ-মোগল আমলে রীতিমত গোলাম ছিল। রাজা-বাদশাদের গোলাম ছিল,—উজির নাজির-কাজী-কোতোয়ালদের গোলাম ছিল,—আর রূপচাঁদওয়ালাদের,—জমিজমাওয়ালাদের, শেঠজিদের ও আমির সাহেবদের গোলাম ছিল। একালের ভারতবাসী সেই মারাঠা-শিখ-মোগলাই গোলামী বরদাস্ত করিতে পারিত না। তখনকার দিনে না ছিল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তা, না ছিল চলাফেরার স্বাধীনতা, আর না ছিল নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ ধনদৌলত ভোগ করিবার সুযোগ। বে-আইনি আর খামখেয়ালি ছিল সেকালের রেওয়াজ। পয়সা-নিরপেক্ষ, পদবী-নিরপেক্ষ, জাত-নিরপেক্ষ আইন-কানুনের টিকি দেখা যাইত না। তা ছাড়া পূজা-পার্ব্বণ, সামাজিক আচার ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের স্বচ্ছন্দ বিকাশ একদম অজানা ছিল। কি হিন্দুর বাচ্চা কি মুসলমানের বাচ্চা, সকলকেই হাড়ে-হাড়ে স্বাধীনতা-হীনতায় বাঁচিয়া থাকিতে হইত। ইংরেজের পূর্ব্ববর্ত্তী মারাঠা-শিখ-মোগল বা হিন্দু-মুসলিম স্বাধীনতার যুগে হিন্দু নরনারী আর মুসলিম নরনারী আটপৌরে জীবনের প্রায় কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রাখিতে পারে নাই।

কিন্তু এই সকল স্বাধীনতার অনেক কিছু পলাশীর পরবর্ত্তী বৃটিশ পরাধীনতার দৌলতে হিন্দু ও মুসলমান নরনারীর নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে দেখা দিয়াছে। বৃটিশ পরাধীনতাটাও এক প্রকার স্বাধীনতা সন্দেহ নাই। এই গুলাকে এক কথায় সহজে বলিব দেশের ভিতরকার মানুষে-মানুষে লেনদেনের বা যোগা-যোগের স্বাধীনতা। বৃটিশ স্বাধীনতার সোজা অর্থ;—আইনের চোখে প্রত্যেক ভারতবাসী স্বাধীন জীব। ভারতে বিপুল আধ্যাত্মিক বিপ্লব আসিয়াছে বৃটিশ স্বাধীনতার আবহাওয়ায়।

১৭৫৭ সালের পর একটা বড় গোছের বৃটিশ আইন জারি হয় ১৭৭২ সালে। সেই আইনে বর্ত্তমান যুগের ভারত-শাসন কায়েম করা হয়। তাহাতে বৃটিশ স্বাধীনতার চৌহদ্দি বেশ-কিছু আগাইয়া আসে। আইন-কানুনের আওতায় ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানেরা স্বাধীনতা চাখিতে অভ্যস্ত হয়। তাহার পর,—আস্তে-আস্তে ঢিমে-তেতালার ঢঙে ভারতের ভিতর আন্ত-র্মানুষিক যোগাযোগের স্বাধীনতা বাড়িতে থাকে। বৃটিশ স্বাধীনতার নানারূপ ভারতীয় আটপৌরে জীবনে জাহির হয়। একালে তাহার

সাক্ষী ও খুঁটা হইতেছে ১৯২২ সালের ভারত-কানুন আর ১৯৩৫ সালের ভারত-কানুন। এই দুই কানুনকে ভারতীয় স্বরাজ-কানুন বলা চলিতে পারে। এই সকল আইন-কানুনেও পলাশীর পরবর্ত্তী বৃটিশ স্বাধীনতাই,—হোমিও-প্যাথিক মাত্রায়, ধাপে-ধাপে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহারই শেষ ধাপ বা মাত্রা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্টের ডমিনিয়নি-স্বাধীনতা।

এই সময়ে একবার ইংরেজ বাচ্চাদের দিকে নজর ফেলা ভাল। ইংরেজ নরনারীর বৃটিশ সাম্রাজ্য ১৭৫৭ সালে কমে নাই,—বাড়িতেছিল। ১৭৭২ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা ও একতিয়ার খাটো হয় নাই,—বাড়তির পথে চলিয়াছিল। ১৯৩৫ সালের ভারতীয় স্বরাজ কায়েম করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য কমজোর হয় নাই। তখনও ইংরেজ বাচ্চাদের আন্তর্জ্জাতিক তাগদ বাড়িয়াছিল। ১৯৪৭ আগষ্টের ডমিনিয়নি স্বাধীনতা জারি করাতে ইংরেজের বাচ্চারা দুনিয়ায় তাহাদের সাম্রাজ্যশক্তিকে কুপোকষা হইতে দেয় নাই,—দুর্ব্বল করিয়া ছাড়ে নাই,—বাড়াইতে পারিয়াছে। আজও বৃটিশ সাম্রাজ্য বাড়তির পথেই চলিতেছে।

নয়া ঢঙে, নয়া গড়নে, নয়া আকার-প্রকারে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত,—মারাঠা-শিখ-মোগল ভারত—বহুত্বশীল, বৈচিত্র্যময়, অনৈক্যপূর্ণ ভারত,—আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানের ইয়োরোপও ঠিক এইরূপ বহুত্বশীল, বৈচিত্র্যময় আর অনৈক্যপূর্ণ। তাহাতে ইংরাজের লাভ আছে,—লোকসান নাই। ১৯৪৭ আগষ্টের পরবর্ত্তী হিন্দু-বিরোধী মুসলিম ভারত, হিন্দু-বিরোধী হিন্দু ভারত, মুসলিম-বিরোধী মুসলিম ভারত, আফগান-বিরোধী পাকি ভারত, সুভাষ-বিরোধী কংগ্রেস ভারত, বাঙালী-বিরোধী বিহারী ভারত, উর্দ্দু-বিরোধী হিন্দী ভারত, আর মালিক-বিরোধী মজুর ভারত ইত্যাদি গণ্ডাগণ্ডা বিরোধশীল ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় একালের বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্মুখে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর সুযোগ-সুবিধাগুলাই নয়া রূপে হাজির করিতেছে। ইয়োরোপের প্রত্যেক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের মতন ভারতের প্রত্যেক বিরোধ আর দ্বন্দ্বের ভিতর ইংরেজ নরনারী সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে দুই পক্ষেই একসঙ্গে নাক গুঁজিবার ও আঙ্গুল চালাইবার ফিকির ঢুঁটিয়া পাইতেছে। ইংরেজ বাচ্চারা মার্কিন, রুশ আর অন্যান্য হুসিয়ার ও খেলোয়াড় জাতের সঙ্গে টক্কর দিতে দিতে এই সকল নয়া বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় কুরুক্ষেত্রের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্য মজবুদ হইতেছে।

সাম্রাজ্য রকমারি। ১৭৫৭ সালের বৃটিশ সাম্রাজ্য ছিল এক প্রকারের। ১৯৪৭ সালের বৃটিশ সাম্রাজ্য দেখা দিতেছে অন্য প্রকারে। ফারাকটা কেবল রকমে, আকার-প্রকারে, গড়নে ও ঢঙে। ইংরেজের তাগদ যে-কে-সেই আছে,—সত্যি কথা বাড়িতেছে। ১৯৩৯-৪৫ সালের বিশ্ব-লড়াইয়ে ইংরেজ বাচ্চারা মার্কিন চ্যাংড়াগুলাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া দিগ্-বিজয়ী হইতে পারিয়াছে। আজ বৃটিশ সাম্রাজ্য বর্ত্তমানে বিশ্বশক্তির অবস্থামাফিক ব্যবস্থা করিল। লড়াইয়ের পরবর্ত্তী কালের উপযোগী যুক্তিনিষ্ঠা দেখাইয়া ইংরেজ জাত আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রীয় ময়দানে ওস্তাদের মতন পাঁয়তারা করিতে পারিতেছে। এই রাষ্ট্রিক যুক্তিনিষ্ঠাকে একালের অর্থনৈতিক পারিভাষিকে বলিব "র‍্যাশন্যালিজেশন"।

বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দুনিয়ায় চরমভাবে শক্তি-শালী ও কর্ম্মদক্ষ করিয়া তুলিবার পক্ষে ভারতের ডমিনিয়নি-স্বাধীনতা অন্যতম বিপুল যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রটাকে নিজেদের কাজে লাগাইবার জন্য কয়জন বাঙালী বাচ্চার মাথা খেলিতেছে?

'উদ্বোধনে'র জয়যাত্রা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। এই অর্ধ শতাব্দী যাবৎ 'উদ্বোধন' দেশের জন-জাগরণে, সাহিত্যের নূতন শৈলীর ভাবধারায়, ব্যষ্টির স্বাধীন চিন্তার উন্মেষে, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উদার সম্প্রসারিত দৃষ্টি আনিয়াছে। কোন সংকীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্রগণ্ডী বা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা-দ্বেষ লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যুগোপযোগী মহাসমন্বয়ের দৃষ্টিতে—পূর্ব ও পশ্চিমের ব্রহ্মবিদ্যা ও বিজ্ঞানের মিলনে এক নূতনতর মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির গঠনে জাতির সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য 'উদ্বোধনে'র অবির্ভাব বা বোধন হইয়াছে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ জলদগম্ভীর ও ওজস্বিনী ভাষায় 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। 'উদ্বোধনে'র ৫ম বর্ষে ১৩০৯ সালে ১লা মাঘের ১ম সংখ্যায় পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাবে উহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "হে পাঠক! 'উদ্বোধন' ৫ম বর্ষে উপনীত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্য বা ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়-নিহিত রজঃ বা ক্ষত্র-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরম কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেই জন্য আপাত শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণ-সাধনে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য্য নহে—সর্ষপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য মনুষ্য-শরীরেই জড়শক্তি-নিয়ামিকা চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্ব-সংসার নিহিত রহিয়াছে। নববর্ষে নবোদ্যমে পুরাতন শক্তি আবার জাগরিতা।"

'উদ্বোধন' প্রকাশের দিন এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামিজীর লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়ন-সম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা—সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস ও ছোট ছাপাখানা, তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কারণ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আধ্যাত্মিক মহাশক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব প্রেরণা ও প্রদীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক বাণী এবং সর্বত্যাগী পরহিতব্রতী রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সুদৃঢ় সংকল্প, নিষ্কাম কর্ম-প্রচেষ্টা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়। আজ মনে পড়ে 'উদ্বোধনে'র সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরু দায়িত্বভার একাকী বহন

করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যাপূত জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামিজীর পত্রিকাপ্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি কার্যক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি—শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কতদিন তিনি কখনও অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখা-শুনা নহে, আজ কম্পোজিটার অনুপস্থিত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল প্রেস-ম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে নানাস্থানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্ উপকরণ পাওয়া যায় সেই তথ্য লইবার জন্য কখনও ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনও কখনও প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ এবং প্রবন্ধ রচনা করিতেও হইত। ঠিক সময়ে পত্রিকা-প্রকাশ না হইলে স্বামিজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যারাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থার আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইত। নানাদিকে এইসব কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত—ক্লান্তির কোন কালিমা দেখা যাইত না। বেশীর ভাগ কম্পোজিটার ও প্রেসম্যান বস্তীতে বাস করিত। তিনি বিনাসঙ্কোচে বস্তীর মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ লইতেন। কতদিন দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে অপরাহ্ণকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলপান করিতেছেন এবং তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি তাঁহার তখনও স্নানাহার হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ্ণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাঁহার দৈনিক সংবাদ 'প্রভাকরে'র সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাঁহাদের 'প্রভাকর প্রেস' নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি যাইতেন। এদিকে পত্রিকায় কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল-ত্রুটী থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতা-নন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামিজীর লিখিত একটী প্রবন্ধ 'উদ্বোধনে' তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধনে' তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, "কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তাতো বুঝতে চাও না!" স্বামিজী বলিলেন, "ওসব কথা রেখে দে—তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস্? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়—যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটী নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল—তাতে ভুল-ত্রুটী থাকে থাকুক। একটী শব্দের এদিক ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি—তবে উন্নতিটা কি হল বল?" স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস ও পত্রিকা দুটীর জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে—বিশেষ কম্পোজিটার প্রভৃতির

সন্ধানে তাঁহাকে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ্ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনও কখনও তিনি 'উদ্বোধনে'র জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হইয়াছে—তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বামিজীর বাংলা রচনা। 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটী ঘটনার উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছু দিন পরে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামিজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন—তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?' দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'আমি এই মাত্র রবি বাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবি বাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বল্লেন, 'আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।' এ ছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন। বইখানি লইয়া দীনেশ বাবু চলিয়া গেলেন। এই চলিত ভাষার ধারা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা-গোমুখী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। বহুপূর্বে 'হুতোম প্যাচার নক্সা'য় চলিত ভাষা ছিল—তাহা ব্যঙ্গ রঙ্গ তামাসা। গভীর চিন্তা ও সাহিত্যিক মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া স্বামিজীর প্রাণস্পর্শী চলিত ভাষা 'উদ্বোধনে' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যকে 'উদ্বোধন' কিরূপ পরিপুষ্ট করিয়াছে 'উদ্বোধনে'র প্রকাশিত গ্রন্থাবলী তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিবে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ', 'ভারতে শক্তিপূজা' প্রভৃতি বাঙ্গলার অগণিত নরনারীর প্রাণে শুধু শান্তি দান করে নাই—অনেকের সাধনায় চিন্তায় ও জীবনে প্রেরণা দান করিয়াছে। অনুবাদ-সাহিত্যের আদর্শ রচনা দেখিতে পাই বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও পত্রাবলীতে। বঙ্গভাষায় এখন পর্যন্ত ইহা অতুলনীয়। 'রাজযোগ', 'কর্ম্মযোগ' প্রভৃতি গ্রন্থও সুন্দর অনূদিত হইয়াছে। অনেকে ইহা স্বামিজীর মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দের ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে অপূর্ব দান। কুরুচিপূর্ণ নাটক, উপন্যাস ও গল্প ব্যতীত চিন্তাশীল প্রবন্ধ সহায়েও যে মাসিকপত্র চলিতে পারে—ইহার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন—'উদ্বোধন'।

বিগত অর্ধ শতাব্দীকাল 'উদ্বোধন' বাঙ্গালী হিন্দু-নরনারীকে, আভিজাত্য-অভিমানী হিন্দুগণকে শিখাইয়াছে—যদি এখনও বাঁচিতে চাও তোমরা তোমাদের মাতৃভূমি—তোমাদের সমাজ ও ধর্ম

বাঁচাইতে চাও—তবে অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হরণ করা অপেক্ষা আর মহাপাপ কি হইতে পারে? যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া এতদিন অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়া আসিয়াছ—তাহাদের অধিকার দাও, বিদ্যা দাও, তাহাদের তোমাদের মত মানুষ করিয়া তোল, সব ভেদ দূর কর। স্বামিজীর ভাষায় বলি—ভারতকে উঠাইতে হইবে, আর পুরোহিতদলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে তাহারা যেন খুবপাক খাইতে খাইতে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন, পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার এক-বিন্দু যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়—তাহা করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে আজ ইহাই প্রধান সমস্যা।

'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। স্বামিজী বলিয়াছেন, "উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

"ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটী লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে, না মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? মুসলমান হিন্দুগণকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? এই বাহ্য সভ্যতার অভাব।"

সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে 'উদ্বোধন'কে অভিবাদন করিয়া বলিতেছি—হে 'উদ্বোধন', তোমার দিব্য কণ্ঠে ফুটিয়া উঠুক শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দের স্বাধীনতার বাণী—এই স্বাধীন ভারতে তোমার আদর্শ সমুজ্জ্বল হইয়া কোটী কোটী নরনারীর হৃদয়ে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রেরণা আনুক—কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক সাধনায়, কি ধর্মক্ষেত্রে ধ্বনিত হোক—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দের প্রেমপরিপূর্ণ উদার বাণী ও মহোজ্জ্বল আদর্শ। সভ্যতার নব রূপ গঠনে কোটী কোটী নরনারী উদ্বুদ্ধ হোক—ভারত আবার সকল বিষয়ে জগতের মহাবরেণ্য আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত হোক।

"সত্ত্ব ও রজঃ এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করাই 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভবিষ্যতের দর্শনে সমন্বয়ের রূপ

ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, এম-এ, পিএইচ-ডি

বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য বোধ হয় তার সমন্বয়প্রচেষ্টায়, অপরের মত একেবারেই ভুল, আমি যা বলছি তাই পুরোপুরি ঠিক, এই ধারণা বর্ত্তমান আপেক্ষিক সত্যে আস্থাশীল যুগের পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী। তথাপি যে আমরা মাঝে মাঝে সব সত্যই আপেক্ষিক অবস্থাসাপেক্ষ বলেও নিজের মতই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সত্য বলে দাবী করে থাকি,—এটা হয়ত প্রাচীন যুগের নিরপেক্ষ সত্যের প্রতি আমাদের প্রীতির প্রচ্ছন্ন রূপ। বোধ হয় নিরপেক্ষ সত্যকে আমরা ছাড়তে চাইলেও শীতের দিনের নদীতে ভাসমান কম্বলরূপী ভল্লুকের মত নিরপেক্ষ সত্য আমাদের ছাড়তে চায় না। যাই হোক্, সত্য মাত্রই যদি আপেক্ষিক হয় তবে দুয়ে দুয়ে কথনও কথনও চারও হয় আর কথনও কথনও পাচও হয় এটা স্বীকার্য্য -গায়ের জোরে শুধু চার হয় বলার জো নাই। আপেক্ষিক সত্যবাদের ভিত্তিই হল বিরুদ্ধ মতকে একেবারে ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া নয়, নিজের মতকে তার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া—যার আর এক নাম বিপরীত ভাবের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য। সুতরাং সমন্বয়-স্পৃহাই প্রচ্ছন্নভাবেই হউক আর প্রকাশ্যভাবেই হউক্ বর্ত্তমান যুগের মূলমন্ত্র। তথাপি যে এই সমন্বয়ের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে হয়েছে নিরপেক্ষ মতবাদীর তরফ থেকে তার কারণ নিছক্ বহু-ই যার আরাধ্য দেবতা সেই আপেক্ষিক মতবাদীর পক্ষে খণ্ড সত্যের একটী ব্যাপক মাল্যরচনা করা অসম্ভব।

নিরপেক্ষ-সত্তাবাদী হিগেল দেখাতে চেষ্টা করলেন—আপেক্ষিকতাবাদ সম্ভব হচ্ছে সত্যের একটি সনাতন শাশ্বত মানদণ্ড রয়েছে বলে। সব মতই সত্য, কারণ তাদের ভিত্তি ও আকর পূর্ণ সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। পূর্ণ সত্যের ধর্ম্ম যদি খণ্ড সত্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে না থাকত, তবে খণ্ড সত্য কথনই সত্য হবার দাবী করতে পারত না। সমস্ত খণ্ড সত্যই নিজেদের সসীমতাজনিত পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে অখণ্ড সত্যে নিত্য মিলিত রয়েছে। তাই ব্রহ্মের স্বরূপই হচ্ছে সমস্ত খণ্ড সত্যের পারস্পরিক সংঘর্ষের চরম সমাধান এবং সমস্ত মনুষ্য-ইতিহাসই এই সমাধান-প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি। কাজেই ব্রহ্মরূপী সর্ব-বিরোধের চরম সামঞ্জস্যকে জানবার উপায়ও হচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে খণ্ড সত্যের বিরোধের সমাধান—যার শেষ লক্ষ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এই পদ্ধতিরই নাম ডায়েলেকটিক। ইহাই ব্রহ্মবাদে হিগেলের অনবদ্য দান এবং এই জন্যই হিগেল বর্ত্তমান দার্শনিক জগতের সমন্বয়-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্।

চুলচেরা বিচারে ডায়েলেকটিক পদ্ধতির ভিতর অনেক ভুল ধরা পড়ে সন্দেহ নাই। ক্রচি ডায়েলেকটিকের তর্কধারার ভিতর হিগেলের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছেন। এমন কি হিগেলের শিষ্যেরাও ডায়েলেকটিককে একেবারে দোষশূন্য বলতে পারেন নি। সত্যই ডায়েলেকটিকের ভিতর একটা যেন কি ভেল্কী-বাজী রয়েছে যার জন্য হিগেলকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না, আর ঠিক এই খানেই যেন

ডায়েলেকটিকের ভিত্তি দুর্ব্বল ও শিথিল। সমস্ত বিরোধ, সমস্ত সংঘর্ষ মিলে গিয়ে যে পুঞ্জীভূত জঞ্জালের সৃষ্টি সেইটিই হ'ল চরম সামঞ্জস্য। হিগেলের কাছে কিন্তু এটা সমস্যাই নয়, কারণ হিগেলের মতে বুদ্ধি নিম্ন স্তরেই বিরোধভীরু, উন্নতস্তরে বিরোধের সমাধানেই তার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা। তথাপি এ কথা স্বীকার্য যে ডায়েলেকটিকের তাত্ত্বিক মূল্য যাই হোক্ না কেন শিক্ষাক্ষেত্রে তার দাম খুব বেশী। কারণ পরমতদূষণের স্পৃহার চেয়ে পরমতের গ্রহণ ও সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টাই শিক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

অনেকের মতে হিগেল তাঁর সামঞ্জস্যবাদের ইঙ্গিত পেয়েছেন তীক্ষ্ণধী ক্যাণ্টের কাছ থেকে। ক্যাণ্ট ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়েছিলেন যে আমাদের দৈনন্দিন জ্ঞানের সঙ্গে যে সমস্ত সাধারণ ধারণার অপরিহার্য্য সংযোগ রয়েছে তাদের প্রথম দুটী পরস্পরবিরুদ্ধ এবং তৃতীয়টিতেই সেই বিরোধের সমাধান। আমাদের বিশ্বাস, আপেক্ষিকতাবাদ দূরে থাকুক ক্যাণ্ট কিংবা হিগেল কেহই সমন্বয়ের যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করতে পারেন নি। হিগেলের ডায়েলেকটিকের দোষ সম্বন্ধে আমরা একটু আগে সাধারণভাবে ইঙ্গিত করেছি। সংক্ষেপে এইটু বলাই যথেষ্ট যে পরস্পর বিরুদ্ধভাবের সমন্বয় স্বীকার করে হিগেল যুক্তির মূলে প্রথমেই কুঠারাঘাত করেছেন। বুদ্ধির দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবের সমন্বয় অসম্ভব; যদিও ব্যবহারিক জগতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরুদ্ধভাবের অবস্থিতি অস্বীকার করবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। অন্যদিকে আবার ক্যাণ্টের সমন্বয় তাত্ত্বিক নয়, জ্ঞানগত। মুখ্য বিশ্লেষণের দ্বারা ক্যাণ্ট দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়েরই সাহচর্য্য স্বীকার্য্য। জ্ঞান শুধু গ্রহণাত্মক নয়, বিশ্লেষণাত্মকও বটে। গ্রহণ ইন্দ্রিয়ের কাজ, বিশ্লেষণ বুদ্ধির। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ না হ'লে জ্ঞান হতে পারে না, আর বুদ্ধি যদি সেই গৃহীত বিষয়কে নিজের মত করে সাজিয়ে না নেয় তাহলেও জ্ঞান অসম্ভব। পদার্থ-বিজ্ঞার তরফ থেকে বলা যেতে পারে একটি ইথারের কম্পনই আমাদের কাছে রূপ বলে প্রতিভাত হয়। এখানে ইথারের কম্পন গ্রহণ-ইন্দ্রিয়ের কাজ, তাকে রূপ বলে সংবেদন বুদ্ধির কাজ। কিন্তু জ্ঞানগত সামঞ্জস্যের অপরিহার্য্য ফল তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের পরিপূর্ণ অজ্ঞতার স্বীকৃতি। বুদ্ধির রঙিন কাচ দিয়ে রং ফলিয়ে বস্তুকে জানা যখন আমাদের স্বভাব তখন বস্তুর আসল রূপটী আমাদের দৃষ্টিকে সর্ব্বদাই এড়িয়ে যায় একথা না মেনে উপায় নেই। ফলে হিগেলের সামঞ্জস্যবাদ যুক্তিবিরোধী, ক্যাণ্টের সামঞ্জস্যবাদ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল।

এখন এই সমন্বয়ের রূপ আমাদের বিবেচনায় যেমন হওয়া উচিত তাই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করছি। এই সিদ্ধান্তগুলিকে মূল বক্তব্যের সূত্র ও অবশিষ্ট গ্রন্থকে এঁদের ভাষ্য বা বিস্তৃত ব্যাখ্যা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দীর্ঘ আলোচনায় পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করতে পারে ভেবে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে সূত্রের উপন্যাসে প্রবৃত্ত হ'লাম। আশা করি, পাঠকের নিকট এই সূত্রগুলো 'হিং টিং ছটের' ন্যায় নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হবে না।

দার্শনিক জগতে বুদ্ধি বা বিচারশক্তি ও ইন্দ্রিয় বা জ্ঞান আহরণী শক্তির ক্ষেত্র, পারস্পরিক সম্বন্ধ ও স্থান নিয়ে অনেক বাগবিতণ্ডা হ'য়েছে। ফলে দর্শনশাস্ত্রে ইন্দ্রিয়কে ন্যূন করে একদিকে যেমন বিচারানুগত্য দেখতে পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি বিচারকে ন্যূন করে ইন্দ্রিয়ানুগত্যও দেখা যায়। জগতের প্রাচীন দর্শনে সাধারণতঃ বিচারানুগত্য এত অধিক যে ইন্দ্রিয়ের স্থান তাতে একরকম নেই বল্লেও চলে। আধুনিক দর্শনে বিশেষতঃ

অতি আধুনিক দর্শনে ইন্দ্রিয়ানুগত্য এত প্রবল যে তাতে বিচারের স্থান নেই বল্লেও চলে। জ্ঞানোৎপত্তির আকর ইন্দ্রিয় না বুদ্ধি এ নিয়ে দার্শনিকদের অনেক সময় দুদলে ভাগ করা হয় এবং একটু আগে আমরা দেখিয়েছি ক্যান্ট কি ভাবে এই বিরোধের মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছেন। আমরা কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুগত্য ও বিচারানুগত্যকে আরও একটু ব্যাপক অথচ স্বতন্ত্র অর্থে গ্রহণ করছি। বিচারের মূলসূত্র নিরূপণের পর তাকেই প্রাধান্য দিয়ে তার মানদণ্ডে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের মূল্য-নির্দ্ধারণ বিচারপ্রধান দর্শনের মূলকথা। আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজ্ঞান-বিরোধিতা হেতু বিচারের মূলতত্ত্বকে অস্বীকার করে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিত্তিতে তত্ত্বনির্দ্ধারণের চেষ্টা ইন্দ্রিয়প্রধান দর্শনের বিশেষ ধর্ম। আমাদের মতে বিচার বিরোধ-বিহীন তত্ত্বের প্রার্থী, ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিরোধবহুল, তাই এই তত্ত্বের বিপরীত। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সতত পরিবর্ত্তনশীল বহুময় জগতে বিরোধহীন তত্ত্ব পাওয়া যায় না, কারণ পরিবর্ত্তনের ভিতর বিরোধের কাজ নিহিত। পরিবর্ত্তনের অর্থ বস্তুর থেকেও না থাকা। বস্তু না থাকলে তার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। আবার শুধু থাকলেও তার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। অতএব পরিবর্ত্তন একাধারে থাকা ও না থাকা নামক বিপরীত ধর্ম্মের মিলনক্ষেত্র। সেই বিরোধহীন তত্ত্ব, স্থির এবং একক। কিন্তু মনে রাখা উচিত ইন্দ্রিয় এবং বিচার উভয়েই আমাদের মনোরাজ্যের মূলীভূত উপাদান। একের দাবীতে অপরকে অস্বীকার অপ্রাকৃত ও নিষ্ফল প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব জগতের ভাবী দর্শনে তত্ত্বসমন্বয়ে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়ের দাবী মেনে নিয়েই সুসংগতভাবে তত্ত্বনির্ণয় প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির এই জ্ঞানগত সামঞ্জস্যই তত্ত্বসমন্বয়ের প্রথম সোপান।

কিন্তু এই সমন্বয় কিরূপে সম্ভব ? ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতার জগৎ বিরোধবহুল, অতএব বিচারের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হলেও তার বাস্তব সত্তা অস্বীকার করা অসম্ভব। অন্যদিকে বুদ্ধির অভিলষিত বিরোধহীন, স্থির একক তত্ত্ব যতই লোভনীয় হোক না কেন সহজানুভূতির দৃষ্টিতে সেটা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। এই আকস্মিক সত্তার মানদণ্ডে বাস্তবের সত্তা নিরূপণে বিচারপ্রধান দর্শন ব্যগ্র। এটা যেন অনেকটা ঘোড়ার ডিম পাবার আশায় হাঁসের ডিমে অবজ্ঞা, সোনার পাথরের বাটীর লোভে সাদাসিদে পাথরের বাটী কাজে না লাগানো! তথাকথিত বিচারবাদী দার্শনিক এইভাবে আকাশে সৌধ রচনা করে কল্পনায় সেখানে বিহার করতে প্রয়াসী। কিন্তু আলনাস্কারের কল্পনার ন্যায় কঠোর বাস্তবের সংস্পর্শে তার সেই স্বপ্নসৌধ মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কাজেই অবাস্তবের সঙ্গে বাস্তবের, মৃতের সঙ্গে জীবিতের মিলনের ন্যায় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মিলন অসম্ভব বলেই মনে হয়, অথচ এ মিলন না হলে আমাদের চিত্তরাজ্যে একটা বিরাট দ্বন্দ্ব থেকে যায় যার ফলে আমরা কখনও ঝুঁকি ইন্দ্রিয়ের দিকে আর কখনও ঝুঁকি বুদ্ধির দিকে।

ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির এই বহুবাঞ্ছিত মিলন সম্ভব অধ্যাত্ম-অনুভূতির সাহায্যে। অধ্যাত্ম-অনুভূতি আমাদের কাছে যতই অসম্ভব মনে হোক্ না কেন যুক্তিবাদের দোহাই দিয়ে কোনও অনুভূতিকে অস্বীকার করবার শক্তি আমাদের নেই—যদি না বিচারবলে সে অনুভূতি ভ্রান্ত বলে আমরা নিশ্চয় করে থাকি। ভ্রান্তি বলে বিবেচিত হলেও অনুভূতিকে অস্বীকার করা যায় না—অবশ্য অনুভূত বিষয়ের সত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যায়। অধ্যাত্ম-অনুভূতির নামে নানাপ্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা আমরা

শুনতে পাই। তার ভিতর যে বহু মেকী আছে সেটা অস্বীকার করা কঠিন। কিন্তু মেকীর পেছনে নিশ্চয়ই আসল কিছু আছে যার নকল-রূপ নিয়ে মেকী বাজারে চালু হয়। অতএব বিনা বিচারে সমস্ত অধ্যাত্ম-অনুভূতিকে মাথার খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়াটাও একটা খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়। যে অবিরোধ, একত্ব ও স্থৈর্য্যের দাবী বিচার করছে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির রাজত্বে তার স্থান নেই সত্য, কিন্তু অধ্যাত্মানুভূতির রাজত্বে তাকে সন্ধান করলেই পাওয়া যায়। একত্বানুভূতি বিচার অস্বীকার করতে পারে না কারণ ইহাই বিচারের প্রাণস্পন্দন। সরষের দ্বারা ভূত তাড়ানোর লোকপ্রবাদ আছে, কিন্তু সরষের ভিতর যদি ভূত ঢুকে থাকে, তবে সে ভূতকে সরষে দিয়ে তাড়ানো অসম্ভব। ঠিক তেমনি বিচারের দ্বারা সমস্ত অধ্যাত্মানুভূতিকে তাড়াবার চেষ্টাও নিষ্ফল কারণ বিচারের মর্ম্ম-স্থানে একটি চরম অনুভূতির অব্যক্ত ইঙ্গিত রয়েছে। এরই নাম অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য এবং একে আশ্রয় করেই সম্ভব হয় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মিলন, যা এর আগে মনে হয় অসম্ভব ও অচিন্তনীয়। একত্বানুভূতির সংস্পর্শে বিচারের কল্পিত একত্ব, স্থৈর্য্য ও অবিরোধ সংজীবনী প্রাপ্ত হয়। কাজেই অধ্যাত্ম-অনুভূতি করে বিচারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, আর এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলেই সম্ভব হয় ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিরোধের সামঞ্জস্য। অতএব বিচার ও অনুভূতির এই সামঞ্জস্যই হল তত্ত্বনির্ণয়ে দ্বিতীয় সোপান।

এই দ্বিতীয় সামঞ্জস্যই আমাদের নিয়ে যায় তত্ত্বনির্ণয়ে—যার নাম দেওয়া যেতে পারে তাত্ত্বিক সমন্বয়। ইন্দ্রিয় বুদ্ধি এই দুয়ের দাবীই যদি সমভাবে স্বীকার্য্য হয় তবে বুদ্ধির দাবীতে তত্ত্ব হবে এক ও অদ্বিতীয় আর ইন্দ্রিয়ের দাবীতে হবে বহু এবং এক ও বহুর সম্বন্ধ এই দৃষ্টিতে নিরূপণই হবে তত্ত্বশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। এই তত্ত্বনির্দ্ধারণে একের মাহাত্ম্যও অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, আর বহুর মাহাত্ম্যও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিতে হবে। কবীরের ভাষায়—'দুনোপাল্লাভারী'। ইহাই হলো সমন্বয় দর্শনের তৃতীয় সোপান।

বেদান্তদর্শনে এক ও বহুর সামঞ্জস্যে একের উপর হয়েছে অধিক পক্ষপাত আর বহু হয়েছে অবহেলিত। কারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও জগৎ হয়ে গেছে ব্যষ্টি-মনের সৃষ্টি। সমষ্টি মনের উক্তি যেন হয়েছে ব্যষ্টি মনের অপরিহার্য্য প্রতিচ্ছবিরূপে। ফলে জগৎ হয়ে গেছে প্রায় ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক। কিন্তু বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে বহুময় জগতের সত্তা বিশ্বকেন্দ্রিক এবং ব্যষ্টি মনই হল সমষ্টি মনের প্রতিচ্ছবি। বহুর সত্তা বিশ্বমায়াবী ঈশ্বরের কাছে অনন্তকাল প্রতিভাত হয়েও মূলতঃ তার সত্তা নেই বলে চরম তত্ত্বের নির্ব্বিশেষ একত্বের প্রতিবন্ধক হয় না। যেমন প্রাতিভাসিক সর্প যদিও অনন্তকাল অনুভূতিগম্য হত তাতেও তার দ্বারা তত্ত্বতঃ রজ্জুসত্তার হানি হত না, শুধু আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই থেকে যেত। সুতরাং নির্ব্বিশেষ এক তত্ত্বের সগুণরূপে প্রতিভাস ত্রৈকালিক—তার নিষেধ হয় না, কারণ তাত্ত্বিক নিষেধ হেতু তার অনির্ব্বচনীয় সত্তা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসত্তার বিরোধী হয় না। মনে হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বেদান্তের অনির্ব্বচনীয়বাদকে, বিজ্ঞান-বাদের ব্যষ্টিকেন্দ্রিকতা ও ভেদাভেদবাদ থেকে পৃথক করে নেওয়া যেতে পারে।

এক ও বহুর এই সামঞ্জস্য আমাদের নিয়ে যায় সমন্বয়-দর্শনের চতুর্থ সোপানে—যার আবার দুটা অবান্তর বিভাগ হতে পারে:—(১) ব্যষ্টি জীবনে সাধনসমন্বয়, (২) সমষ্টি জীবনে পার্থিব ও অপার্থিবের সমন্বয়। একত্বানুভূতিই জ্ঞান-

যোগের প্রাণ। কিন্তু ঈষৎ ভেদবুদ্ধি না থাকলে ভক্তিদ্বারা ভাগবত রসের আস্বাদন হয় না এবং নির্বিশেষ একের রাজত্বে কর্ম্মও তুল্যরূপে অসম্ভব যার জন্য অদ্বয়বাদে নৈষ্কর্ম্মের এত প্রশংসা। তত্ত্বে এক ও বহুর অবিচ্ছেদ্য মিলন—কাজেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়ের দ্যোতক। অন্যদিকে নির্বিশেষ একত্ববাদ স্বীকারে মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মবিলয় অবশ্যম্ভাবী কিন্তু একের সহচর বহুর সত্তা স্বীকারে ব্রহ্মাত্মৈক্যের পরও জীবের কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র সত্তা থাকা অসম্ভব নহে এবং সেই জন্যই সিদ্ধকাম জীব ব্রহ্মানুভূতির পরও বহুর রাজত্বে লোককল্যাণার্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই সাধন-সমন্বয়ের তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি হলে জ্ঞান ও ভক্তির প্রাধান্য নিয়ে যে বিরোধী মনোভাবের পরিচয় অনেক সময় প্রাচীন দর্শনে দেখা যায় তা থেকে সাধক পাবেন মুক্তি ও লোক-কল্যাণের প্রেরণায় তার কর্ম্মজীবন হবে সমুজ্জ্বল। এই তত্ত্বানুভূতির দৃষ্টি থেকেই গীতাকার বলেছেন –

স সর্ব্ববিৎ মাং ভজতি সর্ব্বভাবেন ভারত।'

এক বহু এই উভয় তত্ত্ববিৎ অতএব সর্ব্ববিৎ সাধক ঈশ্বরকে সর্বভাবে অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি সমন্বিত পূর্ণাবয়ব জীবনের দ্বারা ভজনা করেন। ইহাই ব্যষ্টি জীবনের সমন্বয়সাধনের সার সংক্ষেপ।

সমন্বয়-তত্ত্বের সঙ্গে সমষ্টির প্রয়োজনেরও বিশেষ যোগ রয়েছে। একত্বানুভূতি সর্ব্বব্যাপী আত্মতত্ত্বের ব্যঞ্জক বলে অধ্যাত্মবাদ সমন্বয়দর্শনের মূলকথা। কিন্তু একের সঙ্গে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বহুর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ থাকায় সমন্বয়-দর্শন বহুর যে আদর্শ সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন তাকে অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক, পুরোপুরি মেনে নেয়। মুক্ত জীবের ক্ষেত্রে অপার্থিবের প্রেরণায় সমষ্টির পার্থিব জীবনের সেবা পরিপূর্ণ ভাবেই সম্ভব এবং প্রাকৃত লোকও এই অপার্থিবের প্রেরণাকে পার্থিব জীবনের প্রয়োজনসিদ্ধিতে নিযুক্ত করতে পারে। তাই অপার্থিব শক্তির সহায়তায় পার্থিব জীবনের রূপান্তর ও উন্নয়ন সমন্বয় দর্শনের অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল সত্তার ভিত্তিতে মনুষ্য-ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সাম্যবাদে যে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা দেখা যায় বর্ত্তমান অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে তার যথার্থ বিরোধ নেই। অধ্যাত্মবাদের আলোকে সাম্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হবে সর্ব্বতোমুখী এবং তথা-কথিত শক্তিমূলক জড়বাদ থেকে হবে তার নিষ্কৃতি। প্রাচ্য নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের পরিবর্ত্তনপ্রস্তুতির সমন্বয়ের সমষ্টি জীবনে অপরিহার্য্য ফল হবে সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের পারমার্থিকতার ভিত্তিতে সমাধান, যা হবে বহুর শোষণবর্জ্জিত কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানপুষ্ট।

ভবিষ্যতের দর্শনে ইহাই যদি হয় সমন্বয়ের রূপ তবে মুক্তকণ্ঠে বলা যেতে পারে—বহুজনের ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণসাধনে দর্শনের প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার্য্য এবং প্রচলিত দর্শন-বিভীষিকা একান্তই অযৌক্তিক। কবির ভাষায় বলা যায় —

'আশঙ্কসে যদগ্নিং
তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।'*

* লেখক-রচিত 'ভবিষ্যতের দর্শন ও সমন্বয়বাদ' নামক প্রকাশিতব্য গ্রন্থের একটি অধ্যায়।

ব্যাভেরিয়ার যোগিনী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভগবান্ যীশু খ্রীষ্ট শত্রুহস্তে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করেন। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার হস্তপদাদি হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছিল। তাঁহার ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত মূর্তি ধ্যান করিয়া সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সেণ্ট টেরেসার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে রক্ত নির্গত হইত। ফ্রান্সিস ও টেরেসা মধ্যযুগের মহাপুরুষ। বর্তমান যুগে এইরূপ দিব্য অবস্থা হইতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু ব্যাভেরিয়ার পানাহারত্যাগিনী যোগিনী থেরেসা নিউম্যানের অনুরূপ অদ্ভুত অবস্থা বিংশ শতাব্দীতেও হইয়াছে। অধুনালুপ্ত রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী যোগানন্দ ১৯৩৫ খ্রীঃ আমেরিকা হইতে ভারতে আসিবার পথে ব্যাভেরিয়ায় যাইয়া কোনারস্‌রিউথ গ্রামে নিউম্যানের উক্ত অবস্থা দর্শনপূর্বক তাঁহার আত্মজীবনীর[১] ৩৯শ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। ফ্রেডরিক রিটার ভন লামা নিউম্যান সম্বন্ধে ইংরাজিতে দুইখানি বই[২] লিখিয়াছেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ জার্মেণী হইতে আমেরিকান সংবাদদাতাগণ লিখিয়াছিলেন যে, নিউম্যান এখনও ব্যাভেরিয়ার কনারস্‌রিউথ গ্রামে জীবিতা আছেন।

থেরেসা নিউম্যান ১৮৯৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ বৎসর বয়সে এক দুর্ঘটনায় আহত হইয়া তিনি অন্ধ ও পঙ্গু হন। সেণ্ট টেরেসার নিকট আকুল প্রার্থনা করিয়া নিউম্যান ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নষ্ট দৃষ্টিশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। আশ্চর্য উপায়ে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পঙ্গুত্বও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। ১৯২৩ খ্রীঃ হইতে তিনি একেবারে পানাহার ত্যাগ করিয়াছেন। রোজ সকালে ৬টার সময় টাকার আকারে কাগজের মত পাতলা চাউলের রুটী এক টুকরা প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। ১৯২৬ খ্রীঃ নিউম্যানের মস্তকে, বক্ষে ও হস্তপদে বিশু খ্রীষ্টের ন্যায় ক্ষত প্রথমে দেখা দিল। প্রত্যেক শুক্রবার তিনি খৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার গ্রামের প্রচলিত জার্মাণ ভাষাই জানিতেন। কিন্তু শুক্রবার যখন তিনি উপরোক্ত দিব্যাবস্থা লাভ করেন তখন তিনি প্রাচীন আরামাইক ভাষায় কথা বলেন; কখনও বা হিব্রু, কখনও বা গ্রীক ভাষায়ও কথা বলেন।

কয়েকবার তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের অধীন হইতে হইয়াছিল। একটি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট জার্মাণ সংবাদপত্রের সম্পাদক ডাঃ ফ্রিট্‌জ গার্লিক কনারস্‌রিউথ গ্রামে 'ক্যাথলিক ভণ্ডটীর ভণ্ডামি' জানিতে যান! তিনি নিউম্যানের অবস্থা দর্শনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন এবং তাঁহার জীবনী লিখিয়া প্রকাশ করেন। স্বামী যোগানন্দ ১৯৩৫ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত কোনারস্‌-রিউথ নামক গণ্ডগ্রামে যাইয়া দেখেন, নিউম্যানের কুটীরের দ্বার বন্ধ। কুটীরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পার্শ্বে একটী ছোট কূপ ও চারি দিকে কয়েকটী ফুলের গাছ। প্রতিবেশীর নিকট জানিলেন, নিউম্যান ৮০ মাইল দূরবর্তী আইকষ্টাট্ নামক স্থানের সেমিনারী-শিক্ষক অধ্যাপক উর্‌জের

১ "Autobiography of a Yogi" by Swami Yogananda. Philosophical Library, 15 East 40th Street, New York হইতে প্রকাশিত।

২ Therese Neumann: A Stigmatist of our Day এবং Further Chronicles of Therese Neumann. Both by Friedrich Ritter von Lama. প্রকাশক Bruce Publishing Co, Milwanku.

গৃহে গিয়াছেন। যোগানন্দজী পরদিবস আইক-ষ্টাটে উর্‌জের গৃহে যান। উর্‌জ তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। নিউম্যানের নিকট ভারতীয় দর্শকের আগমন সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি উত্তর পাঠাইলেন, 'যদিও বিশপ আমাকে কাহারো সঙ্গে দেখা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তথাপি ভারতীয় সাধুর সহিত আমি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিব।' উর্‌জের গৃহের দ্বিতলে যোগানন্দজী যাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় নিউম্যান হাসিমুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে কাল গাউন ও মাথায় সাদা টুপী, মুখে অপূর্ব প্রশান্তি ও আনন্দ। যদিও তখন তাঁহার বয়স ছিল ৩৭ বৎসর তথাপি তাঁহাকে খুব তরুণী দেখাইতেছিল; শিশুসুলভ লালিত্য ও মাধুর্যের মূর্তি। দেহ স্বাস্থ্যবান ও পরিপুষ্ট, গণ্ডদেশ গোলাপবৎ রঙিন ও প্রসন্ন।

অধ্যাপক উর্‌জ দোভাষীর কাজ করিলেন। নিউম্যান হিন্দু সাধু এইবার প্রথম দেখিলেন। হিন্দু সাধু দর্শনে তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। স্বামী যোগানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি কিছু পান বা আহার করেন না? নিউম্যান উত্তর দিলেন, না। আমি কিছুই পানাহার করি না। মাত্র সকালে এক টুকরা চালের রুটী (একটী টাকার আকার) প্রসাদরূপে খাই। নিবেদিত না হইলে তাহাও গলাধঃকরণ করিতে পারি না। প্রশ্ন—দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পানাহার ব্যতীত কিরূপে বাঁচিয়া আছেন? উত্তর—আমি ঈশ্বরের আলোকে জীবিতা আছি। ক্রাইষ্ট সত্যই বলিয়াছেন, 'মানুষ ঈশ্বরের বাক্যেই জীবন-ধারণ করে, আহারের দ্বারা নহে।' আমি যে আজও পৃথিবীতে আছি তাহার অন্যতম কারণ, মানুষ আহারের দ্বারা বাঁচে না, ঈশ্বরের অদৃশ্য জ্যোতিতেই বাঁচে ইহার প্রমাণ দিবার জন্য। প্রশ্ন—আপনি কি অপরকে শিখাইতে পারেন কিরূপে বিনা আহারে বাঁচিয়া থাকা যায়? উত্তর—না। তাহা আমি পারি না; তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নহে।

তাঁহার সবল ও সুন্দর দুই হস্তে তিনি দুইটী শুষ্ক ক্ষত স্থান দেখাইলেন। ক্ষত স্থানটী হাতের চেটোতে চতুষ্কোণ এবং হাতের পীঠে অর্ধচন্দ্রাকৃতি, লোহার পেরেকের মাথা ও অগ্রভাগের মত। এইরূপ পেরেকের দ্বারা খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন। নিউম্যান বলিলেন, প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার মধ্য-রাত্রি হইতে শুক্রবার বৈকাল একটা পর্যন্ত আমার ক্ষত স্থানগুলির মুখ খুলিয়া যায় ও রক্ত পড়ে। তজ্জন্য আমার ১২১ পাউণ্ড ভারী শরীরের ১০ পাউণ্ড ওজন কমিয়া যায়। এই সময় আমি অবশ দ্রষ্টার মত খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা ভাবনেত্রে দর্শন করি। সমবেদনামূলক প্রেমে আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি। তথাপি প্রত্যেক সপ্তাহে উক্ত দর্শনের জন্য মন আকুল হয়। অধ্যাপক উর্‌জ বলিলেন, নিউম্যানপ্রমুখ আমাদের একটী দল মাঝে মাঝে কয়েক দিন ব্যাপী ভ্রমণে বহির্গত হই জার্মেণীর বিভিন্ন অংশে। আমরা রোজ তিন বার খাই; কিন্তু নিউম্যান কিছুই পানাহার করেন না। পানাহার ব্যতীতও তিনি সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের মত সতেজ ও সুন্দর থাকেন। ক্লান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। পানাহার সত্ত্বেও আমরা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হই। আমরা যখন ক্ষুধিত হইয়া পথিপার্শ্বস্থ চটীর সন্ধান করি তখন নিউম্যান মৃদু হাস্য করিতে থাকেন। …তিনি আহার করেন না বলিয়া তাঁহার পেটটী সংকুচিত হইয়াছে। তিনি মলমূত্রও ত্যাগ করেন না। তাঁহার গাত্রচর্ম কোমল ও দৃঢ় এবং উহা হইতে ঘর্ম নির্গত হয়।

নিউম্যানের দুটী ভ্রাতা বলিলেন, তাঁহাদের ভগ্নী রাত্রিতে মাত্র দুই এক ঘণ্টা নিদ্রা যান। দেহে বহু ক্ষত থাকা সত্ত্বেও নিউম্যান কর্মক্ষম ও উদ্যমশীল। তিনি পক্ষীদের ভালবাসেন, একটী মৎস্যাগারের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং বাগানে ফুলের গাছের যত্ন করেন। তাঁহার নিকট পৃথিবীর নানা স্থান হইতে ক্যাথলিক সাধু ও ভক্তগণ পত্র লেখেন। তিনি পত্রের উত্তর যথাসাধ্য দেন। অনেকে স্ব স্ব রোগা-রোগ্যের প্রার্থনা জানাইয়া কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফার্ডিন্যাণ্ড বলিলেন, নিউম্যান অপরের রোগ স্বীয় শরীরে লইতে পারেন। এইরূপে তিনি বহু আশীর্বাদ-প্রার্থীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। প্রার্থনার দ্বারাই তিনি রোগমুক্তি করিতে পারেন। স্থানীয় একটী যুবক সন্ন্যাসী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ গলরোগে আক্রান্ত হন। নিউম্যান প্রার্থনার শক্তিতে উক্ত যুবকের গলরোগ স্বীয় দেহে টানিয়া আনেন। তখন হইতেই তিনি পানাহার ত্যাগ করিয়াছেন।

নিউম্যানের প্রাত্যহিক ভাবাবস্থা-দর্শন-মানসে শত শত, সহস্র সহস্র দর্শনার্থী নানা দূর দূর স্থান হইতে শুক্রবার কোনারস্‌রিউথ গ্রামে উপস্থিত হন। এই জন্য স্থানীয় গির্জার পাদ্রীর অনুমতি লইয়া দর্শন করিবার নিয়ম করা হইয়াছে। তাঁহার কুটীরের একাংশ মোটা কাচ-নির্মিত। পর্যাপ্ত সূর্যালোক গৃহে আনার জন্যই উক্ত ব্যবস্থা। স্বামী যোগানন্দ শুক্রবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, নিউম্যান সাদা পোষাকে শয্যায় শায়িতা। তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের নিম্ন পাতা হইতে এক ইঞ্চি পরিসর রক্তস্রোত ক্ষীণভাবে বহিতেছে। দৃষ্টি ভ্রূযুগলমধ্যে নিবদ্ধ, ভাবাবিষ্ট। মাথায় যে সাদা কাপড় জড়ান ছিল তাহা 'কণ্টকময় মুকুট পরিধানের ক্ষত' জন্য রক্তসিক্ত। খৃষ্টের বক্ষের এক পার্শ্বে বিংশ শতাব্দী পূর্বে এক অসুব-স্বভাব সৈন্য বর্শা বিদ্ধ করিয়াছিল। সেইরূপ ক্ষত নিউম্যানের বক্ষপার্শ্বে হওয়ায় তাঁহার সাদা পোষাকেও রক্তের দাগ লাগিয়াছে। তাঁহার হস্তদ্বয় মাতৃভাবে প্রসারিত, মুখ প্রসন্ন ও জ্যোতির্ময়। তিনি বিদেশী ভাষায় অস্পষ্ট ভাবে যোগনেত্রে দৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে কি যেন বলিতেছেন। কথা বলিবার সময় তাঁহার ওষ্ঠাধর যন্ত্রণায় ব্যথিত ও কম্পিত। উপহাসকারী জন-মণ্ডলীর মধ্যে খৃষ্ট ভারী ক্রুশটী বহন করিলেন। এই দৃশ্য তিনি ধ্যাননেত্রে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ ক্রুশের ভারে খৃষ্ট ভূপতিত হইলেন। ইহা দর্শনে ব্যথিতা ও শঙ্কিতা হইয়া নিউম্যান মাথা তুলিয়া বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইলেন। তৎপরে তাঁহার দর্শন অন্তর্হিত হইল। খৃষ্টের শেষ আহার হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু ও কবর দেওয়া পর্যন্ত সকল দৃশ্যই নিউম্যান ভাবচক্ষে প্রতি সপ্তাহে দর্শন করেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া যেমন দেহে ও মনে শ্রীকৃষ্ণভাবে রূপায়িত হইতেন, সেণ্ট ফ্রান্সিস, সেণ্ট টেরেসা এবং থেরেসা নিউম্যানও তদ্রূপ খৃষ্টের ধ্যানে তদাকারে আকারিত হন। ইহা শাস্ত্রসম্মত, অবিশ্বাস্য নহে। আধ্যাত্মিক রহস্য বৈজ্ঞানিক রহস্য অপেক্ষা আরও অদ্ভুত, আরও বিস্ময়কর।

যুদ্ধের দক্ষিণা

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সান্ন্যাল, এম-এ

এখনকার সর্বগ্রাসী যুদ্ধে রণনীতির সঙ্গে অর্থনীতিরও একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এই নরমেধ-যজ্ঞের আহুতি যোগান যে কী ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার তা যে কোন যুদ্ধরত জাতির যুদ্ধের খরচের বহর দেখলেই বোঝা যাবে। আমাদের যুদ্ধের ব্যয় পাঁচ বছরে মোট ২৫০০ কোটী টাকার কিছু বেশী—অর্থাৎ দৈনিক দেড়কোটীর মত হয়েছিল, এবং অন্য অনেক দেশের তুলনায় এ খরচ নগণ্য বলা যেতে পারে। এই বিরাট ব্যয় কি ভাবে নির্বাহ করা যেতে পারে এবং আমরাই বা কি ভাবে নির্বাহ করেছিলাম সেই আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দেশের উৎপাদন-শক্তি—যার সাহায্যে নানারকম ভোগ-সামগ্রী প্রস্তুত করে আমরা শান্তির সময় আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধন করি, যুদ্ধ বাধিলে তার যতটা সম্ভব যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত করতে হবে এটা সহজেই বোঝা যায়। কামান, বন্দুক, গোলা, বারুদ থেকে আরম্ভ করে সৈন্যদের পোষাক-পরিচ্ছদ সবই এই উৎপাদন-শক্তির সাহায্যেই পেতে হবে এবং এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিষের উৎপাদন কম হবে। অবশ্য যদি উৎপাদন-শক্তি আগের চেয়ে বাড়ান যায়—বেকার লোকদের কাজে নিয়োগ করে, এক সিফ্‌টের জায়গায় তিন সিফ্‌ট্ কারখানা চালিয়ে, তাহলে এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন যুদ্ধের কাজে লাগান যেতে পারে এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য জিনিসের সরবরাহ আগেকার মতই থাকবে। তেমনি যদি বিদেশ থেকে জিনিসের আমদানি বাড়ান যায় তাহলেও জনসাধারণের প্রয়োজন বিশেষ না কমিয়েও যুদ্ধের প্রয়োজন খানিকটা মেটান যাবে, কিন্তু এভাবে বেশী দিন যুদ্ধের রসদ যোগান সম্ভব নয়। যুদ্ধ কিছুদিন চলতে না চলতে তার প্রয়োজনের বহর এমন ভাবে বাড়তে থাকে যে আমাদের ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদন না কমিয়ে কিছুতেই সে প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটান যায় না। বিভিন্ন দেশ একে একে যেমন যুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকে তাদের কাছ থেকে জিনিষ পাবার পথও তেমনি বন্ধ হতে আরম্ভ হয়। মোট কথা আমাদের ভোগের মাত্রা কমাতে হবে এবং সেই সব জিনিষ দিয়ে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে হবে।

কর, ঋণ এবং মুদ্রাস্ফীতি এই উদ্দেশ্য সাধনেরই তিনটী উপায় মাত্র। সরকারকে কর বা ঋণ দেওয়ার মানে আমার আয়ের একটা অংশ দেওয়া এবং অবশিষ্ট অংশটুকু দিয়ে আমি নিশ্চয়ই আগের চেয়ে কম জিনিষ পাব এবং যে ক্রয়শক্তি আগে আমার হাতে ছিল এখন তা সরকার নিয়ে নিজের কাজে লাগাবেন। অবশ্য দুটোর মধ্যে কিছুটা তফাৎ আছে—ঋণ দিই আমরা স্বেচ্ছায় এবং সুদে-আসলে ফিরে পাব এই বিশ্বাসে। করের বেলায় দেওয়া না দেওয়ার স্বাধীনতা আমাদের নেই। কে কি হারে কর দেবে সেটা নির্ধারিত করে দেবে রাষ্ট্র এবং দিতে হবে সমস্ত মায়া কাটিয়ে। ফলে করের বোঝার ওপর আমাদের থাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আর ঋণ তো ইচ্ছার ব্যাপার, অবশ্য ইচ্ছা বলবতী করবার জন্য সরকার চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন না, কিন্তু খুব বেশী সুফল যে হয় তা নয়। মোট কথা—কর এবং ঋণের সাহায্যে যতটা পাওয়া যায়, সাধারণ সময় তা যথেষ্ট

হলেও যুদ্ধের প্রয়োজন তাতে মেটে না এবং এ অভাব মেটানর জন্য নোট ছাপান ছাড়া উপায় থাকে না। অনেকেই হয়ত ভাববেন, "বাঃ, এভাবে আয়ের ব্যবস্থা যদি গভর্ণমেণ্ট করেন তাহলে আমাদের আয়ের ওপর হাত না দিয়েও তো তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন এবং আমাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ত্যাগের হাত থেকে আমরা রেহাই পাই।" একটু ভাবলেই বোঝা যাবে ব্যাপার তা নয়। কর বা ঋণ দ্বারা সরকার যখন টাকা যোগাড় করেন তখন দেশে মোট টাকার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে, কারণ সরকার যে টাকাটা খরচ করছেন সেটা আমাদের পকেট থেকেই এসেছে এবং সেটা দেওয়ার ফলে আমাদের খরচ ঠিক ততটা কমাতে হয়েছে। কিন্তু নোট ছাপিয়ে যখন গভর্ণমেণ্ট জিনিষ কেনেন তখন আমাদের ব্যয় সঙ্কুচিত না করেই সরকারী ব্যয় বাড়ান হচ্ছে, ফলে মোট চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে এবং জিনিষের দামও হুহু করে বেড়ে যাবে। আগে এক টাকায় যত জিনিষ কিনতে পারতাম এখন আর তত পারব না। ফলের দিক থেকে কর এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই—ক্রয়শক্তি দুভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়; করের দ্বারা হয় আয়ের হ্রাসের দরুণ, মুদ্রাস্ফীতির বেলায় আয় অপরিবর্তিত থাকলেও তার ক্রয়শক্তি হ্রাস পায়। আমরা বঞ্চিত হই সমানই, কেবল করের বেলায় সেটা করা হয় প্রত্যক্ষভাবে, আর মুদ্রাস্ফীতির বেলায় পরোক্ষভাবে। তাই মুদ্রাস্ফীতিকে বলা হয় পরোক্ষ কর।

কর, ঋণ এবং মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধব্যয়-নির্বাহের এই তিন উপায়ের মধ্যে কোন্‌টিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত তার বিচার করতে গেলে, প্রথমে দেখতে হবে এর মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা জনসাধারণের ভোগের মাত্রা বেশী কমান যায়, কারণ জনসাধারণ নিজের কাজে যত কম জিনিষ ব্যবহার করবে ততই যুদ্ধের প্রয়োজন মেটান সহজ হবে। এ বিষয়ে মুদ্রাস্ফীতির সুবিধা হল লোকদের মধ্যে কোন অসন্তোষ সৃষ্টি না করে সরকার তাদের ভোগ থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম হন বলে, প্রয়োজন মেটানোর এটা অসাধু হলেও সুগম পথ। কিন্তু ন্যায়ের দিক দিয়ে এ উপায় একেবারেই সমর্থন করা যায় না। যুদ্ধের খাতিরে ত্যাগস্বীকার আমাদের সকলকেই করতে হবে কিন্তু এটাও দেখতে হবে যাতে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং শ্রেণীর ত্যাগের পরিমাণ তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী হয়। শক্তিভেদে কৃচ্ছ্র-সাধনের তারতম্য হলে তবেই সেটাকে ন্যায়সঙ্গত বলা যেতে পাবে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিষের দাম বাড়লে ত্যাগটা এক রকম ষোল আনাই গরীবকে করতে হবে। জীবন-ধারণের অপরিহার্য জিনিষের সংস্থান করাও তার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠবে, অথচ দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনী শিল্পপতিদের লাভের অঙ্ক বাড়তে থাকবে, গরীবের সর্বনাশ আর বড়লোকদের পৌষ মাস! তা ছাড়া মুদ্রাস্ফীতির ফলে জাতির সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন কি রকম বিপর্যস্ত হতে পারে প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর ইতিহাস তার প্রমাণ। এই জন্য মুদ্রাস্ফীতির আপাতমধুর পিচ্ছিলপথ পরিহার করার উপদেশই অর্থনীতিবিদেরা দিয়ে থাকেন। অনেকে অবশ্য বলেন—দাম বাড়ার ফলে যদি লাভ বেশী হয় তবে উৎপাদনও তো বাড়বে, এবং যুদ্ধের সময় উৎপাদন বাড়ানর চেয়ে অধিকতর কাম্য আর কি হতে পারে? এ যুক্তি সমর্থন করা যায় না, কারণ এই যে লাভ এটা একেবারে "পড়ে-পাওয়া লাভ", এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বিরাট সম্পত্তি পাওয়ার ফলে আমাদের উপার্জনেচ্ছা বাড়ার চেয়ে আলস্য ও বিলাসই যেমন বাড়ে এক্ষেত্রেও তাই হবে। আগে তাদের লাভ

বজায় রাখার জন্য যে চেষ্টা প্রতিনিয়ত করতে হত এখন আর তার প্রয়োজন হবে না এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল শৈথিল্য এবং অমিতব্যয়িতা।

কর আর ঋণের মধ্যে ভাগহ্রাস করার পক্ষে করের উপযোগিতাই বেশী, কারণ ঋণ দেওয়াটা দাতার মর্জির ওপর কিন্তু করের বেলায় প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণ নির্ধারিত করে সেটা আদায় করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের রয়েছে। ত্যাগের চাপ শক্তির তারতম্য হিসাবে ন্যায়-সংগতভাবে নির্ধারিত করার প্রয়োজনীয়তার দিকে আমরা আগেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ বিষয়ে ঋণকেই ভাল মনে হয়, কারণ যদিও আমাদের আয় অনুসারেই রাষ্ট্র করের পরিমাণ নির্ধারিত করেন, আয়কে আমাদের আর্থিক অবস্থার নির্ভুল মাপকাঠি হিসাবে সব সময় নেওয়া যায় না, পোষ্য-পরিজনের সংখ্যা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দুজনের আয় এক হলেই তাদের ত্যাগের ক্ষমতা এক হবে তা নয়, ঋণের বেলায় দেওয়ার পরিমাণ তারা নিজেরা নির্ধারিত করে বলে দুজনেই ঠিক নিজ অবস্থা অনুসারে ঋণ দেবে, করের পরিমাণ নির্ধারিত করে অপরে এবং যতটা সম্ভব ন্যায়সঙ্গত ভাবে করার চেষ্টা করলেও, ক্ষেত্রবিশেষে ঠিক অবস্থা না জানার দরুণ একটু ব্যতিক্রম হওয়া আশ্চর্য নয়; অপর দিকে আবার পরিমাণ নির্ধারণের স্বাধীনতা থাকায় দুজনের আর্থিক অবস্থা এক হলেও যার কর্তব্যবোধ বেশী সে বেশী দেবে এবং যার কর্তব্যবোধ কম সে বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করতে চাইবে না। এটাকে কিছুতেই উচিত বলা যায় না।

তা ছাড়া আর একটী বিষয় মনে রাখতে হবে। ঋণদাতাদের ভবিষ্যতে সুদ দিতে হবে জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করে, ফলে ঋণ নেওয়ার মানে হল ভবিষ্যতে সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্যের বৃদ্ধি করা, কারণ ঋণ দেন প্রধানতঃ বড়লোকেরা। কর আয় অনুসারে ক্রমবর্ধমান হারে বসান হয় বলে এতে অর্থনৈতিক অসাম্য খানিকটা দূরীভূত হয়। এই সব কারণে যুদ্ধব্যয়-নির্বাহের ব্যাপারে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই করকে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী। অনেকে বলেন, করের চাপ বাড়লে উৎপাদন কমে যাবে। লাভ কমে গেলে শিল্পপতিদের উৎপাদনের উৎসাহ কমে যাবে। কিন্তু দেশ যখন চরম বিপদের সম্মুখীন এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে জনসাধারণ যখন সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, যুবকেরা দলে দলে যখন চরম ত্যাগ বরণ করে নিচ্ছে, তখন অতিরিক্ত লাভের প্রলোভন না পেলে শিল্পপতিরা উৎপাদন বাড়াবেন না, এ কী যুক্তি।

যুদ্ধব্যয়-নির্বাহে কোন দেশ কতটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার প্রধান মাপকাঠি হল সেই সব দেশে মুদ্রাস্ফীতি কতটা হয়েছে এবং জিনিষ-পত্রের দাম কি রকম বেড়েছে। কর এবং ঋণ দিয়ে সমস্ত ব্যয়টা যদি নির্বাহ করা যায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতির একেবারেই প্রয়োজন হবে না এবং সেইটাই আদর্শ। যুদ্ধের ব্যয় এমন ভাবেই বাড়তে থাকে যে কর এবং ঋণের দ্বারা সঙ্কুলান হওয়া মুস্কিল, কিন্তু এই আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান কতটা কমান যায় সেইটাই প্রধান সমস্যা। লণ্ডনের Economist পত্রিকার সম্পাদক Crowther এটাকেই বলেছেন, "The problem of fighting the gap." গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধের সময় লর্ড কীনস্ প্রভৃতির ন্যায় অর্থনীতিবিদদের সহায়তায় এই "ব্যবধান" সঙ্কুচিত করতে সমর্থ হয়েছিল বলেই সেখানে মুদ্রাস্ফীতি সব চেয়ে কম হয়েছিল এবং সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর দাম শতকরা মাত্র তিরিশ ভাগ বেড়েছিল, উচ্চতম হারে

কর বসান, বাধ্যতামূলক ভাবে সকলের আয়ের একটা অংশ সরকারকে "ঋণ" দেওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন কিছু করতেই সে ত্রুটী করেনি। আপাতদৃষ্টিতে যুদ্ধব্যয়-নির্বাহের ব্যাপারে ভারতবর্ষের তদানীন্তন অর্থসদস্য Sir Jeremy Raisman কম কৃতিত্ব দেখাননি। যুদ্ধব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে "অতিরিক্ত মুনাফা-কর" প্রভৃতি নূতন কর বসিয়ে এবং করের হার বাড়িয়ে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করার চেষ্টা তিনি করেছেন। অবশ্য ব্যয় যখন খুব বেড়ে গেল বিশেষ করে জাপানী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর, তখন বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বাড়তে লাগল এবং ঋণের আশ্রয় তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ এবং ঋণের পরিমাণ অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম ছিল। আমাদের যুদ্ধব্যয়. কর এবং ঋণের সাহায্যেই সম্পূর্ণভাবে সংকুলান করা সম্ভব হয়েছিল। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে—জিনিষের দাম তাহলে চারগুণ হল কেন এবং মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা সম্ভব হয় নি কেন? তার কারণ আমাদের নিজেদের যুদ্ধব্যয় ছাড়া ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষে যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সমস্ত জিনিষ কিনেছিল তার ব্যয়ও আমাদের নির্বাহ করতে হয়েছে, এবং সেইটা আমরা করেছি মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে। এই ব্যয় বাৎসরিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায়, লোকে বাজেটের সামান্য ঘাটতি দেখে এবং ঋণের সাহায্যে সেটা পূরণ হচ্ছে ভেবে বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছিল। ব্রিটেনের ভারতে ব্যয়-নির্বাহ করতে একেবারেই বেগ পেতে হয়নি, একদিকে আমাদের নামে লণ্ডনে ষ্টার্লিং জমা হতে লাগল, আর তার বদলে এখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট ছাড়তে লাগলেন। জিনিষ-পত্রের দাম বেড়ে গেল অসম্ভব রকম এবং সাধারণ সময়েই যে দেশের লোক দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না, সেখানে এর যা অবশ্যম্ভাবী ফল তাই হ'ল। একেই বলে পরাধীন দেশের অর্থনীতি!

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ভবনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিতেন ভবনাথ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ,—পুরা নাম শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, বরাহনগরে বাস করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কি ভাবে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, স্বামিজীকে প্রথম দর্শনের পরেই তাঁহার সঙ্গে ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধানে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপনীত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মাষ্টার মহাশয় গিয়া দেখিলেন ভবনাথের সহিত ঠাকুর অন্তরঙ্গের ন্যায় ব্যবহার করিতে-ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে উল্লেখ করিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল—এরা সব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটী। নরেন্দ্র আর ভবনাথ দুজনে ভারি মিল—যেন স্ত্রীপুরুষ!"

স্বামিজীর সহিত ভবনাথের পূর্ব হইতেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। ভবনাথ দেখিতে ছিলেন সুপুরুষ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এবং নানা সদ্‌গুণের আধার। ধর্মপ্রাণ নবীন যুবক প্রথমে ব্রাহ্ম-ধর্মে আকৃষ্ট হন, এমন কি ব্রাহ্মসমাজের

সদস্যভুক্ত ছিলেন। বরাহনগরে স্বর্গীয় শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে শ্রমজীবীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন ভবনাথ তাঁহার একজন সাহায্যকারী কর্মী ছিলেন। বরাহনগরে ইঁহাদের একটী দল ছিল—দেশের মধ্যে সংস্কার-মূলক ধর্ম প্রচার, শিক্ষা প্রচার পরোপকার ও পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করাই তাঁহাদের মূল লক্ষ্য ছিল। বরাহনগরে এই শিক্ষিত উৎসাহী দলের অন্তর্গত ছিলেন ভবনাথ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ এই দলের নেতা এবং উপদেষ্টা ছিলেন। ইঁহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং মাঝে মাঝে এই সব যুবকদের সহিত মিলিবার জন্য স্বামিজী বরাহনগরে যাতায়াত এবং কখনও কখনও রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে তিনি বরাহনগরে ছিলেন এবং গভীর রাত্রে সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। শশিপদবাবুর প্রতিষ্ঠানকে (Baranagore Workingmen's Institute) মার্কিন হইতেও তিনি সাহায্য পাঠাইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভবনাথ দিন দিন আকৃষ্ট হইলেন। ঠাকুর একদিন মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "ভবনাথ? সংস্কার না থাকলে এখানে এত আসে?"

ভবনাথের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্ত মণিলাল মল্লিককে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন—"আহা তার কি ভাব! গান গাইতে না গাইতে চোখে জল। হরিশকে দেখে একেবারে ভাব—বলে এরা বেশ আছে।" হরিশ সংসার ছাড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া সাধন-ভজন করিতেন। ঠাকুর মাষ্টার মশায়কে একদিন প্রশ্ন করিলেন—"ভক্তির কারণ কি? ভবনাথ এসব ছোকরার কেন উদ্দীপন হয়?" মাষ্টার মহাশয় নীরব রহিলেন। ঠাকুর তখন নিজেই উত্তর দিতেছেন—"কি জান? মানুষ সব দেখতে একরকম কিন্তু কারুর, ভিতরে ক্ষীরের পোর। ঈশ্বর জানবার ইচ্ছা—তাঁর উপর প্রেমভক্তি এরই নাম ক্ষীরের পোর।" ভবনাথের প্রাণটী ছিল প্রেম-ভক্তি-পরিপূর্ণ। একদিন বিজয়কৃষ্ণকে ঠাকুর বলিতেছেন—"সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।" ভাবমুগ্ধ ভবনাথ সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ কি চমৎকার কথা।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ ভবনাথ কালীকৃষ্ণ নামক জনৈক বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যুষে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সহিত সস্নেহে আলাপ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ভবনাথকে বলিলেন—"নে এখন তোরা গা।" ঠাকুরের ঘরের পূব বারান্দায় তাঁহারা বসিয়াছিলেন। বন্ধু সঙ্গে ভবনাথ গাহিলেন—"ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।" বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঠাকুর বসিয়া গান শুনিতে শুনিতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

বরাহনগরে বাস করায় ভবনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। কখনও কখনও তথায় তিনি রাত্রে থাকিতেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর রাত্রিতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। কথামৃতকার ২৯শে তারিখে লিখিয়াছেন—"ভবনাথ বাবুরাম নিরঞ্জন ও মাষ্টার গত রাত্রি (মহাষ্টমী) হইতে রহিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুর ঘরের উত্তর বারান্দায় শুইয়াছিলেন। শীত-কাল বলিয়া উহা ঝাপ দিয়া ঘেরা ছিল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন ঠাকুর "জয় জয় দুর্গে" বলিয়া মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন—তাঁহারা দেখিলেন যেন একটী দিগম্বর বালক মার নাম করিয়া নৃত্য করিতেছেন।"

ঠাকুর ঘরের ভিতর বসিয়া ভক্তগণের সঙ্গে

আলাপ করিতেছেন এমন সময় কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীনরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রণামের পর ভবনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঘরে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। ঘরে মাদুরের উপর শুইয়া ক্লান্তদেহে নরেন্দ্রনাথ গল্প করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠের উপরে বসিয়া পড়িলেন। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া ভবনাথ সাশ্রুনয়নে ভাবোন্মত্ত ভাবে গাহিলেন—"আনন্দময়ী হয়ে মা গো আমায় নিরানন্দ কোরো না।"

সমাধি ভঙ্গ হইলে ঠাকুর তাঁহার সুধাকণ্ঠে মধুর মার নাম গাহিতে লাগিলেন। ভবনাথও ঠাকুরের সঙ্গে কালীমন্দিরে গেলেন। তথা হইতে চলিয়া আসিবার সময় ভবনাথকে প্রসাদী ডাব আর শ্রীচরণামৃত আনিতে বলিলেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবার পর বেলা ২টার সময় বিশ্রামান্তে ঠাকুর উত্তর-পূর্ব বারাণ্ডায় বসিয়া নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ অন্তরঙ্গদের সহিত আনন্দ করিতেছিলেন এমন সময়ে হঠাৎ দক্ষিণ-পূর্ব বারাণ্ডা হইতে ভবনাথ সহাস্যমুখে ব্রহ্মচারিবেশে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গাত্রে গৈরিক বস্ত্র এবং হাতে কমণ্ডলু দেখিয়া সকলেই আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে ঠাকুর বলিলেন—"ওর মনের ভাব ঐ কিনা তাই ঐ সেজেছে।"

অপরাহ্নে ঠাকুর ঘরে ছোট তক্তপোষটীতে আসিয়া বসিলেন। নানা প্রসঙ্গাদির পর ভবনাথ বিনীত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে মন কেমন করে—তবে তো সবাইকে ভালবাসতে পারলাম না।" শ্রীরামকৃষ্ণ বল্লেন—"প্রথমে একবার তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে ভাব করবার চেষ্টা করবে। তাতে যদি না হয় তবে ওসব আর ভাববে না। তাঁর শরণাগত হও—তাঁর চিন্তা কর—তাকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করবার দরকার নেই।" ভবনাথ বলিলেন—"খ্রীষ্ট চৈতন্য এঁরা সব বলে গেছেন যে সকলকে ভালবাসবে।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"ভাল ত বাসবে—সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন বলে। কিন্তু যেখানে দুষ্টলোক সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে। কি চৈতন্যদেব? তিনিও 'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ।' শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর শাশুড়ীকে চুল ধরে বের করা হয়েছিল।" ভবনাথ—"সে অন্য লোক বের করে দিয়েছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণ—"তার সম্মতি না থাকলে কি পারে? অন্য লোকের মন পাওয়া গেল না বলে কি রাতদিন তাই ভাবতে হবে? যে মন তাকে দেব—সে মন এদিক ওদিক বাজে খরচ করব? আমি বলি মা, আমি নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল কিছুই চাই না কেবল তোমায় চাই? মানুষ নিয়ে কি করবো? তাকে পেলে সব পাব।"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দক্ষিণেশ্বরে ঝাউ-তলার নিকট তারের বেড়ায় পড়িয়া ঠাকুরের বাম হাতে খুব আঘাত লাগে ও হাতের হাড় সরিয়া যায়; তাই ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব যথাসময়ে না হইয়া ২৫শে মে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত মহোৎসবোপলক্ষে কীর্তনের আয়োজন ভক্তেরা করিয়াছিলেন—পালা ছিল শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস। কীর্তন শুনিতে শুনিতে ভাবোন্মত্ত ঠাকুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমাধিস্থ হইলেন। ভবনাথ ও রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) তাঁহাকে ধরিয়া আছেন—পাছে পড়িয়া যান। রাখাল ও বাবুরাম ছাড়া সমাধি বা ভাবাবস্থায় আর কাহারও স্পর্শ ঠাকুর সহ্য করিতে পারিতেন না। ভবনাথকেও স্পর্শ করিতে দিতেন।

এই সমাধি অবস্থায় ভক্তেরা তাঁহার গলা পুষ্পমালায় সজ্জিত করিলেন। বিজয়কৃষ্ণপ্রমুখ ভক্তেরা মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। এই ভাবাবস্থায় ঠাকুর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতেছেন—সেই দিব্য অবস্থা দেখিয়া ও প্রেমমাধুর্যময়ী বাণী শুনিয়া বিজয় ভাবাবিষ্ট হইলেন, কীর্তন গাহিতে গাহিতে যখন কীর্তনীয়া—"সদাই হিয়া মাঝে রাখিতাম" বলিয়া আখর দিল তখন শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন—তাঁহার বামহাতটি ভবনাথের কাঁধে।

দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রপ্রমুখ অন্তরঙ্গরা চড়ুই ভাতি করতেন। ভবনাথও তন্মধ্যে থাকিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন—"অনেক সাবধানে থাকলে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ রাখাল এরা সব একদিন রান্না কল্লে। ওরা খেতে বসেছে—এমন সময় একজন বাউল ঐ পংক্তিতে বসে বলে খাব। বল্লাম, আঁটবে না! যদি কিছু থাকে তবে পরে খেও। সে রেগে চলে গেল!"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ী। তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বল্লুম। ওরা দুজনে অরূপের ঘর। বাবুরাম ভবনাথের প্রকৃতি-ভাব।"

বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আসিতেন, তিনি নরেন্দ্র রাখাল ও ভবনাথকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিতেন। তিনি বলরামকে বলিয়াছিলেন—"এদের খাইও—তা হলে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হবে।"

একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরকে বলিলেন—"ভবনাথ মাছ আর পান ত্যাগ করেছে।" ভবনাথের দিকে অমনি ঠাকুর তাকাইয়া সহাস্যমুখে বলিলেন,—'সে কি রে! পান মাছে কি হয়েছে? ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগই ত্যাগ।'

একবার কোন্নগর হইতে জন কয়েক ভদ্র লোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। স্বামিজীর ভজন গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। ভদ্রলোকেরা সমাধি বুঝিতে না পারিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন—ভবনাথ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"এঁর এখন সমাধি অবস্থা—আপনারা বসুন।" পরে ভবনাথ ঠাকুরকে বলেন, "কোন্নগরের ভক্তেরা আপনার সমাধি অবস্থা বুঝতে না পেরে চলে যাচ্ছিল।" ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন—"কে যেন বলছিল—তোমরা বস।" ভবনাথ বিনীত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে সে আমি।" ঠাকুর রহস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি বাছা ঘটাতে যেমন আবার তাড়াতেও তেমন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথকে বলিয়াছিলেন অরণ্যে তপস্যারত ধ্রুবের ছবি আনিয়া দিতে। সেই সময়ে ভবনাথ কয়েক দিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পারেন নাই এবং ছবিটিও দিয়া যান নাই। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা উক্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, একদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে গ্রীষ্ম কালের প্রচণ্ড রৌদ্রে ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, "তুই একবার যাবি? না, থাক, বড় ধুপ।" রামলাল বলিলেন, "কোথায় বলুন না?" ঠাকুর অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন, "ভবনাথের কাছে—না, থাক, বড় ধুপ।" রামলাল দাদা বলিলেন, "এই বরানগরে যাব—তাতে কি? গামছা মাথায় দিয়ে ছাতা নিয়ে যাব—এই টুকুতে আর কত রদ্দুর লাগবে।" ঠাকুর বল্লেন—"তোর কষ্ট হবে—থাক।" রামলাল দাদা বলিলেন—"কোন কষ্ট হবে না—কি বলতে হবে বলুন।" ঠাকুর বলিলেন—"সে এখানে অনেক

দিন আসে নি—কেমন আছে? তাকে বল এখানে যে ছবি দেবে বলেছিল—তা কি সে নিয়ে এসেছে? যদি এনে থাকে তবে ছবিখানি নিয়ে আসবি।" রামলাল দাদা বরাহনগরে গিয়া দেখিলেন যে ভবনাথ কয়েক জন বন্ধুর সহিত আলাপ করিতেছেন। রামলাল দাদাকে দেখিয়া তিনি সাদরে বসাইয়া হাতপাখা আনিয়া দিলেন। রামলাল দাদার নিকট ঠাকুরের আদেশ শুনিয়া বলিলেন, "দাদা, কার্য্যগতিতে আমি তাঁর কাছে ছবি নিয়ে যেতে পারি নি—ছবি কিনে ঘরে তুলে রেখে দিয়েছি।"—ভবনাথ এই বলিয়া ছবিখানি আনিয়া রামলাল দাদার হাতে দিলেন। রামলাল দাদা গমনোদ্যত হইলে ভবনাথ বলিলেন, "আমি দু-এক দিনের ভিতরে তাঁকে দর্শন করতে যাব।" ঠাকুর রামলাল দাদার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়াছেন—তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "ছবি এনেছিস—তোর বড় কষ্ট হয়েছে—হ্যারে এখান থেকে গেলি, তোকে আদর করেছিল তো?" রামলাল দাদা বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তিনি আবার রামলাল দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আদর? কিছু খেতে দিয়েছিল?" রামলাল বলিলেন, "দুপুরে খেয়ে দেয়ে গেছি—এ সময়ে খেতে দিলে কি খাওয়া যায়?" ঠাকুর বলিলেন, "ঐ তো কলিকাতার ঢং। মানুষ মানুষের বাড়ীতে গেলে অন্ততঃ একটু মিষ্টি বা গুড় আর জল দিয়ে সেবা করতে হয়। ভিতরে যে তিনি আছেন।" পরে ছবিখানি হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে ঘরের দেওয়ালে ছবিখানি যথাস্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে বলিলেন। ছবি টাঙ্গানো হইলে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ঘরে যে ধ্রুবের ছবি আছে তাহা ভবনাথ-প্রদত্ত।

কি পানীহাটিতে, কি অধরের, কি রামের, কি গিরিশের বাড়ীতে, কি সুরেন্দ্রের বাগানে, কি বলরাম মন্দিরে ঠাকুর যেখানে গিয়াছেন ভবনাথ প্রায়ই তথায় উপস্থিত হইতেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রেল গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুরের আগমনোপলক্ষে ভক্তসমাগম, কীর্ত্তনানন্দ এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। ভবনাথ তথায় শ্রীঠাকুরকে বলিলেন, "আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আমি চণ্ডী বুঝতে পারছি না। চণ্ডীতে লেখা আছে যে তিনি সব টক টক মারছেন। এর মানে কি?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওসব লীলা। আমিও ভাবতুম ঐ সব কথা। তারপর দেখলুম সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, সংহারও মায়া।"

ভবনাথ বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৯ই মে ঠাকুর ভক্তদিগের নিকট বলিতেছেন—"ভবনাথ বিয়ে করেছে কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ধর্ম্ম কথা কয়। ঈশ্বরের কথা নিয়ে দুজনে থাকে। আমি বল্লুম পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করবি, তখন রেগে রোক করে বল্লে—আমরাও আমোদ আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?"

কথামৃতে দেখিতে পাওয়া যায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টার মহাশয়কে বলিতেছেন, "এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই' জিজ্ঞাসা করে তারা বহিরঙ্গ। ভবনাথকে দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটী সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন, তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতিরে ঐ রকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই।" ইহাকেই বলে নিয়তি-চক্র—মহামায়ার মায়া!

ভবনাথ সংসারী হইয়া সংসার প্রতিপালনের

জন্য কাজ-কর্মের চেষ্টায় ঘুরিতেছেন। মাষ্টার মহাশয়কে তিনি একদিন বলিলেন, "বিদ্যাসাগরের নূতন স্কুল হবে শুনলাম। আমারও তো খ্যাটের জোগাড় করতে হচ্চে।"

অহেতুককৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথকে অভয় দিতেছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২২শে এপ্রিল গুডফ্রাইডের পূর্বদিন ভবনাথ কাশীপুর বাগানে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দ্বিতলে হলঘরে ঠাকুরের শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ ও ভবনাথ কথাবার্তা বলিতেছেন। কথামৃতকার লিখিতেছেন—"ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন; কর্ম্ম-কাজের চেষ্টা করিতেছেন। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরকে দেখিতে আসিতে বেশী পারেন না, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথের জন্য বড় চিন্তিত থাকেন, কেন না ভবনাথ সংসারে পড়িয়াছেন। ভবনাথের বয়স ২৩।২৪ হইবে।"

নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া পরম অভয়দাতা ঠাকুর ভবনাথকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিতেছেন, "ওকে খুব সাহস দে।" ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া উভয়ে হাসিতে লাগিলেন। ঠাকুর ইসারায় ভবনাথকে বলিতেছেন, "খুব বীর পুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিসনে। শিকনি ফেলতে ফেলতে কান্না।" সকলেই ইহাতে হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভবনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভগবানে মন ঠিক রাখবি; যে বীর পুরুষ সে 'রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ!' পরিবারের সঙ্গে কেবল ঈশ্বরীয় কথা কবি।" পরম করুণায় বিচলিত হইয়া ঠাকুর ইসারা করিয়া ভবনাথকে বলিলেন, "আজ এখানে থাস।" ভবনাথ বলিলেন, "যে আজ্ঞা। আমি বেশ আছি।" শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁহার মনপ্রাণ অর্পিত ছিল। দৈন্যদুঃখে অন্নচিন্তায় প্রপীড়িত হইয়াও ভবনাথ সময় পাইলেই কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যাইতেন। কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের মহাসমাধির পর যে ফটো তোলা হয়—তাহাতে দেখা যায় শোকাহত বেদনাতুর মুখে স্বামিজীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন ভবনাথ। ঠাকুর বলিতেন, "ব্যক্তযোগী আর গুপ্তযোগী। সংসারে গুপ্তযোগী—কেউ তাকে টের পায় না; সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ বাহিরে ত্যাগ নয়।" ভবনাথ সেই গুপ্তযোগী ছিলেন।*

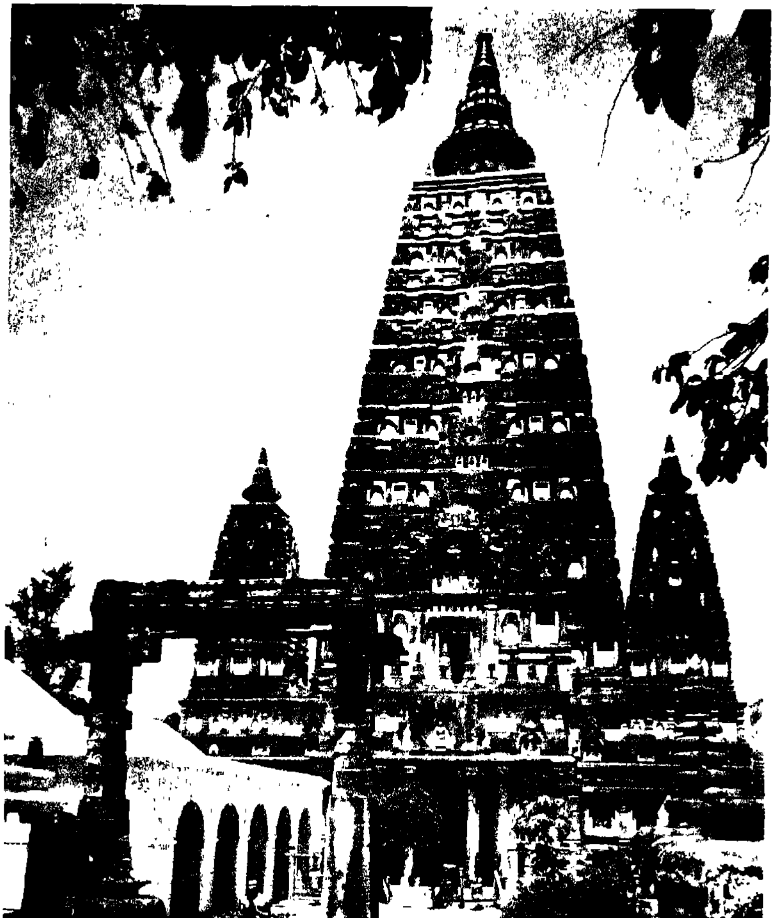
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত হইতে ভবনাথের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের অনেকাংশ সংগৃহীত ও সঙ্কলিত।

"বীরভক্ত না হলে দুদিক রাখতে পারে না। জনক রাজা সাধন-ভজনের পর সিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে দুখানা তলোয়ার ঘুরাতো—জ্ঞান আর কর্ম্ম।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত



ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪



বোধ-গয়া, মহাবোধি মন্দির

উদ্বোধন, সুবর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৪

'রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট্ অব কালচারের' সৌজন্যে

বোধগয়া

ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী, এম-এ, ডি-লিট

এই মন্দিরের চূড়া সূর্যলাগা
স্বর্ণনীল জ্যোতির্ভেদী—
রাত্রে সৃষ্টি অন্ধকারে কালপুরুষের তারা জলজ্বল
কল্প কল্পে চলে শীর্ষে তারি মন্ত্র বিনিময় ;
বক্র হয়ে চাঁদ ঘেরে জাগ্রত পাথর
জ্যোতির মণ্ডলে পূর্ণিমায়।
উদার অতীত শূন্য স্বচ্ছ হয়ে নামে ভোরে
ভাস্বর বাণীর স্তব্ধাকাশে।

এরি কাছে,
যেখানে নদীতে নেমে স্নান তুমি করেছ একাকী
শুভ্র বালি স্বপ্নাভ সেখানে ;
পাশে আজ হাট বসে।
উরুবিল্ব বনে
মনে হয় সবুজের অম্লান নতুন পাতা যত
সেদিনের কোনো স্পর্শ বয় ;
এরা যারা আছে এই পল্লীপাশে, ধন্য তারা,
জানে কি জানে না
তোমারি সেবায় ভোলে মাটির সেবাতে তারা,
ধান ভানে, দুধ দোয, সব্‌জি ক্ষেতে সারাদিন
কাজ করে,
এরা পুণ্যব্রত
যেন সুজাতার মতো পরমান্ন ব'য়ে চলে আজো
সর্বমানুষের
প্রাণতপস্যার মুক্তিদানে।

বড়ো প্রীতি করেছিলে এই পল্লীটিকে
মুগ্ধস্রোতা আজো বহে নদী নিরঞ্জনা—
কী চোখে এদের তুমি দেখেছিলে তাই ভাবি।
গ্রামে যেতে কত নরনারী
ধন্যদৃষ্টি পেয়েছে তোমার
সেই একদিন।
শতাব্দী শতাব্দী চলে গেল তার পর।
নিয়েছ প্রসন্ন মনে তোমার আসন সেই দিন
বজ্রশিলা চৈতন্যের 'পরে
এই প্রান্ত অরণ্যের মৌনতায়।
সব চেয়ে বৃহতের তপোব্রত নিলে ধারণায়,
ধূলির জগতে বসেছিলে
আমাদেরি মৃত্যুশোকে প্রেমের বেদনে মগ্ন হয়ে
নিঃসহ ব্যথার অন্তর্যামী।
পার হয়ে পার হয়ে জন্মমৃত্যু-তরঙ্গ-অকূল
ফিরে এলে লোকালয়ে
দুঃখাতীত আনন্দের দান নিয়ে আমাদেরি কাছে,
বিশ্বের প্রভাতে একদিন।

সেই বোধিতল দেখি দূর চোখে
পুণ্যচ্ছায়াতলে হেথা এসে।
সমুত্থিত দৃঢ় স্তূপ মহাযোগী যেন ঊর্ধ্বে চায়,
এ যে তব চারিত্রের প্রস্তর শরীর
অচল সুন্দর স্থিতি 'পরে!

ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী কর্ম্মচারী

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ-ডি

সত্তর আশী বছর পূর্ব্বেও লোকের ধারণা ছিল যে গণতন্ত্র স্থাপিত হইলেই জন-কল্যাণ পূর্ণ ভাবে সাধিত হইবে। কিন্তু আজকাল রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে জন-কল্যাণ বিশেষ কোন শাসন-পদ্ধতির উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে সরকারী কর্ম্মচারীর সুদক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও সাধুতার উপর। শাসন-তন্ত্র যদি এরূপ হয় যে একজন বা মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক সমস্ত কর্তৃত্বভার নিজেদের সুবিধার জন্য নিজেরাই পরিচালিত করিবার সুবিধা পায়, তাহা হইলে অবশ্য জনগণের কোনরূপ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না।

সেইজন্য সর্ব্বসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের হস্তে দেশের আইন-কানুন বানাবার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কোন একটি আইন তৈয়ারী করিলেই যে তদনুসারে কার্য্য চলিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কেননা কোন আইনকে প্রয়োগ করাব ভার থাকে সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর। মন্ত্রিমণ্ডলী সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে কেবলমাত্র মূলগত নীতি সম্বন্ধেই উপদেশ দিতে পারেন; ব্যক্তি বা সঙ্ঘবিশেষের প্রতি কি ভাবে ঐ আইন প্রযুক্ত হইবে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে সম্ভব নয়। মন্ত্রীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা শাসন-ব্যবস্থার জটিল কূট-কৌশল অবগত নহেন। ইহা আয়ত্ত করিতে হইলে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। বহুদিনের অভিজ্ঞ সরকারী কর্ম্মচারীরাই ঐ কার্য্য সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তৃততর হইতেছে। যে যুগে রাষ্ট্র কেবলমাত্র কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইত ও শান্তি রক্ষা করিত, সে যুগে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতা তত ব্যাপক ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে রাষ্ট্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, এমন কি আহার-বিহারের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্যও নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিতে বাধ্য হইতেছে। সমগ্র আর্থিক ও সামাজিক জীবন আজ রাষ্ট্রের নির্দ্দেশে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভা এই সব বিষয়ে কতকগুলি মূলনীতি ঘোষণা করিয়া আইন পাশ করিতে পারেন; কিন্তু তাহা প্রয়োগ করিবার ভার সরকারী কর্ম্মচারীদের উপরই রাখিতে হইবে। সেইজন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব এ যুগে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হইতে চলিতেছে। শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের পূর্ব্বে ব্যবস্থা-নির্ম্মাতৃ-সমিতি (Constituent Assembly) ঘোষণা করিয়াছেন যে জনসাধারণের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ-বিধান করা রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু বৃটিশ শাসনের আওতায় সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে ঐতিহ্যের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে না পারিলে আমাদের সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড হইয়া

যাইবে। বৃটিশ শাসনের আমলে সরকারী কর্ম্মচারীরাই ছিল শাসক আর প্রজাসাধারণ ছিল শাসিত। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্যতম চৌকিদার ও হাসপাতালের চাপরাশীও জনসাধারণকে অবজ্ঞা ও করুণার চক্ষে দেখিত। নবস্থাপিত ভারতীয় গণতন্ত্রে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে হইতে হইবে জনসেবক বা Public Servants. Indian Civil Service এর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া Indian Administrative Service রাখিলেই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না। ইহার জন্য অনেক বিধিব্যবস্থা ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সাধন করার প্রয়োজন হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এতকাল সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে জনসাধারণের সংস্পর্শ হইতে সযত্নে দূরে রাখা হইত; তাঁহাদিগকে নগরের ঘন-বসতি হইতে বহুদূরে অপেক্ষাকৃত জন-বিরল স্থানে বাসস্থান দেওয়া হইত; তাঁহাদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র 'ক্লাব' ছিল; তাঁহাদের দর্শন পাওয়া সাধারণের পক্ষে অনেক সাধ্য-সাধনার বিষয় ছিল। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে জনসেবকরূপে সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিতে মিশিতে হইবে; তাহাদের সুখ-সুবিধা অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এতকাল তাঁহারা কেবল মাত্র সরকারী পত্রে 'আপনার একান্ত বশংবদ ভৃত্য' এই কথা লিখিয়া দিতেছিলেন; এইবার তাঁহাদিগকে কথায়, কাজে ও ব্যবহারে তাহার পরিচয় দিতে হইবে।

নূতন শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারী-দিগের চরিত্রের ব্যবহারের খাপ খাওয়াইবার জন্য কতকগুলি 'পরামর্শদাতৃ-সমিতি' (Advisory Board) স্থাপন করা প্রয়োজন।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অনেক ক্ষেত্রে এরূপ পরামর্শদাতৃ-সমিতি নিয়োগ করা হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নগরের উদ্যানমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে, স্বাস্থ্যবিভাগের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কীয় তথ্য-সংগ্রহে এইরূপ সমিতির সাহায্য ও পরামর্শ যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছে। যে সকল অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি সাধারণ নির্ব্বাচনের হাঙ্গামা পোহাইতে চাহেন না অথবা সাধারণ রাজনীতিতে যোগদানের কৌতূহল বোধ করেন না তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, বিচারশক্তি ও কার্য্যক্ষমতা রাষ্ট্রের কার্য্যে লাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে এইরূপ সমিতি গঠন করা।

দেশের শাসন-ব্যবস্থাকে জনসাধারণের আয়ত্তে তখনই আনা যায় যখন সাধারণের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা শাসকগণের কার্য্যসমূহের পরিদর্শন করিবার ও পরামর্শ দিবার ক্ষমতা লাভ করেন। জনসাধারণ ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সদাসর্ব্বদা মতামত-বিনিময়ের প্রতিষ্ঠান হিসাবে এইরূপ সমিতি অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি স্বীকার করিয়াছেন।[১]

১ "It provides means for utilizing the services of men who now avoid public life either because they are unwilling to undergo the process of election, or because their interest is not in the general complex of governmental functions but in a single aspect of that complex. This system of popularizing the administrative process by widening the area of persons who are competent to scrutinize, provides for a constant interchange of opinion between the centre and circumference of Government. Because the system is advisory, and not executive in character, it leaves simple and intelligible the ultimate institutions, and it

পরামর্শদাতৃ-সমিতি কেবলমাত্র পরামর্শই দেবেন; কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারী সেই পরামর্শ অনুসারে স্বীয় কার্য্য সম্বন্ধে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তাঁহার উপর থাকিবে; সমিতি বিশেষ কোনো কাজ করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাহা করিয়াছেন এইরূপ যুক্তি তুলিয়া তিনি তাঁহার দায়িত্ব-ভার হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। দায়িত্ব সরকারী কর্ম্মচারীর উপর না রাখিলে অরাজকতা উপস্থিত হইবে; কেননা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে কাহাকেও দায়ী করা চলিবে না। সরকারী কর্ম্মচারী সমিতির বিভিন্ন সদস্যদের মতামত জানিয়া লইবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবেন; সেই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। কি কারণে তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন তাহা সদস্যদিগকে বুঝাইয়া বলিলে, তাঁহারা আবার জনসাধারণের নিকট উহা ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। এইরূপে জনসাধারণের সহিত সরকারী কর্ম্মচারীদের এবং সমগ্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহযোগ স্থাপিত হইতে পারে। সমিতি সাধারণের কথা সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বলিবেন এবং সরকার কি জন্য কোন বিশেষ কার্য্য করিতেছেন তাহা জনসাধারণকে বুঝাইবেন।

পরামর্শ-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন করা সহজ ব্যাপার নহে। মন্ত্রিমণ্ডলী যদি নিজেদের দলের কর্ম্মী ও পৃষ্ঠপোষকদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্য এইরূপ সদস্যপদ প্রদান করেন তাহা হইলে নানারূপ অনাচার দেখা দিবে। কংগ্রেস-শাসিত কোনো কোনো প্রদেশে খাদ্য ও বস্ত্র-বণ্টন ব্যবস্থার জন্য এইরূপ সমিতি গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সদস্য মনোনয়নের সময় সাধারণতঃ কংগ্রেসের উৎসাহী কর্ম্মীদিগকেই লওয়া হইয়াছিল। ঐ কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে তাঁহারা দেশের জন্য শাসক-সম্প্রদায়ের হস্তে অনেক লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন; এখন তাঁহাদের দলের হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে সুতরাং তাহার সুযোগ লইয়া তাঁহারা কিছু সুখ-সুবিধা ভোগ করিবেন না কেন? সরকারী কর্ম্মচারীরা ইঁহাদের দুর্নীতি, অন্যায় ও অনাচার চোখে দেখিয়াও সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন না অথবা বলিলেও ফল হয় না। কর্ম্মীরা সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি চোখ রাঙাইয়া কাজ আদায় করেন; তাঁহাদের কোন আবদার প্রতিপালিত না হইলে মন্ত্রীদের দরজায় যাইয়া ধর্না দেন এবং মন্ত্রীরাও ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনের কথা ভাবিয়া তাঁহাদের অন্যায় কার্য্যে সহায়তা করেন। এইজন্য সমিতির সদস্য-নির্ব্বাচনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। সততা, বুদ্ধিবিবেচনা ও বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা যাঁহার যে ক্ষেত্রে আছে তাঁহাকে সেইরূপ সমিতির সদস্যরূপে মনোনয়ন করা কর্ত্তব্য। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যখন কোন বিষয় লইয়া স্বার্থ-সংঘাত বাধিবার আশঙ্কা থাকে তখন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিকে সমিতিতে স্থান দিতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদের সকলের মতামত শুনিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন যাহাতে কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করা না হয়।

এরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলে কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে অনেক দুর্নীতি দেখা দিয়াছে। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামায়া প্রসাদ গত ২০শে

does not make authority degenerate into anarchy by the indefinite division of power··· ········· It multiplies, in a word, the sources through which citizen's personality may be made significant."

আগষ্ট দানাপুরের এক বৃহৎ জনসভায় বলিয়াছিলেন —"I find that many a Congress man have cast all scruples to the winds and decided to make money in whatever manner and by whatever method possible. The temptation has obviously seized even those whom it should not have. Otherwise, this kind of open loot could not have been possible." মন্ত্রিমণ্ডলী ও তাঁহাদের সমর্থকগণ যদি অন্যায় ভাবে অর্থসংগ্রহণের সন্দেহে লোকচক্ষুতে হেয় হইয়া পড়েন তাহা হইলে শাসন-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। অমুক মন্ত্রী বা অমুক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ কানাঘুষা উঠাও মারাত্মক। দুর্নীতি কলেরা-বসন্তের মতনই ছোঁয়াচে রোগ। সংক্রামক ব্যাধির মত ইহা দ্রুত গতিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া পড়ে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ঘুষ লইতেছেন শুনিলে সাধারণ কর্ম্মচারীরা প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন না। সম্প্রতি কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ঘুষের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় সমাজে বিপুল চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। কিন্তু একটু নিবিষ্ট চিত্তে উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সাধারণ রাজনীতি-ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক প্রভাবই কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারীর নৈতিক অবনতির প্রধান কারণ। রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে দুর্নীতি অপসারণ করিতে না পারিলে সরকারী কর্ম্মচারীদেরও নৈতিক শুচিতা অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হইবে।

প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সহিত নিরপেক্ষ পরামর্শ-সমিতি যুক্ত থাকিলে দুর্নীতি ও অনাচার অনেকাংশে নিবৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কাহাকেও খাদ্য বা বস্ত্র বিক্রয়ের অনুমতি দিবার পূর্ব্বে তাহার স্বভাব-চরিত্র, কার্য্যকুশলতা ও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে স্থানীয় পরামর্শ-সমিতি হইতে মত লওয়া যাইতে পারে। অনুমতি-প্রাপ্তির পর সেই ব্যক্তি কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে কি-না, থাকিলেও উহা কতদূর সত্য তাহা বিবেচনা করিতে পরামর্শ-সমিতির সাহায্য অত্যন্ত মূল্যবান হইবে।

"ইয়োরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্য্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো।" —স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতীয় আর্য্য সভ্যতায় নারীর স্থান

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ

ভারতীয় আর্য্য সভ্যতায় নারীকে কি দৃষ্টিতে দেখা হইত, নারীর প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হইত, নারীর প্রতি ভারতীয় জনগণের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল এইরূপ প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর, ঋক্ সংহিতায়[১] ও অথর্ব্ব-সংহিতায়[২] পঠিত দেবীসূক্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহার মহিমায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার হয় তিনিই পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরকে সকলেই পুরুষ-বাচক (পুংলিঙ্গ) শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। একমাত্র ভারতীয় আর্য্য সভ্যতায়ই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণীকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যাঁহার প্রভাবে জগতের সৃষ্টি ও পরিপালনাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে তিনি স্ত্রী, তিনি নারীমূর্ত্তি। উল্লিখিত দেবীসূক্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি সাহিত্যে এই জগৎ-কর্ত্রী জগদম্বিকার স্বরূপ অতি সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। পৃথিবীর আর কোন সভ্যতায় জগতের সৃষ্টি ও পরিপালনাদির কর্ত্তাকে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয় নাই এবং তাঁহার সমুজ্জ্বল স্বরূপও প্রকাশ করা হয় নাই। জগৎকর্ত্তাকে স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিতে কেহই সাহসী হন নাই। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ সে সাহস দেখাইয়াছেন এবং তাঁহারা ভক্তি-বিগলিত চিত্তে জগদম্বিকার চরণে আনত হইয়াছেন। যাঁহার কটাক্ষনিক্ষেপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার সংঘটিত হইতেছে তাঁহাকে জগজ্জননী-রূপে গ্রহণ করায়—নারীমূর্ত্তিরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করায় আর্য্য সভ্যতায় নারীকে অত্যুচ্চ স্থান দান করা হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রচলিত দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতির প্রতি সাধারণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেও "আর্য্য-সভ্যতায় নারীর স্থান" সম্বন্ধে—নারীর অনন্য-সাধারণ মহত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবসর থাকে না। মার্কণ্ডেয় পুরাণের[৩] দেবীমাহাত্ম্যে সমস্ত স্ত্রী-জাতিই যে জগদম্বার অংশ বা বিভূতি ইহা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। এজন্য ভারতীয় আর্য্যগণ নারীমাত্রের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ভারতীয় আর্য্যগণের নৈতিক ও ধর্ম্মতঃ দায়িত্ব আছে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আবালবৃদ্ধ ভারতীয় আর্য্যগণের স্মরণাতীতকাল হইতে বিদ্যমান।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মানবজাতির আদিপুরুষ, আদিমানব ভগবান মনু যখন স্বর্গগমনে অভিলাষী হইয়া-ছিলেন সেই সময়ে তিনি সকল মানবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে মানবগণ, আজ আমি তোমাদের হস্তে পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতিকে গচ্ছিত করিয়া যাইতেছি। এই নারীজাতিকে ন্যাসরূপে তোমাদের হস্তে দিয়া যাইতেছি। এই নারীকুল তোমাদের অশেষ

১ ঋক্ সং ১০।১০।১২৫ সূঃ

২ অথর্ব্ব সং ৪।৬।৩০ সূঃ

৩ দেবীমাহাত্ম্য (চণ্ডী) ১১।৬ : শ্লোক

কল্যাণপ্রদ হইবে। এজন্য ইহাদের প্রতি অসম্মান হইতে পারে এরূপ কোন কার্য্য তোমরা করিও না।"[৪]

ভগবান মনুর এই অনুশাসন অনুসারে ভারতীয় আর্য্যজাতি নারীজাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নারীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারিগণের নিকট উদ্যত বজ্রস্বরূপ। ভগবান্ মনুর এই অনুশাসন-বাক্যগুলি আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে নারীজাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে এবং তাহাদের রক্ষণে পুরুষের নৈতিক ও ধর্ম্মতঃ দায়িত্ব কেন। যে গচ্ছিত বস্তুর বিনাশ করে, ন্যস্ত বস্তুর যে অপহরণ করে, তাহার কঠোর রাজদণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির অসম্মান প্রদর্শন কারীর প্রতি এই দৃষ্টিতেই কঠোর রাজদণ্ডের ব্যবস্থা আর্য্যশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপকগণ একবাক্যে গর্ভিণী স্ত্রীর "তরণ শুল্ক" রহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রী-জাতির প্রতি যে কর্ত্তব্য ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সত্যই আর্য্যোচিত। বিষ্ণুসংহিতা। ৫।১৩১

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে নারী-ধর্ষণ, কন্যাপহরণ প্রভৃতি অতি নৃশংস কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[৫] এমন কি দস্যুগণেরও এতাদৃশ নৃশংস-কর্ম্ম অতি গর্হিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শান্তিপর্ব্বেই আবার বলা হইয়াছে—'বলপূর্ব্বক স্ত্রী-গ্রহণ যেমন নিষিদ্ধ, এইরূপ স্ত্রী-হত্যাও অতি নিন্দনীয়। কেবল নারীহত্যাই যে নিন্দিত তাহা নহে পরন্তু গো-মহিষাদি স্ত্রীপশুর হত্যাও নিন্দিত কার্য্য। সমস্ত জীবের স্ত্রীজাতিই অবধ্য। মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে শরণাগত পুরুষের প্রতি ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা ও আশ্রিত-পরিত্যাগ অতি নৃশংস দুষ্কর্ম্ম।[৬] মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্গা নামক অপ্সরা বলিয়াছেন—"অবধ্যাস্তু স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টা মন্যন্তে ধর্ম্ম-চারিণঃ"—ধার্ম্মিকগণ স্ত্রীজাতি অবধ্যরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।[৭] রামায়ণেও ভগবান্ বাল্মীকি স্ত্রীজাতিকে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষ্ণুস্মৃতির ৫৪ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে স্ত্রীঘাতীরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে না—এইরূপ বলিয়াছেন। অত্রি-স্মৃতির ১৬৭ শ্লোকে স্ত্রীঘাতীর অতি কঠোর প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিষ্ণুস্মৃতির ৩২ অধ্যায়ের ৭ সূত্রে বলা হইয়াছে যে পরস্ত্রীকে ভগ্নী, কন্যা অথবা মাতা মনে করিবে। আপস্তম্ব সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে "মাতৃবৎ পরদারেষু" এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে। পরস্ত্রীতে মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যা এই তিনটি সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ মনে করা নিষিদ্ধ। বিষ্ণুস্মৃতির ১৬ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে, দুর্বৃত্ত দস্যু হইতে স্ত্রীজাতির রক্ষার জন্য দস্যুদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যদি কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে পরম সিদ্ধিলাভ করিবে, এইরূপ বলা হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্য পুরুষ, স্ত্রীজাতির সম্মানরক্ষার্থ দুর্বৃত্ত দস্যুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়গণই যুদ্ধ করিতেন, অন্য তিন বর্ণ যুদ্ধ করিতেন না। এইরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৭৮ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—

উন্মর্য্যাদে প্রবৃত্তে তু দস্যুভিঃ সংকরে কৃতে।
সর্ব্বে বর্ণা ন দুষ্যেযুঃ শস্ত্রবন্তো যুধিষ্ঠির॥

৪ মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৬ অধ্যায় ৮—৯ শ্লোক।

৫ মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৩৩ ও ১৩৫ অধ্যায়।

৬ মহাভারত, মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব, ৩ অধ্যায় ১৫ শ্লোক।

৭ মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১৭ অধ্যায় ৪ শ্লোক।

শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—'হে মহারাজ! যখন দস্যুবল দ্বারা দেশ আক্রান্ত হইয়া সর্ব্ববিধ মর্য্যাদা রহিত হইবে, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইবে এবং যখন দস্যুগণ নারীগণের ধর্ষণে প্রবৃত্ত হইবে, তখন দেশের চতুর্বর্ণ ই দস্যু-নিরোধের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিবে।' মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে ১৪৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে—'যে রাষ্ট্রে দুর্বৃত্ত-দস্যুগণ বলপূর্ব্বক আর্ত্তনাদকারী স্ত্রীপুরুষগণকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, দস্যুনিবারণে অসমর্থ সেই রাষ্ট্রের রাজা জীবিত থাকিলেও তাঁহাকে মৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে।' আর্য্য-সভ্যতা অনুসারে রাজা পরমপূজ্য হইলেও নারীধর্ষণাদি নৃশংস দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত দস্যুগণের নিবারণে অসমর্থ হইলে সেই রাজার কিছুমাত্র সম্মান করা উচিত নয়। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া সেই রাজ্যের চতুর্বর্ণের প্রজাগণ অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক দস্যুগণকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিবে, ইহাই মনুসংহিতা ও মহাভারতের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ।

স্ত্রী-হত্যার মত মহাপাপ আর্য্য সভ্যতায় আর কিছুই নাই। আর্য্যগণ স্ত্রীহত্যার মত জুগুপ্সিত কর্ম্ম, নারীধর্ষণের মত হীনকর্ম্ম আর কিছুই মনে করেন নাই। আমরা অতি সংক্ষেপে নারীহত্যা ও নারীধর্ষণ সম্বন্ধে ভারতীয় আর্য্যগণের সিদ্ধান্ত বলিলাম। এই সম্বন্ধে ভারতবর্ষ-নিবাসী (দেশান্তর হইতে আগত নহে) দস্যুগণের সিদ্ধান্ত কি ছিল, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব। মহাভারত শান্তিপর্ব্বের ১৩৫ অধ্যায়ে নিষাদীর গর্ভজাত ক্ষত্রিয়-কুমার দস্যুরাজ কায়ব্য দস্যুগণের ধর্ম্ম ও ভারতনিবাসী দস্যুগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে পারিযাত্র পর্ব্বতের নিকট-

৫। প্রদেশে বহু দস্যু বাস করিত। এই দস্যুগণ মিলিত হইয়া কায়ব্যকে দস্যুগণের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নিষাদীর গর্ভ-জাত দস্যুরাজ কায়ব্য অতি বলবান্, অস্ত্রচালনে ও শত্রুমারণে অতি দক্ষ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। এইজন্যই দস্যুগণ তাঁহাকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল। দস্যুগণ কায়ব্যকে বলিয়াছিল—আপনি আমাদের মধ্যে অসাধারণ বীর্য্যশালী ও বুদ্ধিমান্ পুরুষ, আমাদের অধিপতি হইয়া আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমরা তাহাই করিব। দস্যুগণের প্রার্থনা অনুসারে কায়ব্য তাহাদের অধিনায়কত্বগ্রহণপূর্ব্বক দস্যুগণকে বলিয়াছিলেন—'হে দস্যুগণ তোমরা কখনও স্ত্রীজাতিকে হত্যা করিও না, শিশু ও তপস্বিগণকে হত্যা করিও না, বলপূর্ব্বক স্ত্রীধর্ষণ করিও না এবং কোন প্রাণীরই স্ত্রীজাতিকে হত্যা করিও না,' ইত্যাদি।

ভারতীয় দস্যুরাজ কায়ব্য যাহা বলিয়াছিলেন, আজ তাহা অভারতীয় সজ্জনগণের নিকটও প্রত্যাশা করা যায় না! দীর্ঘ দিন হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ অভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে থাকায় হয়ত তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার কিঞ্চিৎ মালিন্য বর্ত্তমান সময়ে সম্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু নারীহত্যা, নারীধর্ষণ ও বালক-বালিকা-হত্যা প্রভৃতি অতি নৃশংস জুগুপ্সিত পাপকর্ম্ম, যাহা ভারতীয় দস্যুগণেরও ঘৃণ্য, তাহাতে ভারতীয় আর্য্যগণ প্রবৃত্ত হইতে পারে না। দস্যুরাজ কায়ব্য স্ত্রীহত্যার মত স্ত্রী-পশুহত্যাও নৃশংস জুগুপ্সিত পাপকর্ম্ম বলিয়াছেন, মৃগয়াধর্ম্মেও স্ত্রীপশুহত্যা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ ছিল। ভারতীয় অরণ্যসমূহ যে ক্রমেই পশুশূন্য হইতেছে ইহারও কারণ স্ত্রীপশুহত্যা।

আর্য্য-সাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের মত গ্রন্থ আর নাই। এই দুইখানি গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যাকাশে চন্দ্র-সূর্য্য স্বরূপ। এই সুবৃহৎ দুইখানি গ্রন্থেই নারীর প্রতি অমর্য্যাদার বিষময়

ফল বর্ণিত। অন্যান্য অনেক নৃশংস জুগুপ্সিত কর্ম্মের বর্ণনাও ইহাতে আছে বটে কিন্তু ঐগুলিকে নারীধর্ষণ ও স্ত্রীহত্যার মত নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম ভারতীয় আর্য্যগণ মনে করেন নাই।

ভগবান পরশুরাম কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতিবার ধরণী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। অতি ক্রোধান্ধ পরশুরামও কিন্তু ক্ষত্রিয় রমণীগণের কেশাগ্র স্পর্শ করেন নাই। ক্ষত্রিয় রমণীদিগকে হত্যা করিলে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় হত্যার প্রয়াস করিতে হইত না। ক্ষত্রিয় রমণীগণ পুনঃপুনঃ ক্ষত্রিয়গণকে প্রসব করিয়াছিলেন।

ভীষ্ম নিজের মৃত্যু জানিয়াও শিখণ্ডীর শরীরে অস্ত্র নিক্ষেপ করেন নাই। শিখণ্ডী স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে কোনও কারণ বশতঃ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন। "মৃত্যুও বরং বরণ করিব তথাপি স্ত্রীদেহে অস্ত্রাঘাত করিব না"—*এই আর্য্য নীতি রক্ষার জন্যই ভীষ্ম দ্রুপদ*-রাজকন্যা শিখণ্ডীর শরীরে অস্ত্রক্ষেপ করেন নাই।

ভারতীয় রাজ-শাসনেও স্ত্রীজাতি অবধ্য ও অধর্ষণীয় ছিল। প্রায় সহস্র বৎসর হইতে ভারতে নারীধর্ষণরূপ নৃশংস জুগুপ্সিত পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আর তাহাতে ভারতীয় আর্য্য জনগণের হৃদয়েও এই ধারণাই দৃঢ় হইয়াছে যে এই নৃশংস দুষ্কর্ম্মও সাধারণ দুষ্কর্ম্মেরই সমান। ভারতীয় আর্য্যগণ রাজাকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য রাজদ্রোহ গুরুতর পাতক বলিয়া গণ্য হইত। ভারতীয় শাস্ত্রে রাজদ্রোহীর দণ্ডও অতি গুরুতর। রাজদ্রোহী গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেও রাজদ্রোহীর মাতা, কন্যা, স্ত্রী, ভগ্নীপ্রমুখ নারীবর্গের প্রতি রাজ-রোষ পতিত হইত না। তাহাদের বধ ও ধর্ষণ প্রভৃতি জুগুপ্সিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন না। এরূপ জুগুপ্সিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান আর্য্য-সভ্যতায় স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

যাঁহারা নারীপ্রগতি, নারীর সম্মান, ভারতের নারীজাতির সমস্যা লইয়া বহু আলোচনা করেন, তাঁহারাও এই মহাজুগুপ্সিত পাপকর্ম্মের বিরুদ্ধে কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। বিগত মহাযুদ্ধে আমরা চীনে, মালয়ে, রাশিয়ায়, জার্ম্মাণীতে ও ফ্রান্সে এই জাতীয় যে বহুতর দুষ্কর্ম্মের সংবাদ পত্রিকা-পাঠে অবগত হইয়াছি, সে সংবাদ পাঠ করিয়া ভারতীয় আর্য্য জাতি, কর্ণযুগল আচ্ছাদন করিয়া ভগবানের স্মরণ ভিন্ন অন্য কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই! আজ স্বমর্য্যাদা-ভ্রষ্ট, দুর্ব্বল, কাপুরুষ আর্য্যজাতি এই নৃশংস বর্ব্বরতাকেও কথঞ্চিৎ শান্ত দৃষ্টিতেই অবলোকন করিতেছে। প্রায় সহস্র বৎসর পরে আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষ তাহার পূর্ব্ব মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই ভারতবাসী কামনা করে। আজ যদি তাহারা এই সমস্ত জুগুপ্সিত নৃশংস কর্ম্মের চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারে তবে বহিরাগত এই মহাপাপ ভারতবর্ষ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার নামে নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া অভারতীয় সভ্যতার সভ্য হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, আমার ভয় হয় তাঁহারা হয়ত এই নৃশংস বর্ব্বরতাকেও 'ভারতের বাহিরে প্রচলিত আছে বলিয়া' অম্লান বদনেই সহ্য করিবেন! আর্য্য সভ্যতায় নারীর স্থান সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রে অসংখ্য তথ্যপূর্ণ বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্কলন করিলে বিশাল গ্রন্থে পরিণত হইতে পারে। কিছুদিন হইতে যে নারীহত্যা, নারীধর্ষণ প্রভৃতি অতি নৃশংস কর্ম্মসমূহ অবাধগতিতে চলিয়াছে ইহাতে হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত ও উত্তপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই ভারতীয় সভ্যতায় নারীর স্থান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে যদি কাহারও হৃদয়ে কোন আঘাত লাগিয়া থাকে সে জন্য বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ

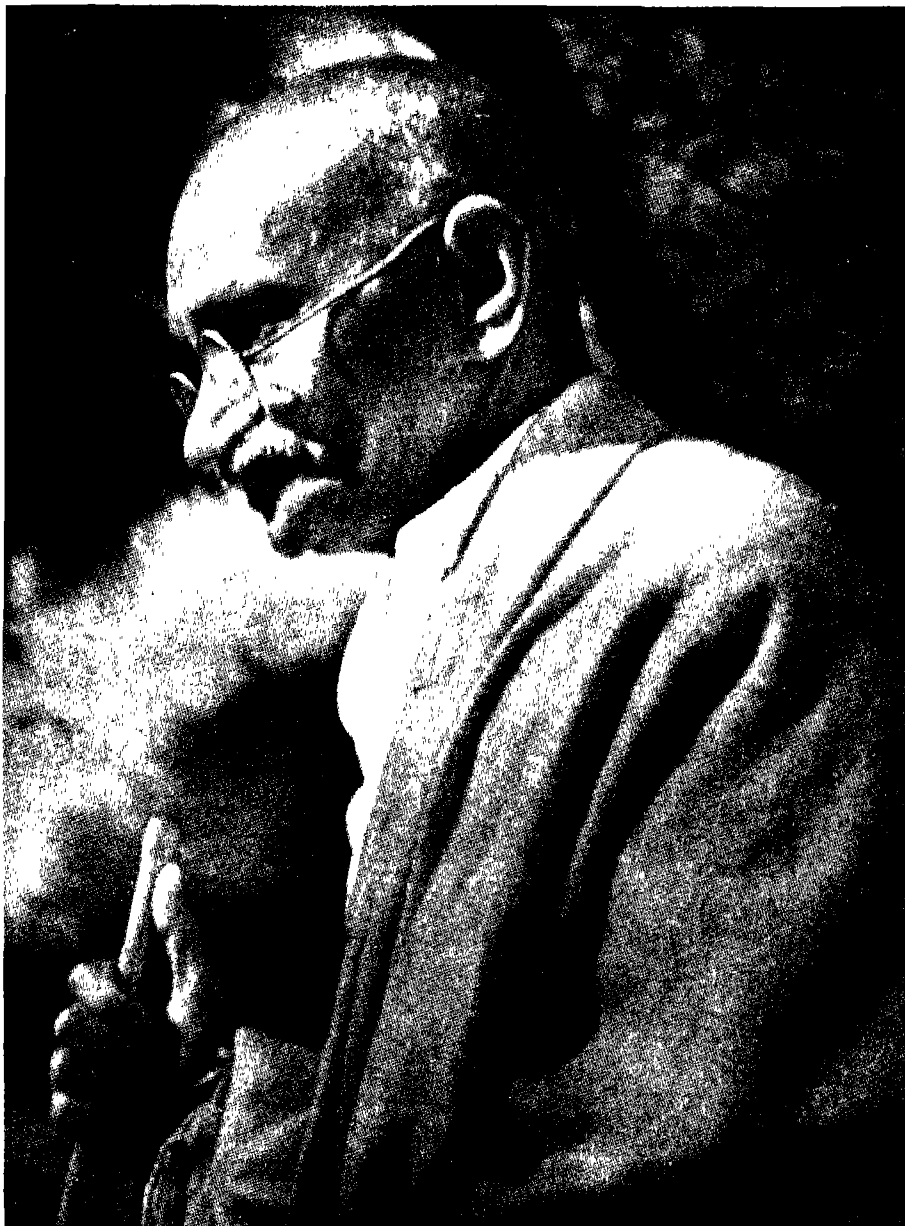
গত ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্ন ৫-৫ মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লীস্থ বিড়লা-ভবন হইতে প্রার্থনা-সভা-মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে সমবেত জনগণ দুইপার্শ্বে সরিয়া তাঁহাকে পথ করিয়া দেন। এই সময়ে জনৈক ব্যক্তি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া মাত্র কয়েক হাত দূর হইতে মহাত্মাজীর প্রতি চারিবার রিভলবারের গুলী নিক্ষেপ করে। তাঁহার বুকে ও পেটে গুলি লাগায় তিনি রামনাম উচ্চারণ করিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যান। জনতার মধ্য হইতে কয়েক জন লোক অগ্রসর হইয়া আততায়ীকে তখনই ধরিয়া ফেলেন। হত্যাকারী মারাঠি-হিন্দু, তাহার নাম—নাথুরাম বিনায়ক গড়সে। গান্ধীজীকে তৎক্ষণাৎ বিড়লা-ভবনে আনয়ন করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু গুলিবিদ্ধ হইবার ৩৫ মিনিট পরই তিনি দেহত্যাগ করেন।

পরদিন বেলা ১১-৪৫ মিনিটের সময় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে একটি সুসজ্জিত গাড়ীতে মহাত্মা গান্ধীর নশ্বর দেহ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর এক অতি বিরাট শোভাযাত্রা পাঁচ মাইল দূরবর্তী যমুনা-তটে উপনীত হয়। অপরাহ্ণ ৪-৫৫ মিনিটের সময় ভারত-সরকারের পূর্ত-বিভাগের তত্ত্বাবধানে রচিত চন্দনকাষ্ঠের চিতায় মহাত্মাজীর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রামদাস গান্ধী বৈদিক প্রথানুসারে অগ্নিসংযোগ করেন। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, লেডি মাউণ্টব্যাটেন এবং তদীয় কন্যা, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন।

বর্তমান জগতে সর্বজনমান্য মহামানব মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক শোচনীয় দেহত্যাগের সংবাদ বিদ্যুৎবেগে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের সকল নরনারী শোকে মুহ্যমান হইয়া সকল কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণে বিশ্বের সকল নরনারী যেরূপ বেদনা-বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ আর দেখা যায় নাই। পৃথিবীর মনীষিমাত্রই এই অতি-মানবের অসাধারণ গুণাবলী কীর্তন করিয়া তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বময় মানুষের মনের উপর মহাত্মাজী কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহা তাঁহার দেহত্যাগের পর বিশেষভাবে বুঝা যাইতেছে।

দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনে মহাত্মা গান্ধীর অবদান অপরিসীম। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে তিনিই গণ-আন্দোলনে পরিণত করেন এবং তাঁহারই নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এরূপ অভূতপূর্ব উপায়ে পৃথিবীর কোন পরাধীন জাতি এ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। তিনি স্বদেশের জন্য প্রকৃতই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া নির্ভীক ভাবে শত নির্যাতন স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রেমের মূর্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ বহুকাল পূর্বে বলিয়াছিলেন, "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারত-বাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই- ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন-রাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" গান্ধীজী ছিলেন স্বামীজীর এই মহতী বাণীর যথার্থ জীবন্তবিগ্রহ।

কেবল ভারতবর্ষে নয় পরন্তু বিশ্বময় মানুষে মানুষে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা মহাত্মা গান্ধীর প্রধান আদর্শ ছিল। ইহা কার্যে পরিণত করিবার উপায়-রূপে তিনি সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের



মহাত্মা গান্ধী

উদ্বোধন, শ্রাবণ সংখ্যা
১৩৫৫

বেঙ্গল অটোটাইপের
সৌজন্যে

অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত "যত মত তত পথ" বাণী নূতন ভাবে প্রচার করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের—বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য যথার্থই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। এ জন্য তিনি কয়েকবার প্রায়োপবেশনে জীবনদান করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় সকল ধর্মের প্রতিই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জড়বাদের পূর্ণ প্লাবনের মধ্যে রাজনীতিতে লিপ্ত থাকিয়াও মহাত্মা গান্ধী ধর্ম তথা ঈশ্বর এবং সত্য অহিংসা ন্যায় ও নীতিকে যে ভাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা যথার্থই অতুলনীয়। জগৎময় অধর্ম হিংসা অসাম্য ও অশান্তির ঘনান্ধকারে এই মহামানব ছিলেন ধর্ম অহিংসা সাম্য ও শান্তির অত্যুজ্জ্বল আলোক-বর্তিকাস্বরূপ। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগে তাঁহার এই দেববাঞ্ছিত ভাবরাশি অশরীরী আকার পরিগ্রহ করিয়া এবং অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উহাদের তীব্র ছটায় পৃথিবীর সকল নরনারীর অন্তর উদ্ভাসিত করুক এবং ইহার ফলে পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ক, ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য। আমরা মর্ত্যজগতে দুর্লভ এই মহামানবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।*

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

* এই সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যার মুদ্রণ প্রায় শেষ হইলে মহাত্মাজী মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। এজন্য অতি সংক্ষেপে এই সংবাদ দেওয়া হইল। পরে আমরা এই দেব-মানবের কর্মবহুল জীবন এবং অমূল্য অবদান সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা করিব।—উঃ সঃ

বিবিধ সংবাদ

স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের স্থান—এ বৎসর পাটনায় ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর বলেন,—"স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানকে আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা চলিবে না। বিশ্বের বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিকল্পে ভারতবর্ষ যাহাতে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে পারে তজ্জন্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মনীষার চরম উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত দেশের সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধি করা ভারতবাসীর পক্ষে অপরিহার্য।

"ইতঃপূর্বে দেশে যে ধরণের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন ছিল উহার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। পূর্বে বিদেশী শাসনকর্তাগণ প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জন্যই দেশের সম্পদ-সমূহের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাইয়াছেন। দেশের জনসাধারণের অর্থনীতিক মানের উন্নতি সাধন করিতে হইলে শিল্প-বিস্তার-প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করিতে হইবে। ভারতে শিল্পোন্নতিকল্পে দেশের বিরাট বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগান বিশেষ আবশ্যক। ইহা ব্যতীত নবলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইলে এবং বাহিরের প্রভাবমুক্ত পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করিতে হইলে দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিতেই হইবে।

"যদিও সত্যানুসন্ধানের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হইয়া থাকে, তথাপি বিজ্ঞানানু-শীলনের ফলে যদি দারিদ্র্য ও কষ্টের লাঘব না হয় অথবা ব্যবহারিক কোন উপকার না পাওয়া যায় তাহা হইলে বিজ্ঞানচর্চা ব্যয়সাধ্য বিলাস বলিয়াই পরিগণিত হইবে এবং কোন রাষ্ট্রই এতদুদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য করিবে না।

"অতঃপর ভারতীয় ভাষাসমূহের সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সৌকর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে এই ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষকদিগকে এতৎসম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করা আবশ্যক।"

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের জাতীয় সেনা-দল গঠন—পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত এলাকায় জনরক্ষা ও বে-আইনী মাল-চালান নিবারণের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী-গঠন-পরিকল্পনার অংশ-রূপে পশ্চিম বঙ্গ সরকার "জাতীয় সেনাদল" সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে

এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং বে-আইনী মাল চালান-নিবারণে পুলিসের সহায়তার জন্য সীমান্ত এলাকার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারী করা হইতেছে। প্রস্তাবিত জাতীয় সেনাদল সরকারের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হইবে।

যুক্ত-প্রদেশে জমিদারী ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা—পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুক্ত-প্রাদেশিক জমিদারী-প্রথা-উচ্ছেদ কমিটির এক সভায় প্রদেশের বাইশ লক্ষ জমিদারের জন্য এক শত কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহাদের আয় পাঁচ শত টাকার উর্দ্ধে তাঁহাদের শতকরা আড়াই টাকা সুদে চল্লিশ বৎসরের বণ্ড এবং যাঁহাদের আয় পাঁচ শত টাকার নিম্নে তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের টাকা একসঙ্গেই দেওয়া হইবে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট প্রদেশকে অর্থ-সাহায্য করিবেন। যাঁহাদের মোট আয় পচিশ টাকা তাঁহারা আয়ের পচিশ গুণ এবং যাঁহাদের আয় পাচ হাজার হইতে দশ হাজার টাকা তাঁহারা আট গুণ ক্ষতিপূরণ পাইবেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন—এই সংখ্যায় শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভূষণ গুপ্তের অংকিত কয়েকটি চিত্র প্রকাশিত হইল। প্রচ্ছদপদটি মণীন্দ্র বাবু অংকন করিয়াছেন। এ জন্য আমরা উভয় শিল্পীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর—আবেদন

সর্ব্বধর্ম্মের প্রতীক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-ক্ষেত্র কামারপুকুর গ্রাম বর্ত্তমানে জগতের সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির নিকট একটি মহাতীর্থ।

সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বোধ করিতেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ ও বাণীই এই দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ জগতে শান্তি আনয়নের একমাত্র উপায়। তাঁহার জন্মস্থান ভারতের একটি জাতীয় সম্পদ এবং উহার সংরক্ষণ ভারতবাসীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

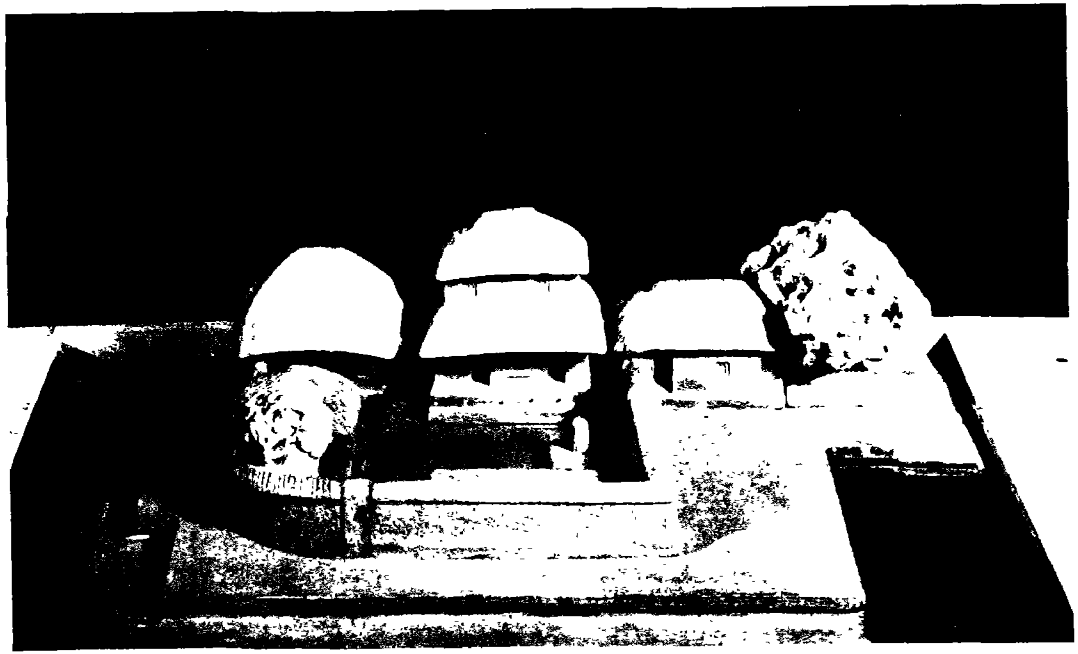
উক্ত স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের জন্য অন্য ওয়ারিশগণের সহিত সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী ঐ স্থানটুকু শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎসংলগ্ন বাস্তুভিটা ও অন্যান্য জমি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রয় করিতে অসমর্থ হওয়ায় মঠ স্থানাভাব বশতঃ এতকাল শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর ইচ্ছাপূরণ করিতে পারেন নাই।

ইদানীং গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে রামকৃষ্ণ মিশন ঐ বাস্তুভিটাসহ প্রায় ১৬ বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছেন এবং মঠ ও মিশন ঐ স্মৃতি-মন্দির-নির্ম্মাণ ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্য দ্বারা কামারপুকুর গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তথায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ঐ স্থান পরিদর্শনপূর্ব্বক উক্ত স্মৃতি-মন্দিরের ও বাস্তুভিটা সংরক্ষণের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল কাজের জন্য অন্ততঃ লক্ষমুদ্রার প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারা যেন মুক্তহস্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিরক্ষা ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ইচ্ছাপূরণে আমাদিগকে সাহায্য করেন। সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে:—

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

(২) কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

স্বামী মাধবানন্দ, সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মস্থান, কামারপুকুর।

উদ্বোধন, স্বর্ণ জয়ন্তী
১৩৫৫

শ্রীনন্দলাল বসু কৃত
মৃন্ময় প্রতিকৃতি হইতে গৃহীত